KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৪০৮/১, মেডিকেল পার্ক, কল-৫৫
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভব (BIVAV)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : 18/1 18/2 18/3 18/4 19/2	Year of Publication : Sept - 1995 Jan - March 1996 April - Sept 1996 Feb - 1997 Oct - 1997
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, আরতি সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা ১৪০৩

বিভাব

প্রধান সম্পাদক ।। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদক ।। আরতি সেনগুপ্ত

বিভাব

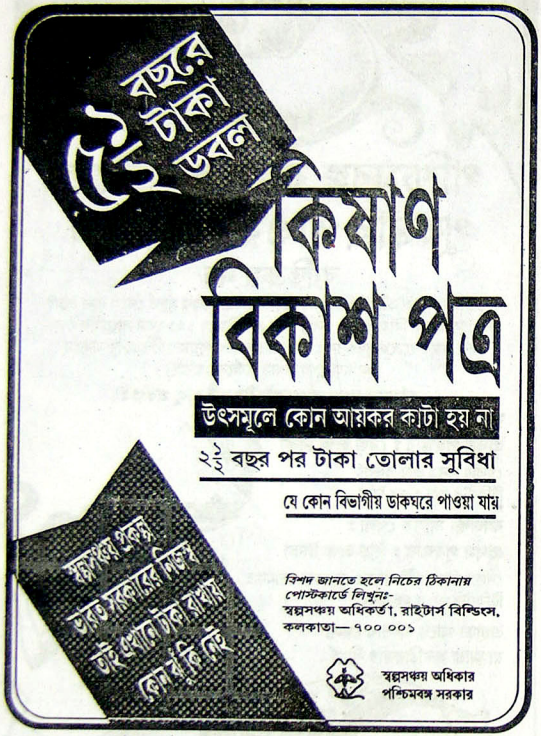

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদকীয়

বিভাবের বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা প্রকাশিত হলো। সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত নানা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এবারের বিভাবের আকর্ষণ। বহুকৌণিক এই সংখ্যাটি পাঠককে খুশি করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

এই সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ সদ্য প্রয়াত হরিসাধন দাশগুপ্তর প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছবি "একই অঙ্গে এত রূপ"-এর সম্পূর্ণ চিত্রনাট্যের মুদ্রণ। মূল ছবিটি থেকে অপরিসীম পরিশ্রমে অতিদ্রুত চিত্রনাট্যটি তৈরী করে দিয়েছেন নন্দনের লক্ষণ ঘোষ যিনি বিভাবের ফিল্ম সংখ্যাটিরও একাধিক চিত্রনাট্য সরাসরি ছবি থেকে অনুলিপি তৈরী করে দিয়েছিলেন। তাকে জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা। চিত্রনাট্যটি প্রকাশের অনুমতি দেওয়ার জন্য হরিসাধনপুত্র রাজা দাশগুপ্তকেও আমাদের কৃতজ্ঞতা।

এ সংখ্যার প্রায় প্রতিটি লেখারই এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ রয়েছে। আলাদা আলাদা উল্লেখ তাই অপ্রয়োজনীয়। তবে রবীন্দ্রসদনে প্রয়াত শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রদত্ত তাঁর জীবিতকালের শেষ ভাষণ "কবির ভূমিকা"-র অনুলিপি ছাপতে পেরে আমরা খুশি। ভাষণটি ছিল এক্সটেমপোর, পূর্বপ্রস্তুতিতে লিখিত ভাষণ নয়। অনুলিপিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সৌজন্যে মুদ্রিত হল।

আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ধরিত্রী বসুকে প্রয়াত সমরেশ বসুর অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ মুদ্রণের অনুমতির জন্য। বিষ্ণু দে-র কবিতা দুটির জন্য কবির কনিষ্ঠা কন্যা উত্তরা বসুর কাছেও আমাদের কৃতজ্ঞতা।

জীবনানন্দের মূল কবিতাটি উদ্ধার করেছেন কবি ভূমেন্দ্র গুহ।

একটি বিশেষ নিবেদন, এবার থেকে বছরে একটি সংখ্যা শুধু কবিতা সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে। গুচ্ছ কবিতা, একক কবিতা সহ সাম্প্রতিক কবিতার খবরাখবর ও আলোচনা সমৃদ্ধ কবিতা সংখ্যাটি প্রতি বছর কবিপক্ষে প্রকাশিত হবে। বিভাবের অন্য কোন সংখ্যায় আর কবিতা ছাপা হবে না।

কিছুদিন আগে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান জারক-কেন্দ্র কফি হাউসটির পরিচালনাভার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে কফি হাউস কো-অপারেটিভ পরিচালক মণ্ডলীর হাতে তুলে দিলেন শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বাংলার প্রতিটি লেখক

শিল্পী এর জন্য সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। তবে বহু বছরের পুরানো এই কফি হাউসটির সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের দিকে যাতে একই সঙ্গে লক্ষ্য রাখা হয় সেই প্রার্থনা। না হলে সরকারের এই সাধুপ্রয়াস বেশিদিন কার্যকরী থাকবেনা। কিছুদিন আগে বাংলা আকাদেমীতে "সোমেন চন্দ স্মৃতি পুরস্কার" উৎসবটি অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের গল্পকারদের জন্য নির্দ্দিষ্ট এই পুরস্কারটি ইতিমধ্যেই এক বিশেষ তাৎপর্যে উত্তীর্ণ। এই পুরস্কারের ব্যবস্থাপক শ্রদ্ধেয় কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তকে অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন জানাই তরুণ লেখক কামাল হোসেনকে, যিনি এবারের পুরস্কার পেলেন। পরিশেষে বিভাবের প্রতিটি পাঠক, শুভানুধ্যায়ী ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা। শুরু থেকেই তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিলে বিভাব একুশ বছর পর্য্যন্ত প্রকাশনা অব্যাহত রাখতে পারতো না।

বিভাব সম্পাদকমণ্ডলী

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

শরৎকালীন সংখ্যা ১৪০৩ বিংশ বর্ষ

অপ্রকাশিত

জীবনানন্দ দাশের 'এই সব পাখী' কবিতার পাণ্ডুলিপি ও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ১ ভূমেন্দ্র গুহ

বিষ্ণু দের অপ্রকাশিত দুটি কবিতা ৭

আলোচনা

কবির ভূমিকা: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ১০ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সিগি উ-অপ্ সাহেব ৮৩ বন্দনা সান্যাল

প্রবন্ধ

জাপান ১৪ অশোক মিত্র

রামপ্রসাদের প্রথম ও একমাত্র ছবি এবং ডেভিস ৭৭ বাঁধন সেনগুপ্ত

পত্রাবলী

সমরেশ বসুর অপ্রকাশিত পত্রাবলী ৪৭

বিদেশী সাহিত্য

ফ্লবেয়ার প্রসঙ্গে বোদলেয়ার ৬১ নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

পুরাতনী

কলকাতার কলের গান ও টকিং মেশিন ৭২ কল্যাণী দত্ত

কবিতাগুচ্ছ

অমিতাভ গুপ্তর কবিতা ৯০ সুমিতা চক্রবর্তী

কাজল চক্রবর্তীর কবিতা ৯৬ মল্লিনাথ গুপ্ত

অরুণ চক্রবর্তীর কবিতা ১০০ মল্লিনাথ গুপ্ত

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কবিতা ১০৪ কৃষ্ণা বসু

গল্প

রক্ত এবং অশ্রু ১১১ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কোথায় পালাবে তুমি ১২৩ স্বপ্নময় চক্রবর্তী

শেষ বাঙালি ১২৯ এষা দে

দাহ ১৪১ মৃত্যুঞ্জয় সেন

ধর্মের কল এবং কলের ধর্ম ১৫৫ সুব্রত মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা নেই ১৬৮ সুনীল দাশ

অন্বেষণ ১৭৭ কামাল হোসেন

বৃক্ষ-বন্দনা ১৮৭ হারুন হাবীব

ক্রোড়পত্র: উপন্যাস
কুশপুত্তলি ১ কল্যাণ মজুমদার
ক্রোড়পত্র: নাটক
ন্যায়মূর্তি ৬৩ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
ক্রোড়পত্র: চিত্রনাট্য
একই অঙ্গে এত রূপ ১৩৫ পরিচালনা: হরিসাধন দাশগুপ্ত
শ্রদ্ধানিবেদন
হরিদা ১৬৭ বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
ইতিহাস আমাকে উপেক্ষা করেছে ১৬৮ অংশু শূর
'পরাণ সখা বন্ধু হে আমার ১৭২ সুনেত্রা ঘটক
হরিদা ১৭৪ প্রবোধকুমার মৈত্র

সম্পাদকমণ্ডলী:
পবিত্র সরকার বন্দনা সান্যাল চন্দ্রশেখর রুদ্র
ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল দেবীপ্রসাদ মজুমদার সাধন সরকার

প্রধান সম্পাদক:
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদক:
আরতি সেনগুপ্ত

প্রধান যোগাযোগকেন্দ্র ও লেখা পাঠাবার ঠিকানা:
সম্পাদকীয় দপ্তর
'বিভাব'
৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলকাতা ৬৮

প্রচ্ছদ:
রনেন আয়ন দত্ত

[redacted]

সডাক: চল্লিশ টাকা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা ৬৮ থেকে প্রকাশিত এবং টেকনোপ্রিন্ট, ৭ সুষ্টিধর দত্ত লেন, কলকাত ৬ থেকে মুদ্রিত।

ভূমেন্দ্র গুহ

—

জীবনানন্দ দাশের 'এই সব পাখী' কবিতার পাণ্ডুলিপি ও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব

জীবনানন্দর 'এই সব পাখী' কবিতাটির পাণ্ডুলিপি কী ক'রে যে আমার কাছে থেকে গিয়েছিল, আশ্চর্য! আমি এ-রকম নিঃসন্দিগ্ধ ছিলুম যে, ষাট সালের শেষের দিকে জীবনানন্দর তাবৎ পাণ্ডুলিপি থেকে আমি নিজেকে পরিপূর্ণ সরিয়ে নিতে পেরেছি; এখন দেখছি, এই ছেঁড়া সুতোটুকু তবু থেকে গিয়েছে।

অনিবার্য জীবনযাপনের জন্য পরীক্ষাপাশের দলিলদস্তাবেজের কাগজপত্র ইত্যাদি তন্মুহূর্ত ভারি সব ফরমান সযত্নে জমিয়ে রাখতেই হয়, সেই সবের দর্পিত অবস্থানের সঙ্গে এই ক্ষীণাঙ্গ দুর্বল পাণ্ডুলিপিটিও কী ভাবে যে থেকে গিয়েছে! এখন যখন সেই সব শিলমোহর লাঞ্ছিত দ্বারপালদের দাপট ফুরিয়েছে, তাদের বিদায় করতে গিয়ে দেখছি যে, পাণ্ডুলিপিটি ক্ষতবিক্ষত দেহে একসঙ্গে রয়েছে তবু, যথেষ্ট ভঙ্গুর যদিও, তবু দাঁড়িয়ে থাকার দাপট তো তার তিলপরিমাণ কমে নি।

পাণ্ডুলিপিটি যে-কবিতার, তা আমারই হঠকারিতায় এত দিন গুপ্ত হয়ে ছিল, সে তো এক গভীর অপরাধবোধের উৎসস্বরূপ। কিন্তু এ-ও দেখছি যে, মূল পাণ্ডুলিপি যদিও এটিই, তবু আমাকে স্বস্তি দেবার জন্যই যেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ'-তে অন্য কোনো প্রকারে কবিতাটি একই নামে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। তার ফলে এই একটা বিশেষ স্বস্তিদায়ক ঘটনা ঘটেছে যে, নতুন আবিষ্কারের কৃতিত্বের দাবি আমাকে করতে হচ্ছে না।

অবশ্য দেবীপ্রসাদের সংগৃহীত কবিতাটি, [জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৭৩৮-৭৪০, ভারবি-প্রকাশিত] পত্রস্থ কবিতাটি থেকে বেশ দীর্ঘ, পাঠেও কিঞ্চিৎ হেরফের আছে, পাঠক মিলিয়ে প'ড়ে দেখলেই বুঝবেন। কাব্য-সংগ্রহের কবিতাটিতে ০৮ থেকে ৩৮ পঙক্তি অতিরিক্ত পাওয়া যাচ্ছে; এই পঙক্তি-গুলির ভিতরে পাখিরা যদিও আছে এবং নেই, তবু, পাণ্ডুলিপির কবিতাটির সঙ্গে সংগ্রহের কবিতাটি সামান্য মনোযোগসহকারে মিলিয়ে পড়লেই অনুপলব্ধ থাকবে

না যে, বাড়তি পঙক্তিগুলি সম্ভবত অন্য কোনো ভাবনার কবিতার অংশবিশেষ, ভ্রমক্রমে এই কবিতাটিতে সংযুক্ত হয়েছে। এই ভ্রম যে ইচ্ছাপ্রযুক্ত নয়, নিতান্তই অনবধানতার ফসল, তা মেনে নিতে কারুরই আপত্তি হবার কথা নয়, বিশেষত যখন এই কথা স্মরণ করা যাবে যে, 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ'-এর তুল্য বড়ো কাজ প্রায় একাহাতে সম্পাদিত হয়েছে; একক-পরিশ্রমে নির্মিত পাণ্ডুলিপিতে এতাদৃশ অঘটন অস্বাভাবিক নাও হতে পারে।

কবিতাটি সম্ভবত উনিশশো চৌত্রিশ বা তার আগে-পরে কোনো সময়ে লেখা। 'মোটরকার' নামে একটি কবিতার জীবনানন্দর স্বহস্তনির্মিত পাণ্ডুলিপির কথা আমরা জানি, যে-পাণ্ডুলিপিটি কাগজে লিপিতে ভঙ্গুরতায় কীটদষ্টতার চরিত্রে বর্তমান পাণ্ডুলিপিটির সহজ যমজ, এবং সেই পাণ্ডুলিপিতে কোনো জায়গায় 1934 বছরটির উল্লেখ আছে।

তা হোক বা না হোক, এ-বিষয়ে নির্দ্বিধ হতে পারা যায় যে, এই কবিতাটি যখন লেখা হয়েছিল, তখন কলকাতায় 'সারা দুপুর পাখীগুলো দূরের থেকে আরো দূরে কোথায় চলে' যেত, এবং তার ফলে শহর দরিদ্র হয়ে পড়ত; সে-সব পাখি কলকাতায় সে-সময়ে ছিল; এখন যারা কলকাতার পাখি, যদি আদৌ কোনো পাখি থেকে থাকে, তাহলে, তারা 'দূরের থেকে আরো দূরে' যায় না, এবং ফলত শহর সে-রকম ভাবে দরিদ্র হয়ে পড়েও না। কলকাতার সংজ্ঞা বাহিরে অন্তরে সঠিক নেই আর, এখন শহর স্বভাবত দরিদ্র হয়েই আছে, এবং আছে।

এই সব পাখী

সারাদিন পাখীগুলো জোর আলো থেকে জোর আকাশে যাবে কে কবে!
শহর – কলকাতার শহর যেন পাখীদের হয়ে থাকে;
পাখীদের আমি সবচেয়ে বড় ব্যাপারটাকে মনে করি;
কুইনিনের মাদুরের মত সব রকম, –
কিন্তু কলকাতা কি শুধু কুইনিনালাদের?

কলকাতা আমাদের,
কলকাতা – কলকাতার পাখীদের!

সারা দুপুর পাখীগুলো দূরের থেকে আরো দূরে কোথায় চলে যায়?
শহর দরিদ্র হয়ে পড়ে,
শহর বিপন্ন হয়ে পড়ে!

ধীরে ধীরে বিকেলের নরম আলো
নরম আলো পৃথিবীতে নামে;
ঝিঁঝিঁর দলে তখন কাজ মত্ত
কাজায় ঘুরে;
বাতাস তখন কম – আলো কম;
পাখীদের তখন পৃথিবীতে নামবার সময়;
র রং তখন বিষাদী,
া রং সোনালি,
র রঙের ধোয়া শুধু তখনই

ক্লাইভ্ স্ট্রীটের জানালাগুলো সচকিত হয়ে ওঠে :
পৃথিবী কোন্ জিনের সমুদ্রের ভিতর চলে গেল !

পাখীরা তখন আকাশ থেকে নামে,
বলে তারা : 'এমনতর কলকাতায় থাকতে পারা যায়;
এই সন্ধ্যার সমুদ্রে
আমরা গোলাপের পাপড়ির মত খসে পড়ছি।'

অনেকখানি দূরে ছড়িয়ে দিয়েছি আমি
হারাদিনে পাখীরা আলো;
আলো আর পাখীরা
ডুমুরের ডুমু ডুমু দেবদারু পাতার ভিতর ডুবে যাচ্ছে;
দেবদারু পাতার ফাঁক দিয়ে সোনার ডিমের মত সূর্য্যি,
রুপোর ডিমের মত চাঁদ,
শিশির ঝরছে;

এই কি কলকাতা?
এই তো কলকাতা!

শ্রী জীবনানন্দ দাশ

এই সব পাখী

সারাদিন পাখীগুলো কোন্ আকাশ থেকে কোন্ আকাশে থাকে কে জানে !
শহর—কলকাতার শহর যেন পাখীহীন হয়ে থাকে ;
পাখীদের আমি সব চেয়ে বড় ক্যাপিট্যাল মনে করি ;
জুটমিলের মালিকদের মত অন্যরকম,—
কিন্তু কলকাতা কি শুধু জুটওয়ালাদের ?

কলকাতা আমাদের,
কলকাতা—কলকাতাও পাখীদের।

সারা দুপুর পাখীগুলো দূরের থেকে আরো দূরে কোথায় চলে যায় !
শহর দরিদ্র হয়ে পড়ে,
শহর নির্জ্জন হয়ে পড়ে।

ধীরে ধীরে বিকেলের নরম আলো
নরম আলো পৃথিবীতে নামে ;
ভিস্তির জলে তখন রাস্তা ঠাণ্ডা
রাস্তায় ছায়া ;
ব্যস্ততা তখন কম—আরো কম ;
পাখীদের তখন পৃথিবীতে নামবার সময় ;
[…]র রং তখন পিঁয়াজী
[… র রং সোনালি,
[…]র রঙের সময় শুধু তখন ;
ক্লাইভ্ স্ট্রীটের জানালাগুলোও সচকিত হয়ে ওঠে :
পৃথিবী কোন্ জিনের সমুদ্রের ভিতর চলে গেল !

পাখীরা তখন আকাশ থেকে নামে,
বলে তারা : 'এমনতর কলকাতায় থাকতে পারা যায় ;
এই সন্ধ্যার সমুদ্রে
আমরা গোলাপের পাপড়ির মত খসে পড়ছি।'

অনেক ক্ষণ ছাদে দাঁড়িয়ে দেখি আমি
চারদিকে পাখ্‌না পালক ;
পালক আর পাখ্‌না
কলেজের উঁচু উঁচু দেবদারু গাছের ভিতর ডুবে যাচ্ছে ;
দেবদারু পাতার ফাঁক দিয়ে সোনার ডিমের মত সূর্য্য,
রূপোর ডিমের মত চাঁদ,
শিশির ঝর্‌ছে ;

এই কি কলকাতা ?
এই তো কলকাতা।

বিষ্ণু দের অপ্রকাশিত দুটি কবিতা

যায় প্রতিদিন যায় রে
বছর বছর আমার জীবনে
ছড়ালে রঙের স্ফুলিঙ্গ
সেই হৃদয়ের আগুনে রাঙিয়ে
তোমায় আমার আরতি।
তাই তো তোমায় প্রতিদিন
এই আকুতি
যেহেতু আমার জীবন
আমারও হয়ে যাবে জানি হায় রে
শুভ্র শীতল সুদূর গৌরীশৃঙ্গ।

৬.৯.৬২

কবি তাঁর স্ত্রী প্রণতি দে-কে রবীন্দ্রনাথের "স্ফুলিঙ্গ" কাব্যগ্রন্থটি উপহার দিয়েছিলেন। তাতে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে এই কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন।

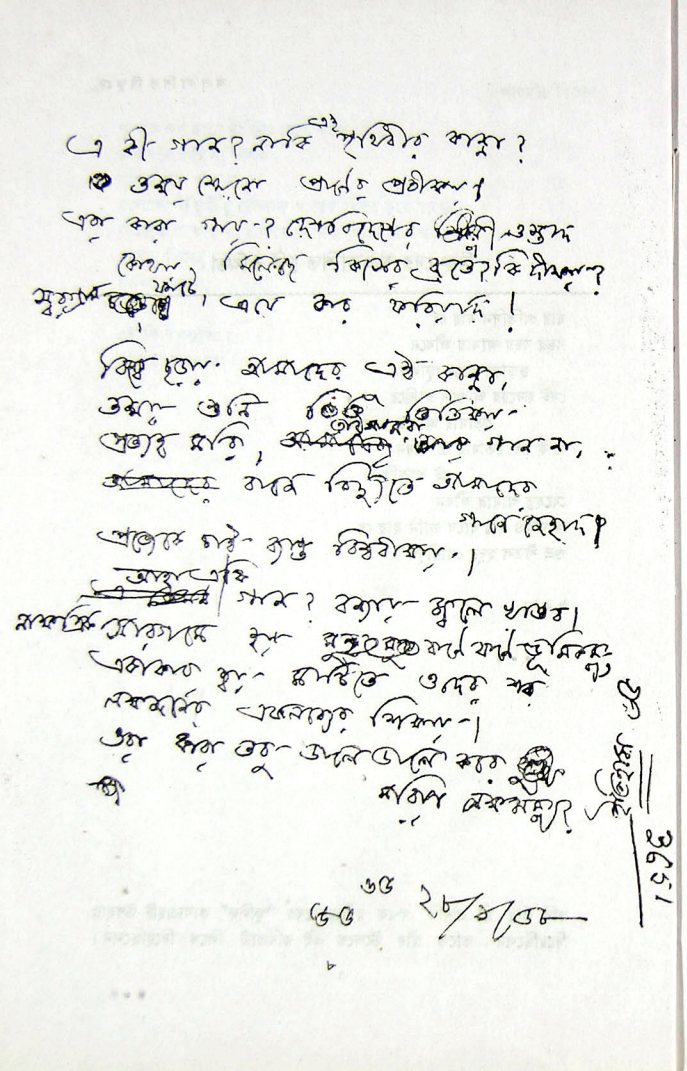

এ কী গান ? নাকি এই পৃথিবীর কান্না ?
তন্ময় শোনো প্রাণের প্রতীক্ষায়।
এরা কারা গায় ? দেশ বিদেশের ওস্তাদ
কোথায় মিলেছে কিসের ব্রতে ? কি দীক্ষায়
স্বরগ্রাম কাটে, এযে কার ফরিয়াদ !

বিশ্বে ছড়ায় আমাদের এই কান্না,
তন্ময় শুনি তিক্ত তিতিক্ষায়
প্রত্যহ মরি, তাই আমাদের গান না,
বাজে বিদ্যুতে আমাদের গানে জেহাদ
প্রত্যেকে চাই ব্যাপ্ত বিশ্ববীক্ষায়

আহা একি গান ? বন্যায় জলে খাওব।
নাক্ষত্রিক সারগমে হয় ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প,
একাকার হয় মাটিতে ওদের শব
লক্ষ্যজনের একলব্যের শিক্ষায়।
ওরা কারা তবু ডালে ডালে করে
মরিয়া লক্ষসম্প্য ?

২৮.১.৫৮

এই কবিতাটির একটি অন্যরূপ আগে প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতার কোনো নাম নেই—কবিকন্যা উত্তরা বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

—

কবির ভূমিকা : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য

বন্ধুগণ—আপনারা আজকের এই অনুষ্ঠানে বলবার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন, আমি খুব সম্মানিত বোধ করছি। রবীন্দ্রনাথের আজকে মৃত্যুদিন। অর্ধ শতাব্দী পার হয়ে গেছে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। বলতে গেলে ৫৩ বছর পূর্ণ হল তিনি চলে গেছেন। তাহলে তাঁর বয়স আজকে ১৩৩ বছর। কবির কোন বয়স নেই, যতদিন তাঁর ভক্ত আছে, কাব্যরসিক আছে, ততদিনই তাঁর জীবৎকাল। তাই জীবন শেষ হয়নি, তার প্রমাণ আপনারা। আজ যে এখানে আপনারা উপস্থিত কবির গান শোনবার জন্যে, কবির কবিতার আবৃত্তি শুনবেন। কবি সম্পর্কে হয়তো নানান জনের কথা শুনবেন। এই যে আপনাদের আগ্রহ, এই আগ্রহের মধ্যেই কবি বেঁচে থাকবেন। যতদিন আগ্রহ থাকবে ততদিনই তাঁর জীবৎকাল। আশা করছি বহু শতাব্দী ধরে চলবে—সকল মহাকবিই আজ পর্যন্ত বেঁচে আছেন। রবীন্দ্রনাথও তেমনি বেঁচে থাকবেন। রামায়ণ ও মহাভারতের কবি যেমন কবিকে ঋষি হিসাবে দেখেছে। বাল্মীকী তিনি মুনি ছিলেন কি না জানিনা। কবি বলেই ঋষি বলা হয়েছে। রামায়ণ মহাভারতের কবির মতই তিনি বেঁচে থাকবেন। তাকে আমরা ঋষি হিসাবে দেখেছি। তিনি অতীতকে দেখেছেন, বর্তমানকে জানেন আবার ভবিষ্যতকে কল্পনার মাধ্যমে জানতেন। তিনি হচ্ছেন দ্রষ্টা, তিনিই সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ।

২,৫০০ বছর আগে বুদ্ধ যখন আমাদের দেশে তখন গ্রীক দেশে ছিলেন সক্রেটিস। সক্রেটিস কিছু লিখে যান নি। তিনি শুধু মুখে বলতেন। তাঁর অনেক শিষ্য ছিল তার মধ্যে প্লেটো ছিলেন অন্যতম। তিনি অর্থাৎ প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রের একটি ছবি তুলে ধরেছেন তার Republic গ্রন্থে। রাষ্ট্রনায়ক কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, পরামর্শদাতা কিভাবে পরামর্শ দেবে, শিক্ষাদাতা কিভাবে শিক্ষা দেবে, যোদ্ধারা কিভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করবে তার সুন্দর চিত্র তুলে

[এই ভাষণটি ১৪০১ সালে রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিবসে প্রদত্ত। জীবিতকালে এটিই তার শেষ ভাষণ। —সম্পাদক]

ধরেছেন। প্রত্যেকের ইতিকর্তব্য বর্ণনা করেছেন।

তখন গ্রীক দেশ ছিল একটি নগররাষ্ট্র—City State. পরে অবশ্য প্লেটো এথেন্সে জীবন-যাপন করেন। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা বা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল এই এথেন্স।

প্লেটো কবি সম্বন্ধে একটি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। কবি যদি তোমার নগরে আসে তাকে খুব সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করবে, ফুল দিয়ে সংবর্ধনা করবে, গুণকীর্তন করবে, তাকে সময়োচিত শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে তাকে সবিনয়ে বলবে এবার আপনি আমাদের রাজ্য ছেড়ে চলে যান। পশ্চিম দেশ বলেছে প্লেটোই সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি। তাকে বলা হয়েছে 'Plato is philosophy, philosophy is Plato'. সেই দার্শনিক এই কথা বলেছেন!

অনেকদিন ইউরোপ এই কথা জানত না—গ্রীস দেশেই আবদ্ধ ছিল। গ্রীসের সভ্যতার সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতার কোন মিল ছিল না। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মান, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম—এই দেশ নিয়ে ছিল পশ্চিম ইউরোপ। কনস্টান্টিনোপলে তখন বড় বড় পণ্ডিতরা বাস করত। গ্রীক রাষ্ট্রের অধীন ছিল এই কনস্টান্টিনোপল।

Banaras যেমন Ancient Indian learning কেন্দ্রস্থল ছিল। তেমনি শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল এথেন্স। তার পরের স্থান অধিকার করল এই কনস্টান্টিনোপল। পঞ্চদশ শতকে তুর্কীরা এই কনস্টান্টিনোপল দখল করে। আজ থেকে প্রায় ৫০০-৬০০ বছর আগে, সেখান থেকে গ্রীক পণ্ডিতরা তাদের পাণ্ডুলিপি নিয়ে পশ্চিম ইউরোপে পালিয়ে এলেন।

এর পরই পশ্চিম ইউরোপ গ্রীক সভ্যতার স্বাদ পেল। তারা প্লেটো পড়ে বিস্মিত হল, তারা সুসভ্য হল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী—সমস্ত পশ্চিম ইউরোপে এক বিরাট বাদানুবাদের সৃষ্টি হল। প্লেটো কবিকে এভাবে বললেন তার কারণ কি? ইংল্যাণ্ডের কবি শেলী বললেন প্লেটো কবির প্রতি অবিচার করেছেন, শেলী কবিকেই শক্তিমান ও জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বলেছেন। প্লেটো অনুগামীরা বলেছেন আসলে প্লেটো রাষ্ট্রঅন্ত প্রাণ ছিলেন, রাষ্ট্রকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। কবি হচ্ছেন খামখেয়ালী প্রকৃতির তিনি রাষ্ট্রের খেয়ালে চলেন না। কবি আপন বোধ-বুদ্ধি মত চলবে। রাষ্ট্র পরিচালক যা বলবে রাষ্ট্র তা মেনে চলবে। এখানে প্লেটো কবিকে উচ্চস্থান দিয়েছেন। কবির কথার মধ্যে একটা মাদকতা আছে, শক্তি আছে, কবি যদি কাব্যের ভাষায় বলেন তার মধ্যে এমন আকর্ষণ থাকবে যে সমস্ত দেশ তার কথাই শুনবে, রাষ্ট্রের কথা শুনবে না। তাহলে রাষ্ট্রের শাসন বানচাল হয়ে পড়বে। এইজন্যই প্লেটো কবিকে প্রশ্রয় দিতে না করেছেন। প্লেটো অনুরাগীরা এই কথাই বলতে চেয়েছেন প্লেটো কবিকে ছোট করতে চান নি।

শৈলীও যুক্তি দিয়েছেন কবিই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ। প্লেটো বলেছেন রাষ্ট্রনায়ক যে পথ বলে দেবেন সেটাই শ্রেষ্ঠ পথ। কবিকে তিনি এখানে স্থান দিতে চান নি।

এ প্রসঙ্গে এসে যাচ্ছে আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথের কথা।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা যায় রাষ্ট্র-পরিচালক বা Establishment-এর মতের কোন মিল হয়নি। বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিনচন্দ্র পাল—এসব নেতা ইংরাজদের ঘোর বিরোধিতা করেছেন, সমালোচনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথও এদের উৎকৃষ্ট সহযোগী হয়েছেন।

সিপাহীরা যে বিদ্রোহ করেছে সেটা কোন রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না। এটা ছিল একটি স্বাধীনতা আন্দোলন। যাকে বলা যায় সশস্ত্র বিদ্রোহ। রাজনৈতিক আন্দোলন বা অভ্যুত্থান বলতে যা বোঝায় তা ছিল ১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলন। এটাই প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিনচন্দ্র পাল। এর প্রধান অস্ত্র ছিল রবীন্দ্রনাথের গান।

"ওদের বাধন যতই শক্ত হবে"—ধরণের গান

শুধু গানের সাহায্যেই সমস্ত দেশে উত্তেজনার সৃষ্টি হল। কবি যদি কথা বলেন মানুষ রাষ্ট্রনায়কের কথা শুনবে না। দুই বাংলা এক হয়ে গেল। এখানেই ইংরাজদের প্রথম পরাজয়। তাহলে প্লেটো যা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের বেলায় তা প্রমাণিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীকে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট Recognise করেনি, এমনকি কোনরকম help-ও করেনি। ঠিক হয় শান্তিনিকেতন থেকে পাশ করলে চাকুরী হবে না। এক circular জারী করা হয় যে কোন সরকারী চাকুরে তার ছেলেমেয়েদের শান্তিনিকেতনে পড়াতে পারবে না। বলতে গেলে সব দিক দিয়ে বিরোধীতা।

এই স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি আরেকটি অগ্নিযুগের সৃষ্টি হল—অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ-এর তত্ত্বাবধানে গোপনে বোমা তৈরী হতে থাকল, কেমন করে স্বাধীন করতে হবে—নানা শিক্ষার মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হল। বিভিন্ন দল যেমন—যুগান্তর দল, অনুশীলন দল এই সব দল থেকে তরুণ ছেলেদের Recruit করা হত। তাদের নিয়ে class হত। দেশের জন্য কি কি করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে, গান শুনিয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া হত।

এখানে একটি গল্প বলি—১৫-১৬ বছরের একটি খুব তেজীয়ান ছেলেকে জোটানো হয়েছে। তাদের কবিতা শোনানো হচ্ছে—রবীন্দ্রনাথের বর্ষশেষ কবিতা।

"ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে না হেরে প্রেয়সীর অশ্রুজল"।

তোর জন্য ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নয়—ছেলেটি কবিতা শুনে কাঁদছে, সে রবীন্দ্রনাথের নাম শোনেনি। ছেলেটি বলছে রবীন্দ্রনাথ একথা লিখেছেন—তিনি সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ!

সবশেষে বলি যতদিন তাঁর ভক্তরা থাকবে তাঁর জীবৎকাল বাড়িয়ে যাবে। তাঁর অর্ধশত কেন আরো বহুশতাব্দী—অনন্তকাল তিনি বেঁচে থাকুন আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রেকর্ড করা ভাষণ থেকে অনুলিপি করে দিয়েছেন দীপঙ্কর মজুমদার—তার কাছেও আমাদের কৃতজ্ঞতা। কয়েকটি যায়গায় বার্ধক্যজনিত কারণে শ্রদ্ধেয় হীরেন দত্তর কথা অস্পষ্ট। সে কারণে মাঝে মাঝে অতি অল্প একটি দুটি লাইন আমাদের বাধ্য হয়েই বাদ দিতে হয়েছে। এতে বক্তব্যের কোন হেরফের ঘটেনি।

সম্পাদক: বিভাব

অশোক মিত্র

—

জাপান

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ডাঃ রায় মাসখানেক জাপানে থেকে ফেরার পর যেদিন অফিসে এলেন, বিকেলে আমাকে ডেকে বললেন: 'সত্যেন রায় ও বিনয় দাশগুপ্তকে বলেছি, তুমি, বচু, উদয়ন আর নির্মল চারজন জাপানের শিল্প পরিচালনা খুঁটিয়ে দেখার জন্য চার সপ্তাহের মত জাপানে গিয়ে সেখানকার নানা ধরনের শিল্প ও কারখানা বিশেষত বড় কারখানার সঙ্গে ছোটশিল্প কারখানা, এমনকি হস্ত ও কুটীর শিল্প কী ধরনের অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে জড়িত, ছোট যন্ত্রপাতির কারখানা-গুলি কীভাবে বড় শিল্পের যোগান বা এ্যান্সিলারি হিসাবে কাজ ও উৎপাদন করে, সেই সঙ্গে লগ্নির সাহায্য পায়, ভাল করে দেখে বুঝে আসবে। ওখানকার অভিজ্ঞতা এখানে নতুন কিছু করতে কাজে লাগবে, চোখ কান খুলে যাবে। আমি সবাইকে বলে ব্যবস্থা করে এসেছি, তোমরা এই মাসের শেষে যাবে; জাপানী সরকার ও জাইবাৎসুর বড় বড় কর্তৃপক্ষরা যত্ন করে নানা জায়গায় ঘুরিয়ে তোমাদের সব দেখাবেন ও বুঝিয়ে দেবেন বলেছেন। ওদের খুব ইচ্ছা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তারা কিছু কাজ করে দেখায়। ভাল করে ঘুরে দেখা আর ওদের কাজ করার রীতিপদ্ধতি বোঝার চেষ্টা করা ছাড়া তোমাদের বিশেষ দুটি কাজ থাকবে। একটি ভাল সুতাকলের সব কিছু সাজসরঞ্জাম কেনার জন্য কয়েকটি কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সঙ্গে একটি চুক্তির খসড়া তৈরি করতে হবে, তার সঙ্গে কারখানা যেখানে স্থাপিত হবে সেখানকার জমি পরিষ্কার করার কাজ দিয়ে শুরু করে কারখানা থেকে তৈরি সুতা বাজারে ছাড়া পর্যন্ত প্রতি ধাপের পর পর একটি টাইম-টেবল তৈরি করা অবশ্যই দরকার হবে, খরচ এবং তার ভাগাভাগি ত বটেই। সেই চুক্তির খসড়া তোমরা নিয়ে এলে, তার পর এখানে জাপানী কনসালেটের মারফৎ বৈঠক করে আমরা কনট্র্যাক্ট করব। সেইসঙ্গে জাপানী কোম্পানিরা মিলে বড় শিল্পকারখানার ছোট প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জোগানের জন্য একটি প্রোটোটাইপ প্রডাকশন ও ট্রেনিং সেন্টার নিজেদের মূলধনে ও লোকবলে করতে আগ্রহী, অবশ্য দীর্ঘমেয়াদে তাদের খরচখরচা শোধ দিতে হবে, তবে জাপানী কারিগরদের কাছে বাঙালিরা শেখার সুযোগ পাবে। জাপান যাবার আগে আমি আলামোহন দাসের সঙ্গে কথা বলেছি, দাশনগরে সে জমি

দিতে ও অন্যান্য সাহায্য করতে রাজি। সেখানে তোমাদের ঐ নতুন অজিত ঘোষ ছেলেটিকে ভার দিলে বোধ হয় মন্দ হয় না, বুদ্ধিশুদ্ধি চোখ-কান খোলা বলে মনে হয়। তোমাদের চার জনের মোটামুটি খরচ কত হবে, বিনয়কে বলে দিয়েছি; তাতে নবাবী করা চলবে না। তবে নেহাৎ কষ্ট করেও থাকতে হবে না। তাছাড়া জাপানীরা তোমাদের খুব যত্ন করবে, এদিক ওদিক ঘোরবার, দেখবার ব্যবস্থা করবে।'

কথা শেষ করে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন, 'দেখো জাপানে দেখে এসেছি, কোরিয়া যুদ্ধের ডিসপোজাল হিসাবে সস্তায় পুরনো হেলিকপ্টার বেচে দিচ্ছে। খবর নিয়ো ত, যদি সুবিধা দরে একটি হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করতে পারো। প্রতিবছর যে ধরনের বন্যা আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে, তাতে সরকারের নিজের একটি হেলিকপ্টার থাকলে সুবিধা হয়।' শুনে পা দুটো মুহূর্তের জন্য একটু যেন নড়বড় করে উঠল।

বিশের দশকের শেষে যখন বয়স ছিল এগারো বারো, তখন প্রায় গোগ্রাসে গিলেছিলুম রুশ-জাপান যুদ্ধের বৃত্তান্ত (১৯০৪-৫)। সেই প্রথম পুব-পশ্চিমের চরম লড়াইয়ের ফলে পূর্বজগতের জাপান অবিসংবাদিতভাবে জেতে, আর রাশিয়ার মত বিরাট সাম্রাজ্যশক্তি লজ্জাকরভাবে হারে। বর্ধমানে যখন যাই তখন শুনি সেখানের বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়ের নাম টোগো সরকার। মনে হল অ্যাডমিরাল টোগোরই বংশধর। কিন্তু তখনও জানিনি ১৯০৫ সালে রাশিয়ার কাছ থেকে কোরিয়া ছিনিয়ে নিয়ে জাপান সেই দেশের উপর কী অত্যাচার শুরু করে। প্রথম পড়লুম, রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'র পরিশিষ্টে 'কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত'-এর নথি থেকে। সেই সঙ্গে ১৯৩১ সালে (তখন আমার বয়স চোদ্দ) জাপান যখন মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করে ও ১৯৩২-এ সাংহাই আক্রমণ করে মাঞ্চুকুয়ো নামে সাক্ষীগোপাল সরকার খাড়া করে ১৯৩৬ সালের শেষে সারা উত্তর চীনকে ক্রীতদাস করে অকথ্য শোষণ ও অত্যাচার শুরু করে তখন মনে বিশেষ সংশয় জাগে, বিশেষত যখন ফিশার, এডগার স্নো প্রভৃতির লেখাপড়ার সুযোগ পেলুম!

১৯০৪ থেকে ১৯২৯-৩০ সাল পর্যন্ত ছিল জাপান সম্বন্ধে অশেষ আগ্রহ ও শ্রদ্ধার যুগ। ১৯০২ সালে কলকাতায় এলেন ওকাকুরা, তাঁর পদানুসরণে মহান জাপানী চিত্রকররা; শিল্পে প্রাচ্যের দেশাত্মবোধ ও নিজস্বতার মাহাত্ম্য প্রচারবাণী নিয়ে। জাপান সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধাভক্তি বাড়ে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও চিঠিপত্র থেকে, সেই সঙ্গে তাঁর ভ্রমণসঙ্গীদের লেখা পড়ে। তার পরেই প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের কোরিয়ান যুবকের সঙ্গে কথোপকথন ও পড়ি ফিশার, স্নো প্রভৃতির লেখা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ১৯৪২ সালে যখন জাপান বিদ্যুৎবেগে পুবে

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে ভারতের পূর্বপ্রান্তে এসে, অধিকৃত সমস্ত অঞ্চলে অমানুষিক নৃশংসতা ও বর্বরতা, এমনকি পরাজিত শত্রুসেনাকে যেভাবে নিপীড়ন করে তখন আর সেগুলিকে মিত্রশক্তির মিথ্যা প্রচার বলে মনে স্থান দিতে পারিনি। বিশেষত মুন্সীগঞ্জে থাকাকালে বর্মার উদ্বাস্তুদের মুখে তাদের প্রাণান্ত বিপদের কথা যখন শুনি। সুভাষচন্দ্র যখন জাপানে গিয়ে জাপানের সাহায্যে ভারতীয় জাতীয় সেনা তৈরি করেন তখন আমার সত্যই খুব আতঙ্ক হয় ভারতে জাপান এলে মাঞ্চুকুয়োর চতুর্গুণ পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনায়। নেতাজীর মণিপুরের প্রান্তে আসার খবর সত্ত্বেও আমি ১৯৪৩-৪৪ সালে বিশেষ উদ্বিগ্ন এমনকি উদ্‌ভ্রান্ত ছিলুম ভারতের পূর্বাঞ্চলে মিত্রশক্তির পরাজয়ের আশঙ্কায়। মিকটিনা যুদ্ধের পর মন একটু আশ্বস্ত হল।

অন্যদিকে ছেলেবেলায় ল্যাফকাডিও ও হার্ন প্রভৃতির লেখায়, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের রচনা পড়ে জাপানী সাহিত্য, শিল্প, দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনে একাধারে প্রকৃতি, শিল্প, দর্শন, ধর্ম ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গিসম্পর্ক সম্বন্ধে আমার অনাবিল শ্রদ্ধা জন্মায়। ইংলণ্ডে থাকতে ১৯৪০ সালে প্যাট্রিকের সঙ্গে স্ট্যাফোর্ডশিয়ারে বার্নার্ড লীচের সেরামিক কেন্দ্র ও তাঁর কাজ দেখে, সেরামিক সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি খুলে যায়। প্রকৃতির মাটি, পাথর, গাছ, কাঠ যা কিছু আছে তাদের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক রঙ, চরিত্র ও স্পর্শ যতদূর পারা যায় অবিকৃত রাখলে শিল্পসামগ্রীর মর্যাদা কতখানি বাড়ে এবং প্রকৃতি ও বিশ্বের সঙ্গে কীভাবে একাত্মভাব আসে তার আভাস পেলুম। সেই সঙ্গে এল মানুষের তৈরি সৃষ্টিতে অযথা নানা বিচিত্র রঙের অনাবশ্যকতা এবং তার ফলে প্রাকৃতিক রূপের কীরকম চরিত্রভ্রংশ ঘটে, উপরন্তু একধরনের ইতর রুচি সম্ভব, এবং যা কত অবাঞ্ছনীয় তার সম্বন্ধে কিছুটা বোধ ও প্রশ্ন এল। ১৯৫০ সালে যখন কলকাতায় এলুম তখন অজিত মুখার্জি, পৃথীশ নিয়োগী ও চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শুনে ও বই পড়ে আমি জাপানী স্থাপত্য ও শিল্পের প্রতি মন দিই। পৃথীশের কথায় আমি জাপানী স্থাপত্যের পত্রিকা শিনকেনটিকুর গ্রাহক হই। পত্রিকাটি প্রাচীন ও আধুনিক জাপানী স্থাপত্যের গতি-প্রকৃতি, বিশেষত বাসস্থান ও সাধারণের উপভোগ্য ও ব্যবহার্য বড় বড় গৃহ, হাসপাতাল, আর্ট গ্যালারি, সভাগৃহের নব্য স্থাপত্য মুখ্য উপজীব্য হিসাবে উপস্থাপিত করে। আইলিন এডারটন আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সেরামিক শিল্পী হামাদা ও কাঞ্জিরো কাওয়াইএর ঠিকানা দেন। হামাদা তখন থাকতেন আকিটা প্রদেশে, কাঞ্জিরো কিয়োটো শহরে মৃৎশিল্প পল্লীতে। তার সঙ্গে আইলিন দেন কিয়োটা শহরের বিখ্যাত প্রাচীন সামগ্রীর ব্যবসায়ীদের বাসস্থান ও ঘরোয়া দোকানভরা একটি রাস্তা—শিনমনজেন স্ট্রীটের কয়েকটি ব্যবসায়ীর কাছে পরিচয়পত্র।

এইভাবে যুগপৎ বিরূপতা ও অনুরাগের দোটানায় দোদুল্যমান মন নিয়ে

৬ নভেম্বর মঙ্গলবার ভোররাত্রে বি-সি মল্লিক, উদয়ন চ্যাটার্জি, নির্মল বিশ্বাস ও আমি জাপান যাত্রা শুরু করি।

১৯৪০ সালের পর কখনও দেশের বাইরে যাইনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবী কত বদলে গেছে, কোনো স্পষ্ট ধারণাই ছিল না। মাটিতে গুঁড়ো হয়ে পাতিত হওয়া জাপান আবার কীভাবে দাঁড়িয়ে উঠল, যার ফলে সারা পৃথিবীর সম্ভ্রম সে অত্যল্প সময়ে কেড়েছে, ফলে আমাদের সেখানে প্রার্থী হয়ে ছুটতে হচ্ছে, নিজের চোখে দেখার আগ্রহ দুর্বার হল। উপরন্তু বিদেশভ্রমণ।

এয়ার ইণ্ডিয়ার কনসেটলেশন প্লেনে কিছুটা উঠতে না উঠতেই সকাল যেন হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। খেয়াল হল আমরা পূর্ব অভিমুখে ছুটছি, পূর্বকে এগিয়ে আনার জন্য। সকাল গোটা নয়েকের সময়ে প্লেনটি ব্যাংককে নামল। মনে হল যেন ব্যারাকপুরের এয়োরোড্রোমে নেমেছি, একটু ন্যাড়া ন্যাড়া, দমদমের বিস্তৃতি ও সরঞ্জামও যেন নেই। সব কিছু কাজ শরীরের মেহনতেই হচ্ছে। বেশ গরম। লোকজনের ব্যবহার খুব ভদ্র। গলা প্রায় ওঠে না, শোরগোল একেবারে নেই, নিঃশব্দে সব কাজ হচ্ছে। মোটবাহী থেকে শুরু করে প্রত্যেকের পরনে ধোপদোরস্ত, অথবা ধবধবে সাদা পোশাক, বিশেষত মেয়েদের দেখে মনে হয় সদ্য স্নান করে, ঘন কালো, মসৃণ চুল আঁচড়িয়ে এসেছে। চোখের তারা ঘন কালো, পাতাগুলি আমার চোখের মত ভারি। চাউনি খুব নরম, অর্থাৎ আমার বিপরীত।

তার পরের ধাপ হংকং। হংকঙে আমাদের এয়ারপোর্ট থেকে বেরনো হল না, কারণ ঐ প্লেনই আমাদের টোকিও নিয়ে যাবে। হংকং তখনই এক বিরাট এয়ারপোর্ট। অপেক্ষা করার জায়গাটি কাঁচ দিয়ে ঘেরা। প্লেনের রানওয়েটি দেখে মনে হল সোজা সমুদ্রে চলে গেছে, চওড়া লম্বা পাটাতনের মত যেন ভাসছে। পূর্ব দিকে, হংকঙে, তখনই আকাশচুম্বী বাড়ি ওঠা শুরু হয়েছে। কাওলুন একটু বস্তি মতন। এয়ারপোর্টটি ইংরেজদের, ভারপ্রাপ্ত উর্দিপরা লোকজনদের ব্যবহার বেশ কড়া, ভাবখানা সব যাত্রীই যেন চোরাই কারবারের আসামী। লোকজন সত্ত্বেও গোলমাল কম, ভারতবর্ষের সঙ্গে সর্বত্র এইখানে পার্থক্য।

যতদূর মনে আছে, সন্ধ্যা যখন নামে নামে প্লেন তখন উঠল। ১৯৪০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান শহরের পর সেই আবার নিয়ন আলোর ব্যাপক ব্যবহার দেখলুম। নানা রঙের ঝলমলে নিয়ন আলো, একে একে দপদপ করে জ্বলে উঠছে। এই অবস্থায় প্লেন উঠতে না উঠতেই অন্ধকারে ডুব দিল।

রাত্রে খাবার পর দেখি জানলার আলসেতে, একটি নতুন ধরনের ফাউণ্টেন পেন কে যেন ফেলে গেছে। নিব নেই, একটি পিনের মত মুখ, লিখতে গেলে কালিতে লেখা হচ্ছে, শিষে নয়। সঙ্গের যাত্রীরা বলল সেটি তাদের নয়। পকেটে

রাখলুম। সেই আমার প্রথম জটার বা ডট পেন। জাপানে বেশ কাজ দিল।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। চোখ খুলে দেখি বাকি তিনজন উঠে জিনিসপত্র গোছাচ্ছে, হাতের ব্যাগ থেকে ভারি কোট বার করে পরছে। কিছুক্ষণ পরে কানে তালা লেগে চারদিকে মাটির জগৎ হঠাৎ যেন আবছাভাবে উঠে এল। তখনও ভোরের আলো আসেনি। প্লেনটি হঠাৎ দুড়ুম করে মাটিতে ঠেকল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এয়ারপোর্টের চওড়া ঢাকা বারান্দার দিকে এগিয়ে দেখি কয়েকজন যেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। মোটা কোট পরা চারজন কালো লোক দেখে তাঁরা এগিয়ে এলেন। হানেডা এয়ারপোর্ট। অদূরে সমুদ্রের জল ভোরের আলোয় ছল ছল করছে। অপেক্ষারতদের মধ্যে একজনের শরীরের গড়ন, চুলে পাক, মুখচোখের গড়নে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ দেখে মনে হল ইনিই বোধ হয় মিঃ বোস হবেন। বহুদিন জাপানে থাকার ফলে হাবভাব একটু জাপানী হয়ে গেছে মনে হল, যাকে বলে পরিবেশের ছাপ। বয়স মনে হল বছর পঁয়ষট্টি। সেই মুহূর্ত থেকে তিনি আমাদের অভিভাবক হলেন, যেমন সস্নেহ ব্যবহার, তেমনি সবদিকে নজর। আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। বুঝলুম, কত বিশদভাবে ডাঃ রায় আগে থেকে আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য জানিয়ে গেছেন। উপরন্তু তিনি আমাদের ব্যক্তিগত মঙ্গলেরও ভার নিলেন। তাঁর সঙ্গে, স্পষ্টত জাপানী, অথচ ভারতীয়ের মত কালো গায়ের রঙ, কালো শক্ত চুলওলা এক ভদ্রলোক, নাম হোরি। ইনি যুগপৎ জাপানী বিদেশ বাণিজ্য মন্ত্রক ও প্রধান শিল্পপতিদের দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, বিদেশীদের ভার নেন। কথায় বুঝলুম তিনিও ডাঃ রায়ের সঙ্গে ঘোরাফেরা করেছেন। ভারতীয় দূতাবাস থেকে একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী এসেছেন। আগের দূত বি-আর সেন জাপান ছেড়ে গেছেন, নতুন দূত চন্দ্রশেখর ঝা তখনও এসে পৌঁছননি। সেই হল জাপানে বাসকালে আমাদের দূতাবাসের সঙ্গে আমাদের প্রথম ও শেষ পরিচয়। যদিও পরে ভারত সরকারের সেক্রেটারি হিসাবে কয়েকবার গেছি, তা সত্ত্বেও ভারতীয় দূতাবাস কোথায় তা দেখিনি, প্রবেশের আহ্বান ত দূরের কথা।

সুটকেস ছাড়িয়ে, পাসপোর্টে সীলমোহর করিয়ে মিঃ বোস ও মিঃ হোরি আমাদের গাড়িতে তুললেন। অন্য জাপানী অভ্যর্থনাকারীরা বিদায় নিলেন। তখনও বড় জাপানী গাড়ি হয়নি। সব থেকে প্রচলন হয়েছে ছোট ডাটসুন ও হোণ্ডা'র। দেখতে কিছুটা যুদ্ধোত্তর মরিস মাইনরের মত। সুটপুট করে চলে, কলকাতার বাসচালকরা যাকে বলে ছারপোকা। রাস্তা যদিও চওড়া, তবুও আমাদের মত হঠাৎ এদিক ওদিক বাঁ, ডান করে বেরিয়ে যায়। রাস্তায় যানবাহন সব দক্ষিণবাহী, বামপন্থী নয়।

শহরে যখন ঢুকছি, তখন ভোর হয়ে আসছে, বিজলী বাতি সব ম্লান হয়ে

যাচ্ছে। নতুন নতুন উঁচু বাড়িগুলি স্পষ্ট হচ্ছে। মিঃ বোস বাংলায় বললেন, আমাদের তিনি শিমবাসি স্টেশনের গায়ে ডাই-চি হোটেলে তুলবেন। মোটামুটি অল্পভাড়ায় অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোটেল, সব সুবিধা আছে। মারুনোচি অঞ্চলের বড় হোটেলে গিয়ে কাজ নেই। জাপানে আসার সৌভাগ্যেই মত্ত আমরা একস্বরে বললুম নিশ্চয়, নিশ্চয়, ফিরে গিয়ে আপনার আশীর্বাদে ডাঃ রায়কে কাজ দেখাতে পারলেই হল।

ঢুকে দেখি প্রকাণ্ড হোটেল, অথচ জাঁকজমক নেই। কলকাতার মত জমকালো উর্দি পরা লোকজন ইতস্তত ঘুরছে না। লোক কম, সকলেই ক্ষিপ্র, নিঃশব্দ। লবিতে বসতে না বসতেই কো-চা এল। এটি দুধবিহীন খুব পাতলা জাপানী সবুজ চা। আমাদের ধরনের কালো চা, দুধ চিনি দিয়ে খাবার চা-কে বলে ও-চা। কো-চা সর্বত্র বিনি পয়সায় দেয়, পানীয় জলের বদলে। একজনের জন্য একপট কালো চা, দুধ চিনির দাম চল্লিশ ইয়েন। এক কাপ দুধ ত্রিশ ইয়েন, একজনের কফি, দুধ, চিনি আশি ইয়েন। তার কারণ কফি বিদেশ থেকে আসে। জাপানে বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানোর রীতি ছিল না, এমনকি বুকের দুধও কম খেত। জেনরল ম্যাকার্থার পুষ্টির কারণে জোর করে বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানো অভ্যাস করাবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার ফোরমোস্ট কোম্পানিকে কাগজের কার্টনে দুধ বেচার ব্যবস্থা করতে আদেশ দেন। দুধ চালু করার জন্য দুধের দাম সব থেকে কম রাখেন। হোক্কাইডো ও কোবেতে বেশ ফলাও করে গো-পালনের ব্যবস্থা করেন, যাতে দুধ ও গোমাংসের সরবরাহ বাড়ে। প্রসঙ্গত এক হাজার ইয়েনের মূল্য তখন বিলেতী ১ পাউণ্ড, আমাদের সওয়া তেরো টাকা, ডলারে সওয়া তিনশ' ইয়েন।

হোটেলের লোক আমাদের নিজের নিজের ঘরে নিয়ে যাবে। বোস সাহেব ও হোরি বললেন, আমরা যেন খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করে নিই। ওরা সাড়ে দশটায় আসবেন। দুপুরের খাওয়া বাইরে।

ঘরের সংলগ্ন বাথরুম। ঘরটি ছোট, দুহাত বাড়ালে আড়াআড়ি দুই দেয়ালের গায়ে প্রায় পৌঁছয়, লম্বার দিকে ঢোকার দরজা, অপরদিকে বড় জানলা দিয়ে স্টেশন দেখা যায়। ইলেকট্রিক ট্রেন যখনই চলে বেশ একটি ছন্দ শোনা যায়। ঢুকে বাঁ দেয়ালে সরু দরজা, ভিতরে বাথরুম: টয়লেট সীট, পাশে ছোট উঁচু সিমেন্টের বাথটব, তবে প্রায় বসা অবস্থায় স্নান করতে হবে, আধশোয়া অবস্থায় নয়। জলভরা যায়, উপরন্তু উপরে শাওয়ার। বাথের মাথায় বেশ কয়েকটি ট্যাপের মাথা ঝকঝক করছে। বাথের গা এবং স্নানঘরের দেয়াল কলকাতার পাতাল রেলের স্টেশনের থাম যেমন ছোটছোট চৌকো মোজেইকের টালি দিয়ে মোড়া তেমনি। ব্রেশট বলেছিলেন, নতুন সব কিছুই ভাল। মিনিট খানেকের মধ্যে

বুঝলুম, নতুন অভিজ্ঞতার ঝক্কি আছে।

আমরা আজ টেকনোলজির প্রশংসায় মুখর। সেই ভাষাতেই বলি, আজন্ম আমি যাকে বলে বাকেট এণ্ড মাগ টেকনোলজিতেই স্নান করতে অভ্যস্ত, এমনকি পল ম্যানশনে প্রকাণ্ড বাথটব থাকা সত্ত্বেও। অর্থাৎ কলের মুখে বালতি পেতে, সেটি ভরে, মগ ডুবিয়ে গায়ে মাথায় জল ঢালা। এখানে স্নানের বাথে ঢুকে অতগুলো কল দেখে ধাঁধা লেগে গেল। যেটাই খুলছি হয় বেরোচ্ছে বরফগলা জল, না হয় গা-পুড়ে যাওয়া গরম জল, হয় সরু সাবানের রেখা না হয় গরম হাওয়া। নাকানি চোবানি খেয়ে টব থেকে বেরিয়ে বেল বাজিয়ে পরিচারককে ডেকে সব বুঝে নিলুম। এই হল টোকিওর প্রথম অভিজ্ঞতা। হৃদয়ঙ্গম হল এতদিন কী আদিম অবস্থায় ছিলুম। ৮ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সাড়ে দশটার আগে তিনচার জন ভদ্রলোক লবিতে এসে হাজির। বোস সাহেব, হোরি, মি-টির (MITI—মিনিস্ট্রি অভ ইণ্টারন্যাশনাল ট্রেড এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি) একজন মাঝারি স্তরের প্রতিনিধি এবং যে কোম্পানিতে প্রথম দিন যাব—হিতাচি—তার প্রতিনিধি। দপ্তরে পৌঁছনোর পর ঘরে আরো কয়েকজন সঙ্গে বসলেন। রবিবার থেকে পরের রবিবার পর্যন্ত প্রস্তাবিত প্রোগ্রামের সব খুঁটিনাটি, প্রায় মিনিটে মিনিটে ভাগ করা। আমরাও হার মানতে নারাজ। বোস সাহেব বললেন, 'শুক্রবার ও শনিবার মি-টি দপ্তরে যেতে হবে। রবিবার ১১ই আপনাদের আউটিং। রবিবার সকাল ৭ টার সময়ে সুমুখের শিমবাশি স্টেশনে উঠে আমরা নিক্কো যাব, সেখানে সারাদিন থাকব। বিদেশি কেউ এলে তাকে নিক্কো, কিয়োটো, নারা দেখানো একটি অবশ্যকর্তব্য। কিয়োটো, নারা পরে হবে। নিক্কো জাপানের অন্য তীর্থের মত নয়। এর পর থেকে সারাদিনব্যাপী ছুটি আর একটিও নেই।'

শুক্রবার দশটার সময়ে ডাই-চি হোটেল থেকে রওনা হয়ে প্রথমে গেলুম মি-টির দপ্তরে, দেখা করতে জাপান সরকারের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা ওকিটা সাবুরোর সঙ্গে। পেশায় উনি কেইয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনীতির অধ্যাপক, ইতিমধ্যে একবার দিল্লী ঘুরে এসেছেন। যুদ্ধের পর আমেরিকান সরকার তাঁকে কিছুদিনের জন্য হার্ভার্ড এম-আই-টিতে নিয়ে যান। যেমন শান্ত, ভদ্র, তেমনি তীক্ষ্ণধী, উপরন্তু পৃথিবী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, মনে হয় জে-এম কেনসের স্বগোত্র। জাপানীদের শেষ নামটি হয় যে-গ্রাম বা অঞ্চল থেকে এসেছেন তার অনুসরণে, আমাদের তামিলদের প্রথামত। যথা, সাবুরো এসেছেন ওকিটা অঞ্চল থেকে; জাপানী মতে ওঁর নাম আসলে হবে ওকিটা সাবুরো।

আমাদের সঙ্গে তিনি প্রায় ঘণ্টাখানেক সৌজন্য সহকারে জাপানী বিদেশী বাণিজ্যনীতির মূলকথা ও তাঁর দেশের অন্বিষ্টের সূত্র বললেন।

যে কোনো দেশ বা সংস্থার সঙ্গে বড় রকমের লেনদেনের কথা শুরুর আগে

একদিকে শিল্পপতিদের প্রতিনিধিরা বিদেশে কীভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন নতুন কী যন্ত্রপাতি, কারখানা, প্রযুক্তি অথবা প্রচলিত প্রযুক্তির উন্নতি, সংস্কার বা পরিবর্তন হয়েছে তার বিশদ খোঁজ খবর নেন। কোনো কোনো কারখানা থেকে নমুনা বা সম্ভব হলে বিশদ ড্রয়িং, উপাদানের খুঁটিনাটি জোগাড় করেন, সম্ভব হলে চর লাগিয়ে কেনেন। অন্যদিকে মি-টি আপন বিশেষজ্ঞদের লাগিয়ে চাহিদা, দর, ইত্যাদির খোঁজখবর নেন। এরপর দুই পক্ষ একত্র আলোচনায় বসে স্থির করেন, বিদেশী পণ্যে কী কী উন্নতি বা অদলবদল করলে তাদের পণ্যকে টক্কর দিয়ে আরো কম দামে সে দেশে জাপানী মাল রপ্তানি করে বাজার দখলের চেষ্টা করতে হবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য শিল্পপতি ও মি-টি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মত একজোটে হাত মিলিয়ে কাজ করে। যতদূর আমার মনে হয় জাইবাৎসু সংগঠনের উত্তরাধিকারী খাইরাৎসু-ও মিটি এখনও সেইভাবে হাত মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

সাবুরো-সান আরো কয়েকটি মৌলিক জাতীয় সূত্রের কথা বলেন। সম্ভবত তিনি আগের মাসে ডাঃ রায়ের সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হন, ফলে আমাদের তাঁর প্রতিনিধি ভেবে মন খুলে কথা বলেন। তাঁর বক্তব্যে জাপানী পুনরুজ্জীবনের মূলমন্ত্র হল প্রযুক্তি, বিজ্ঞান বা অর্থনীতির কূট অঙ্কে নয়, সেটি হল যেমন সরল, তেমনি জাতির চেতনার গভীরে। প্রথম হচ্ছে দেশপ্রেম, অর্থাৎ জাপানকে সর্বদিকে সর্বশ্রেষ্ঠ হতে হবে। দ্বিতীয় হল জাপান দেশ হিসাবে ধনী হবে, কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে কোনো জাপানীর পক্ষে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ধনীদের মধ্যে গণ্য হওয়া চলবে না। অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থকে দেশের স্বার্থের পায়ে নিবেদন করতে হবে। অতএব, জাপানী পুনরুত্থানে ম্যাজিক বলে কিছু নেই। আছে চরম ব্যক্তিগত পরিশ্রম, আত্মনিয়োগ, নিজেকে শিক্ষিত, আরো শিক্ষিত করার তাগিদ ও ঘণ্টা পিছু শ্রমে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ মূল্য বাড়িয়ে যাওয়া, যার পিছনে থাকবে নতুনতর প্রযুক্তি, ব্যক্তিগত দক্ষতা, কৌশল ও ধ্যান, অনুশীলন ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য।

তার পর বলেন, যুদ্ধোত্তর জাপানের নিজভূমিতে আমেরিকান শ্রমিকের কাজ করার ধরনধারণ ও প্রস্তুতি লক্ষ করার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে। অধীনতার পরিবর্তে জাপান কিছু শিখেছে। কারখানায় তারা যন্ত্রপাতি কীরকম পরিষ্কারভাবে রাখে, দিনান্তে পরিপাটি করে গুছিয়ে যায়, কী করে সারা কারখানার সব কিছু ঝকঝকে রাখে, প্রতিটি আমেরিকান নিজের উদ্ভাবনীশক্তি ও শ্রমের পরিবর্তে আরো বেশী উৎপাদন করতে পারে, তার স্বাধীনতা সে পায়, পুরস্কারও।

যুদ্ধের পর জাপান সরকারের শিল্পপতিরা একটি শপথ নিলেন বলা যায়। দ্বিতীয় যুদ্ধের আগে পৃথিবীতে জাপানী দ্রব্যের পরিচয় ছিল, জাপানকা মাল,

দরিয়ামে ডাল। অর্থাৎ সস্তা জাপানী জিনিসের মূল্য একবার ব্যবহার করলেই ফেলে দিতে হবে, কোনো সময়ে হয়ত আদৌ ব্যবহারের যোগ্য হবে না, শুধু পয়সা নষ্ট। শপথ হল প্রতিক্ষেত্রে জাপানী মালের উৎকর্ষ ও ব্যবহারিক আয়ু অন্য দেশের পণ্যকে হারাবে, তার জন্য দাম বেশী পড়ে তাও স্বীকার।

তৃতীয় হচ্ছে যুদ্ধের আগে জাপানের দুর্নাম ছিল পরের থেকে চুরি করে সস্তায় নকল করে বাজারে ছাড়া, ক্ষণিকের জন্য বাজার দখল করা যাতে প্রথম চোটে কিছু লাভ হয়। অর্থাৎ মতিগতি ছিল খুচরো হকার বা দোকানদারের। নতুন সংকল্প হল একদিকে নতুন প্রযুক্তি ও পণ্য আবিষ্কার ও উৎপাদন করে জগতের বাজার জয় করতে হবে। তার জন্য প্রতি শ্রমিকের শিক্ষার মান আরো, আরো বাড়াতে হবে, সেই সঙ্গে তার কাজের উপাদানের উন্নতি। প্রথম নতুন পণ্য যা জগতে আবিষ্কার হিসাবে গণ্য হল সেটি পলিয়েস্টার সূতা; সূতাকল ও বস্ত্র। দ্বিতীয় জগজ্জয়ী আবিষ্কার হল ক্যামেরার প্রথম শ্রেণীর লেন্স, যার ফলে নিকন ও অন্যান্য ক্যামেরা শিল্পপতিরা দ্রুতবেগে জাইস্, আগফা, কোডাকের লেন্স হারিয়ে দিয়ে প্রায় অজেয় হয়েছে। ক্যামেরার বাকস ও ধাতব বা প্ল্যাস্টিক কলকব্জা হয়ত তখনও জার্মান বা আমেরিকান ক্যামেরার মত পোক্ত হয়নি কিন্তু নিকন লেন্স অন্তিম পরীক্ষায়—যেমন উত্তর মেরু বা বিষুবরেখা বা অত্যন্ত ভিজে আবহাওয়ায় কোনোমতেই ঝাপসা হবে না অথবা তাতে ছাতা পড়বে না। পর পর তৃতীয় আবিষ্কার হল, নতুন প্রযুক্তিতে ইস্পাত ও মিশ্র ধাতুর ইস্পাত তৈরি। নতুন প্রযুক্তির ইস্পাত কারখানা। চতুর্থ কীর্তি, যা তখনও চলছে, সেটি, সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরি। এসব কীর্তির মূলমন্ত্র হল সাধারণ জাপানী শ্রমিকের জীবনমরণ পণ করে খাটা। সাবুরো-সান বলেন তিনি আশা করেন, ফ্যাক্টরি ইত্যাদি দেখার সময়ে আমরা বিশেষ করে জাপানী শ্রমিকের শিক্ষাপদ্ধতি দেখার সময় পাব।

এখন বলি, উপরে যে সব কথা আমি সাবুরো-সানের মুখে দিলুম, তিনি সেগুলি দুই দফায় বলেন। প্রথম, যেদিন প্রথম দেখা হয় অর্থাৎ ৯ নভেম্বর। দ্বিতীয়, ২ ডিসেম্বর তারিখ, যেদিন জাপান ত্যাগের আগে আমরা মি-টি কর্তৃপক্ষকে বিদায় ও ধন্যবাদজ্ঞাপন করি। ইতিমধ্যে মনে হল তিনি সব খবর রেখেছেন আমার সঙ্গীরা কোথায় কোথায় গেছে, কীভাবে সবকিছু দেখেছে, নিরীক্ষণ করেছে। সম্ভবত সেইজন্য তিনি বিশেষ সন্তোষপ্রকাশ করেন। আমার বিশেষ সৌভাগ্য যে ১৯৯২ সালে সাবুরো-সানের সঙ্গে আবার কলকাতায় গ্র্যাণ্ড হোটেলে দেখা হয়। ভারতীয় চেম্বার অভ কমার্সের নিমন্ত্রণে তিনি ভারতের উদার অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করেন। আমার সঙ্গে কয়েক মিনিট আলাপ হয়। তার আগে তাঁর সঙ্গে ১৯৬৫ সালে প্ল্যানিং কমিশনে একটি লম্বা বৈঠকে সাক্ষাৎ হয়, এবং ১৯৭১ সালে আবার দেখা হয় আমেরিকার এম-আই-টি

কেম্ব্রিজে, শিল্পনীতি সম্বন্ধে একটি আলোচনা সভায়।

শনিবার বেলা দশটার সময়ে আমরা মিৎসুবিশির দপ্তরে গেলুম; সেখানে লাঞ্চে ও পরে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত একনাগাড়ে বসে আগের দিনের আলোচনার জের টেনে আগামী তিন সপ্তাহের প্রতিদিন আমরা কী কী নতুন কারখানা, নতুন দপ্তর, নতুন শহর, জাপানী সংস্কৃতির তীর্থস্থান দেখব, সেই সঙ্গে কী কী বিষয়ে আমরা চুক্তির জন্য আগ্রহী তার জন্য যথেষ্ট সময় রাখার ব্যবস্থা হল। ঠিক হল প্রতিদিন কাজ শুরু হবে সকাল আটটায়, শেষ হবে সন্ধ্যা সাতটায়। এর মধ্যে প্রতিটি মিনিট বেঁধে দেয়া, কোথায় যাব, কার সঙ্গে কথা বলব, কী দেখব, ইত্যাদি। রাত্রে সপ্তাহে অন্তত দুই বা তিন দিন আমরা কোনো না কোনো বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের নৈশ-আহারের অতিথি হব। সেদিন সোজা কর্মস্থল থেকে আমরা গিঞ্জা বা অন্য কোনো অঞ্চলে গিয়ে জাপানী আনুষ্ঠানিক গেইশা ডিনার খাব। হোটেলে ফিরতে রাত দশটা বেজে যাবে।

প্রথম শনিবার সন্ধ্যায় হল আমাদের ছুটি। তার কারণ প্লেন থেকে নেমে শনিবার পর্যন্ত খেটে আমরা নিশ্চয় ক্লান্ত। পরের দিন ভোরে নিক্কো যাব। সঙ্গে যাবেন বোস সাহেব ও মিঃ হোরি।

রাত্রে হোটেলে ফিরে আভাকে চিঠি লিখে সব খবর দিলুম, লিখলুম এখানে যেভাবে প্রতিটি মিনিট তাঁরা কাজের হিসাবে বাঁধছেন, তাতে রাত্রে রোজনামচার মত নোট লিখে নিয়মিত চিঠি লেখা সম্ভব হয়ত হবে না। যেন চিন্তা না করে। ছোট শ্যালক বিশু ও মেজ শালী তন্দ্রা থাকায় আমার অবশ্য কোনো চিন্তার কারণ ছিল না। তাছাড়া আরেয়া ও পল ম্যানশনের কর্মীরা ছিল বিশেষ বিশ্বস্ত।

সেদিন রাত্রে অফিস পাড়াতেই একটি ছোট খাবার জায়গায় বোস সাহেব, হোরি, আমরা চারজনে খেলুম, হোরি খাওয়ালেন। রাস্তায় বেরিয়ে আমরা হাঁ হয়ে গেলুম। রাস্তায় প্রতিটি দোকান রঙ বেরঙের বড় বড় আলোয় দিনকে হার মানিয়ে দেয়। তারপরে তিন-চারতলা উঁচুতে বাড়ির গায়ে বড় বড় নিয়ন টিউবে নানা রঙের আলো ছোটাছুটি করে বিচিত্র সব বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। সারা শহরময় এত বিচিত্র আলো এই প্রথম দেখলুম। হোরি বললেন, আমাদের সরকারকে দেখুন, নিজেদের খরচ বাঁচাবার জন্য তাঁরা টোকিও শহরেও রাস্তায় আলোর বন্দোবস্ত করেন না। দোকানের আলোতেই রাস্তা আলোকিত হয়। জাপানের কোনো শহরেই আপনি রাস্তায় সরকারি বা মিউনিসিপালিটির আলো দেখতে পাবেন না।

রবিবার ভোরে তাড়াহুড়ো করে তৈরি হয়ে ধার্য সময়ের পাঁচ মিনিট আগে লবিতে নেমে দেখি বোসসাহেব ও হোরি অপেক্ষা করছেন। হোটেলের সমুখেই শিমবাশি স্টেশন। প্ল্যাটফর্মে উঠে, একটি কর্মচারীর পোশাক দেখে মনে হল

তিনি স্টেশন মাস্টার। ট্রেন আসতে অল্প দেরি, তিনি নিজেই জলের পাইপ টেনে টেনে জলের তোড়ে প্ল্যাটফর্ম ধুয়ে ফেলছেন। ঠিক সময়ে ট্রেন এসে দাঁড়াল। সারা প্ল্যাটফর্মে আড়াআড়ি ডোরাকাটা লাইন, প্রতি দুই লাইনের মধ্যে নির্দিষ্ট নম্বর করা ট্রেনের কামরা দাঁড়াবে, টিকিটেও কামরার নম্বর লেখা থাকবে, সেই হিসাবে প্ল্যাটফর্মের নির্দিষ্ট জায়গায় আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। কামরায় উঠে দেখি যাকে বলে লাকশারি ট্যুরিস্ট ট্রেন। কামরাটি চেয়ারকার, প্রতিটি চেয়ার সুইভেলে ১৮০ ডিগ্রি ঘোরানো যায়, সুদৃশ্য নরম ভেলভেটে মোড়া। সারা কামরার দুই ধারে কাঁচ যাতে দৃষ্টি ব্যাহত না হয়। গাড়ি ছাড়ার আগে প্ল্যাটফর্ম ধোয়া হয়ে গেছে, যেই চলতে শুরু করল, অমনি জলতরঙ্গের মত বাজনা বেজে উঠল, সুর করে করে শিমবাশির আর নিক্কোর মধ্যে পরপর যে স্টেশনগুলি আসবে, তাদের নাম বলে গেল, তারপর টুং। যেমন শিমবাশিতে ওঠার পর, টোকিও স্টেশন পৌঁছনোর আগে, ট্রেনটি যেহেতু ইয়োকোহামা থেকে আসছে, সেহেতু গাড়ি ছাড়তেই সুর করে গেয়ে উঠল : ইয়োকোহামা, কানাগাওয়া, কামাকুরা, শিমবাশি, টোকিও, গোদাইমাস, টুং-টুং-টুং। স্টেশন ঘোষণার পর বলল সঙ্গের খাবার বা পানীয় খেয়ে আবর্জনা কোনখানে রাখা পাত্রে কীভাবে ফেলতে হবে, বাথরুম কীভাবে ব্যবহার করতে হবে। ট্রেন কীভাবে পরিষ্কার থাকবে সেই বিষয়ে যাত্রীকে অবহিত করল। সেগুলি আবার জাপানী উচ্চারণে ইংরেজিতে পুনরুক্তি হল। তারপর আরিগাতো গোদাইমাস্তা। টুং টুং টুং : পুনরায় জলতরঙ্গ বেজে উঠল।

ঘণ্টাখানেকের উপর এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিতে চলে ট্রেন নিক্কোতে পৌঁছল। প্ল্যাটফর্মের নির্দিষ্ট নম্বরে আমাদের কামরা থামল। গাড়ি আগে থেকে ঠিক করা ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে নিক্কো পৌঁছলুম।

জাপানের বিষয়ে, বিশেষত জাপানী মন্দির ভাস্কর্য ও স্থাপত্য সম্বন্ধে এতাবৎ যা পড়েছিলুম, নিক্কো তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তীর্থটির সবগুলি অঙ্গই চৈনিক স্থাপত্যে ও অলঙ্কারে ভরা, এমনকি উজ্জ্বল চৈনিক রঙের খুঁটিনাটি বিচিত্র ব্যবহারে। ছাতের গড়ন চৈনিক, কার্নিশের মোল্ডিং থেকে দরজা, জানলা, সবই চৈনিক রীতির উচ্চকিত প্রকাশ ও অলঙ্কারবহুল। যেমন মন্দিরগুলি, তেমনি তাদের সংলগ্ন মণ্ডপ ও সমাধিগুলি। তৈরি হয় ইডো যুগে (১৬০০-১৮৬৪) অর্থাৎ মেইজি-র ঠিক আগে পর্যন্ত। সব থেকে উল্লেখযোগ্য ইয়োমেই মণ্ডপটি ও তৎসংলগ্ন ইয়োমেইমন তোরণটি। দেখেই মনে হয় সম্রাটরা বেইজিং স্থাপত্য ও অলঙ্করণের সমকক্ষ এমনকি উৎকৃষ্টতর নিদর্শন রাখার প্রয়াস করেছেন।

সারা সকাল ঘুরে ঘুরে মন্দিরের সবকটি অঙ্গ দেখলুম। দুপুরে খেলুম সারে সারে খাবার দোকানের চত্বরে। সেখানে গিয়ে পর্যটকদের মঞ্চে উঠে নিক্কোর

চতুর্দিকে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে চোখ ফেরানো যায় না। যতদূর দৃষ্টি যায়, উঁচুনিচু পাহাড়, পাইন ও ক্রিপ্টোমেরিয়ার স্বাভাবিক ঘন বন, অথচ সযত্নে রক্ষিত, তার সঙ্গে অজস্র ছোটবড় জলপ্রপাত ও ছোট ছোট ঝর্ণার মত জলধারা রেখা, তার সঙ্গে জলের মধুর গুঞ্জনের স্বপ্ন। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলেই ধারণা হয় Zen দর্শনের ও ধ্যানের ভিত্তি কোথায়, প্রতি গৃহস্থের বাড়িতে রক্ষিত টোকোনোমা তাংখার প্রেরণা কোথা থেকে এসেছে। যিনি প্রকৃতির জন্য হয়ত আদৌ ব্যাকুল নন, তিনিও প্রকৃতির স্তবে মাথা নত করে স্তব্ধতা ও আত্মনিবেদনের আশ্রয় নেবেন।

সারাদিন নিক্কোয় কাটিয়ে রাত্রে হোটেলে ফিরে চারজনে চুপচাপ খেয়ে যখন শুতে গেলুম, মনে হল গত কয়েকদিনের শারীরিক ক্লান্তি সব যেন কেটে গেছে। রেললাইনের ধারে জানলা থেকে ভোরে শুরু হল ইলেকট্রিক ট্রেনের একটানা ছন্দ।

প্রথম কয়েকদিন ভয়ে টিপে টিপে ইয়েন খরচ করে দেখলুম, প্রায় প্রতিদিনই দুপুরে ও সপ্তাহে অন্তত দুদিন রাত্রে অন্যেরা খাওয়াচ্ছেন। সুতরাং বিনয় দাশগুপ্ত মশায় যে পয়সা মঞ্জুর করেছিলেন তাতে সকালে কিছুটা পেটভরে ব্রেকফাস্ট করা যায়।

১২ নভেম্বর থেকে প্রতি সপ্তাহে সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত প্রতিদিন টোকিও এবং আশেপাশে অন্তত দুটি করে ছোট বড় কারখানা, তার সঙ্গে জাপানের সর্ববৃহৎ পাঁচ ছয়টি শিল্পগোষ্ঠী ও তাঁদের সংলগ্ন ক্ষুদ্রশিল্পপতির সঙ্গে দিনান্তে বৈঠক করতুম। শনিবার কাজ হত সকাল ৮টা থেকে ৩টে পর্যন্ত। জাপানী পক্ষ আমার সহকর্মীদের নিষ্ঠা, উৎসাহ ও পরিশ্রম দেখে বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করেন, ও পরের সপ্তাহ থেকে দ্বিগুণ মনোযোগ সহকারে আমাদের সর্বত্র নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন, তার সঙ্গে আমাদের জাপান দেখা ও অবসর বিনোদনের ব্যবস্থায় আরো দৃষ্টি দেন। সংযোগ দৃঢ় হল, কিছুটা আত্মীয়তার সম্বন্ধও যেন এল। সব মালিকই কারখানার শপ-ফ্লোর দেখানোর আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিভিন্ন ধরনের কারখানার বিশদ বিবরণ দিয়ে পাঠকের ক্লান্তি ঘটাব না। কিন্তু আমার অনভিজ্ঞ চোখে ও মনে যেগুলি বিশেষ ছাপ রাখে সে বিষয়ে সাধারণভাবে বলি।

প্রায় চব্বিশ দিনে সবসুদ্ধ বোধ হয় গোটা কুড়ি বড় বড় উপরন্তু প্রায় একই সংখ্যক ছোট কারখানায় ঘুরেছি। তার মধ্যে দুটি খুবই বড় সুতাকল তৈরির কারখানা। প্রতিটির সংলগ্ন ছোট গুটিকয়েক বিশেষ বিশেষ অংশ উৎপাদনের কারখানা, বড় কলটির জন্য সরঞ্জাম তৈরি করছে।

যে শিক্ষাগুলি আমার মনে গেঁথে গেছে, তার উল্লেখ করি। বর্ধমানে ও হাওড়ায় কাজ করার সময়ে আমি বেশ কিছু কারখানা দেখেছি। সেগুলিতে

বিরাট খেলার মাঠের মত শপ-ফ্লোর ; সবই বেশ নোংরা ও আবর্জনাপূর্ণ, মনে হয় অনেকদিন ঝাঁট পড়েনি। যন্ত্রপাতি যেখানে সেখানে ছড়ানো, গুছিয়ে টেবিলে বা দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা নেই, অতএব যে কোনো যন্ত্র খুঁজতে নিশ্চয় সময় নষ্ট হয়। জাপানে যত বড় ফ্যাক্টরিই হোক শপফ্লোর যেন তকতক করছে, যন্ত্রপাতি সার করে বড় থেকে ছোট আকারে লাইন ধরে সাজানো, যেন চোখ বুজে হাতে স্পর্শ করে ঠিক সাইজের যন্ত্রটি পাওয়া যায়। ব্যবহার শেষ হলে আবার স্বস্থানে ফিরে যায়। দ্বিতীয়ত, যেখানেই গেছি সঙ্গে গেছেন বেশ উপরতলার ফোরম্যান বা সহকারী ম্যানেজার, সঙ্গে আমরা চারজন বিদেশী। কিন্তু কোনো শ্রমিককে কখনও, হাতের কাজ ফেলে শরীর বা মাথা ঘুরিয়ে, ক্ষণিকের জন্যও তাকিয়ে থাকতে দেখিনি। উপরন্তু, বিলেতী কারখানায় যাকে বলে ক্যাপ-টাচিং, অর্থাৎ উপরওলাকে দেখলেই হাত স্বতঃই সসম্ভ্রমে মাথার টুপির ডগা ছোঁবে, সেরকমটিও দেখিনি। অথচ, বড়কে সম্মান দেখানো জাপানী রক্তের গভীরে ; উপরওলা নেহাৎ কাছে গিয়ে কথা বললে তবেই মাথা নামিয়ে নমস্কার জানাবে। তৃতীয়ত, কাজ বিরতির বাঁশি পড়লে পর কাজ ছেড়ে যন্ত্রপাতি গুছিয়ে যেতে বা বাড়ি যাবার উপক্রম করবে, তার আগে কোনো পাঁয়তাড়া নেই। চতুর্থত, কাজ সেরে যখন সন্ধ্যায় ফিরছি তখনও অনেক সময়ে দেখেছি, বাঁশি বাজার বেশ পরেও, কোনো কোনো কর্মী নিজের কলে তেল লাগাচ্ছেন অথবা ঝাড়পোঁছ করছেন।

সব থেকে ভাল লাগল, প্রতি ফ্যাক্টরিতে একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে যখন একটি সেকশনের সব কর্মীরা একটি ক্লাস ঘরে জড়ো হবে। এটা সাধারণত দিনের শেষে বাড়ি ফেরার আগে বাড়তি একটি ঘণ্টা, যার জন্যে শ্রমিককে ওভারটাইম দেয়া হয়। ক্লাসে সব থেকে প্রাধান্য পায় এঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং পড়তে শেখা, যাতে ব্লু-প্রিন্টগুলি পরীক্ষা করে নিজেদের যন্ত্রপাতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার বোধ বাড়ে, এবং সব থেকে বড় জিনিস, মাথায় নতুন প্রয়োগ বা উন্নতির চিন্তা খেলে। এর সুফল হচ্ছে যন্ত্রপাতির আভ্যন্তরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞান প্রখর হয় এবং শ্রমিক সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতিকল্পে চিন্তা করতে শেখে।

সবশেষে যে রীতির উল্লেখ প্রয়োজন, সেটি উপরন্তু তদারকি ফোরম্যানদের সপ্তাহে একদিন, প্রয়োজনে দুদিন, মিটিং। সকলেই পাশ করা অথবা সার্টিফিকেট পাওয়া দক্ষ এঞ্জিনিয়ার। এই মিটিংগুলিকে আজকালের ভাষায় বলা যায় ইণ্টারনাল ওয়ার্কশপ : অর্থাৎ গত সপ্তাহে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে তার বিশদ আলোচনা, সমাধান ও পরস্পরের সহযোগিতার ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে অন্য দেশে সেই ধরনের সমস্যার কীরূপ সমাধান হয়েছে তার সম্বন্ধে যাকে বলে গঠনমূলক আলোচনা।

এইসব অভ্যাস বা রুটিন যেন নাওয়া-খাওয়ার মত প্রতিটি কর্মীর অভ্যাস হয়ে

গেছে। জাপানী আজ্ঞানুবর্তিতা সম্বন্ধে আমাদের একটি ভুল ধারণা ছিল : যেন অধস্তন কর্মী মুখ বুজে জো-হুজুর করে উপরওলার কথা মেনে নেবে। দেখলুম, তা নয়। বিনীত কণ্ঠে, নিচু স্বরে, কথা উভয় পক্ষেই চালু, অথচ সাধারণ কর্মী তার বক্তব্যটি পুরো ব্যক্ত করার অনুমতি পায়, শেষে মাথা ঈষৎ নিচু করে মুখে অস্ফুট সম্মানসূচক শব্দ করে বসে।

আমাদের সঙ্গে যখন যন্ত্রপাতি কেনাবেচা ও যাকে বলে টেকনোলজি-ট্রান্সফারের কথা হত, তখন বিশেষ করে কোম্পানির ব্যবসায়ের দপ্তরের লোক উপস্থিত থাকতেন।

পুরো তিন সপ্তাহ ধরে কার্যসূত্রে ঘোরাফেরা ও বৈঠকে নানা ধরনের লেন-দেনের খুঁটিনাটি আলোচনা করে আমরা একটি জিনিস হাড়ে হাড়ে বুঝলুম, যে বিষয়ে বোস সাহেব আমাদের প্রথমেই অবহিত করেন। জাপানীদের চুক্তি খসড়া, তার সঙ্গে দরাদরি আর বৃটিশ, জার্মান বা রাশিয়ান কোম্পানির সঙ্গে কথা বলার মধ্যে খুবই তফাৎ। অত্যধিক অধ্যবসায় ও প্রতিটি কমা, ফুলস্টপ বিষয়ে নজর রাখা আবশ্যক, যা অন্য পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে কথাবার্তায় অনেক সময়ে ভদ্রলোকের কথাবার্তায় উহ্য থাকে, অথচ ধরে নেয়া যেতে পারে যে আছে। পরে প্রশ্ন উঠলে অন্তত রফা করা যায়। জাপানীদের সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তাবিত কনট্র্যাক্ট খসড়ার প্রতিটি কথার প্রকাশ্য, নিহিত অর্থ বা ইঙ্গিত সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হতে হবে, যাতে আপনার কোনো শর্ত বাদ বা উহ্য না থাকে, তা যত সামান্য মূল্যেরই হোক। যদি চুক্তিপত্রে উল্লেখ না থাকে, তবে যত প্রাসঙ্গিক ও উহ্যই হোক অর্থাৎ গতানুগতিক হিসেবে ধর্তব্য হোক, বেশ গুণাগার দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত আমাদের কেমন যেন ধারণা হল, যত বড় বা ছোট শিল্পই হোক কোনো কারখানা বা প্রস্তুত দ্রব্যের কোনো অংশ যদি ক্ষয়, হারিয়ে বা ব্যবহারে নষ্ট হয়, তাহলে জাপানী স্পেয়ার পার্টস কিনতে হবে, এবং সেই সব স্পেয়ারের মূল্য সাধারণত বাজারের তুলনায় বড় বেশী ধার্য করা হয়। ফলে অনেক সময়ে সাধারণ স্পেয়ার বদলাতে বদলাতে আসল জিনিস বা যন্ত্রের প্রায় নতুন দাম উঠে যায়। এসব দিকে আগে থেকে সতর্ক না হলে, ব্যবসা করতে গিয়ে জাপানীদের সঙ্গে বড় মুশকিল এমনকি তিক্ততা হত। অন্য দেশের, বিশেষত পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে চুক্তির পরে এধরনের সমস্যা কম হত, এমনকি অনেক বিষয়ে সম্ভাব্য বা অসাবধানতাজনিত ভুলের জন্য কিছুটা রেহাই পাওয়া যেত, অত খেসারত দিতে হত না। কিন্তু জাপানীদের সঙ্গে তা নয়, শাইলকের পাউণ্ড অভ্ ফ্লেশের কথা মনে পড়ে যায়। বোস সাহেব অযাচিতভাবে অনেক সময়ে একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাদের ঋণপাশে আবদ্ধ করেন।

১৯৫৬ সালে জাপানে রাস্তাঘাট কিছুটা আদিম অবস্থায় ছিল। লোকজন

চলাচল ও মাল অধিকাংশই রেলপথে হত, বিশেষত দূরপাল্লার। এমনকি টোকিও নগরীর শহরতলি অঞ্চলেও রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা, এবড়োখেবড়ো ছিল। সেই হিসেবে, ট্রেনগুলি ছিল যেমন ক্ষিপ্রগতি তেমনি আরামের। অনুপাতে জাপানের মোটর শিল্পের ছিল শৈশব অবস্থা: ডানস্থন ও হোণ্ডাই বেশী। টয়োটা ইত্যাদি খুব কম। তখনও টোকিওর মেট্রো রেলে (কিছু কিছু স্থানে পাতালগামী) অত ভিড় হত না, যা ১৯৮২ সালে দেখেছি। ১৯৮২-তে শহরতলির মেট্রোরেলে ওঠা হয় প্রাণান্তকর ব্যাপার। জাপানী কুস্তিগীরের মত প্রকাণ্ড দেহের এক একটি লোক প্রতি কামরার দরজার সমুখে দাঁড়িয়ে থাকত, দরজা খুললেই আপনাকে মোট টেনে তোলার মত করে ঠেলে ঠেলে কামরার মধ্যে ঢুকিয়ে দিত। তাদের বলত 'পুশার'। কামরায় একবার ঢুকলে নড়াচড়া মুশকিল, দমবন্ধ হবার উপক্রম। নামার সময়ে গাড়ির ভিতরের ভিড়ই পুশারের কাজ করে আপনাকে ঠিকরিয়ে বার করে দেবে। এসব সত্ত্বেও ট্রেন আসতে বা ছাড়তে সাধারণত এক সেকেণ্ডও বিলম্ব হয় না। সাধে কি জাপানীরাই পলিয়েস্টার কাপড়ের প্রথম আবিষ্কারক হয়। অন্য কাপড়জামা পড়লে প্রতিবার উলঙ্গ হয়ে নামতে হত।

সেবার জাপানে থাকতে হোক্কাইডো, এমনকি দক্ষিণে কিউ-শু দ্বীপেও কখনও যাইনি। মধ্যমণি হোনশুর ভিতরেই যা কিছু ঘোরাফেরা করেছি: উত্তরে নী-গাটা, দক্ষিণে হামামাৎসু-ওয়াকায়ামা, পশ্চিমে ওকায়ামা (হিরোশিমা যাইনি)। মুখ্যত ঘুরেছি টোকিও, মাৎসুমোটো, পশ্চিমে ইজুমা, হিমেজি, কোবে, ওসাকা, কিয়োটো, ইজে, নারা, নাগোইয়া, হামামাৎসু, ইয়োকোহামা, কামাকুরা, টোকিও শহরের ও আশেপাশের বিস্তৃত শহরতলি, এবং ফুজিদানের দক্ষিণ পাদদেশে মিয়োনোশিটা-হাকোনে। ফুজিসান হচ্ছে ৩৭৭৬ মিটার উঁচু।

প্রথম সপ্তাহে প্রতি বিষয়ে আমার সঙ্গীদের আগ্রহ, অনালস্য ও নিষ্ঠা দেখে জাপানী কর্তৃপক্ষ সম্ভবত যুদ্ধ ও আশ্বস্ত হন, বিশেষত দীর্ঘ দিনের শেষে আমার সঙ্গীদের দেহে মুখে কোনো ক্লান্তির ছাপ না দেখে। সোমবার সন্ধ্যায় যেখানে সান্ধ্য আহারের নিমন্ত্রণ ছিল সেখানে পৌঁছতে হয়ে গেল প্রায় সাতটা। সাধারণত গিঞ্জাপল্লীতে ভিড় হতে শুরু করে ছটার পরই। গিঞ্জায় গেইশা-রেস্তরাঁয় সান্ধ্য আহার জাপানীদের পক্ষেও অপেক্ষাকৃত বিরল উৎসব। গেইশা হোস্ত্রীদের তত্ত্বাবধানে ও পরিচর্যায় সান্ধ্য ভোজের জন্য উদগ্রীব হবেন না, এমন পুরুষ পৃথিবীতে বিরল।

বিদেশে সম্ভ্রান্ত ও বিস্তৃত রেস্তরাঁ পাড়ার একমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল লণ্ডনের সোহো পল্লীর। ১৯৩৯-৪০ সালে যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সন্ধ্যায় ব্ল্যাক-আউট শুরু হয়, ফলে সোহোতে আলোর জাঁকজমক আমার দেখার সুযোগ হয়নি। কিন্তু গিঞ্জায় ঢোকার অনেক আগেই দূর থেকে মনে হল এক ইন্দ্রপুরী। ছোট ছোট কাঠের

দোতলা বা তেতলা হাতাওলা বাড়ির সমষ্টি দিয়ে পল্লীটি তৈরি। আকাশ থেকে দিনের বেলা দেখলে হয়ত মনে হবে পরিচ্ছন্ন বিরাট একটি বস্তি। সমস্ত পাড়াটিই আলোয় আলোয় এতই যাকে বলে খিরখিট্টি, সূর্যের তেজকেও যেন হার মানায়। রাস্তায় একটি পিন পড়লেও দেখা যায়। প্রতিটি বাড়ির সম্মুখে ভদ্র, নম্র দরজা, বাকিটা কাঠের পাঁচিল ঘেরা। মাথার উপরে একটি জাপানী লণ্ঠন। ঢোকার সময়ে মনে হবে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ি। আমাদের হোতা বললেন, সমুখটি যত সাধারণ দেখাবে, ততই হবে সেটি মহার্ঘ স্থান। ঢুকতেই সাবেকি পোশাকে সজ্জিতা গৃহস্বামিনী আপনাকে হাঁটু গেড়ে মাথাটি প্রায় মাটিতে মিশিয়ে স্বাগত জানিয়ে মাথা তুলে স্বাগত করবেন। সাজ পোশাক একেবারে ইডো যুগের জাপানী উডকাট রমণীদের মত, হাঁটা চলা যেন হারুনোবুর ছবি থেকে জ্যান্তশরীরে বেরিয়ে এসেছেন। আগন্তুক সকলে একে একে জুতো ছেড়ে, দরজার সমুখে সারি সারি সাজানো চটিজুতো পরে, হাত মুখ ধুয়ে পুঁছে, একে একে খাবার ঘরে সমবেত হবেন। প্রতি রেস্তরাঁয় এই ধরনের আলাদা খাবার ঘর অনেকগুলি আছে, প্রতিটির জন্য আলাদা হোস্ত্রী থাকবেন। ঘরে ঢুকলে দেখবেন, আরো দুজন গেইশা মহিলা একে একে খাবার এনে সাজাচ্ছেন। প্রতি অতিথির জন্য হাতে-ছাপা কাপড়ে-মোড়া অতি সদৃশ্য একটি বড় কুশন প্রতি আসনের সমুখে একটি ল্যাকার করা নিচু চৌকি, তাতে ভোজের পদগুলি একের পর এক রাখা হবে। প্রধান অধিকারিণী সকলের সমুখে মাঝখানে একটু দূরে বসে অতিথিদের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করেন, সেই সঙ্গে চোখের ইশারায় যে সব গেইশারা খাবার আনেন তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশ দেন।

সবথেকে মহার্ঘ ও এলাহি আহার হল সুকিয়াকি ডিনার। প্রত্যেকের প্লেটের একপাশে থাকবে একজোড়া হাড় বা হাতির দাঁতের চপস্টিক (আজকাল প্ল্যাস্টিক)। প্রথমেই আসবে প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা সাকের একটি সরু মুখওয়ালা ছোট বোতলের মত ফ্লাস্ক, তাঁর সঙ্গে খুরো দেয়া সাকে খাবার ছোট্ট বাটি। সঙ্গে আসবে ছোট ছোট প্লেটে নানারকম ছোট ছোট করে কাটা ফল ও সবজি, তার সঙ্গে আলাদা ছোট ছোট পাত্রে সয়া সস ও হর্সর‍্যাডিশ (একধরনের সবুজ মূলো, কিন্তু ভীষণ ঝাঁঝ)। অসাবধানে মুখে সামান্য বেশী পুরলে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত ঝনঝন করবে। এটি হল ইংরেজিতে যাকে বলে এপারেটিভ, অর্থাৎ রসনায় লালা সঞ্চারক। তার পর আসে কাঁচা মাছের ডুমোডুমো চৌকো টুকরোর পদ, নাম শুশি, তার সঙ্গে আবার নানাধরনের কাটা সবজি ও ফল, একটি একটি করে সসে ডুবিয়ে খেতে হয়। প্রথমে আমি খুবই ভীত হয়েছিলুম, কিন্তু একবার শুশি মুখে দিয়ে হলুম পরম আসক্ত। আপনি যদি চান, এরপর আসবে মাছের টেম্পুরা, (কিছুটা আমাদের ব্যাটার দিয়ে ভাজা সরু সরু টুকরো ভেটকি, তপসে বা বাগদা

চিংড়ি, অথবা অন্য মাছ যাতে আঁশ নেই)। তার সঙ্গে সবজি ও সস। সমান তালে চলেছে এক এক ঢোঁক সাকে। প্রতি ঢোঁক অবশ্য দুই কি তিন চায়ের চামচ। অথবা সাকুরা বিয়ার। জাপানীদের মধ্যে ওসাকায় তৈরি সাকে শ্রেষ্ঠ ছিল। এই ধরনের ভোজ এতই খরচসাপেক্ষ যে সাধারণত টেম্পুরা দিয়ে শেষ হয়। প্রথম দিন এছাড়াও এল সুকিয়াকি, যাকে বলে সুকিয়াকি ডিনার—অর্থাৎ শুশি বা টেম্পুরার পর ষাঁড়ের মাংসের পদ। সবথেকে মহার্ঘ মাংস হচ্ছে কোবে বীফ। কোবের চারদিকে বিস্তৃত প্রান্তরে পালিত গরু ষাঁড় দলে দলে চরে, যথেচ্ছ বিচরণ করে স্বাভাবিক ঘাস খাবে। সেই ধরনের পালিত ষাঁড়ের মাংসকে বলে লোকিং বীফ, অর্থাৎ তাদের শরীরের মাংসের ভাঁজে ভাঁজে থাকে সরু পাতলা চর্বির পর্দা। ফলে রাঁধা মাংস যেন মুখে দিলেই মিলিয়ে যায়। স্টলে বাঁধা গরু-মোষের মাংস হয় খুব ঠাস, শক্ত, আর ওজনে ভারি। কোবে ষাঁড়কে মাঠে চরানোর পর স্টলে এনে পান করানো হয় বালিসেদ্ধ আর বালতি বালতি বিয়ার। এইসব তথ্য আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা মিৎসুবিশির ডেপুটি চেয়ারম্যান টাকাহাশি-সান বলেন। রান্নার তরিবত ও নিবেদন হয় যেন বিস্তারিত পূজার উপাচারে। এই ধরনের ভোজ শুরু হয় সন্ধ্যা ছ'টা সাড়ে ছ'টায়, শেষ হয় রাত্রি দশটা সাড়ে দশটায়। এর পর বাড়ি গিয়ে কোনো নোট বা রোজনামচা লেখা অসম্ভব, কারণ পরের দিন আবার ভোর সাতটার সময়ে সেজেগুজে তৈরি হয়ে ঘর থেকে নামতে হবে। জাপানী মালিকরা কী করে যে এই রুটিন অনুসরণ করেন এবং তার ফল কী, দেখলুম ১৯৮২ সালে। ১৯৫৬ সালের যেসব পরিচিত বন্ধু ১৯৮২তে জীবিত ছিলেন, তাঁদের সকলের চুল পাকা, মুখে গভীর বলিরেখা, অধিকাংশের হৃদরোগ, না হয় ডায়াবিটিস বা অজীর্ণ। অথচ দ্বিতীয় যুদ্ধের আগে পর্যন্ত জাপানী পুরুষদের চুল থাকত ঘন কৃষ্ণ রঙের, হৃদরোগ প্রায় ছিলই না, মানসিক রোগ ত নয়ই।

সেইদিন রাত্রে গাড়ি থেকে ডাই-চি হোটেলে নামার সময়ে বোস সাহেব ও হোরিকে বলা হল এরকম আদর আপ্যায়ন বড় জোর সপ্তাহে একদিন চলে, না হলে আমরা ফিরে গিয়ে ডাঃ রায়ের কাছে বেত খাব। সহকর্মীদের এই কথা হোরি বোধ হয় কর্তৃপক্ষকে নিবেদন করেন, ফলে তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহে আমাদের নানাস্থানে নিয়ে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব কিছু দেখাতে শুরু করলেন। কোনো কিছু দেখতে চাইলে কখনোই বলেননি এখানে বা ওখানে আপনাদের নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে হোরিকে আমার নিজের আর্জি আর ফর্দ পেশ করেছি। টোকিও শহরে কী কী দেখার ইচ্ছা, বিশেষ করে, মেইজি ও হিয়ে মন্দির, সেংগাকুজি, গোকোকুজি, সেনসোজি, কোরাকুয়েন উদ্যান। উপরন্তু অতি সমৃদ্ধ টোকিও মিউজিয়ম, ইম্পিরিয়াল মিউজিয়ম, অস্ত্রশস্ত্রের মিউজিয়ম। সেই

প্রসঙ্গে, পৃথীশের প্রস্তাব মত কাদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা তাও জানালুম। যেমন স্থপতি ইয়ামাদা-সান, লোকশিল্পের মিউজিয়াম মিংগেইকান, এবং বিখ্যাত পণ্ডিত শিনজি কোইকে-সান। উপরন্তু কেইয়ো বিশ্ববিদ্যালয়, মেয়েদের ওয়াসেদা মেডিকাল কলেজ। তাছাড়া মারুনোচিতে স্থপতি ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের তৈরি সুবিখ্যাত ইম্পিরিয়াল হোটেল, জাপান সম্রাটের প্রাসাদের দেওয়ালের সমুখে।

তখন স্ত্রীস্বাধীনতা আন্দোলন সবে শুরু হয়েছে। সম্রাটের কোনো উৎসবের নিমন্ত্রণে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা কেন নিজের স্ত্রীকে না নিয়ে তাঁদের প্রিয় গেইশাদের নিয়ে যাবেন, তার বিরুদ্ধে প্রতিদিন সংবাদপত্রে অজস্র চিঠি প্রকাশিত হচ্ছে। স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত আক্ষেপের কথা বলি। এক একদিন রাত্রে হোটেলে যাবার পর আমি শিমবাশি স্টেশনে ট্রেন ধরে একা একা টোকিও আসতুম, ফিরে যেতুম। উদ্দেশ্য, চারিদিকে সাধারণ লোককে নিরীক্ষণ করা ও হাত-পা ছাড়ানো। পাঠক নিশ্চয় এতক্ষণে নৃতত্ত্ববিদরা যাকে বলে ওরিয়েণ্টাল মডিউল, আমার দেহাবয়ব ও মুখের ছাপ যে তাই সে সম্বন্ধে জেনেছেন। অর্থাৎ থাইল্যাণ্ডে আমাকে ভাবত থাই, মালয়েশিয়াতে মালয়, ফিলিপিনে ফিলিপিনো, জাপানে জাপানী, কোরিয়াতে কোরিয়ান। দার্জিলিং-এ গুর্খা, বিশেষত যখন সামান্য গোর্খালি জানি। আভা সে-সময়ে কলকাতায় স্টেনো-টাইপিং শিখে জাপানী কনসালেটে জাপানী ভাষায় কথাবার্তা বলা শিখছে। আনো-নে, মসিমসি, আরিগাতো, সোদেশ-নে, সোদেশ-কা বলা রপ্ত করছি। সন্ধ্যাবেলা হয়ত শিমবাশি স্টেশনে ট্রেনে উঠছি। অফিস ফেরতা মহিলারা প্রায়ই জাপানী বলে ভুল করে কথা শুরু করতেন, মুহূর্তে আমার শূন্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে মাথা নিচু করে ভুলের মাশুল হিসাবে নমস্কার জানিয়ে অন্যের কাছে যেতেন। মন খারাপ হয়ে যেত।

আমার অনুরোধে, পৃথীশ ও মিস এডারটন তাঁদের পরিচিতদের লিখে দিয়েছিলেন। পৃথীশের পরিচিত স্থপতি ইয়ামাদা-সান ও তাঁর- সাকরেদ নাকামোটো ডাই-চিতে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের কৃপায় ও মিৎসুবিশির মাঝারি স্তরের কর্তা টাকাহাশি-সানের সঙ্গে পরিচয়ের পর আমরা নাকামোটো ও টাকাহাশির বাসগৃহে যাই। জাপানী পরিবারের বাসগৃহে নিমন্ত্রিত হওয়া রীতিমত দুষ্কর, বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ ত দূরের কথা।

জাপানী বাড়ি সাধারণত বেশ ছোট হয়। বাড়ির বাইরে সামান্য চারদিক ঘিরে মাথাপ্রমাণ সরু সরু কাঠের পাটার দেয়াল, যাতে রাস্তা থেকে ভিতরে সাধারণত না দেখা যায়। সামনের অল্প বাগানের উপর বাড়ি, অনেক সময়ে সমুখে বারান্দা থাকে না। পাশে সরানো যায় এমন হাল্কা কাঠ ও অস্বচ্ছ শোজি কাগজের শার্সি দেয়া দরজা খুলে দিলে সারা ঘরই বারান্দা হয়ে যায়, ফলে ছোট

বাগানের ও আকাশের শোভা দেখা যায়। স্পষ্টই বোঝা যায় ঘরের (নীড়ের) ক্ষুদ্রতাকে প্রকৃতি ও আকাশের অসীমতায় (বিশ্ব) খুলে দেবার জন্য সারা বাড়িময় এইরকম ব্যবস্থা। ঘর থেকে ঘরে যাবার পাশে-টানা দরজা দিয়ে ইচ্ছামত ঘরের সাইজ বাড়ানো, কমানো যায়। শোজি কাগজের শার্সির দরুণ যথেষ্ট স্বাভাবিক আলো আসে অথচ নিভৃততা থাকে। বিশ্বকে ঘরের অন্তস্থলে আনা, ঘরের অন্তস্তলকে বিশ্বে মিলিয়ে দেয়াই জাপানী গৃহস্থাপত্যের উদ্দেশ্য। স্থাপত্যের ভিত্তি হচ্ছে Zen দর্শনে। সেই দর্শনের ভিত্তিতেই বাড়ির যাবতীয় উপচারের, সে কাঠ, মাটি, বাসনকোশন থেকে শুরু করে প্রতিটি বস্তুর, যথাসম্ভব প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক রঙ রাখার প্রয়াস। যা কিছু বর্ণাঢ্যতা আসে তার অধিকাংশই কাপড় ঢাকা, গৃহ বা দেহসজ্জায়। ঘরের আয়তন যদিও ছোট, বিস্তৃতির অনুভূতি দেবার উদ্দেশ্যে, উপরন্তু মেঝেকে গরম ও সুদৃশ্য, প্রশস্ত ও ধূলিশূন্য রাখার জন্য প্রতিটি ঘরে এক বা একাধিক কালো বা রঙিন নকশাওলা কাপড়ের পাড়-দেয়া পুরু মাদুর বিছানো। জাপানীতে মেঝের এই মাদুরকে বলে টাটামি। প্রায় সর্বত্র একই সাইজ, তিন ফুট চওড়া ছয় ফুট লম্বা, প্রয়োজন হলে তার অর্ধেকও হয় যথা দেড় ফুট, তিন ফুট। মেঝের উপর পাশাপাশি, আড়াআড়ি, লম্বালম্বি অথবা চৌখুপি করে সাজানো। টাটামি অনুসারে ঘরের সাইজ হয়, যেমন দুই টাটামি ঘর, চার, ছয়, আট দশ টাটামি ঘর ইত্যাদি। ভগ্নাংশও হয় যেমন সাড়ে চার টাটামি ঘর।

কোনো ঘরে কোনো আসবাব নেই, কেবল রান্নাঘরে বাসনকোশন মশলা-পাতির তাক, ও রান্না ধোয়ার আয়োজন ছাড়া। সব কিছু, বসা, খাওয়া, শোয়া, মেঝের উপর। কুশন ও ছোট ছোট খাবার, আঁকার ও লেখার চৌকি, রান্নার পাশে প্যান্ট্রিতে রাখা। ঘরময় যাকে বলে দেয়ালে ঢোকানো আলমারি, তাদের দরজাও ডাইনে বাঁয়ে পাশে ঠেলে খোলা যায়। তার মধ্যে লেপ, তোষক, গদি, কুশন, চাদর থেকে শুরু করে যাবতীয় জামাকাপড়, জিনিসপত্র পরিপাটি করে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে দরজা টেনে দেয়াল করা যায়। প্রতিটি আলমারির তাকে তাকে থরে থরে জিনিস সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা, একচুলও টেরাবেঁকা নয়। Everything straight and true, not a thread nice and crooked.

ইয়ামাদা-সান, টাকাহাশি-সান, নাকোমোটো-সানের কাছে জাপানী রুচি ও ভব্যতা সম্বন্ধে একটি জিনিস শিখলুম, যা আমার ইংরেজি আভিজাত্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধাকেও হার মানায়। কোথায় যেন লিখেছি এলিস্টেয়ার কুক নিউইয়র্কে একবার বার্ট্রাণ্ড রাসেল সম্বন্ধে লিখেছিলেন, সালটি ১৯৫০। নিউইয়র্ক থেকে ইংলণ্ড হয়ে সে বছর তিনি নোবেল প্রাইজ আনতে স্টকহোলমে যাবেন। ১৯৩৬ সংস্করণের হুইটেকারের পিয়ারেজ বলে, বার্ট্রাণ্ড রাসেল ছিলেন তাঁর বংশানুক্রমে তৃতীয়

আর্ল (ইংলণ্ডের)। খাস বেডফোর্ডে ছিল আদি নিবাস। সুতরাং বংশগৌরবের কোনো প্রশ্নই থাকে না। এই প্রসঙ্গে একান্তে একটি কথা বলি। আই-সি-এস পাশ করে দেশে চাকরিতে যোগ দেবার আগে সভা-সমিতিতে পরার জন্য অন্তত একটি স্যুট বণ্ড স্ট্রীট বা স্যাভিল রোর কোনো বড় দোকানে করানো রেওয়াজ ছিল। যেমন আমি করাই পোপ এণ্ড ব্র্যাডলিতে। নতুন স্যুট যাতে ঝকমক না করে, তার জন্য আপনাকে দেবার আগে দোকানদার সারা স্যুটটি স্টীম ইস্ত্রি করে দিত, যাতে নতুনভাব কেটে গিয়ে কাপড়ের চেহারা এমন হয়, যেন কিছুদিন পরা হয়েছে, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত পুরনো। একেবারে নতুন কিছু পরে হঠাৎ-নবাবরা। এবার কুকের গল্প বলি। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সঙ্গে কুকের পেনসিলভ্যানিয়া স্টেশনের কনকোর্সে দেখা করার কথা ; সেখানে রাসেল অপেক্ষা করবেন। বেশ সকাল, তখনও খবরের কাগজের স্ট্যাণ্ড খোলেনি। স্টেশনে ঢুকে দূর থেকে মনে হল একটি জীর্ণ শীর্ণ ভিখারি দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে মাপের থেকে অনেক বড় সবুজ বিবর্ণ টপকোট (ফ্যাশনের সবুজ নয়, রঙ চটে সবুজ)। কুকের আশঙ্কা হল এই বুঝি কোনো পুলিশম্যান তাঁর ঘাড়ে হাত রেখে প্রশ্ন করবে 'এখানে থাকার ঠিকানা আছে ? কোথায় যাবে ভায়া ?' বলে ধরবে। কুক লিখছেন, 'আর পুলিশটি কাটাকাটা উত্তর পাবে, "আমি বার্ট্রাণ্ড আর্থার উইলিয়াম, ৩য় আর্ল রাসেল, এখন থাকি সারে'র রিচমণ্ডে, অল্পদিনের মধ্যে যেতে হচ্ছে সুইডেনের স্টকহোল্‌মে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ আনতে। আপাতত যাচ্ছি ওয়াশিংটনে আমার কন্যা কেটকে দেখতে"।' ১৯৫৫ সালে আবার নিউইয়র্কে দেখা। বুটেনে সাধারণ নির্বাচনে ক্লেমেণ্ট অ্যাটলি জিতবে কি অ্যাণ্টনি ইডন এই নিয়ে আলাপ হল। কুক রাসেলকে সোজা জিগ্যেস করলেন 'ইডনকে আপনার কেমন লাগে ?' কুক বললেন রাসেল (তখন বয়স সাড়ে তিরাশি) কিছুটা রাগতভাবে তাঁর দিকে তাকালেন, স্মৃতি থেকে যেন নামটি টেনে বার করে, সেটিতে এক পলক চোখ বুলিয়ে বললেন, 'ভদ্রলোক নয়, বড় বেশী সাজগোজ।' কুকের মন্তব্য, 'বুড়োর শিরার রক্ত এখনো নীলই আছে।'

কিন্তু জাপানী ভদ্রলোকের কাছে রক্তের যে মন্তব্য শুনলুম, মনে হল আরেক কাঠি সরেস। তিনজনেই বললেন, 'আমরা ফ্যাশনের জন্য, বা চমক লাগাবার জন্য নানা কাপড়ের ভিন্ন ভিন্ন স্যুট করি না, পাছে লোকে মনে করে রোজই নতুন জামাকাপড় বা জুতো পরছে। অনেক বিচার করে যে কাপড়টি আমাদের সবদিকে মানায় বলে দরজি ঠিক করে, সেই একই কাপড়ের আমরা দু-তিনটি একই কাটের স্যুট করি, একই ধরনের ও রঙের কয়েক জোড়া জুতো কিনি। ফলে প্রায় রোজই ভিন্ন ভিন্ন স্যুট ও জুতো পরা হয়, অথচ অফিসে বা আড্ডাতে মনে হবে একই জামা-কাপড় রোজ পরছে। যাতে বড়মানুষি চালিয়াতি করছে না ভাবে।' এই ধরনের

সুশিক্ষা সাঁইত্রিশ বছর বয়সে প্রথম হল। তাও পুরোপুরি হল না, এ জীবনে।

যা বলছিলুম। সব আলমারির বাইরের দরজাই দেশে যাকে আমরা বলি ইকত বা ডবল ইকত বা পাটান পটোলা বুননের কাপড়ে অথবা বান্ধনি নকশার ছাপা কাপড়ে ঢাকা। তখনও এই সব কাপড় হত মুখ্যত ভেজিটেবল ডাইয়ের রঙের সুতোয় বা ছাপায়। ছাপা ও নতুন কাপড়ের কেন্দ্র ছিল কিয়োটোয়। কারণ কিয়োটোর কাৎসুরা নদীর জল এইসব ছাপা বা রঙিন কাপড় ধোয়ার পক্ষে ছিল সব থেকে ভাল। তখনও ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশের বুনন বা ছাপাই কীভাবে হয় আমার ভাল জানা হয়নি। এখন বুঝতে পারি বহু শতক ধরে এই সব ভারতীয় বুনন ও ছাপাই কীভাবে ওকিনাওয়া দ্বীপকে কেন্দ্র করে উত্তরে জাপান, পশ্চিমে ফরমোজা এবং পুবে ফিলিপিনে ছড়িয়ে পড়েছিল।

প্রথম ইওরোপীয়রা জাপানী সভ্যতার নাম দেন 'এ সিভিলাইজেশন উইদাউট ফার্নিচার'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জনস্ফীতির চাপে ইওরোপীয় রীতিতে বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি শুরু হয়ে গেল, তার সঙ্গে এল চেয়ার, টেবিল, র‍্যাক, এমনকি আলাদা রাখা দাঁড় করানো আলমারিও। ফলে নাকামোটো তাঁর তৈরি যে সব ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলেন সেখানকার ঘরগুলি, যদিও চিরাচরিত জাপানী রীতিতে ছোট, এবং মেঝেতে টাটামি পাতা, তবুও তার উপরে চড়ল ইওরোপীয় আসবাব। ফলে আমার চোখে যেমন অসঙ্গত লাগল, তেমনি ঘরগুলি নড়াচড়ার জায়গার অভাবে গুদাম মনে হল। সবই খুব বুকচাপা লাগে। উপরন্তু জাপানী পরিবার যে তখনও টেবিল চেয়ারে অভ্যস্ত নয়, চেয়ার টেবিল সাজানোর রীতিতে তা বোঝা গেল। আসবাবহীন ঘরে যে সেন্স অভ স্পেস হয়, সেই সেন্স অভ স্পেস যেন হারিয়ে গেছে মনে হল। ঠিক যেমন তামিলনাড়ুতে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যখন বিচিত্র রঙের নকশা ছাপা নাইলন শাড়ির সহসা খুব রেওয়াজ হল, তখন বনেদী তামিল রুচি যেন হঠাৎ অন্তর্ধান করল, এমনকি কাঞ্চীপুরম শাড়িতেও বীভৎস সব রঙের বুনন ও নকশা হল।

জাপানী গৃহের প্রধান দৃষ্টিকেন্দ্র হল ঘরের একটি দেয়ালে বেশ কিছুটা, প্রায় মাথা থেকে মেঝে পর্যন্ত, কুলুঙ্গির মত ঢোকানো, তাতে পরিবারের অতি প্রিয় হাতে-আঁকা একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য, বৌদ্ধ থাংকার মত, টাঙানো থাকে। হয়ত সংসারে কয়েকটি এরকম থাংকা থাকে, কিছুদিন অন্তর বদলে বদলে টাঙানো হয়, নাম 'টোকোনোমা'। বৌদ্ধ থাংকায় যেমন বুদ্ধের অথবা প্রজ্ঞাপারমিতা ইত্যাদির ছবি থাকে, জাপানী টোকোনোমায় থাকে একটি খুব সরল অথচ খুব স্পষ্ট প্রাকৃতিক দৃশ্য, বা গাছপালা, বা ফুলের ছবি। এই ধরনের থাংকায় বিশ্বপ্রকৃতির কাছে প্রত্যহ পূজা ও ধ্যানের মাধ্যমে আত্মনিবেদন করে, পরিবারের সকলে দিন শুরু বা শেষ করেন। টোকোনোমার নিচে মাটিতে জাপানী প্রথায় একটি পাত্রে

ফুল-পাতা সাজানো থাকে।

রেস্তরাঁয় ভোজের কথা লিখেছি। এখন টাকাহাশি-সানের বাড়িতে তাঁর স্ত্রীর নিমন্ত্রণে রাত্রে খাওয়ার কথা বলি। সেই আমার জীবনে কোনো জাপানী বাড়িতে কর্ত্রীর নিমন্ত্রণে একবারমাত্র খাওয়া। পরে মিঃ বোস আমাকে বলেন, জাপানী পরিবারে, এমনকি পরিজনের নিমন্ত্রণও খুব কম হয়, অপরিচিতের ত কথাই নেই। স্বদেশের বন্ধুরাও বাড়িতে নিমন্ত্রণ প্রত্যাশা করেন না, যা কিছু হয় সব বাইরে। এই ধরনের রীতি বেশী প্রচলিত ফ্রান্সে, সেখানেও বন্ধুরা পর্যন্ত বাড়িতে নিমন্ত্রণ পান না। একমাত্র খেয়েছি বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক লুই ডুমোর বাড়িতে একা ওঁর আর ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে। শুনেছি ফ্রান্সে এ প্রথা এখনও চালু আছে। পাঠক বুঝতেই পারছেন, যেহেতু মিৎসুবিশির দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্তা, তাঁরা জাপানী হিসেবে নিশ্চয় বেশ উচ্চ মধ্যবিত্ত। কিন্তু খাবার অতি সাদাসিধে। স্বাদ কিন্তু অপূর্ব। যেগুলি শুধু সবজির পদ সেগুলি, আগেই যা বলেছি, মনে হয় যেন পূর্ববঙ্গের হিন্দু বিধবাদের রান্না। সেইরকম সূপ দিয়ে শুরু, তাতে সয়া বা অন্য সস ঢেলে যা কিছু স্বাদের রকমফের হয়। তারপরে দুটি পদ : একটি শুশি অর্থাৎ কাঁচা মাছ ; অন্যটি টেম্পুরা, যার উপাদানের কথা আগেই লিখেছি। মিষ্টির পদ নেই। সঙ্গে প্রচুর কো-চা বা ও-চা, সাকে বা বিয়ার। গোমাংস বা শূকরের মাংস নেই। পাঁঠা বা মেষমাংস জাপানে খাইনি। বাড়ির রান্নার স্বাদ জাপানেও কীরকম স্নিগ্ধ হয় তার প্রমাণ পেলুম।

দুপুরে কার্যস্থলে বা চারপাশের দোকানে জাপানীরা কী খাবার কেনে দেখার ঔৎসুক্যে একদিন এক কারখানার বাইরে আশেপাশে ঘুরলুম। সব থেকে মুগ্ধ হলুম সাধারণত ৬ বা ৮ ইঞ্চি লম্বা ৪ ইঞ্চি চওড়া ও প্রায় ১½ ইঞ্চি পুরু অতি পাতলা অথচ সুন্দর দেখতে পাইনকাঠের ঢাকনাওলা বাকসে, তার সঙ্গে একজোড়া বাঁশের চপস্টিক। ঢাকা খুলে দেখি গুটি বারো, পাশাপাশি তিন সারিতে সাজানো, ভাতের মণ্ড, প্রতি মণ্ডের মধ্যে ছোট্ট এক টুকরো মাছ বা সবজি, প্রতিটি মণ্ড আবার সমুদ্রের তলার শুকনো আয়োডিন পাতা দিয়ে মোড়া, সেই সঙ্গে আছে কয়েক খণ্ড নানাজাতীয় মাটির তলায় শিকড়ের মত গজানো সবজি। এত স্বাস্থ্যকর, অথচ সাদাসিধে ও সম্পূর্ণ পুষ্টিকর খাদ্য কল্পনা করা শক্ত, উপরন্তু এত যত্ন ও সুন্দরভাবে প্যাক করা। বাকসের ঢাকনায় আবার একটি ক্রিসান্থিমাম বা অন্য কোনো ফুল ছাপ মারা। একটি দুপুরের আহারের বাকসর দাম হল দেড়শ ইয়েন, আমাদের এক টাকার সামান্য বেশী। ফলের মধ্যে যে ফলটি আমার সব থেকে ভাল লাগত সেটি পার্সিমন, খানিকটা বড় ড্যামজন প্লামের মত, কিন্তু শাঁস কিছুটা ঠাস পীচের মত।

গৃহস্থাপত্যে ক্ষণিকের জন্য ফিরে গিয়ে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য

ব্যবহারিক স্থাপত্যের কথা কিছু বলব। ১৯৫৬ সালে টোকিও বা কিয়োটোতে, যে-কোনো পারিবারিক বাথরুম ব্যবহারের সময়ে, আমি স্নান-শৌচ কক্ষে কোনো বাথটবের ব্যবস্থা দেখিনি। টোকিওতে নতুন ধরনের বাড়িতে দেখেছি ঠাণ্ডা-গরম জলের শাওয়ার, বড় জোর গরুর জাব দেবার মত কাঠের একটি বড় ডাবা, সেটি সাধারণত বাইরের উঠোনেই থাকে। তাতে গরম-ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে ছোট ছেলে-মেয়েদের স্নান করানো হত। টোকিওতে কোনো সাধারণের ব্যবহার্য বড় স্নানাগারে যাইনি; কিন্তু হাকোনে বা নাগোইয়া শহরে যেহেতু উষ্ণ প্রস্রবণের প্রাচুর্য, সেখানে বড় ছোট সকলের একত্রে স্নান করার মত সুইমিং পুল আকারে স্নানাগার দেখেছি। জাপানের অদ্ভুত নিয়ম, এইসব জনসাধারণের স্নানাগারে নারীপুরুষ একসঙ্গে সম্পূর্ণ নগ্নদেহে স্নান করেন, অথচ কখনও কোনো অশ্লীল ব্যবহার বা মন্তব্যের অনুযোগ হয়নি। এইটেই চিরাচরিত জাতীয় রীতি। যেহেতু জাপান গ্রীষ্মেও বেশ ঠাণ্ডা, বিশেষত কলের জল, সেহেতু এবং সর্বত্র উষ্ণ প্রস্রবণের কারণে, স্নানের জল রীতিমত উত্তপ্ত হয়। ইয়ামাদা-সান একদিন দুঃখ করে বলেন, অত গরম খনিজ প্রস্রবণের জলে স্নান করে জাপানী মেয়েদের গায়ের ত্বক চীনে মেয়েদের ত্বকের থেকে অনেক পুরু, খসখসে, এমনকি বয়সানুপাতে বেশী দ্রুত কুঞ্চিত হয়ে যায়। চীনে মেয়েরা ঠাণ্ডা সাবান গোলা জলে গায়ের এক একটি অংশ অল্প অল্প করে মুছে ধোয় বলে তাদের ত্বক যেমন মসৃণ, তেমন কোমল। সত্যমিথ্যা পরীক্ষা করার সুযোগ আমার কোনোদিন হল না।

দ্বিতীয় সপ্তাহের শনিবার অপরাহ্ণে আমার সঙ্গীরা বাজার করতে গেলেন। আমি সেই সুযোগে ইয়ামাদা-সানের সঙ্গে শিবুইয়া পল্লীতে তাঁর প্ল্যানে সদ্য তৈরি একটি বড় হাসপাতাল দেখতে গেলুম। সঙ্গে গেলেন তাঁর শিষ্য নাকামোটো।

হাসপাতালে পৌঁছে বুঝলুম চিরাচরিত হাসপাতাল স্থাপত্য আধুনিক চিকিৎসা ও শুশ্রূষামতে কত বদলানো উচিত। ইংলণ্ডে থাকতে অক্সফোর্ডের হাসপাতাল, লণ্ডন ও এডিনবরার বড় বড় পুরনো হাসপাতালগুলি দেখে কলকাতার হাসপাতালগুলিতে যে তাদেরই উন্নত সংস্করণ সেই ধারণা হল। ইয়ামাদার হাসপাতালটি প্রায় সাত-আট তলা হবে। বিরাট বড়, চারদিকে প্রচুর জমি, ও নানাদিকে ড্রাইভ-ওয়ে। রোগীর গাড়ি, এমার্জেন্সী গাড়ি, অন্যান্য গাড়ি পার্ক করার আলাদা আলাদা এলাকা। সারা বাড়িটির জমির তলাটি উঁচু স্তম্ভের উপর তোলা, যাতে গাড়ি ইত্যাদি সোজা লিফট পর্যন্ত আসতে পারে। ফাঁকা এক-তলার ঠিক মধ্যস্থল দিয়ে একটি বেশ বড় গোল মিনার সোজা অট্টালিকাটি ফুঁড়ে, ছাত পর্যন্ত উঠে গেছে। হাসপাতালটি Y (ওয়াই) আকারে তৈরি, অর্থাৎ তিনদিকে তিনটি হাত, পাশেরটির সঙ্গে ১২০° (ডিগ্রি) কোণ করে উঠে গেছে। প্রতিটি হাত বেশ লম্বা। মধ্যের মিনার বেয়ে যত ওঠানামার লিফট—পরিচারক,

নার্স-ডাক্তার, রোগী, খাবার নিয়ে যাওয়া, অস্ত্রোপচার, ওষুধপত্র—সবের আলাদা আলাদা লিফ্‌ট ও দরজা, যাতে ধাক্কাধাক্কি বা বিভ্রম না হয়। প্রতিতলায় লিফ্‌ট পৌঁছে সেই তলার যাবতীয় যাত্রী ও সরঞ্জাম বার করে অথবা ঢুকিয়ে নেমে যাবে। প্রতি তলায় তিনটি হাতে যাবার জন্য তিনটি ব্যবস্থা। জেনরল ওয়ার্ডগুলি সবই যেমন চওড়া তেমনি লম্বা, মধ্যে দিয়ে আসা-যাবার চওড়া পথ। ওয়ার্ড, কেবিন, কাজের ঘর যথাসম্ভব স্বাভাবিক আলো পায়। প্রতিটি অপারেশন থিয়েটারের সঙ্গে সংলগ্ন ডিসিন্‌ফেকটিং, স্টেরিলাইজিং, অস্ত্রোপচারের পোশাক কাচার-কল, আবর্জনা রাখার আলাদা ব্যবস্থা। আসা যাওয়া, রোগীদের বসা ও পায়চারির, পরিজনের সঙ্গে আলাপের ব্যবস্থা, প্রতি তলার প্রতি ডানায় আলাদা করে আছে। আমার চোখে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ এক নতুন জগৎ খুলে গেল। হাসপাতালের ভিতরে এই ধরনের রোগীর ওয়ার্ডব্যবস্থা ও অন্যান্য চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার বিভাগের ব্যবস্থা কিছুটা দেখি ১৯৬১-৬২ সালে জয়পুরের সরকারি হাসপাতালে। তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডাঃ ঋষির তত্ত্বাবধানে নতুন ধরনের হাসপাতাল স্থাপত্যের সৃষ্টি হয়।

আমার বরাত ভাল, জাপানী হোতারা এক ফ্যাক্টরি বা দপ্তর থেকে দেশের অন্যত্র কোনো শহরে মোটরপথে নিয়ে যাবার পথে যদি কোনো স্থান, প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি দেখতে চাইতুম, তারা ত আপত্তি করতেনই না, বরং সাগ্রহে গাড়ি থামিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছা দেখতে দিতেন। পরের কাজে সেই বেশী সময়টুকু কাটাতে কোনো আপত্তি করতেন না। যেমন হাকোনে থেকে নাগোইয়ার পথে গোটা এগারোর সময়ে একটি প্রাথমিক স্কুল যখন দেখতে চাইলুম তখনই আমাকে পুরো সুযোগ দিলেন। এই ভাবে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখার সুযোগ হয় ওসাকা থেকে কিয়োটো যাবার পথে।

প্রাথমিক স্কুলটি দেখে শুধু অবাক নয়, আমি স্তম্ভিত হই বলা যায়। ফলে, সত্তর ও আশির দশকে যখন জাপানে কয়েকবার গিয়ে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি দেখলুম, আমি মোটেই বিস্মিত হইনি। স্কুলগৃহটি বাইরে কংক্রিট, ভিতরে ক্লাসঘরগুলিতে ক্রিপেটামোরিয়া কাঠের প্যানেলে ঢাকা দেয়াল। প্রত্যেকের জন্য আলাদা ছোট ডেস্ক আর চেয়ার। পাশের দুটি দেয়ালময় তাক, তার উপর খেলনা, বই, আঁকার সরঞ্জাম ইত্যাদি। শিক্ষকের পিছনের দেয়াল খালি, টাঙানো শুধু জাপানের ম্যাপ। সবসুদ্ধ গুটি চার পাঁচ ক্লাস ঘর। তাছাড়া শিক্ষয়িত্রীদের ঘর, বাইরে খেলার মাঠ ও সরঞ্জাম। অবশ্য ক্লাসঘর বাড়ানোর জায়গা প্রচুর আছে। যে-দৃশ্যের জন্য আমি তৈরি ছিলুম না, সেটি আলাদা অথচ সংলগ্ন একটি বড় খাবার ঘর। কিছুটা বৃটিশ আমলের বড় অফিসারদের বাড়ির বাবুর্চিখানা মহলের মত। রান্নাবাড়িতে প্রশস্ত একটি রান্নাঘর, সব রকম আধুনিক সরঞ্জামে ভরা,

কুকিং রেঞ্জ, বাসনধোয়ার বড় সিংক, বাসনকোসন শুকিয়ে নেবার যন্ত্র। যাকে প্যান্ট্রি বলে তাতে ঘরের চার চেয়ালে বুক উঁচু দু-সার তাক। তাতে সারে সারে প্রতি ছাত্রের জন্য আলাদা থালা, বাটি, কাপ, গেলাস, প্রত্যেক সেটের তলায় ছাত্র বা ছাত্রীর নাম লেখা। যাতে তারা নিজে পেড়ে নিয়ে খেতে বসতে পারে।

শুনলুম প্রতি স্কুলে পেরেন্ট-টীচার এসোসিয়েশন আছে। প্রতিদিন প্রতি ক্লাসের একজন ছাত্র বা ছাত্রীর মা পালা করে সকালে এসে স্কুলের মাইনে করা কর্মচারীদের সঙ্গে রান্নায় ও পরিবেশনে সাহায্য করেন, খাইয়ে দাইয়ে, খাবার টেবিল, ঘর ও প্যান্ট্রি পরিষ্কারে সাহায্য করে পরিপাটি করে সাজিয়ে বাড়ি ফিরে যান বেলা দেড়টায়। প্রতিমাসে দুটি ছুটির দিনে ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে পায়ে হেঁটে দূরে বেড়াতে যায় বা চড়ুইভাতি করে, তখনও পালা করে মায়েদের ডিউটি পড়ে, শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে একত্রে ছেলেমেয়েদের হেফাজত করতে। যেদিন গেছি প্রধানা শিক্ষয়িত্রী আমাকে সেদিনের আহুত মায়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, তার সঙ্গে অন্যান্য পরিচারক কর্মচারীদের। সব কিছু, থালা বাসন ঝকঝক করছে। তৎক্ষণাৎ মনে হল এদেশ বড় হবে না ত কোন দেশ হবে। এমন ব্যবস্থা আমি পরে ইংলণ্ডে, এমনকি ডেনমার্ক বা ফিনল্যাণ্ডেও দেখিনি।

টোকিওতে এসে মিউজিয়াম ইত্যাদি, মায় লোকশিল্পের গৃহ, মিংগেইকান দেখার পর 'কাবুকি' না দেখলে ত জীবন ব্যর্থ হয়, বিশেষত যাঁরা শারাকু হোকুশাই, হারুনোবু প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীর উডকাটের সঙ্গে পরিচিত। টোকিওর কাবুকি অঞ্চলটি কিছুটা লণ্ডনের শাফটেসবারি এভেনিউ-হে'মার্কেট অঞ্চলের মত। যে-কোনো সন্ধ্যায় পাড়ায় গেলে রাস্তার ধারে খাবার দোকানে সনাতনী পোশাকে বহু জাপানী প্রৌঢ় ও বৃদ্ধকে দেখা যাবে, হালের ভাষায় যাঁদের বলা যাবে কাবুকি বাফ। কাবুকি থিয়েটার একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা; বিশেষত আমাদের যাত্রার মত যখন সারি সারি দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত পাতা কাঠের পাটাতনের – যাকে জাপানীতে বলে হানামিচি – তার কাঠের পাটার উপর দিয়ে দুমদুম করে ছুটতে ছুটতে বীর দর্পে প্রধান চরিত্র হুঙ্কার দিয়ে দূর থেকে এসে মঞ্চে ওঠেন। পোশাকের জাঁকজমকে, প্রাচীনতায়, ইউরোপীয় অপেরাও যেন হার মেনে যায়। পরে ১৯৬০ সালে ভিয়েনাতে স্টেট অপেরা হাউসেও আমি অত জাঁকজমকের পোশাক দেখিনি।

কিন্তু যে স্টেজ ও অভিনয় আমাকে গভীর ভাবে নাড়া দেয় – যেমন নাকি শেক্‌সপীয়র বা রবীন্দ্রনাথের নাটক আমাকে এক অতন্দ্রলোকে নিয়ে যায় – তা ছিল ওসাকার নো-থিয়েটারে নো-অভিনয়। অবশ্য তার জন্য আগে থেকে কিছুটা তৈরি ছিলুম, এজরা পাউণ্ড ও উইলিয়াম ইয়েটসের লেখা পড়ে। ছোট থিয়েটার। সমস্ত স্টেজটি একান্ত নিরাভরণ; পিছনের দেয়াল কালো কাপড়ে ঢাকা। সমস্ত

আবহাওয়া মনে হয় নিভৃত। কালো কিমোনো পরে যন্ত্রবাদকরা একধারে বসে কোটো, শামিসেন, বিওয়া প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজান। অভিনয়ের বিষয় হয় সাধারণত বিয়োগান্তক; মিলনান্তকও হয়। কাবুকি বা নো থিয়েটারে অল্পবয়স্ক জাপানীকে কমই দেখছি।

১৯৫৬ সালে শিনজুকু পল্লীটি ছিল অল্পবয়স্কদের আমোদপ্রমোদের পল্লী। সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে গিঞ্জার মত জেগে উঠত, তবে অল্পবয়স্কদের বলে এলাহি খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্তের থেকে সাকে, বিয়ার, ফাস্ট ফুডই বেশী। অত আগেই জাপানে ফাস্ট ফুড চালু হয়েছে। ছোট ছোট টেবিল বা বারে বসে আহার, পান, তার উপরে কান ফাটিয়ে বাজনা ও গান। ১৯৭২-এ যখন দ্বিতীয়বার গিয়ে কয়েকদিন থাকি তখন শিনজুকুকে ছাপিয়ে রপোঙ্গি পল্লীটির খুব রমরমা হয়েছে। ১৯৭৯ সালে গিয়ে দেখি আরো একটি পল্লী মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

কামাকুরা, কিয়োটো, নারা, কোবে ও ইজে, হাকোনের কথা বলার আগে ১৯৫৬ সালে টোকিওতে জিনিসপত্র কেনা ও দামের কথা সামান্য বলি। আমার বিশেষ সৌভাগ্য যে আমি ১৯৫৬ সালে জাপানে যাই যখন ইয়েনের দাম বাড়তে শুরু করেনি; জাপানে হাতে তৈরি জিনিসপত্রের চাহিদা সারা বিশ্বে বাড়তে শুরু করেনি; উপরন্তু যুদ্ধোত্তর অধীন অবস্থায় জাপানীদের আপন ক্রয়শক্তি কমের দিকে ছিল। ফলে, জাপানের ডিপার্টমেণ্ট স্টোরগুলি – যেমন টাকাশিমায়া, মিৎসুকোশি ইত্যাদি, হাতে তৈরি বা তাঁতে বোনা, হাতব্লকে ছাপা, সুতি, সিল্ক ও ব্রোকেডের দাম বোধহয় সর্বাপেক্ষা কম ছিল। উপরন্তু তখনও সারা বিশ্বের সম্পন্ন পরিবারদের মধ্যে হাতে গড়া জাপানী মৃৎশিল্প বা সেরামিকের চাহিদা শুরু হয়নি। বার্নার্ড লীচের অনুগামী বৃটিশ ও আমেরিকার নিউ ইংলণ্ডের পরিবাররাই শুধু কিছু কিছু হাতে গড়া পটারি কিনতেন। হাতে গড়া পটারির সব থেকে বড় চাহিদা তখনও জাপানীদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। একটি উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে। ১৯৫৬ সালে আমি জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ পটার (potter) হামাদাসানের একটি বাটি কেনার উদ্দেশ্যে যখন টাকাশিমায়া স্টোর্সে যাই, তখন তাঁর তৈরি সব থেকে ছোট এবং জাপানী মানে মামুলি দেখতে বাটির দাম ছিল ছয় হাজার ইয়েন, অর্থাৎ ছয় পাউণ্ড বা প্রায় কুড়ি ডলার। ১৯৮২ সালে যখন প্রায় একই মানের ও সাইজের বাটি কিনতে চাই, তখন সেটির মূল্য ধরা ছিল ৮৫,০০০ ইয়েন এবং ইয়েনের দাম ডলারের হিসেবে হয়েছে ১৬০ ইয়েনে ১ ডলার। ফলে হামাদার কোনো কাজ আমার কেনা সম্ভব হয়নি। ভাগ্যে আমি কাওয়াই কাঞ্জিরো-সানের একটি বাটি তাঁর কাছ থেকে ২৫০০ ইয়েনে কিনি, একমাত্র সেইটিই আমাদের বাড়িতে দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ জাপানী শিল্পীর হাতে তৈরি। ১৯৮২ সালে সেই ধরনের কাঞ্জিরো-সানের বাটির দাম হয় ৫৬,০০০

ইয়েন। কিয়োটো এবং টোকিও-তে ১৯৫৬ সালে যে সব হাতে করা ল্যাকারের ও আসল কাঠের বাটি কিনি, সেগুলি ১৯৭২ সালে কোনো ডিপার্টমেণ্ট স্টোরে পাওয়া যেত না, যদিই বা জুয়েলারি সেকশনে পাওয়া যেত, আকাশ-ছোঁয়া দাম। বিক্রির জন্য যে সব জিনিস প্রকাশ্যে থাকত সেসব প্লাষ্টিকের তৈরি, উপরে একটু ল্যাকার করা। ১৯৫৬ সালে যে দু-তিন গজ ফুজি সিল্ক এবং আভার জন্য একটি স্যাটিন-ফিনিশ দোরোখা ছোট জ্যাকেট কিনি ১৯৮২তে তা আর পাওয়া যেত না। সকলেই বললেন যে মজুরি এত বেশী পড়ে যে জাপানী বড়লোকরাই কিনতে পারেন না। আমাদের দেশের একান্ত দুষ্প্রাপ্য মহার্ঘ জামেয়ার শালের থেকেও সেগুলি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য। এমনকি কো কেশি ডল বা পুতুল (যা একের মধ্যে, আরেক, তার মধ্যে আরেক, ক্রমে খুব ছোট হয়ে যেত) তাও আর কাঠে তৈরি হত না, প্লাষ্টিকের ছাঁচে ঢালাই। পৃথিবীর সব হস্তশিল্পের মত ১৯৫৬ সালের কাজের তুলনায় সব হাতের জিনিসই নিকৃষ্ট মানের হয়ে যায়। এমনকি নিউইয়র্কের ফিফথ এভেনিউর দোকানে বা ওয়াশিংটনের বড়লোকের পাড়াতেও হাতে তৈরি জাপানী সামগ্রী পাওয়া যায় না। অথচ ১৯৫৬ সালে আমি যে নিকন ১.২ লেন্সের ক্যামেরা, এবং স্ট্যাণ্ডার্ড বাইনকুলার কিনি, তাদের দাম আজও কিন্তু ইয়েনের দামে খুব বেশী বাড়েনি। সেই হিসেবে জাপানের তুলনায় আমাদের অবস্থা বেশী খারাপ নয়।

প্রত্যাবর্তন

২৫ রাত্রি থেকে ২৮ নভেম্বর রাত্রি, এই চারদিনে টোকিও থেকে বুলেট এক্সপ্রেসে ওসাকা গিয়ে ওসাকা, কোবে, কিয়েটো, নারা, ইজে দেখে ২৯ ভোরে টোকিও ফিরে কাজে যোগ দেবার কথা এখন যেই ভাবি, আশ্চর্য হই কত যত্ন ও বিবেচনা খরচ করে হোরি-সান ও স্থানীয় জাপানীরা প্রতি মিনিট মেপে আমাদের সব দেখার ব্যবস্থা আগে থেকে করে সকলকে জানিয়ে রেখেছিলেন। আমাদের দেশের সরকার বিদেশের কোনো রাষ্ট্রপতির সফরের ব্যবস্থাও বোধ হয় এত সতর্কতার সঙ্গে করেন না। মনে রাখতে হবে ওরই মধ্যে ওসাকা ও কোবেতে আমরা কয়েকটি ছোটবড় কারখানা দেখি। ওসাকায় আমরা ষোল শতকে তৈরি হিদেওশি দুর্গ-প্রাসাদ ভাল করে দেখার সময় পাইনি (প্রকাণ্ড প্রাসাদ), যদিও নো-থিয়েটার দেখার জন্য যথেষ্ট সময় পাই। কোবে শহরে হিয়েগো ভাল করে দেখি, তাছাড়া আকাশি, আমাগাসাকি, হিমেজি ও নিশিনোমায়ায় যাই। অবশ্য, আইলিন এডারটন ও পৃথ্বীশের কথামত, আমার মন পড়ে ছিল কিয়োটো ও নারার প্রতি।

কোবে থেকে কিয়োটো উপত্যকায় যখন ঢুকছি তখন শীতের বিকেল। পশ্চিমদিক থেকে পাহাড়ের পিছনে ডোবার আগে সূর্যের পড়ন্ত আলোয় কিয়োটো উপত্যকা দেখাচ্ছে যেন স্বপ্নপুরী ইলিয়াডে বর্ণিত ট্রয়ের মত, অথবা মাইকেলে বর্ণিত স্বর্ণলঙ্কার মত। বাঁদিকে ফিল্মে পরিচিত কাৎসুরা নদী, শিমলা শহরের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে নিচে সমতলভূমিতে দেখা ঝিলমের রেখার মত ঝিকমিক করছে। ১৯৫৮ সালের শেষে যখন পুণায় প্রথম যাই তখন কিয়োটোর কথা মনে হল। মহাত্মা ডি-কে কার্ভের পুত্রবধূ, বিখ্যাত ভারতসমাজতত্ত্ববিদ ইরাবতী কার্ভে, যাঁর গৃহে আমি অতিথি হই, স্টেশন থেকে আনার সময়ে আমার মুখে কিয়োটোর উল্লেখ শুনে বললেন আগা খাঁ সাহেব পুণায় তাঁর প্রাসাদ গড়ার সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে বলেন ভারতে তাঁর মতে পুণাই একমাত্র উপত্যকা যেখানে সারা বছর, বিশেষত বর্ষা ঋতুতে, হাওয়ায় আর্দ্রতা থাকে সব থেকে কম। উপরন্তু উপত্যকা বলে শীতের হাওয়ার প্রকোপ কম, এবং বর্ষাকালে একনাগাড়ে কখনও বেশীক্ষণ বৃষ্টি হয় না, প্রবল বৃষ্টিও স্বল্পস্থায়ী হয়, পরক্ষণেই রোদ উঠে উপত্যকাকে শুকিয়ে দেয়, জল জমে না। কিয়োটো দেখেও মনে হয়েছিল, কিয়োটো সম্রাটরা পাহাড়ে-ঘেরা উপত্যকাটি রাজধানী হিসাবে বেছে-ছিলেন উত্তর মেরুর হাওয়ার প্রকোপ কমাবার আশায়, অন্যদিকে দক্ষিণ থেকে সমুদ্রের সর্বনাশা টাইফুন বা বেলোমির সম্ভাবনা থেকে রক্ষার জন্য।

সন্ধ্যার আগে কিয়োটোর অন্যতম প্রধান রাজপথ গোজোর উপর ছোট হোটেলটিতে সকলে সুটকেস রেখে হোরি-সানের সঙ্গে যখন বেরোলুম তখন গোজো ও কাওরামাচি রাজপথ দিয়ে হেঁটে মনে হল যেন অলকাপুরীতে ঘুরছি। এরকম সুন্দর স্বপ্নশহর অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। গোজো ও কাওরামাচি দুটিই প্রশস্ত রাজপথ, প্রতিটির দৈর্ঘ্য বরাবর দুপাশে ফুটপাথের বদলে আছে স্বচ্ছ বহতা নদীর মত দুটি খাল। প্রতিটি খালের দুই তীরে উইপিং উইলো ও ল্যাবার্নাম গাছ: প্রতিটি গাছ যেন মাথা নিচু করে খালের জলে খোলা চুল ডুবিয়ে চিন্তায় মগ্ন। ইওরোপীয়রা তাঁদের মহাদেশের অহঙ্কারবশে কিয়োটোর নাম দেয় 'ভেনিস অভ দি ঈস্ট'; কিন্তু ১৯৬০ সালে যখন ভেনিস যাই, দেখি ভেনিসের খালগুলি আবর্জনাপূর্ণ ঘোলা জলে ভর্তি এবং কোনোটির পাশেই প্রশস্ত রাজপথ নেই, প্রশান্ত গাছপালা ত দূরের কথা। ভেনিসের খালগুলি কোলাহলপূর্ণ যাত্রী ও মাঝিচালিত গণ্ডোলায় ভর্তি। অন্যপক্ষে গোজো ও কাওরামাচির রাস্তার দুধারে, খালের ওপারে ছিল অতি সুন্দর জাপানী দোকানের টানা সারি, প্রতিটির সদর দরজায় বিচিত্র জাপানী লণ্ঠন। বিচিত্র রঙের নিয়ন বিজ্ঞাপনে সারা রাস্তা উদ্ভাসিত, অথচ খালে গাছের লতাপাতা হাওয়ায় দুলে আলোছায়ার অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য তৈরি করেছে। আমি যদি জেন অস্টেনের নভেলের বিশেষ বিশেষ

নারীচরিত্র হতুম, হয়ত ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময়ের আতিশয্যে মূর্ছা যেতুম।

পরের দিন ভোরে, কোনোরকমে নাকেমুখে কিছু গুঁজে, হোরি-সানের সঙ্গে বেরিয়ে গেলুম কাৎসুরা ভিলা দেখতে। ভাগ্যক্রমে কাৎসুরা ভিলা সেদিন যাত্রীদের জন্য খোলা ছিল। কাৎসুরা ভিলা বা ভবনের চারিদিক ঘিরে বিস্তৃত বাগান, বন, পাথর, তাদেরই মধ্যে যত্নে লালিত গাঢ় সবুজ রঙের অতি পুরু মখমলের মত ঘাসের লন, বড় বড় পাথরের চাঁই পর পর সাজিয়ে চতুর্দিকে ঘোরাফেরার পথ, সীমান্তে আঁকাবাঁকা কাৎসুরা নদী, তার ওপারে কাপড়ধোয়ায় রত জাপানী রজকিনী রমণীরা, জলের উপরে তাদের গোড়ালি ও পা দেখা যাচ্ছে; প্রাসাদের প্রতি ঘরে শোজি কাগজের জানলা সরিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কোণ থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ফ্রেম; সারা প্রাসাদের প্রতিটি আপাত নিরাভরণ ঘরে, নিভৃত, মৌন, বিনম্র ঐশ্বর্যের জ্যোতির্ময় আভাস। সমস্ত কিছু উপভোগ করার জন্য যিনি তৈরি না হয়ে যাবেন, তাঁর পক্ষে কর্মব্যস্ত, শব্দমুখর টোকিও বা ওসাকা শহর থেকে সহসা এসে সবকিছু হৃদয়ঙ্গম করা শক্ত। ভাগ্যক্রমে আমার মন কিছুটা তৈরি ছিল কলকাতায় কাৎসুরা ভিলার বিষয়ে ফিল্মটি দেখে। কিন্তু আসল ভিলাটি ছবিটিকে শতগুণে হারিয়ে দেয়।

আগে থেকে কিয়োটো সম্বন্ধে আমার উৎসাহ আন্দাজ করে হোরি-সান সেদিন সকাল ও দুপুরটি আমাকে অন্য কর্তব্য থেকে রেহাই দিয়ে আমার সঙ্গে ঘুরলেন। সঙ্গীরা গোজো ও কাওরামাচিতে বাজার করতে গেলেন। কাৎসুরা থেকে আমরা গেলুম রিওয়ানজি মন্দির দেখতে। বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন কাকে বলে কেউ যদি জানতে চান তাহলে রিওয়ানজি মন্দিরে অতি অবশ্য যাবেন। মন্দিরের স্থাপত্য জাপানী ঐতিহ্যগত, কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনদিকে উঁচু পাথরের পাঁচিল ঘেরা একটি মাঝারি সাইজের উঠোন। উঠোনের সারা জমিটি সমুদ্রের গভীর থেকে ছেঁচে তোলা বড় বড় দানার শুভ্র বালি দিয়ে বিছানো। সেই বালি-বিছানো নাতিবৃহৎ গৃহস্থ বাড়ির উঠোনে মনে হয় যেন ভগবদ্দত্ত অনুপ্রেরণা ও জ্যামিতিক বিচারের ফলে স্থানে স্থানে, পরস্পরের মধ্যে নির্ভুল ও অব্যর্থ দূরত্ব রেখে নানা সাইজের ও আকারের এবড়ো খেবড়ো স্বাভাবিক আকৃতির বেলে পাথরের চাঁই বালিভরা মেঝের ভিতরে বসানো। প্রতিটি পাথর ঘিরে বালিগুলি আঁকুশি দিয়ে অতি সযত্নে বিলি কেটে আবর্ত সৃষ্টি করা হয়েছে, ঠিক মনে হয় সমুদ্র তরঙ্গের আবর্তগুলি দ্বীপগুলিকে ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে মাঝ দরিয়ায় মিশে যাচ্ছে, আবার ঘুরে আরেক দ্বীপের চারদিকে পাক খাচ্ছে। ঠিক এই দৃশ্য আমি দেখলুম হানেডা থেকে প্লেনে ফিরে যাবার পথে, সমুদ্র থেকে প্রায় ১৪-১৬ হাজার ফিট উপরে ওকিনাওয়া দ্বীপপুঞ্জের আমামি, টকুনো নাহা প্রভৃতি দ্বীপগুলি ঘিরে সমুদ্রতরঙ্গের আবর্তে।

এই দুই তীর্থ সেরে দুজনে গেলুম শিনমনজেন স্ট্রিটে আইলিন এডারটন প্রদত্ত অ্যান্টিক ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের বাড়িতে। সারা শিনমনজেন স্ট্রীটটি নিভৃত গলির মত; রাস্তার দুধারে সরু সরু কাঠের পাটা দেয়া এক নাগাড়ে কাঠের দেয়াল মাথা পর্যন্ত উঁচু: মাঝে মাঝে এক একটি বাড়ির গেট। আইলিনের কুশল সংবাদ নিয়ে অতি প্রসন্ন মুখে তিনি তাঁর সংগ্রহ দেখালেন। তিনি সম্ভবত আন্দাজ করেছিলেন তাঁর থেকে কিছু কেনার সঙ্গতি আমার নাও থাকতে পারে, তাই কিয়োটোর কোন কোন দোকানে খোঁজ করলে ঐ জাতীয় জিনিস দেখাতে পারবে বললেন। হোরি-সান ও আমি লিখে নিলুম।

ওঁর কাছে আমরা কাওয়াই কাঞ্জিরোর বাড়ির ঠিকানা ও নির্দেশ পেলুম। তাঁর কথা মত বেলা দুটোর সময়ে কাঞ্জিরো-সানের বাড়িতে হাজির হলুম। বাড়িটি খাস কুমোর-পাড়ায়। চারদিকে মাটির জিনিসপত্র পোড়ানোর জন্য বড় বড় গোল চুল্লি বা ভাঁটা, বাড়িগুলির পাঁচিল ছাড়িয়ে আকাশে ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। কাওয়াই-সানের বাড়িতে ঢুকে হোরি আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। কাঞ্জিরো-সান নিচু হয়ে নমস্কার করে সমুখের প্রশস্ত দাওয়ার মেঝেতে পুরু গদির উপর তাঁর দুপাশে আমাদের বসালেন। যখন গেলুম, দেখি তিনি উরু থেকে পায়ের উপর সুন্দর ছাপা কাপড়ের লেপ ঢাকা দিয়ে বসে, মনে হল পা দুটি মাটির নিচে ঢোকানো। দেখি, সত্যিই তাই। তাঁর কুশনের সমুখে একটি প্রায় আড়াই ফুট লম্বা আড়াই ফুট চওড়া চৌকো গর্ত, প্রায় পাঁচ ফুট গভীর। তার নীচে একটি জালের তলায় একটি কাশ্মীরী কাংড়ির মত পাত্রে কাঠকয়লার আগুন। আমাদের পা দুটি নামিয়ে দিতে বলে, তিনজনের পায়ের উপর নকশাকরা লেপটি ঢাকা দিয়ে দিলেন। কী সুন্দর যে আরাম লাগল ভাষায় বলতে পারি না। অল্প অল্প ইংরেজি বলেন, হোরি-সানই তাঁর অনেক জাপানী কথা অনুবাদ করে দিলেন। ঘুরে ঘুরে তাঁর তৈরি ছোট বড় কাজ দেখালেন। মাল ভর্তি দুটি জলন্ত ভাঁটার কাছে নিয়ে গিয়ে সব কিছু বুঝিয়ে বললেন। জীবন সার্থক হল এই ভাব নিয়ে যেন হাওয়ায় ভেসে হোরি-সানের সঙ্গে বেলা চারটেয় হোটেলে ফিরলুম; ইংরেজিতে যাকে বলে walking on eggshells। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে কাওয়াই-সানের ছেলে দিল্লীতে আমাদের ওয়েলেস্‌লি রোডের ফ্ল্যাটে এসে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে যান।

৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে কিয়োটোতে মিকাডো রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৬ একর জমির উপর অনেকগুলি ছোট বড় প্রাসাদের সমষ্টি নিয়ে হয় প্রাসাদ। রাজধানীটি নানা মন্দিরে ভরা, তার মধ্যে কিটানো টেন্‌জিন মন্দিরটি শিনটো সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা টেনজিন সামাকে উৎসর্গীকৃত, এখানেই মঞ্জুশ্রীর বিখ্যাত ছত্রিশটি ভিন্ন ভিন্ন রূপের আরাধনা হয়। তাছাড়া আছে বৌদ্ধমূর্তি, ডাইবাৎসু। এতবড়

বুদ্ধমূর্তির জুড়ি আছে কামাকুরায়।

সেখান থেকে নারা। 'নারা' তীর্থের পরিচয় পাঠক হয়ত আমার থেকে বেশি জানেন। ৭০৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। নারা হোরিউজি মন্দির একমাত্র জাপানীরাই করতে পারতেন, তার সঙ্গে বিরাট হোরিউজি বুদ্ধমূর্তি। নারার মৃগকানন দেখে মনে হয় উদ্যানটি সারনাথের আদর্শে তৈরি হয়।

জাপানে তীর্থভ্রমণের কথা মিয়োনোশিটা-হাকোনের সামান্য বৃত্তান্ত দিয়ে শেষ করি। বোসসাহেব ও হোরি-সান বললেন, হাকোনে থেকে ফুজি-সান দর্শন না করে গেলে জাপানে আসাই বৃথা। ফুজিসান হচ্ছে জাপানীদের কৈলাস-মানস সরোবর। আমাদের দেশে যেমন উত্তর দিশিতে আছেন দেবতাত্মা হিমালয় নগাধিরাজ, তেমনি এদেশে দক্ষিণ দেশে ফুজিসান : কৈলাস মানস সরোবরের মত জাপানের সব দার্শনিক তত্ত্বের ভৌগোলিক উৎস। উপরন্তু জাপানীদের কাছে হৃদিস্থিত হৃষীকেশের মত ফুজিসান সব চারুকলা, অলঙ্কার, গৃহসজ্জার অন্তিম প্রতীক। ফুজিসান আর লম্বা সাইবিরিয়ান সারস। দুই হচ্ছে প্রজ্ঞা ও সার্থক পবিত্র দীর্ঘ জীবনের প্রতীক। ফুজিসানের শীর্ষ যেমন চওড়া তেমন গভীর, আগ্নেয়গিরি হিসাবে তাঁর অভ্যুত্থান। মাত্র ১২৩৮ ফুট, দার্জিলিঙের সন্দকফু বা সিকিমের নাথুলার থেকে বিশেষ বেশী বা কম না হলেও গ্রীষ্মেও ফুজিসানের মাথায় তুষারের গোলটুপি থাকে, গা দিয়ে তুষার গলে পড়ার রেখাই তার মহিমা বর্ধন করে। ফুজিসানের সারা পাদদেশময় স্বাভাবিক প্রকৃতিদত্ত শোভা অতি ভক্তির সঙ্গে রক্ষিত, গাছপালা, বনজঙ্গল, সরোবর, হ্রদ, জীবজন্তু পাখি কোনো কিছুর ক্ষতি করা হয় না। আমেরিকা বা ইংলণ্ডে যখন হেমন্তে, শীত পড়ার আগে, অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের শেষে অক্টোবরের প্রথম থেকে অধিকাংশ গাছের পাতা হলদে থেকে শুরু করে ঘোর লাল বা উজ্জ্বল তামার রঙ হয় পরে বিবর্ণ হয়ে নভেম্বরের শেষে গাছপালা নিষ্প্রত্র হয়ে যায়, যাকে আমেরিকায় বলে fall, জাপান যেহেতু বিষুবরেখার আরো কাছে, উপরন্তু চারদিকে সমুদ্রবেষ্টিত, তার ফলে জাপানে fall শুরু হয় অক্টোবরের শেষে, চলে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত। বড়দিনের সময় থেকে ঝপঝপ করে পাতা ঝরতে শুরু করে, কলকাতায় যা হয় প্রায় মাঘের মাঝামাঝি বা শেষে। সেইটি যথার্থ সময় হাকোনে-তে গিয়ে ফুজিসান দর্শনের। ফুজিসানের গায়ে শুভ্র তুষার চূড়া থেকে দ্রুত নেমে সারা গা সাদা করে, আর পাদদেশের সারা অঞ্চল (ফুজি-হাকোনে-ইজু ন্যাশনাল পার্কে) প্রকৃতির পাতার যত রঙ আছে সব যেন বিকশিত হয়ে আকাশ বাতাসে রঙে ভরিয়ে দেয়। সে রঙের বাহার বিচিত্র ফুলের বাহারের থেকে অনেক বেশী, কারণ মানুষের হাতে পালা ফুল দেখতে গেলে চোখ নিচে নামাতে হয় আর এ রঙ চোখের উপর থেকে আকাশে উঠে যায়, সূর্য-ঢলে-পড়ার রঙের সঙ্গে মিশে যায়।

ফুজি-হাকোনে টোকিওর দক্ষিণ পশ্চিমে। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল থেকে বেশী ভিতরে নয়, সোজাসুজি আকাশপথে বড় জোর পঁচিশ মাইল। ফিরতি পথে হাকোনে থেকে কিছুটা নামলেই দূরে প্রশান্ত সাগরের গাঢ় নীল, পিছনে ফুজির শুভ্র তুষার, সে এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি। হাকোনে জাতীয় পার্কের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে ছোট্ট মিয়োনোশিটা শহর, গ্রামই বলা যায়, তার উপরে একটি উঁচু টিলায় ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইটের তৈরি মিয়োনোশিটা-হাকোনে হোটেল। এই ঋতুতে হোটেলে জায়গা পাওয়া মুশকিল কিন্তু হোরি-সান অসাধ্যসাধনে অভ্যস্ত। সকালবেলা প্রাতরাশের বিশাল ঘরটির দুটি লম্বা দেওয়াল বরাবর পুরু কাঁচে মোড়া ; আপনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফুজিসানের ধ্যানে কাটিয়ে দিতে পারেন। ঝোপেঝাড়ে, লতাপাতায়, ফুলে, বনেজঙ্গলে, বড় ছোট হ্রদে ভর্তি সারা প্রদেশটি নিক্কো জাতীয় পার্ককেও হার মানিয়ে দেয়, মুখ্যত ফুজিসানের দেবমূর্তি-অধিষ্ঠানে। আমাদের বিশেষ ভাগ্য যে ১৯৫৬ সালে প্রথম যাই, যখন তিন চার তলা উঁচু ক্লোভার-লীফ হাইওয়ে বা জনস্ফীতির ফলে হাকোনে অঞ্চলে মানুষের ভিড়ে দুর্গম হয়নি, যা হয় ১৯৭২ সালের মধ্যে। দ্বিতীয়বার, অর্থাৎ ১৯৭২ সালে, হাকোনে অবধি সারা রাস্তা জুড়ে দেখেছি হয় দৃষ্টিরোধকারী পাক-খাওয়া হাইওয়ে, না হয় হংকং-কাউলুনের মত দুধারে সারি সারি বহুতল বাড়ির বারান্দায় বাসিন্দাদের কাচা কাপড় শুকোচ্ছে।

২৯ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর রাত্রি পর্যন্ত আমরা প্রায় সারাদিন নানাবিধ চুক্তির খসড়া পরীক্ষা করে শেষ করলুম। প্রতিদিনই আমরা বিদায় ভোজ হিসেবে গিঞ্জায় গেইশা ডিনার খেলুম। প্রতি সন্ধ্যায় ও রাতে সারা টোকিও শহর, বিশেষত গিঞ্জা অঞ্চল তখন আসন্ন বড়দিনের উৎসবে রঙে, আলোয়, সাজসজ্জায়, বাজির শব্দে, আনন্দে যেন ফেটে পড়ছে। যেন সেদেশে কোনোদিন পরাধীনতা বা যুদ্ধ আসেনি। এরকম আলো ও সাজের উৎসব পরে, নিউ ইয়র্কেও কোনো ডিসেম্বরে দেখিনি।

বোস সাহেব আগে থেকে আমাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন আমরা ফেরার সময়ে যেন কোনো উপহার কারোকে টোকিও থেকে কিনে না দিই, যদি কিছু দিতে হয় যেন এয়ার-ইণ্ডিয়া মারফৎ দেশ থেকে কিনে পাঠিয়ে দিই। তার কারণ জাপানীদেরকে কিছুতেই আপনি শেষ উপহার দিতে পারবেন না, যখনই মনে হবে আপনি প্রত্যুত্তরে উপহার দিচ্ছেন তখনই পুনঃ প্রত্যুত্তরে আবার উপহার হাজির হবে। এই ধরনের প্রত্যুপহারের কথা শুনে একটি মজার গল্প মনে পড়ল। সুনন্দ দত্তরায় লিখেছিলেন। গল্পটি দিয়ে জাপানভ্রমণ শেষ করি। কলকাতার সদাগরি অফিসের এক ইংরেজ কর্তা, তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে তার ঘামের গন্ধ দূর করতে একটি ডিওডোরান্টের ছোট শিশি বড়দিনে উপহার দেন। সহকারীটি উপহার

পেয়ে কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে ভাবল, সাহেব বোধহয় এই ব্র্যাণ্ডের গন্ধদ্রব্যটি বিশেষ পছন্দ করেন। ফলে নতুন বছরের প্রথম দিনে একই এসেন্সের তিন চার সাইজের বড় বোতল সাহেবকে প্রত্যুপহার দিল। সাহেব ত হতভম্ব; ভাবলেন, অ্যাঁ, আমার গায়ে এত ঘামের গন্ধ হয় নাকি!

এই পরিচ্ছেদটি খুবই লম্বা হয়ে গেল। শৈশব থেকে ভাষা ও সাহিত্য মারফৎ ইওরোপ, ইংলণ্ড, আমেরিকাকে মনে হত কিছুটা চিনি, সুতরাং ১৯৩৯-৪০এ ইংলণ্ডে গিয়ে মনে হয়েছিল চেনা দেশ। কিন্তু জাপান আমার কাছে এক সম্পূর্ণ নতুন বিশ্বের বিস্ময় নিয়ে আবির্ভূত হল; আমার সারা চেতনা ও বিশ্ব তিন সপ্তাহে যেন এক নতুন রূপ, ঐশ্বর্য ও মহিমায় অভাবনীয়ভাবে প্রসারিত হল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার – দে'জ পাবলিশিং। লেখকের আশুপ্রকাশ্য তিন কুড়ি দশ (চতুর্থ খণ্ড) ১৯৫৬-১৯৬৬ থেকে।

সমরেশ বসুর অপ্রকাশিত পত্রাবলী

[বাংলা কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু এক অবিস্মরণীয় নাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে যে কজন গদ্যশিল্পী বাংলা কথাসাহিত্যতে এক নতুন উন্মেষ সঞ্চার করেছিলেন সমরেশ তার অন্যতম প্রধান লেখক। প্রতিনিয়ত নতুন বিষয় ও তার উপযোগী ভাষা নির্মাণে দীর্ঘ তিন দশক তিনি বাঙালী মননশীল পাঠককে একই সঙ্গে চমকিত ও মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। স্বনামে ও কালকূট নামের আড়ালে তার ভিন্ন চরিত্রের রচনাগুলি এখনও আমাদের স্মৃতিধার্য ও অমলিন। লেখার মতো তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও ছিল এতটাই বৈচিত্রবহুল যে তাও আলাদাভাবে একটি উপন্যাসের যোগ্য বিষয় হতে পারতো। কিন্তু সে অর্থে আলাদাভাবে তিনি কোনো আত্মজীবনী লিখে রেখে যাননি। নানা উপন্যাস, গল্পে, ভ্রমণকাহিনীতে বাধন মানসিকতায় তাঁর বিচিত্র জীবনকাহিনী ওতপ্রোত হয়ে আছে।

আমাদের হাতে তাঁর অপ্রকাশিত বেশ কিছু চিঠি এসেছে। এ সংখ্যায় কয়েকটি মুদ্রিত হলো। চিঠিগুলি স্ত্রী ধরিত্রী বসু ও কনিষ্ঠ পুত্র উদিতকুমার বসুর সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। এবারের প্রকাশিত চিঠিগুলির মধ্যে অনেকগুলিই দিল্লী, লণ্ডন ও জার্মানীতে প্রবাসকালীন লেখা। মুক্তমনা সমরেশ স্ত্রীর কাছে, বিশেষত পুত্র বাবিনের কাছে চিঠিতে যেভাবে নিজেকে উন্মোচিত করেছেন তা আমাদের মুগ্ধ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। নিতান্ত ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি চিঠি ছাপা হলো যা মানুষ সমরেশকে চিনতে সাহায্য করবে। তাঁর মন ও মননের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনধারণ-প্রণালীর অল্পবিস্তর সাক্ষ্য মিলবে এই চিঠিগুলিতে। – সম্পাদক]

House Of Lords
The Royal Retreat
18 Golf Links, New Delhi-110003
Phone – 618541-697108

২.১০.৮৩
সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা

টুনি,

গত সোমবার পৌঁছে তোমাকে চিঠি দিয়েছি। আজ বুধবার। আমরা এখনও রাজস্থান যাত্রা করি নি। কথা ছিল আজ রাত্রের ট্রেনে আমরা বেরিয়ে পড়বো।

কিন্তু সেটা স্থগিত হয়েছে। আগামীকাল সকালে দুটো গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া হচ্ছে।

এখানে এসে কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করি নি। তিনটি দিন খেয়ে আর শুয়েই কাটিয়ে দিলাম। কোথাও বেরোই নি। এরকম জোর করে বিশ্রাম আমার ঘটে না। সকলেই কোথাও না কোথাও ঘুরছে। দেবুবাবু তো ব্যস্তই আছেন। ওঁর ব্যস্ততার জন্য, আর খানিকটা ঠিক কী ভাবে কোথায় আগে যাওয়া যাবে, এসব প্রোগ্রাম করতেই তিন দিন কেটে গেল। যাই হোক, আগামীকাল সকালে গাড়ি নিয়ে নিশ্চিত বেরিয়ে পড়ছি।

আমাদের ফেরার টিকেট কাটা হয়েছে ১৪ নভেম্বরের রাজধানী express-এ। হাওড়ায় পৌঁছুবো ১৫ তারিখে বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ, যদি গাড়ি খুব লেট না করে।

রাজস্থান থেকে কিনে নিয়ে যাবার জিনিসের মধ্যে মেয়েদের নানা রুপোর অলংকার এবং সুন্দর টেঁকসই নাগরা জুতো। বাবিনের জন্য একজোড়া নাগরা জুতো নেবার খুব ইচ্ছে। কিন্তু মাপটা ঠিক করবো কি করে? ধৃতীন আর বাবিন মাথায় প্রায় সমান হবে। কিন্তু তা দিয়ে পায়ের মাপ ঠিক করা দুরূহ। বাবিনের জন্য যদি নাগরা কেনা না হয়, তা হলে আমারটাই বা কেনা যায় কেমন করে? যারাই রাজস্থান যায়, তারাই পুরুষদের ও মহিলাদের জন্য নাগরাও কেনে। তোমারও নাগরা কিনে নিয়ে যাবো কিনা ভাবছি। তুমি কি পরবে? রুপোর অলংকার কী পাওয়া যায় দেখবো। ট্যাঁকের জোর অনুযায়ী চেষ্টা করবো।

চলে আসার পরে মনে হচ্ছে, কয়েকটি কাজ হয় নি। পারমিতা বিশ্বনাথনকে বলা আছে, ৮ নভেম্বর সন্ধ্যাবেলা ওঁদের বাড়ি যাবো। ওঁকে টেলিফোন খারাপ থাকায় বলে আসা হয় নি। টেলিফোন ভালো হবার পরে আমি তো আর ঐ ফ্ল্যাটে যাইনি। নীল রঙের টেলিফোনের খাতায় পারমিতার টেলিফোন আছে। তোমার পক্ষে কি সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যে ওঁকে টেলিফোন করে জানানো সম্ভব, আমি হঠাৎ কলকাতা ত্যাগ করেছি? পরে গিয়ে দেখা করবো। সুনীল গাঙ্গুলিকে একটা টেলিফোন করতে পারলে ভালো হয়। সুনীল যেন আনন্দবাজারের পার্থ বসুকে জানিয়ে দেয়। আমি কলকাতায় ফিরে পার্থর সঙ্গে যোগাযোগ করবো। পার্থও আমাকে খুঁজবে, আমারই প্রয়োজনে।

এ চিঠিতে কেবল কাজের কথাই লিখলাম। মেজাজটা তেমন ভালো নেই। দিল্লীর ঠাণ্ডায় খানিকটা সর্দিও লেগেছে। ক্যাপস্যুল S.F খাচ্ছি। খারাপ কিছু নেই। আমি তো বেশ আরামেই। কিন্তু মনে আরাম নেই। সেই কবে থেকে ঠিক মতো কাজে বসা হয়নি। ভিতরে একটা তাড়া আর উদ্বেগ বোধ করছি।

অনেক কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু এখন আর বলবো না। বলার কথা তো

ফুরোবে না। তবে ভেবে দেখলাম, বাস্তবিকই জীবনের কথা সাহিত্যে সিদ্ধির জন্যই কিছু নতুন করে লিখতে হবে।

আমার এ চিঠি তুমি নৈহাটি থেকে ফিরে এসে পাবে। আজ ২ তারিখের সন্ধ্যাবেলা লিখছি। আগামীকাল চিঠি হবে।

বাবিনের চিন্তা মাথা থেকে যাচ্ছে না। ওকে বলো, এখানে ভারত ওয়েস্টইণ্ডিজের খেলা দেখবার টিকিট পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি যাই নি। শুয়েই কাটালাম। অবিশ্যি শারদীয় আনন্দবাজারটার কিছুটা পড়েছি।

নৈহাটির কালী পূজা ও মানুর ছেলের অন্নপ্রাশনের কথা গিয়ে শুনবো। আজ এখানেই শেষ করি। বাবিনকে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিও। তুমি আমার মেজাজ খারাপের ভালো দিকটা নিও। —ইতি।

এক অস্থির প্রাণ মানুষ—স

House Of Lords
The Royal Retreat
18 Golf Links, New Delhi-110003
Phone 618541 697108

৩১.১০.৮৩

বাবিন,

চিঠিটা কোথা থেকে লিখছি, প্যাডের ঠিকানা দেখলেই বুঝতে পারবে। পরিবেশ বেশ শান্ত আর নিরিবিলি। কাছেই কোথা থেকে ময়ূরের ডাক ভেসে আসছে। দিল্লী স্টেশান থেকে আসার পথে, তোমার মতো একদল ক্রিকেট পাগল পাগল ছেলেকে দেখলাম, ব্যাট বল গ্লাভস্ ইত্যাদি নিয়ে কোথায় হৈ হৈ করে চলেছে।

এখানে শীত কিছু পড়েছে। তবে তেমন কিছু না। দিনের বেলা কলকাতার মতোই প্রায় গরম। সন্ধ্যে বেলা শীত পড়বে। তোমাকে চিঠি লিখছি, দুপুরে খেয়ে উঠেই।

আমাদের যেখানে যাবার কথা, সেই রাজস্থান বিরাট জায়গা। তার একটা বড় অংশ হলো বিকানীর ও জয়সলমীর। সবই মরুভূমির মধ্যে। ভাবতে অবাক লাগে, বহুকাল আগে রাজারা মরুভূমিতে কী করে রাজপ্রসাদ ও মন্দিরগুলো তৈরি করেছিলেন। মরুভূমির বুকে ভিত্ কেটে প্রাসাদ ও মন্দির গড়া সহজ কথা নয়। তার মধ্যেই আছে মরুদ্যান। পাখি পাখালি, আশেপাশে জঙ্গল এবং সেসব জঙ্গলে (সংরক্ষিত বন) বাঘ হরিণ চিতাও আছে। এসবই না দেখে,

মুখে শুনে ও ছবি দেখে তোমাকে লিখছি। আমাদের বেড়ানোটা কেমন হবে, এখনো স্থির হয়নি। এক সঙ্গে অনেক কিছু দেখার মতো ছুটে বেড়াবার শক্তি আমার আর নেই। তবে, নতুন কিছু দেখলেই তোমাদের কথা মনে পড়বে, মনটা খারাপও হবে।

তোমার পরীক্ষা সামনে, এ কথাটা আমি কোনো সময়েই ভুলতে পারছিনে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এবার তোমার প্রস্তুতি অনেক ভালো। তারপরে পরীক্ষা হয়ে গেলে, আমরা কোথায় যাবো, সেটা ঠিক করা যাবে।

ক্রিকেট খেল, এখন একেবারে মস্‌গুল হয়ে যেও না। আমিও চাই, তুমি ভবিষ্যতে একজন ভালো খেলোয়াড় হও।

আজ এখানেই শেষ করছি। মাকে না জানিয়ে কোথাও যেও না, কিছু করো না। আমার আশীর্বাদ ও গভীর স্নেহ নিও। —ইতি,

বাবা

House Of Lords
The Royal Retreat
18 Golf Links, New Delhi-110003
Phone 618541-697108

৩১.১০.৮৩

টুনি,

ওপরের ঠিকানায় আজ এসে উঠেছি। খুব সুন্দর জায়গা।

উঠলাম এইমাত্র। ডাল বেগুনভাজা আলুকপির তরকারি আর কাটা পোনা মাছ। রান্না বাঙালীর হাতের, চমৎকার! আসতে পথে কোনো দেরি হয় নি, অসুবিধেও হয় নি দেবুবাবু স্টেশনে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন।

ধৃতিন এসেই দেবুবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল। গোটা রাজস্থান আর মরুভূমি বেড়াবার সব খোঁজ খবর কাগজপত্র নিয়ে এসেছে। এবং কবে কোথায় যাওয়া যায়, তা নিয়ে প্রোগ্রাম লিখতে বসে গিয়েছে। দেবুবাবু গিয়েছেন কোথায় দুপুরের লা নিমন্ত্রণে। ফিরে এসে জল্পনা কল্পনা হবে বেড়াতে যাবার।

আসবার দিন তোমার মেজাজ ভালো ছিল না। বলাবাহুল্য, তার ধাক্কা আমারও লেগেছে। সেটা তুমি বিশ্বাস করবে কিনা, তুমিই জানো। আমি এক একটা কাজ করে বসি, কোনোটাই ইচ্ছাপূর্বক পরিকল্পিত নয়। তারপর ঘটনা ঘটে যাবার পরে অপরাধী হয়ে পড়ি। যাই হোক, এখন আর এসব বিষয় নিয়ে কিছু বলবো না।

ভাবছি, বেড়াবার ব্যাপারটা অনেক দূরের পথে তাড়াহুড়ো করে সারতে হবে কি না। ভয় আছে, তাতে ক্লান্ত হয়ে পড়বো। তবে দেবুবাবু সব জানেন বোঝেন। আশা করছি, সেরকম হ্যারিকেন ট্যুর হবে না। ধৃতিন বাদ দিয়ে কেউ তা চাইছেও না।

বাবলুর বাড়িতে ও মানুর বাড়িতে না যেতে পারার জন্য মনটা খচ্‌খচ্‌ করছে। বিশেষ করে, মানুর ছেলের অন্নপ্রাশনে। কী আর করা যাবে। চলে এসেছি যখন, তখন আর সেসব ভেবে লাভ নেই। আমার চলে আসার কথা জানিয়ে সরোজকে একটি চিঠি দিয়ে এসেছি। অবিশ্যি কাজের চিঠিতেই কথাটা জানিয়েছি।

তুমি নৈহাটি গিয়ে বাচ্চু ও মিঠুর ব্যাপারটা নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করতে পারো। মিঠুর সঙ্গে শান্ত ও সাধারণভাবে কথা বলতে পারলে ভালো হয়।

আমার চিঠি পৌঁছুবার আগেই হয় তো ভাগ্যর মারফৎ তুমি খবর পেয়ে যাবে। বাবিনকে একটা চিঠি দিলাম। পনেরো বছর আগের মতো করে চিঠি শেষ করতে পারছি না। অতএব তোমার জীবনের ও মনের সকল দিক নতুন আলোতে উদ্ভাসিত হোক, এটাই প্রার্থনা করি। আমার জীবনটা যে একরকমের সোজাসুজি চলে এসেছে, বা চলবে এমন মনে হয় না। তবে জীবনের অন্ধকার দিক বলতে যা বোঝায় তার দায় আমাকে নিতেই হয় এই জেনে, আমি অন্ধকার পথে চলিনে। অথচ মিথ্যে কথার দায় আমার ঘাড়ে এসে পড়ে। যার হাত থেকে আমি রেহাই পাইনে। আবার একথাও মনে হয়, মিথ্যেগুলোর মধ্যে নিছক মিথ্যে বলে কিছু রয়ে গিয়েছে। বোঝাতে পারলাম কিনা জানিনে।

আমার শুভেচ্ছা ও স্নেহ জেনো। সেই সঙ্গে আরো কিছু। —ইতি

সমরেশ

পুঃ এখান থেকে দু একদিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়বো। —স

ফ্র্যাংকফুর্ট (ওফেনবাগ)
৩০.৯.৮৬

কল্যানীয়েষু বাবিন,

ফ্র্যাংকফুর্ট থেকে তোমাকেই প্রথম চিঠি লিখছি। জানিনে কবে পাবে। আমার হাতের ঘড়িতে ভারতীয় সময় ছিল প্রায় বিকেল চারটে। এখন এখানে সকাল সাড়ে দশটা। আমিও সময়টা তাই করেনিলুম। নইলে বড় অসুবিধে হচ্ছিল।

ইওরোপে এসে কারোর বাড়িতে থাকা এই প্রথম। রাশিয়ায় গিয়ে হোটেলেই ছিলুম। ফ্র্যাংকফুর্ট শহর থেকে ৫/৬ কিলোমিটার বাইরে ভারি সুন্দর

নির্জন পরিবেশে একটি বাড়ি। আমি যাঁর অতিথি, তাঁর নাম প্রবাল দে। প্যান-অ্যাম-এ কাজে নিযুক্ত আছেন। তাঁর স্ত্রী জর্মন। তাঁদের তিনটি সন্তান। সকলের ছোটটি মেয়ে। বছর ২/২॥ বয়স। ভারি চঞ্চল আর মিষ্টি। স্বামী স্ত্রী দুজনেই চাকরিতে গিয়েছেন। বড় মেয়ে আর ছেলে স্কুলে গেছে। ছোট নাতনিটিকে নিয়ে রয়েছেন ওঁর জর্মন দিদিমা। দিদিমা ইংরেজি বোঝেন না। তাঁর সঙ্গে আমার ইশারায় দু একটা শব্দের মধ্যে দিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। আমি এখানকার ন'টা নাগাদ উঠে মুখ ধুয়ে চা খেয়ে, দাড়ি কামিয়ে চান করেছি। তারপরে breakfast নিয়ে মুশকিল। পোর্ক হ্যাম সবই আছে। মাখন চিজ আছে। টোষ্ট ছাড়াও আছে নানারকম তিল দেওয়া বড় আকারের মিষ্টি রুটি। অবিশ্যি জেলি আর জ্যামও আছে। আমি টোষ্ট, এক-টুকরো চিজ, জেলি আর জ্যাম দিয়ে প্রাতঃরাশ খেলুম। চা তো ছিলই। ওষুধ খেয়ে তোমাকে চিঠি লিখছি।

এজায়গাটির নাম ওফেনবার্গ। ফ্র্যাংকফুর্ট বস্তুতপক্ষে হিটলারের সময় ছিল শিল্পাঞ্চল। ফলে মিত্রপক্ষ এ জায়গাকে আঘাত করেছিল বেশি (২য় মহাযুদ্ধের সময়)। সত্তরভাগ বাড়িই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। বাকি তিরিশভাগও বাস ও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ তুমি এদেশ দেখলে অবাক হবে। সেই ধ্বংসস্তুপের ওপর যেন এক স্বপ্নপুরী তৈরী করেছেন এখানকার মানুষ। ধ্বংসের কোনো চিহ্ন নেই। নিজের দেশকে ভালবাসা কতখানি থাকলে এটা সম্ভব, বুঝতেই পারছ। রাজনীতি আছে, থাকবে। কিন্তু দেশপ্রেম ছাড়া রাজনীতি অতি বীভৎস ও ভয়াবহ।

যাইহোক, তবে এখানে পুজো শরৎকালের কোনো চিহ্ন নেই। তোমরা এখন যা নিয়ে মেতে আছ, তা এখানে সম্ভব নয়। অবিশ্যি এখানকার বাঙালীরাও পুজোর জন্য তৈরী হচ্ছেন, আমার মনে হয়, লণ্ডনের বাঙালীরা দুর্গাপুজো নিয়ে যতোটা মাতামাতি করেন, এখানে তা হয় না। লণ্ডনে বাঙালীর সংখ্যা অনেক বেশি, পুজোও বেশি। তবে আমার খুব সন্দেহ, এবার পুজোয় পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টি হবে। তুমি কিন্তু খুবই সাবধান! পুজোয় মাতামাতি করতে গিয়ে, বৃষ্টিতে ভিজবে না। কলকাতার বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা আমাকে এখনো রেহাই দেয়নি। খুব ভয়ে ভয়ে আছি। কারণ কাশিটা রয়েছে।

এখানে এখন আমাদের শেষ অগ্রহায়ণের মতো শীত। তবে আমার পক্ষে হয়তো একটু বেশি সাবধানেই থাকা উচিত। আপাততঃ কয়েকদিন কারোকে চিঠি লিখতে পারবো না। কারণ 'দেশ' পত্রিকার জন্য একটা জরুরি লেখা সঙ্গে নিয়ে এসেছি, সেটি শেষ করতে হবে, এবং ফ্র্যাংকফুর্টে লণ্ডনের আনন্দবাজার পত্রিকার correspondent আসবেন, তাঁর হাতে লেখাটি দিতে হবে। তিনি এখান থেকে সোজা কলকাতায় যাবেন।

ফ্র্যাংকফুর্টের বাঙালী বন্ধুরা আমাকে ষষ্ঠীর দিন পর্যন্ত রেখে দিতে চাইছেন অর্থাৎ ৯ অকটোবর। তাহলে ১০ তারিখে আমি লণ্ডনে যাবো। লণ্ডনে যেতে প্লেনে এক ঘণ্টা লাগে।

বম্বে থেকে গালফ্ এয়ারে-এর প্লেনে আসতে আমাদের সময় লেগেছিল ন' ঘণ্টা। দু জায়গায় প্লেন থেমেছিল। ওমান-এর রাজধানী 'মাস্কট' এবং 'দোয়া' নামে এক জায়গায়। সেটিও কোনো আরব দেশের রাজধানী, আমার জানা নেই। সুদীর্ঘ পথই সমুদ্রের ওপর দিয়ে আসে।

আজ এখানেই শেষ করছি। আগামীকাল বেলা ২-৩০ মিনিটে একটি মিটিং আছে। এখনো কলকাতার সকলের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আজ রাত্রে হতে পারে।

তোমার মাতৃদেবীকে আমার কল্যাণ চিন্তা জানাবে। নৈহাটিতে আলাদা চিঠি দেবো। তোমার দুই ভক্ত ভানু ও হেমন্তকে স্মরণ না করে উপায় নেই। বুজেকে আমার আদর জানিও। তুমি আমার স্নেহ আদর ও আশীর্বাদ নিও।

—ইতি
সমরেশ বসু
(বাবা)

বার্লিন
৬.১০.৮৬

টুনি,

আমি যে বার্লিনে আসবো, সে কথা টুম্পা ভুব্‌নির চিঠিতে আগেই জানিয়েছি। বার্লিনের দুজন বাঙালী, সরল সেন ও পঙ্কজ চ্যাটার্জি ফ্র্যাংকফুর্ট বইমেলায় গিয়েছিল। ওদের সঙ্গেই বার্লিনে এসেছি। আসাটা খুবই ভালো হয়েছে। সাড়ে ছ'শো কিলোমিটার রাস্তা, জার্মানির বহু জায়গা দেখতে দেখতে এসেছি। নুরেমবুর্গ, লাইপজিগ্, পটাসডম্ ইত্যাদি, সবই পূর্বজার্মানি (রাশিয়া অধিকৃত) এলাকাতে পড়ে। আমরা যদিও পশ্চিম বার্লিনে এসেছি, কিন্তু আসতে হয়েছে পূর্ব বার্লিন ডিঙিয়ে। ভীষণ কড়াকড়ি। পাসপোর্ট দেখে, ভালো করে মুখ দেখে, খুশি না হলে পথ বন্ধ। যাই হোক, সেসব ঝামেলা কিছু হয়নি।

সরল আর পঙ্কজের সঙ্গে সুনীল স্বাতীও এসেছে। পঙ্কজের বাড়ি গরিফা রায়পাড়ায়। সরল হাওড়ার অধিবাসী। আমি সরলের বাড়িতে উঠেছি। সুনীল স্বাতী পঙ্কজের ওখানে উঠেছে। সরলের নিজস্ব ফ্ল্যাট একেবারে বার্লিন শহরের মাঝখানে, কলকাতার চৌরঙ্গি বলতে যা বোঝায়। ওর স্ত্রী চাকরি করেন। মেয়ে

ডাক্তারি পড়ছে। সরল অবিশ্যি এখন নিয়মিত বার্লিনে থাকে না। হাওড়াতেই থাকে, এবং সি. পি. এম. করে। বছরে একবার ইওরোপ ভ্রমণে আসে।

গতকাল বার্লিনে আসার আগে, ফ্র্যাংকফুর্ট থেকে লণ্ডনে শক্তির সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে। বার্লিন থেকে ৮ তারিখের রাত্রে, ট্রেনে রওনা হয়ে, ৯ তারিখে ভোরে ফ্র্যাংকফুর্টে পৌঁছুবো, এবং ঐ দিনই সন্ধ্যায় প্রতিমা উন্মোচন অনুষ্ঠান হবে। ১০ তারিখে আমার লণ্ডন যাবার ফ্লাইট নেই, তাই ১১ তারিখে লণ্ডনে যাবো। শক্তিকে সবই জানিয়ে রেখেছি। লণ্ডনে সম্ভবতঃ দিন সাতেক থেকে, প্যারিসে যাবো। প্যারিস থেকে টেলিফোন করবো। অথবা বম্বে থেকে। তুমি আমাকে এত পাঞ্জাবী দিয়েছিলে, তার অধিকাংশই আমি সুপ্রিয় সরকারের মেয়ে সুদীপার বাড়িতে রেখে এসেছি। অতএব, বম্বেতে আমাকে একদিন থাকতেও হতে পারে। সেখান থেকেও টেলিফোন করতে পারি। কেবল পাইনি একটিও রুমাল।

ফ্র্যাংকফুর্টে অরূপ অভীক রাখী এসেছিল। অরূপ আমাকে কিছু জর্মন মার্কস দিয়ে গিয়েছে। ফ্র্যাংকফুর্টেও যাদের বাড়িতে আছি, প্রবাল দেব ও তার জর্মন স্ত্রী খুবই ভালো। প্রবালের জর্মন শাশুড়ি আমার শার্টের কলারে সামান্য দাগ দেখলেই, ধুতে নিয়ে চলে যান। সবই তো মেশিনের ব্যাপার।

গতকাল সারাদিন গাড়িতে সাড়ে ছ'শো কিলোমিটার রাস্তা আসাতে কোমরের আর কিছু নেই। কিন্তু গোটা পথটা পঙ্কজ গাড়ি চালিয়েছে। এখন এখানে বেলা সাড়ে দশটা। একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গেল খানিকটা। ঠাণ্ডাও পড়লো। পাতা ঝরছে। পঙ্কজ ওদিকে সুনীল স্বাতীকে নিয়ে দুপুরে খেয়েই গাড়ি নিয়ে আসছে। পঙ্কজের বউও (বাঙালী) আসবে। রাত্রে এবাড়িতে সবাই খেয়ে ফিরবে।

শরীর (বলতে ভয়!) এখনো মোটামুটি ভালোই আছে। ওষুধ নিয়মিত খাচ্ছি। এ্যাসথালিন ফুরিয়ে গিয়েছে। আর মাত্র একটা আছে। তুমি নৈহাটি থেকে ফিরে আমার চিঠি পাবে। প্রথম চিঠি বাবিনকে কলকাতার ঠিকানায় পাঠিয়েছিলুম। ও তা পেয়েছে কি না, জানিনে। অরূপ এবং পরে বুদ্ধদেব গুহর (হঠাৎ দুদিন আগে এসে হাজির) মুখে শুনলুম, কলকাতায় নাকি আবার বৃষ্টি হচ্ছে।

যাইহোক, ধরে নাও, ১৭ বা ১৮ তারিখে যদি প্যারিসে যাই, ওখানে চার পাঁচ দিন থাকলেও, ফিরতে ফিরতে বোধহয় ২৪-২৫ অক্টোবর হবে। বাবিনকে বলো ওকে চিঠি দিচ্ছি। ভালো থেকো, মন ভালো রেখো, শুভেচ্ছা নিও। বাবিনকে স্নেহাদর জানাই। ভানু ও হেমন্তকে ও সুরিন্দরকে বলো, ওদের কথা আমার খুবই মনে পড়ে। শ্রীমান বুজেকে একটি হাম্‌পু।

—ইতি,
সমরেশ

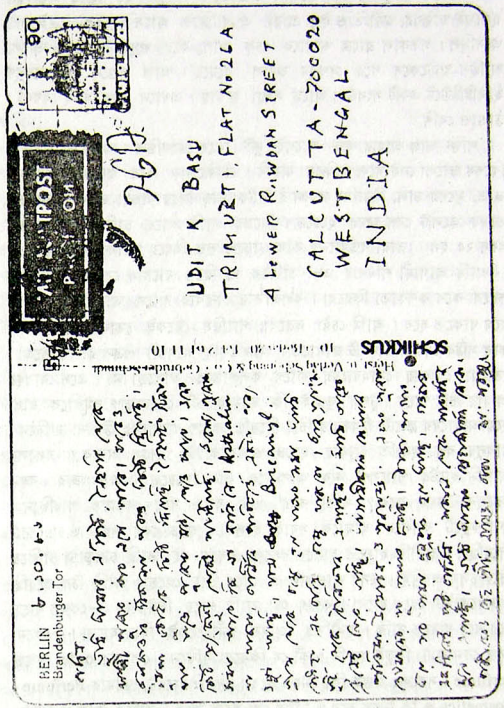

লণ্ডন
১৩.১০.৮৬

টুনি,

আশা করি বার্লিন থেকে পাঠানো চিঠি পেয়েছো। আমি পরশু ফ্র্যাংকফুর্ট থেকে এসেছি। শক্তি আর আরতি গাড়ি নিয়ে লণ্ডন বিমানবন্দরে ছিল। কিন্তু

লণ্ডনে এসে একটু কাশির প্রকোপ বেড়েছে। বাবলুর এক বন্ধু ও বন্ধুপত্নী, দুজনেই ডাক্তার, সুনীতি ও ইলা প্রায়ই এ বাড়িতে আসে। পরশু রাত্রেই ওরা এসেছিল। গতকাল রাত্রে আমাকে চেক্ আপ করে ওষুধ দিয়েছে। ভালো আছি। স্যুটকেসে পরে দেখলুম রুমাল রয়েছে। আজ লণ্ডনে কমনওয়েল্‌থ ইনিস্টিটিউটে একটি সংবর্দ্ধনা আছে সন্ধ্যা ছ'টায়। এখানে সারাদিনই মেঘলা। ঠাণ্ডাও বেশি।

শক্তি আজ আমার জন্য আগেই ছুটি নিয়ে রেখেছিল। আরতির শরীরটা বিশেষ ভালো নেই বলে অফিসে যায়নি। টেলিফোন করে জানিয়ে দিয়েছে। ভাত, মুগের ডাল, নিরামিষ তরকারি টাটকা মাছ দিয়ে খাওয়া ভালোই চলছে। ওদের ছেলেটি বেশ সুন্দর হয়েছে। নিজের গাড়ি আছে চালিয়ে কাজে যায়। বয়স ২৫ হল। তারা বর্তমানের কাজ ছাড়াও অন্য বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে চলেছে। ...আমি আগামী শনিবার ১৮ তারিখে প্যারিসে যাবো। সেখানে গিয়ে ঠিক করবো কবে কলকাতা ফিরবো। কলকাতায় ফেরবার আগে আমাকে এক রাত্রি বম্বে থাকতে হবে। আমি চেষ্টা করবো, প্যারিস থেকেই তোমাকে টেলিফোন করে সঠিক ফেরবার দিনটি জানাতে। আজ সোম আগামী শুক্রবার লক্ষ্মীপুজো। তোমরা বোধহয় সোমবারের আগে কলকাতায় আসছো না। এসে বোধহয় আমার চিঠি পাবে। টুম্পা ভুরাই কি আমার চিঠি পেয়েছে? বুম্‌বাকে বাধ্য হয়ে আমাদের ফ্লাটের ঠিকানায় চিঠি দিয়েছি, কারণ বাবলুদের ঠিকানা জানিনে। বাবলুর বন্ধু সুনীতি আমার হাতে ওভারকোটটা দেখে অবাক! বললো, আপনি হার্টের প্যাসেন্ট, নব আপনাকে এটা দিয়েছে? এত ভার বহন করছেন কেমন করে? সত্যি আর ওটা ঘাড়ে বয়ে বেড়াতে পারছিনে। ফ্র্যাংকফুর্টে বার্লিনে আমাকে সবাই হালকা অথচ বেশ গরম ওভারকোট দিয়েছিল। সুনীতি হাসতে হাসতে বললো, নবকে এই ভারি চামড়াটা চাপিয়ে দিয়েছিলুম আমিই। এসব আজকাল এ দেশে উঠে গেছে। আমি ঠিক করেছি ওভারকোটটা রেখে যাবো। কারণ এটা আমি গায়ে দিই না। —কেবল ঘাড়ে করে বয়ে ঘামতে থাকি। সুনীতির জিনিস সুনীতিকেই দিয়ে যাবো।...এখনো পর্যন্ত কেনাকাটা কিছুই হয় নি। কী যে কিনবো বুঝিনে। তোমার order আছে Perfume। সকলের জন্যই কিছু নিতে হবে। মদ, সিগারেট, তোমার Perfume। Cosmetics ও কি নিতে হবে? নিতে তো ইচ্ছে করে। বাবিন ডাকু ও নাতি-নাতনিদের জন্য কী নেওয়া যায়, ভাবছি। একটু আগে বাদল টেলিফোন করেছিল। এখন এখানে বেলা একটা। কলকাতায় সন্ধ্যা ছ'টা। বাদল আমার সঙ্গে কথা বলার আগেই কলকাতায় অরূপের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে। অরূপ জানিয়েছে, কলকাতার খবর সব ভালো। রুবিকে বলো, ওকে পরে চিঠি দিচ্ছি।

কিন্তু আমি ওর বাড়ির ঠিকানা নিয়ে আসি নি, অতএব ত্রিমূর্তির ঠিকানাতেই চিঠি যাবে। আশা করি যথা সময়ে চিঠি পাবে। তোমার মঙ্গল ঈশ্বরের হাতে। প্রীতি (পিরীতি) ও শুভেচ্ছা নিও।

—ইতি,
সমরেশ

বাবিন,

তোমার মায়ের সঙ্গে একই খামে চিঠি দিলুম বলে রাগ করো না। সব সময়ে খাম, কার্ড, স্ট্যাম্প কিনতে বেরোনোও এক ঝামেলা। আমি আছি লিইটন্-এ পূর্ব লণ্ডনে। এখানে হিথ্‌রো এয়ারপোর্টে। আমাদের হাওড়া স্টেশনের মতোই, গাড়ি পার্ক করা যায়। প্লেন থেকে নেমে মালপত্রসহ, একেবারে গাড়ির কাছে হাজির হওয়া যায়। তবে প্লেন থেকে নেমে অনেকটা হাঁটতে হয়। আমার পক্ষে কষ্টকর। তারপরে মালপত্র সব ঠ্যালায় চাপিয়ে শান্তি। সোজা car parking-এ গিয়ে মাল গাড়িতে তুলে হাওড়া স্টেশনের মতোই সার্চিং-এর চার্জ দিয়ে বেরিয়ে আসা। অবিশ্যি লণ্ডনের সবই তো তোমার জানা।

আমি পশ্চিম বার্লিন থেকে পূর্ব বার্লিনে গিয়ে, সবচেয়ে বেশি excitement feel করেছি। কারণ আমার বয়স যখন তোমার মতো তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়েছিল। হিটলারের ভয়াবহ কাণ্ডকারখানা আজও আমরা ভুলতে পারিনে। পূর্ব বার্লিনে গিয়ে হিটলারের হুংকার যেন শুনতে পাচ্ছিলুম। বস্তুতপক্ষে জার্মান জাতির লোকেরা এখনো মনে করে, তারা ইচ্ছে করলে পৃথিবী জয় করতে পারে। যেখানে এক সময় হিটলার লক্ষ লক্ষ সৈনিকের অভিনন্দন গ্রহণ করতো, আর কমা ফুলস্টপ ছাড়া বক্তৃতা দিতো। সেই সুদীর্ঘ পথের আসল নাম UNTER DEN LINDEN (লিণ্ডেন বৃক্ষের তলে)।

সারি সারি লিণ্ডেন গাছ। পাতা ঝরছে অজস্র আর গাছ তলায় তরুণ তরুণীরা জোড়ায় জোড়ায় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে। হিটলারের যুগের ত্রাস নেই। নেই নাজি সৈনিকদের Past march, অদূরেই হিটলারের ধ্বংসাবশেষ যেখানে বাংকারের নিচে হিটলার, এভা ব্রাউন এবং আরো কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছিল। ওদিকটায় সাধারণ মানুষদের যেতে দেওয়া হয় না। সব চেয়ে অবাক লাগে, যে বিশাল সহর বোমার আঘাতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল আজ এই শহর দেখলে তা বিশ্বাস হয় না। পূর্ব বার্লিনের ছবি একরকম। পশ্চিম বার্লিনেই আমি ছিলুম। সেখানে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে। উঠতি বয়সীরা রাত্রের যেকোনো সময়েই ডিসকো নাচতে বেরিয়ে যাচ্ছে। সারারাত জুয়া খেলা, হৈ হুল্লোড়। নাইট ক্লাবে নাচগান চলছে। আমি ছিলুম শহরের একেবারে কেন্দ্রে (কলকাতার চৌরঙ্গিতে)। কিন্তু রাত্রে বেরোতাম না। যে

বাড়িতে ছিলুম, সেই বাড়ির মেয়ে মিঠু, ১৯ বছর, ডাক্তারি পড়ে। বয় ফ্রেণ্ডের সঙ্গে মাঝ রাত্রে নাচতে বেরিয়ে যায়। আবার শেষ রাত্রে ফেরে। সকাল সাতটার মধ্যে ক্লাস করতে বেরিয়ে পড়ে। পশ্চিম জার্মানিতে বোঝা যায় হিটলার একেবারে মরে নি। NAZIISM-এ এখনো অনেকে দীক্ষা নিচ্ছে। তবে গোপনে।

ভাবছি একটা জিনস্ কিনবো। তোমার মা একটি ট্রাউজার দিয়েছেন। খেয়াল করেন নি ওটার হাঁটুর কাছে এক জায়গায় পোড়া দাগ আছে। এখানে দেখছি মেয়ে মদ্দ, যুবা যুবি বুড়া বুড়ি সবাই জিনস্ পরে। গরমও আছে। যথেচ্ছ ব্যবহারও করা যায়। তোমার জন্য কী নিয়ে যাবো ভাবছি। সিগারেট খাওয়াটা পছন্দ করিনে, তোমার শরীরের পক্ষেও এখন মোটেই ভালো নয়। নইলে এক কার্টুন মার্লবোরো সিগারেট নিয়ে যেতুম। অবিশ্যি কিছু সিগারেট নিয়ে যেতেই হবে। অশোকবাবুদের তো দিতে হবে। ভালো কলমের ওপর আমার লোভ আছে। দেখি কেমন পাওয়া যায়। Perfume-এর দাম শুনলেই চক্ষু চড়কগাছ। ছোট্ট এক শিশি, কুড়ি পাউণ্ড! ১৮ টাকায় এক পাউণ্ড। মানে ছোট্ট এক শিশির দাম ৩৬০ টাকা।

আশা করি পুজো ভালই কাটিয়েছো। এসব জায়গায়ও বাঙালিরা বেশ কিছু পূজা করেন। সকলেই বাড়ি থেকে যতোটা পারেন, প্রসাদ ফলমূল খিচুড়ি তরকারি তৈরি করে নিয়ে আসেন। মেমসাহেব বউরাও শাড়ি পরেন, পুজো নিয়ে মেতে ওঠেন। আজ এখানেই শেষ করছি। আশা করি প্যারিস থেকে চিঠি দিতে পারবো। বুজেকে আমার আদর জানিও। হেমন্ত ভানু সুরিন্দরকে আমার বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাই। তুমি আমার স্নেহ ও আশীর্বাদ জেনো।

—ইতি,
সমরেশ বসু
(বাবা)

প্যারিস
কল্যানীয়েষু বাবিন, ১৯.১০.৮৬

তোমাকে লণ্ডন থেকে যে-চিঠি দিয়েছি, আশা করি তা পেয়েছো। গতকাল প্যারিসে এসে পৌঁছেছি। গতকাল আর বেরোইনি। এখানে আমি যাঁর বাড়িতে আছি, তিনি আমাদের আনন্দ পাবলিশার্সের বাদলের বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একলা মানুষ। আজ ওঁর সঙ্গে লুভ্‌র ম্যুজিয়ম গিয়েছিলুম। ছেলেবেলা থেকে যাঁদের ছবি 'ভারতবর্ষ' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় দেখেছি, এবং যাঁদের জীবনের বহু বিচিত্র

কথা পড়েছি, তাঁদের আঁকা original সব painting লুভ্‌র-এ দেখলুম। লিওনার্দো-দ্য ভিঞ্চি, রেমব্রাণ্ট, সব দিকপালদের ছবি। এগুলো দেখতে পাওয়া একটা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আমার বিশেষ ইচ্ছে, বড় শিল্পীদের কয়েকটি মাঝারি আকারের পোস্টার কিনে নিয়ে যাবো।

২০.১০.৮৬

গতকাল ঐ পর্যন্ত লিখে রেখেছিলুম। আজ আমার টিকেটের confirmation হয়েছে। আগামী শনিবার ২৫ তারিখে বেলা বারোটায় আমার flight, কিন্তু আমি সরাসরি বম্বে যেতে পারবো না। আমাকে বাহ্‌রিনে নামতে হবে, এবং রাত্রে অন্য flight-এ বম্বে পৌঁছবো রবিবার ভোরে। এয়ারপোর্ট থেকে আমাকে যেতে হবে সুপ্রিয় সরকারের মেয়ের বাড়িতে। রবিবারেই আমি কলকাতায় ফিরতে পারবো না। সোমবার কোন্ flight ধরবো, তা এখান থেকে এখনই বলা মুশকিল। খুব ভোরে flight হলে ধরতে কষ্ট হবে। তা হলে হয়তো বিকেলের flight-এ যাবো। চেষ্টা করবো, বম্বে থেকে তোমাদের টেলিফোন করতে।

আমি আজ এখন আমার টিকিট নিয়ে Galf Air-এর অফিসে যাচ্ছি। সেখানে কাজ মিটিয়ে, কয়েক জায়গা ঘুরে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তারপর আর বেরোনো নেই। তবে এখন আমার কলকাতায় ফেরবার জন্য মন কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইচে। তবু কপাল ভালো, প্যারিসে পরশু ও গতকাল আবহাওয়া ভালো ছিল। আজ সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে। আমি একটা নতুন কোট কিনেছি। সেটা গায়ে দিয়ে বেরোবো। মাথায় ছাতা রাখতে হবে। আজ সাঁজে লিঁজে ও রোঁদার ম্যুজিয়মে যাবো। এইরকম ঠিক হয়েছে। অবিশ্যি, আমি লিখছি, তোমরা হয়তো এ চিঠি আমি পৌঁছুবার পর পাবে।

এর আগের চিঠি তোমার মা'কে দিয়েছিলুম। সেই সঙ্গে তোমাকে। এখন কাজের জন্যও খানিকটা চিন্তিত হচ্ছি। এরকম বেড়ানোর মধ্যে আনন্দ নেই। কারণ, কাজের চিন্তা মনকে আচ্ছন্ন করে রাখলে, বেড়াতে ভালো লাগে না। যাই হোক। রুবি পিসিকে আমাদের ঠিকানায় চিঠি দিয়েছি। কারণ তার বাড়ির ঠিকানা আমার জানা নেই। মা'কে বলো, তাঁকে আর আলাদা করে চিঠি লিখলুম না। খরচ যা, তা তোমাকেই জানালুম। শরীর মোটামুটি ভালো আছে।

হেমন্ত ভানু সুরিন্দর আশা করি ঠিক আছে। বুজের খবর কী? এখানে যে রকমের কুকুর দেখি! তখন ওর কথা মনে পড়ে। টুম্পা ভুবজিকে নৈহাটির ঠিকানায় চিঠি দিয়েছি। জানিনে পেয়েছে কি না। তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ জানবে। মা'কে আমার শুভেচ্ছা জানাই।

—ইতি,
সমরেশ বসু (বাবা)

টুনি,

২৮.১১.৮৬

আজ ভাবছি, সুকুমার সেনের সঙ্গে একবার দেখা করবো। সাড়ে চারটে নাগাদ বেরিয়ে, সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরবো। সুভদ্র সেনকে একটা বই উৎসর্গ করেছি, 'উদ্ধার' বইয়ের একটা কপি হেমন্তর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিও। সঙ্গীতাঙ্গন-এর চিঠির কপি ভানুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলুম। হরপ্রসাদ মুকুলরা দেখবে। আগামী সোমবার এগুলো আনন্দবাজারে xerox করে, যাকে যাকে দেবার দিয়ে দেবো।

সমরেশ

টুনি

ডাক্তারবাবু বলছেন ছোটখাটো হলেও, নার্ভের একটা কিছু গোলমাল হয়েছে। উনি চান আজই ডঃ ছেত্রীকে একবার দেখিয়ে নিতে। কিন্তু তোমার সময় কোথায়? মৃত্যুঞ্জয়ের ভাইপোকে দিয়ে খবর পাঠাবে? নইলে ডঃ ছেত্রীর লোকটির সঙ্গে কথা বলার সময় তো পাব না। ব্যাপারটা চেপে রাখা ঠিক হবে না। তুমি নিজে না এসে আমায় যদি পাঠাতে আরো ভালো হয়।

৬.২.৮৭ সমরেশ

সমরেশ বসু চিঠিতে উল্লেখিত নামের পরিচিতি

১। টুনি—ধরিত্রী বসু—সমরেশের স্ত্রী। ২। বাবিন—উদিতকুমার বসু—কনিষ্ঠ পুত্র। ৩। রমেশ—রমেশ দে—সমরেশের ইনকাম ট্যাক্সের উকিল। ৪। ভানুবাবু—মিত্র ঘোষের ভানু রায়। ৫। দ্বিতীয় ভানু—কাজের লোক। ৬। শক্তি—শক্তি ভট্টাচার্য—সমরেশের নৈহাটির বন্ধু—বর্তমানে লণ্ডনে আছেন। ৭। বুজে—সমরেশের প্রিয় কুকুর। ৮। রিহার্সেল—সমরেশ বুধসন্ধ্যা নামে খ্যাত সংস্কৃতি সংস্থার সভাপতি ছিলেন। চিঠি লেখার সময়ে ঐ সংস্থা আয়োজিত রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারার" রিহার্সেল চলছিল। সমরেশ একটি প্রধান ভূমিকায় ছিলেন। ৯। হেমন্ত—কাজের লোক। ১০। দেব—দেবকুমার ভট্টাচার্য, সমরেশের বন্ধু। ১১। দিব্যেন্দু সিংহ—সমরেশ "মহানগর" নামে যে মাসিক পত্রিকাটির সম্পাদনা করতেন তার স্বত্বাধিকারী। ১২। শক্তি—লণ্ডন প্রবাসী সমরেশের বন্ধু। ১৩। ডাকু—কন্যা বুলবুলের ছেলে। ১৪। ধৃতীন—বন্ধু। ১৫। হরপ্রসাদ—বিংশ শতাব্দীর—অধ্যাপক হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৬। সুনীল—লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ১৭। টুম্পা, বাপান—নাতি নাতনী। ১৮। সুরিন্দার—ড্রাইভার। ১৯। পারমিতা বিশ্বনাথন—কালিদাস নাগের কন্যা। ২০। অশোক—গল্পকার অশোক সেনগুপ্ত। ২১। বাবলু—পুত্র ডাক্তার নবকুমার বসু। এছাড়াও দু'একটি নাম আছে যাদের পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি।

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

—

ফ্লবেয়ার প্রসঙ্গে বোদলেয়ার

১

সমালোচনার ক্ষেত্রে, যে লেখক সবার পরে আসেন, অর্থাৎ বিলম্বিত লেখকের কতকগুলি সুবিধা থাকে, যেগুলি যাঁরা সাহসের যোগ্যতা ও অনুরক্তি দিয়ে সাফল্যকে প্রচার ও তার সম্মান দাবি করেন, এমন নেতৃস্থানীয় লেখকদের থাকে না।

আজ শ্রীগুস্তাভ ফ্লোবের-এর অনুরক্তির প্রয়োজন আর নেই, কোনোদিনই তা ছিল না। অসংখ্য শিল্পী, এবং শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা উৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে স্বীকৃত, তাঁরা তাঁর এই অপূর্ব উপন্যাসটিকে জয়মাল্য দিয়েছেন ও এটিকে বিখ্যাত করেছেন। ফলত, এটিকে ব্যাখ্যা করবার আর কিছুই নেই, যা বাকি আছে তা হল, এটির যে সব কোণে আলোকপাত করা হয়নি সেগুলির কথা বলা এবং আরও সোচ্চারভাবে সেইসব রেখা ও রং-এর ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করা, আমার মতে সেগুলির যথেষ্ট ব্যাখ্যা ও প্রশংসা হয়নি। তা ছাড়া, মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে বিলম্বিত লেখকের রচনায় এক ধরনের আত্মবিরোধী শ্রী থাকে যার কথা আমি গোড়াতেই আভাসিত করবার চেষ্টা করেছি। তা অনেক বেশি মুক্ত, কারণ বিলম্বিত ব'লে লেখক একা, তাঁর লেখা আগের বাদানুবাদগুলির সংক্ষিপ্তসার বলে মনে হয় এবং এটি অভিযোগ ও উত্তরের ক্ষেত্রে প্রাবল্যকে এড়াতে পারে এবং স্থির মস্তিষ্কে কেবলমাত্র সুন্দর ও সুবিচারের প্রতি অনুরক্তিজনিত নতুন পথ-সৃষ্টির অধিকার পায়।

২

যেহেতু আমি এই সাংঘাতিক ও মোক্ষম সুবিচার শব্দটিকে ব্যবহার করেছি—এবং যেহেতু এটি করে আনন্দ পেয়েছি, তাই এক্ষেত্রে ফরাসি বিচারকরা যে নিরপেক্ষতা ও সুরুচির মহান পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অনুমতি আমায় দেওয়া হোক[১]। নৈতিকতা সম্পর্কে অন্ধ ও অত্যুৎসাহী উদ্যম

এবং ক্ষেত্র সম্পর্কে ভ্রান্ত বুদ্ধির দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে হঠাৎ বিখ্যাত এক লেখকের রচিত একটি উপন্যাসের সামনে উপস্থাপিত—একটি উপন্যাস, আর সেটা কোন উপন্যাস! সবচেয়ে নিরপেক্ষ, সবচেয়ে বিশ্বস্ত,—সমস্ত ক্ষেত্রের মতোই সাধারণ একটি ক্ষেত্র, যা প্রকৃতির মতোই সমস্ত ঝঞ্ঝাবাত্যার দ্বারা সিক্ত ও কষাহত হয়েছে,—যে বইটিকে তাঁদের সামনে মহান বিভীষিকা হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে সেটির বিচারে ফরাসি বিচারকেরা এই উপন্যাসটির মতোই নিজেদের বিশ্বস্ততা ও নিরপেক্ষতা প্রমাণ করেছেন। তার চেয়েও ভালো, তাঁদের রায়ের বক্তব্যটির সম্পর্কে যদি কিছু বলবার অধিকার আমায় দেওয়া হয়, তাহলে আমি বলব যে বিচারকেরা বইটির মধ্যে কিছু কিছু দোষনীয় বস্তু খুঁজে পেলেও বইটি যে সৌন্দর্যের দ্বারা ভূষিত, তার জন্য তাঁরা এইসব ত্রুটিগুলিকে ক্ষমা করেছেন। যাঁদের বুদ্ধি ও বিচার শুধুমাত্র যথাসাধ্য ও সত্যের বিচারের কাজে প্রয়োজন হয়, তাঁদের সৌন্দর্য সম্পর্কে এই অভিনিবেশটি সত্যই অত্যন্ত সুন্দর লক্ষণ, বিশেষভাবে, যখন এর সঙ্গে সেই সমাজের তুলনা করা হয় যে সমাজের উদগ্র পরশ্রীকাতরতা সমস্ত বৌদ্ধিক রসবোধকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেছে এবং যা প্রাচীন রসবোধকে উপেক্ষা করে; ফলে, তাকে আরোগ্যের পথে নিয়ে যাবার জন্য এই ধরনের পথ্য দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই। এক কথায় বলা যায়, যে, তার উচ্চ কাব্যিক প্রবণতার জন্য এই রায়টি হয়ে উঠেছে চিরস্থায়ী, মামলায় কাব্য-লক্ষ্মীর জয় হল এবং লেখকপদবাচ্য সমস্ত মানুষ শ্রীগুস্তাভ ফ্লবের-এর মাধ্যমে বেকসুর খালাস পেলেন।

নির্জ্ঞাত ও সামান্য বিরক্তি সহকারে অনেকেই যেমন বলেছেন যে বইটির অসামান্য সাফল্য ঐ মামলা এবং বইটির স্বপক্ষের রায়ের ওপর নির্ভরশীল, সে কথা আমরা বলব না। নিগ্রহিত না হলেও বইটি একই ধরনের কৌতূহল বিস্ময় ও আলোড়নের সৃষ্টি করত। তা ছাড়া অনেকদিন ধরেই রচনাটি শিক্ষিত পাঠকের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে। 'লা রভ্যু দ্য পারী'তে অযৌক্তিক ছেদন তার সমন্বয়কে ব্যাহত করা সত্ত্বেও রচনাটির প্রথম আকার প্রবল উৎসাহ জাগিয়েছিল। হঠাৎ-বিখ্যাত গুস্তাভ ফ্লবের-এর অবস্থাটি হল যুগপৎ ভালো ও মন্দ; এই দ্ব্যর্থক অবস্থার মধ্যে তাঁর অপূর্ব ও বিশ্বস্ত প্রতিভা জয়ী হতে পেরেছে; সাধ্যমতো আমি তার বিভিন্ন কারণগুলিকে প্রকট করব।

৩

অত্যুত্তম;—কারণ যে উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড আশ্চর্য ও অভূতপূর্ব প্রাচ্যের মতো; শীতল মরুভূমিকে অনৈসর্গিক আলোর প্লাবনে আবৃতকারী আরোরা বোরিয়ারিসের মতো যিনি আমাদের দেশকে শ্লাঘনিয়তার জীমূতের দ্বারা মণ্ডিত করেছিলেন, সেই বালজাক-এর মহাপ্রয়াণের পর উপন্যাস সম্পর্কে সমস্ত

অনুসন্ধিৎসা তৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এটাও মানতে হবে যে তারপরেও আশ্চর্যকর প্রচেষ্টাও হয়েছিল। ইতিমধ্যেই অনেকদিন হয়ে গেল 'আলয়', 'ল্য মোঁদ কম ইল এ' এবং 'এতেল'-এর ক্রম-জনশূন্য এক সমাজে 'শ্রী দ্য কুস্তিন'[২] বিখ্যাত হয়েছিলেন—শ্রী দ্য কুস্তিন হলেন কুৎসিতা যুবতীর স্রষ্টা, চরিত্রটি রচনা করে তিনি বালজাকের ঈর্ষার বস্তু হয়ে উঠেছিলেন (আসল 'মেরবাদে' দেখুন), ইনি 'রোমুয়ালদ উ লা ভোকাশিঁও' নামের একটি রচনা পাঠকের হাতে দিয়েছেন, রচনাটি চূড়ান্ত অনৈপুণ্যে ভরা, যেখানে অনুপম পৃষ্ঠাগুলি শ্লথতা ও অপটুতার জন্য যুগপৎ সাধুবাদ ও নিন্দা পেতে পারে। শ্রী দ্য কুস্তিন হলেন প্রতিভার এক বিশেষ ক্ষুদ্র সংস্করণ, এক ধরনের প্রতিভা যা বাবুগিরিজনিত অযত্নের আদর্শ হতে পারে। ভদ্রতাজাত এই সততা, এই কাব্যিক আকুলতা, এই বিশ্বস্ত কৌতুকপ্রিয়তা, এই সম্পূর্ণ ও উদাসীন ব্যক্তিত্ব গড্ডলিকাপ্রবাহের লোকেদের পক্ষে উপলব্ধি করা অসম্ভব, এবং তাঁর এই প্রতিভা যা সমস্ত দুর্ভাগ্যকে টেনে আনে, সেগুলির সমস্তই এই মহার্ঘ লেখকের সাফল্যের বিরুদ্ধে ছিল।

'উন ভিয়েই মেত্রেস' ও 'অঁসরসলে' উপন্যাস দু'টি লিখে শ্রীজ্যোরেভিলি[৩] বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন; কিন্তু রূঢ় সত্যের এই পূজা সাধারণ লোকের অপছন্দ না হয়ে পারে না। সৎ ক্যাথলিক জ্যোরেভিলি ঝড়ের মধ্যে গান গেয়ে ও কেঁদে জয় করবার জন্যই কামোচ্ছ্বাসকে জাগিয়ে তোলেন, মনে হয় যেন হতাশার এক পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আয়াক্স্ তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বলছে—মানুষ, বজ্র, দেবতা বা প্রভু—"আমায় উৎপাটিত করো, নয়তো আমি তোমায় উৎপাটিত করব।" এটিও সেই ঝিমিয়ে পড়া জীবদের দংশন করতে পারেনি, যারা অসাধারণত্বের অলৌকিকতার দিকে চোখ বন্ধ রাখে।

শিশুসুলভ ও শ্রীমণ্ডিত বুদ্ধি নিয়ে শ্রীশঁফ্লরি[৪] অতি সুখে পরিবারের বা রাস্তার আকস্মিক ঘটনা ও হাস্যকর পরিস্থিতিগুলি কাব্যের চশমার মধ্য দিয়ে (তিনি নিজেই জানেন না যে তা কত কাব্যিক) দেখে নিজের খেয়ালে খেলা করেছেন; কিন্তু অসাধারণত্ব বা দৌর্বল্যের ফলে, ইচ্ছাকৃতভাবে বা নিয়তির সংঘটনে যেখানে সবাই মিলিত হয়, বাগ্মিতার সেই সাধারণ জমির মিলন-স্থলটিকে তিনি উপেক্ষা করেছেন।

আরও সম্প্রতি, নিয়মানুবর্তী নৈয়ায়িক মনের অধিকারী শ্রী শার্ল বারবারা[৫] যিনি মননশীলতাকে তার প্রাপ্যটি দিতে উৎসুক, তিনিও কয়েকটি মহান প্রচেষ্টা করেছেন; তিনি চেষ্টা করেছেন (এই প্রলোভন এড়ানো সত্যিই শক্ত) অসাধারণ মনের অবস্থাগুলিকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে অনূত অবস্থায় সোজাসুজি তার সে ফলটি হয় সেটিকে দেখাতে। অন্য মেরুতে অধিষ্ঠিত উত্তেজনাপ্রিয়, কু-রূপ ও ভয়ানকের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ক্ষমতার অধিকারী পল ফেভাল[৬] হলেন বিলম্বিত

নায়কের মতো, যিনি ফ্রেদেরিক স্থলিয়ে[৭] ও উজেন স্যুয়ে[৮]-র পরে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু 'মিস্তের দ লোঁদ্র' ও 'স্বস্থ'-র লেখকের উজ্জ্বল প্রতিভার মতো অনেক অসাধারণ প্রতিভার কেউই এই হতভাগী গ্রাম্য অসতীর হাল্কা ও হঠাৎ বিস্ময়কর ঘটনাটি রচনা করতে পারেনি, সুনিশ্চিতভাবে যাঁর গল্পটি আত্মহত্যার দ্বারা ছিন্ন একটি জীবন থেকে ছিনিয়ে নেওয়া দুঃখ, জুগুপ্সা, দীর্ঘশ্বাস এবং কয়েকটি মানসিক অবসাদের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে।

বহু লেখক, যাঁদের মধ্যে কেউ ডিকেন্স[৯]কে প্রদক্ষিণ করেছেন, কেউ বা বায়রণ[১০] বা বুলওয়ার[১১]-এর ছাঁচে নিজেকে ঢেলেছেন, তাঁরা হয়ত অত্যন্ত ক্ষমতাবান, অত্যন্ত উন্নাসিক হয়েও সাধারণ লেখক পল দ কক[১২]-এর মতো জনপ্রিয়তার আন্দোলিত চৌকাঠ পেরোতে পারেননি; যে সব নির্লজ্জ্য বলাৎকারকে আক্রমণ করে তাদের আমি ধর্তব্যের মধ্যেই আনি না—তাদের কোনো প্রশংসাও করি না; একইভাবে শ্রীগুস্তাভ ফ্লবের-এর কোনো বিশেষ ক্ষমতার কথা আমার জানা নেই যার দ্বারা প্রথম প্রচেষ্টাতেই তিনি সেইটি পেয়েছেন, যার জন্য সবাই সারা জীবন চেষ্টা করে। তাছাড়া তার মধ্যে আমি ক্ষমতার আধিক্যের লক্ষণটি দেখাব এবং যে সব কারণগুলি লেখকের মননকে, অন্য পথ ছেড়ে, এই পথে চালনা করল সেগুলি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করব।

কিন্তু একথাও বলব যে এই সদ্য-আগতের পক্ষে এই সময়টি মন্দ; হায়! একটি দুঃখজনক সাধারণ কারণের জন্য। বেশ কিছুদিন ধরেই বৌদ্ধিক বস্তু সম্পর্কে জনসাধারণের ঔৎসুক্য বিশেষভাবে কমে গেছে; তার উৎসাহের ক্ষেত্রটি ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। লুই ফিলিপের রাজত্বের শেষের দিকে কল্পনার খেলায় উৎসাহী হবার শেষ ঝলকানিটি দেখা দিয়েছিল; কিন্তু এই নতুন ঔপন্যাসিকের সামনে আছে সম্পূর্ণভাবে ক্ষয়ে যাওয়া এক সমাজ—তার চেয়েও বেশি—তাহল, বোকা ও লোভী, কল্পনা সম্পর্কে জুগুপ্সিত এবং বস্তুর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমিক।

এমন অবস্থায় সুন্দরের প্রতি উৎসাহ পুষ্ট কিন্তু অনুশীলনের দ্বারা গঠিত বুদ্ধি অবস্থার ভালো ও মন্দ দিকগুলির বিচার করে মনে মনে বলবে: "এই জড় হৃদয়গুলিকে আন্দোলিত করবার সবচেয়ে সঠিক পন্থাটি কি? বস্তুত, যা এদের পছন্দ হবে তা এরা জানে না; মহত্বের প্রতি এদের শুধুমাত্র ঘৃণাই আছে; সরল, উত্তপ্ত, উন্মুক্ত কাব্যিক কামনা এদের কান লাল করে দেয় ও এদের কষ্ট দেয়। ফলত, বস্তুর ক্ষেত্রে সাধারণ হওয়া যাক, কারণ মহৎ বস্তু বেছে নেওয়া উনিশ শতকের পাঠকের কাছে অভদ্রতা; এবং নিজেদের কথায় ভেসে যাওয়ার থেকে বিরত থাকতে হবে। যে ক্ষেত্রে সাধারণ লোকেরা নিজেদের উত্তাপ আরোপ করে, সেই সব আকাঙ্ক্ষা ও উত্তেজনার ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা থাকা যাক; ইস্কুলে যেমন বলা হয় নৈর্ব্যক্তিক ও বিষয়মুখ হতে হবে, আমরা তাই হবো।"

"তা ছাড়া, সাম্প্রতিক, অসার ঘরানাগুলির বকবকানিতে আমাদের কান ঝালাপালা এবং সমস্ত বিচারের মুখে ছুঁড়ে দেওয়া কটুবাক্য ও মোটেই রচনার নতুন পদ্ধতি নয় সেই 'রিয়ালিজম'-এর নাম আমরা শুনেছি; এটি হ'ল সহায়ক বস্তুগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা—বুদ্ধির এই ভ্রম এবং সাধারণ অজ্ঞতার সুযোগ আমরা নেব। একটা সাধারণ পটের ওপর একটি চকিত, চিত্রময়, ইঙ্গিতময় ও যথাযথ শৈলী ছড়িয়ে দেব। সবচেয়ে উত্তপ্ত ও আন্দোলিত অনুভূতিগুলিকে সবচেয়ে সাধারণ কামনার ঠাট দিয়ে ঘিরব। সবচেয়ে গভীর ও সবচেয়ে অমোঘ কথাগুলি বেরোবে সবচেয়ে বোকার মুখ থেকে।

বোকামীর সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র, সবচেয়ে বোকা শ্রেণী, উদ্ভটত্বের সবচেয়ে বড়ো উৎপাদক ও সবচেয়ে বোকা অসহিষ্ণুতার জায়গা কোনটি?

—গঞ্জ, শহর।

—সেখানে সবচেয়ে অসহ্য অভিনেতা কারা?

—তুচ্ছ লোকেরা, যারা তুচ্ছ কাজ করে এবং তার ফলে তাদের চিন্তাও ভুল পথে চলে।

সবচেয়ে ক্ষয়ে যাওয়া, সবচেয়ে ব্যবহৃত, বর্বরতার যন্ত্রটির সবচেয়ে ক্লান্ত বস্তুটি কি?

—ব্যভিচার।

কবি নিজেকে বললেন আমার নায়িকার নায়িকা হওয়ার প্রয়োজন নেই। যেটা প্রয়োজন তা হ'ল, সে যেন যথেষ্ট সুন্দরী হয়, তার যেন স্নায়ু থাকে, থাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উঁচু মহলে ওঠার অদম্য বাসনা ও সে যেন আকর্ষণীয় চরিত্র হয়। তার উদ্যমটি হবে অভিজাত, তার অন্তত এই গুণটি থাকবে, যার ফলে সে আমাদের আগের যুগের আমোদ-প্রিয়া, বেশি কথা বলা মহিলাদের থেকে ভিন্ন হবে।

শৈলী, দৃশ্যময়তার বিন্যাস ও পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন আমার নেই; প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্ষমতার সবকটি গুণই আমার আছে; আমি যৌক্তিকতা ও বিচারের ওপর ভর দিয়ে চলব এবং এমনিভাবেই প্রমাণ করব যে তাকে ব্যবহারের পদ্ধতির ওপরেই বস্তুটি ভালো বা মন্দ হয়ে ওঠে এবং সবচেয়ে সাধারণ বস্তু সবচেয়ে মহার্ঘ বস্তু হয়ে উঠতে পারে।"

এমনিভাবেই, সমস্ত শিল্পকর্মের মতোই মাদাম বোভারি'-র বাজিটিও সৃষ্ট হল।

লেখকের বাকি রইল, তাঁর উদ্যমে পরিপূর্ণ ব্যবহার, যতটা সম্ভব, নিজের লিঙ্গ থেকে মুক্ত হয়ে নারী হয়ে ওঠা। ফলটি হল একটি অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি; এবং অভিনেতার সমস্ত প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও, তাঁর চরিত্রের ধমনীতে তিনি পুরুষের রক্ত ভরে না

দিয়ে পারলেন না, তার মধ্যে যা কিছু সবচেয়ে উদ্যমী, সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সবচেয়ে স্বপ্নবিলাসিতা নিয়েও মাদাম বোভারী পুরুষই থেকে গেলো। পাল্লাস[১৩] যেমন জিউসের মাথা থেকে অসি-চর্ম নিয়ে জন্ম নিলো, তেমনি এই অদ্ভুত পুং-নারীর পুরুষালি হৃদয়ের সমস্ত আকর্ষণগুলি সুন্দর নারী-দেহের দ্বারা আবৃত হল।

৪

অনেক সমালোচকই বলেছেন : রচনাটি বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খতা ও জীবনময়তার দ্বারা সত্যিই সুন্দর হয়ে উঠেছে, এর মধ্যে একটি চরিত্রও নেই যে বিবেকের ভূমিকা নেয়। যে লেখকের বিবেকের কথা বলে। কোথায় সেই পৌরাণিক ও প্রবাদ-প্রতীম চরিত্রটি যার কাজ হল গল্পের ব্যাখ্যা দেওয়া ও পাঠকের বুদ্ধিকে পরিচালনা করা ? অন্যভাবে বলা যায়, প্রশ্নকর্তা কোথায় ?

উদ্ভটত্ব। কর্ম ও প্রকার-এর অপরিসীম ও অসংশোধনীয় মিশ্রণ—একটি আসল শিল্পকর্ম যার প্রশ্নকর্তার প্রয়োজন নেই। কাজটির যৌক্তিকতাই নীতির সমস্ত অঙ্গীকারের পক্ষে যথেষ্ট, পাঠকের কাজ হল পরিণাম থেকেই সমস্ত পরিণামগুলি খুঁজে বার করে নেওয়া।

গল্পে নিজস্ব ও প্রধান চরিত্রটি নিঃসন্দেহে হল অসতী নারীটি ; একমাত্র সেই হল নিন্দিত বলি, যার মধ্যে নায়কোচিত সবকটি গুণই আছে। আগেই বলেছি যে চরিত্রটি হল প্রায়-পুরুষ এবং, হয়ত বা নিজের অজ্ঞাতসারেই, লেখক সবকটি পুরুষোচিত গুণের দ্বারা সেটিকে অলংকৃত করেছেন !

মনোযোগ দিয়ে বিচার করা যাক :

(১) প্রধান ও স্বেচ্ছাচারী কল্পনা, এর মূলে আছে, যাকে বলা যায় হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, সাধারণভাবে বলা যায় যে সেখানে বিচারের কোনো স্থান নেই এবং যা প্রধানত জানোয়ারদের মতোই নারীদের ওপরেও প্রভুত্ব করে।

(২) আকস্মিক কর্মোদ্যম, সংকল্প নেবার ক্ষিপ্রতা, যা হল কামনা ও বিচারের রহস্যময় সংমিশ্রণ, এটি উদ্যমী পুরুষের লক্ষণ।

(৩) আকর্ষণ ও প্রভুত্ব করবার অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা, এবং তার জন্য আকর্ষণ করবার সমস্ত সাধারণ পন্থাগুলি গ্রহণ, যা পোশাকের ক্ষেত্রে প্রতারণা ও এসেন্স এবং পমেটম মাখা পর্যন্ত পৌঁছয়—এক কথায় বলা যায় ড্যাণ্ডিপনা ও প্রভুত্বের প্রতি পরিপূর্ণ আকর্ষণ।

অথচ কল্পনার চাতুরীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে মাদাম বোভারী উদারভাবে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে পুরুষালী বোকামী করে যা তার যোগ্য নয়, ঠিক যেমনভাবে

কবিরা বোকামীর শিকার হয়।

তার ধমনীতে পুরুষ-রক্তের আর একটি প্রমাণ হল যে এই হতভাগিনী মোটামুটিভাবে তার স্বামীর গ্রাম্যতার খুঁতগুলির দৃশ্যমান লক্ষণগুলি নজর করে ; তার প্রতিভার অভাব, বুদ্ধির স্বল্পতা, যার ফলে কুশ-পা ঠিক করবার জন্য সে অস্ত্রোপচার করে।

এক্ষেত্রে উপন্যাসটিতে বর্ণিত সেইসব পৃষ্ঠাগুলি আবার পড়ুন ; যেসব পৃষ্ঠাগুলির প্রতি অবিচার করে সেগুলিকে অপ্রয়োজনীয় বলে ধরা হয়, অথচ এগুলি চরিত্রটির পরিপূর্ণ রূপটিকে উজ্জ্বল আলোয় প্রকাশ করে। অনেকদিনের জমাট বাঁধা কালো ক্রোধ বোভারী-পত্নীর মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটায়—সশব্দে দরজা বন্ধ হয়, যে কখনও তার স্ত্রীকে বৌদ্ধিক আনন্দ দিতে পারেনি, সেই অকর্মণ্য স্বামী পরিত্যক্ত হয় ; অজ্ঞান দোষী প্রায়শ্চিত্ত করছে। আর হতাশ মাদাম বোভারী একজন অযোগ্য কাপ্তেনের কণ্ঠলগ্না হয়ে লেডি ম্যাকবেথের মতো চীৎকার করছে : "হায় ! আমি অন্তত সেইসব কুঁজো ও টেকো পণ্ডিতদের কারোর স্ত্রী নয় ; সবুজ চশমা ঢাকা চোখ নিয়ে যে বিজ্ঞানের পুঁথির ওপর ঝুঁকে থাকে। গর্বভরে আমি তার হাত ধরে ঘুরে বেড়াতে পারি ; আমি অন্তত একজন জ্ঞানের রাজার সঙ্গী হতাম, কিন্তু এই গাধার সঙ্গী হওয়া ! যে একজন প্রতিবন্ধীর পা ঠিক করতে পারে না, তার সঙ্গী হওয়া ! উঃ !"

বস্তুত সমগোত্রীয়দের মধ্যে এই নারী সত্যিই মহান ; এই ক্ষুদ্র দিকচক্রবাল ও তার ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে।

৪) এমন-কি কনভেণ্টে পড়াশোনার সময়েও মাদাম বোভারীর চরিত্রের একই বৈশিষ্ট লক্ষ্য করেছি।

কনভেণ্টের সন্ন্যাসিনীরা লক্ষ্য করেছিলেন এই বাচ্চা মেয়েটির মধ্যে জীবনকে ভোগ করবার স্পৃহা ও তার জন্য অসাধারণ তৎপরতা এবং তার থেকে সুখ পাবার প্রচেষ্টা—এগুলি উদ্যমী পুরুষের লক্ষণ !

অথচ এই বাচ্চা মেয়েটি শার্শির রং ও কনভেণ্টের ভেতরে রং করা কাঁচের মধ্য দিয়ে আশা আলোর কবোষ্ণ রং দেখে আনন্দে মাতাল হয়ে যেত ; মেয়েটি ধর্মীয় সঙ্গীত গিলত, এবং, স্নায়ুজনিত এবং আত্ম-বিরোধের ফলে সে তার হৃদয়ে বাস্তব ঈশ্বরকে বসাত তার কল্পিত ঈশ্বর—ভবিষ্যত ও অচিন্তিত ঘটনার বর্ম পরা গোঁপওয়ালা ভগবান দেখুন একজন বিকারগ্রস্ত কবি।

বিকার। কেন এই মনোবৈজ্ঞানিক রহস্যটি সাহিত্য সৃষ্টির মূল ও জমি হবে না ; এই রহস্যটি, আজও চিকিৎসাশাস্ত্র যার কিনারা করতে পারেনি এবং যা নারীদের মধ্যে গলায় উঠে আসা বল ও নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার অনুভূতির দ্বারা প্রকাশ পায় (আমি শুধু প্রধান লক্ষণগুলির কথা বলছি) এবং অনুভূতিশীল

পুরুষের মধ্যে সব ধরনের অক্ষমতা ও আধিক্যের প্রতি আসক্তির দ্বারা প্রকাশ পায় ?

৫

এক কথায়, সত্যিই বড়ো মাপের এই নারী চরিত্রটি, এটি প্রধানত করুণার পাত্র এবং কেবলমাত্র পুতুল নাচ দেখানোওয়ালার কর্তব্যটি করবার জন্য ও রচনায় অনুপস্থিত থাকার জন্য লেখকের সুসংবদ্ধ ও কঠোর প্রচেষ্টায় সমস্ত বুদ্ধিমতি তাঁর কাছে এইজন্য কৃতজ্ঞ থাকবেন যে তিনি নারীকে এই পর্যায়ে ক্ষমতাবতী করেছেন ও তাকে জানোয়ারদের থেকে এত দূরে ও আদর্শ পুরুষের এত কাছে নিয়ে গেছেন ; এটি তিনি করেছেন চরিত্রকে স্বপ্নালুতা ও বিচক্ষণতার দ্বিমুখী চরিত্র দিয়ে, যা নিখুঁত সত্তা রচনা করে।

লোকে বলে যে মাদাম বোভারী হাস্যকর। বস্তুত তাই, এই দেখুন, কখনো একজন সাধারণ শহুরে ভদ্রলোককে সে ওয়াল্টার স্কটের নায়ক বলে ধরে নিচ্ছে—আমি বলব, এমন-কি একজন গেঁয়ো ভদ্রলোককে ?

—যে উল্টোপাল্টা পোশাক পরে। আবার নোটারীর কেরানীর প্রেমে পড়ছে, যে তার প্রেমিকার জন্য কোনো ঝুঁকিই নিতে পারে না এবং শেষে ক্লান্ত হতভাগিনী, অদ্ভুত পাসিফায়ে[১৩], গ্রামের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে পড়ে এলাকার চায়ের দোকানে ঝকমকে জামা-পরাদের মধ্যে তার আদর্শ পুরুষকে খুঁজছে : কি আসে যায় ? বলা হোক, মেনে নেওয়া হোক, সে হল কারপঁত্রা[১৪] গ্রামে সিজার ; নিজের আদর্শকে খুঁজছে।

লিকঁত্রপ[১৫]-এর মতো বলব না বিদ্রোহের ডাইরী ; সে বিদ্রোহ হেরে গেছে : "বর্তমানকালের সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও বোকামী বিপরীতে আমাদের হাতে সিগারেটের কাগজ আর ব্যভিচার ছাড়া আর কি কিছু আছে ?" কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিক্তির মাপে সব কিছুর মূল্যায়ন করেও আমি স্বীকার করব যে আমাদের জগৎটি যীশুখৃষ্টের সৃষ্ট জগতের পক্ষে বড়ই কঠোর এবং ব্যভিচারিণীর প্রতি পাথর ছোঁড়বার মতো গুণ তার প্রায় নেই ; তা ছাড়া ঘড়ির কাঁটাকে একটু বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিলেও তা জ্যোতিষ্কগুলির আবর্তনের গতিকে বাড়াবে না এবং ধ্বংসটিকেও এক মুহূর্ত আগে ঘটাতে পারবে না।—ক্রম-সংক্রামক বক-ধার্মিকতার শেষ হবার সময় এসেছে। বলবার সময় এসেছে যে মনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অংশ পর্যন্ত পচে মাওয়া নর-নারীদের পক্ষে হাস্যকর হল চীৎকার করে সেই দুঃখী লেখককে ধিক্কার দেওয়া যিনি আলঙ্কারিকদের মতো পবিত্রতা দিয়ে, কদর্য, কুৎসিত, বাঁকা কেচ্ছার ওপর মহিমার ওড়না তখন বিছিয়ে দেন যখন কবিতা তার বিনিদ্র, অনচ্ছদ্যুতি দিয়ে তাতে শিহরন জাগায় না।

এই বিশ্লেষণের উতরাইটি যদি আমি ত্যাগ না করি তাহলে মাদাম বোভারী সম্পর্কে আমার কথা বলার শেষ হবে না ; মূলত ইঙ্গিতময় এই বইটির বিশ্লেষণ করে একখণ্ড বই লেখা যায়। এখন আমি নিজেকে সেইসব ঘটনাগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব, যেসব জরুরী ঘটনাগুলি সমালোচকদের দ্বারা গোড়ায় অবহেলিত বা নিন্দিত হয়েছে। যথা : কুশ-পা অপারেশনের অসাফল্য এবং এটি অত্যন্ত অসাধারণ, অত্যন্ত বাস্তবিকভাবে আধুনিক এবং এত হতাশাব্যঞ্জক, এখানে ভবিষ্যৎ ব্যভিচারিণী—এখনও সে উৎরাইয়ের গোড়ায় ! হতভাগিনী গির্জায় যাচ্ছে সাহায্যের জন্য, ঐশ্বরিক মাতার কাছে, তাঁরই কাছে যাঁর সদা প্রস্তুত না থাকার কোনো অছিলা নেই, সেই ফার্মাসিতে যেখানে কারোর ঘুমিয়ে থাকার অধিকার নেই। সেই ভালো বিশপ বুর্ণিসিয়্যাঁ, যে শুধুমাত্র শিষ্যচরিতের ছেঁড়া জামা নিয়েই ব্যস্ত এবং যে গির্জার চেয়ার টেবিলের মধ্যে জিমনাস্টিক করে বেড়ায়, সে অত্যন্ত সরলভাবে উত্তর দিল, "আপনি যেহেতু অসুস্থ এবং যেহেতু আপনার স্বামী ডাক্তার তাই আপনি আপনার স্বামীর কাছে যাচ্ছেন না কেন ?"

বিশপের এই অপ্রতুলতার সামনে এমন বাতুল ক্ষমা পেয়ে কোন নারী ব্যভিচারের ফুটন্ত জলে মাথা ডুবিয়ে দেবে না,—এবং আমাদের এই হাবা কালে এবং বিপর্যস্ত অবস্থায় আমাদের মধ্যে কেই বা না অক্ষম শাসকের সঙ্গে পরিচয় করতে বাধ্য না হয়েছে ?

৬

একই লেখকের দুটি বই ('মাদাম বোভারী' ও 'তঁতাসিও দ্য স্যাঁ অঁতোয়ান, শেষেরটির ফর্মাগুলি একত্রিত হয়ে বই হিসাবে এখনও বেরোয়নি) হাতে পেয়ে আমার প্রথম পরিকল্পনাটি ছিল যে এ দুটির এক ধরনের সমান্তরালকরণ। এ দুটির মধ্যে সমানুপাতিকতা ও যোগাযোগ দেখাতে চেয়েছিলাম। আমার পক্ষে 'মাদাম বোভারী'র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বুননের মধ্যে, 'লা তঁতাসিওঁ দ্য স্যাঁ অঁতোয়ান'-এ উজ্জ্বলভাবে আলোকিত যে মহান শ্লেষ ও গীতিময়তা আছে সেটিকে বার করে দেখানোটি সহজ হতো। এখানে কবি ছদ্মবেশ ধরেননি এবং তাঁর বোভারী মায়ার সমস্ত দানবদের দ্বারা বিধর্মী ও পারিপার্শ্বিক সমস্ত বস্তুগুলির ভোগস্পৃহায় প্রলুব্ধ হয়ে অবশেষে তাঁর স্যাঁ অঁতোয়ানে পৌঁছেছে ; এসবের ফলশ্রুতি হিসাবে যে বাতুলতার শিকার আমরা হই তা এই ক্ষুদ্র বুর্জোয়া কল্পিত গল্পের চেয়ে আরো উৎকৃষ্ট অছিলা হতে পারত। দুঃখের বিষয় যে এই রচনাটির লেখক কেবলমাত্র কয়েকটি খণ্ডিত অংশই আমাদের দিয়েছেন, যার মধ্যে কয়েকটি আশ্চর্যকর উজ্জ্বল টুকরো আছে ; আমি কেবলমাত্র নেবুকাডনাজারের ভোজসভা, একজন সন্তের চোখের রেটিনার ওপর নৃত্যরত মিনিয়েচার হিসাবে পাগলিনী সেবা'র আবির্ভাব

এবং পেছনে তার মাহুতকে নিয়ে আপোলোনিয়াস দ তিয়ান্[১৫]-এর ভণ্ড স্বরূপের জোরালো উপস্থাপন বা তার পোষণকারী সেই বোকা ক্রোড়পতি যাকে সে সারা পৃথিবী নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায় তার কথাই শুধু বলছিনা ; অন্তঃশীলা, বিদ্রোহী এবং যন্ত্রণাকাতর গুণটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যা রচনাটির সর্বত্র উপস্থিত, এই অন্ধকারময় সূত্র যা আলোকিত করে—ইংরাজরা যাকে বলে আণ্ডার কারেন্ট এবং সেটা একাকীত্বের এই বিষাদময় উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে দিশারী হিসেবে কাজ করে।

যা আমি আগেই বলেছি, যে আমার এটা দেখানো খুবই সহজ হতো, যে 'মাদাম বোভারী'র মধ্যে গুস্তাভ ফ্লবের স্বেচ্ছাকৃতভাবে তাঁর সুউচ্চ গীতিময়তা ও শ্লেষের ক্ষমতাকে ঢেকে রেখেছেন, সেটি তাঁর 'তঁতাসিও'তে পরিপূর্ণভাবে প্রকট হয়েছে এবং এই রচনাটি তাঁর মননের গোপন ঘরটি কবি ও দার্শনিকদের কাছেই বেশিভাবে উপভোগ্য হবে।

হয়ত অন্য কোনো সময়ে এর সম্পর্কে লেখার সুখটি আমি পাবো।[১৬]

পাদটীকা

১. বোদলেয়ার-এর 'ফ্লর দ্যু মাল' কাব্যগ্রন্থের অশ্লীলতা সম্পর্কে বিচারের অল্পদিন আগেই ফ্লবের-এর 'মাদাম বোভারী' উপন্যাসেরও বিচার হয় একই অভিযোগে—বিচারে 'মাদাম বোভারী' বেকসুর খালাস পায় কিন্তু 'ফ্লর দ্যু মাল'-এর ভাগ্যে তা হয়নি। বোঝাই যাচ্ছে লেখাটি রচিত হয়েছিল 'মাদাম বোভারী'-র বিচারের পরে এবং 'ফ্লর দ্যু মাল'-এর বিচারের আগে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'লারতিস্ত' কাগজের ১৮ অক্টোবর ১৮৫৭ সালে।

২. অনেক খুঁজেও এই নামের কোনো লেখকের সন্ধান পাইনি ; হতে পারে যে এই লেখক দু'একটি উপন্যাসমাত্রই রচনা করেছিলেন এবং আজ হারিয়ে গেছেন। আঠারো শতকে এই নামের একজন ফরাসি জেনারেল ছিলেন ১৭৯৩ সালে যাঁর গিলোটিন হয়,—হতেও পারে যে ইনি ঐ জেনারেলের সন্তান বা ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

৩. পুরো নাম বারবে দোরেভিলি (১৮০৮-৮৯)। ফ্রান্সের নরম্যাণ্ডি অঞ্চলের অভিজাত, ড্যাণ্ডি জীবনযাপন করতেন, ইনি কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেন তার মধ্যে 'অঁসরসলে' উল্লেখযোগ্য।

৪. জুল উসোঁ শঁফ্লরি (১৮২১-৮৯) ঔপন্যাসিক ও চিত্র সমালোচক।

৫. শার্ল বারবারা অল্পবয়সেই দুর্ঘটনায় মারা যান, বোদলেয়ারের বন্ধু ছিলেন, তাঁর রচিত 'আসসিনা দু পোঁ রুজ' কাব্যগ্রন্থে ১৮৫৫ সালে মাদাম সাবাতিয়ের উদ্দেশ্যে একটি সনেট প্রকাশ করেন।

৬. পল ফেভাল (১৮১৭-৮৭) তৎকালের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক, কিন্তু আজ অজ্ঞাত। এঁর রচিত 'মিস্তের দলোঁদ্র' ও 'ল্য বস্থ' অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত হয়।

৭. ফ্রেদেরিক স্থলিয়ে (১৮০০-৪৭)—১৮২৮ সালে তাঁর অনূদিত 'রোমিও জুলিয়েটে'র সাফল্যের পর তিনি ১৮৪৬ সালে 'লা ক্লোশরি দে জেনে' নাটক লিখে সাফল্য পান। 'লে মেমোয়ার দু দিয়াব্ল' নামে আট খণ্ডের উপন্যাস লিখে তিনি যশস্বী হন।

৮. উজেন স্যুয়ে (১৮০৪-৫৭)—জাহাজের ডাক্তার হিসাবে জীবন শুরু করেন—পরে তা ছেড়ে দিয়ে সাহিত্যে মনোনিয়োগ করেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে নাবিকদের জীবন উপজীব্য করে 'লা মালামঁদ্র' উপন্যাস প্রকাশ করেন ও বিখ্যাত হন : পরে 'মাতিল্দ' ও 'লে মিস্তের দ পারী' (১৮৪২-৪৩) লিখে প্রভূত সাফল্য পান। ইনি ড্যাণ্ডিদের জীবনযাপন করতেন—এবং উপন্যাসে 'রিয়ালিজম'-এর পূর্বসূরী হিসাবে এঁকে ধরা হয়।

৯. চার্লস ডিকেন্স (১৮১২-৭০) বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক। বোদলেয়ার ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা ইংরাজি সাহিত্যও—বিশেষভাবে, ইংরাজি উপন্যাস-চর্চা করতেন।

১০. লর্ড বায়রণ (১৭৮৮-১৮২৪) বিখ্যাত ইংরাজ রোমান্টিক কবি। তাঁর কবিতার চেয়েও বেশি, তাঁর জীবনযাত্রা আঠারো-উনিশ শতকের ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের নাড়া দেয়—প্রায় বলা যায় যে উনিশ শতকের ফরাসি লেখক সমাজের 'ড্যাণ্ডি' চরিত্রটি হল বায়রণের নকল।

১১. স্যার বুলওয়্যার লিটন (১৮০৩-৭৩) জীবৎকালে বিখ্যাত, বর্তমানে অজ্ঞাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক।

১২. পল দ কক (১৭৯৩-১৮৭১) ফরাসি লেখক। প্রচুর নাটক, কমিক ওপেরা ও ভোদভিল নাটক লিখেছিলেন ; জীবৎকালে ইনি অসামান্য সাফল্যলাভ করেন—আজ অজ্ঞাত।

১৩. পাসিফায়ে—গ্রীক পৌরাণিক চরিত্র—ম্যাজিসিয়ান সার্সীর বোন—মিনস-এর স্ত্রী—আরিয়াদ্নি—আন্দ্রোজে ও ফিদ্রার মা—জলের দেবতা পোসেইদন-র দ্বারা কামনা চরিতার্থ করবার জন্য ক্রীট-এর ষণ্ডের সঙ্গে সহবাস করেন ও মিনোতর-এর জন্ম দেন।

১৪. কারপঁত্রা—দক্ষিণ ফ্রান্সের একটি গ্রাম—ফুটি ফলের জন্য বিখ্যাত।

১৫. লিকঁত্রপ—পেক্রস বোরেল-এর (১৮০৯-৫৯) ছদ্মনাম। কথাটির অর্থ হল—মানুষ নেকড়ে—ইনি বোদলেয়ারের বিশেষ বন্ধু ও গুরুস্থানীয় ছিলেন।

১৬. অন্যান্য অনেক পরিকল্পনার মতোই এ লেখাটিও তাঁর লেখা হয়ে ওঠেনি।

কল্যাণী দত্ত

—

কলকাতার কলের গান ও টকিং মেশিন

আমি একটু বেশী পুরোনো মানে একশো বছর আগের থিয়েটারী গান নিয়ে দুকথা বলতে এসেছি। নির্বাক ছবিতে তো গান থাকতে পারে না সবাক বা টকী হলো তো ১৯৩১-৩২।

টকীর যুগে পুরোনো গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রহ অনুমান করছি কলকাতা শহরে বহুলোকেরই আছে। দোকান থেকে বই-এর তালিকার মত সেকালে রেকর্ডের তালিকাও বের হত তাদের কিছু কথা বলি। চোঙ্‌দার প্রকাণ্ড গ্রামোফোনের পাশে সেজেগুজে ঘড়ির চেন ঝুলিয়ে মাটিতে চাদর লুটিয়ে মখমলের কুশনের ওপর পা রেখে স্টার থিয়েটারের কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় জমিদার বাবু সেজে ছবি তুলিয়েছিলেন। সচিত্র ওডিয়ন গীতাবলীতে হরিশ্চন্দ্র রাজার সঙ্গে রানী শৈব্যার শ্মশানে আলাপ নিয়ে পালা ছিল, অমরেন্দ্রনাথ দত্তের গোবিন্দলাল আর কুসুমকুমারীর রোহিণীর পালা ফাজিল ছেলেরা অনেকে মুখস্থ করে টেনে টেনে আবৃত্তি করত। পান্নাময়ী দাসীর কীর্তন তখন বেশ নাম করেছিল—'কানু কহে রাই কহিতে ডরাই ধবলীচরাই মুই। রাখালিয়া মতি, না জানি পিরীতি রসের পশরা তুই।।" এই গানটা ছোট বড় সকলেরই শোনবার অধিকার ছিল। বড়দের আড্ডা ঘরে তো ছোটরা ঢুকতে পায় না কিন্তু গলির জানলার খড়খড়ি সামান্য উঁচু করলেই শোনা যেত—মায়াবিনি, আমি তব ধাইব পশ্চাতে সাথে লয়ে তপ্ত আঁখিজল, তুমি কিন্তু চলে যাবে ফিরায়ে বদন বরষিয়া বিদ্রূপের হাসি।'

তখনকার রেকর্ডের গায়িকাদের নাম শুনুন—দু'চার জনের বেদানাবালা, ডালিমমণি, মালতী মালা, সুশীলাসুন্দরী, নরীসুন্দরী, উষাবালা, এইসব। এছাড়া সেকালে একটি মুসলমান ছেলের ছিল অতি সুকণ্ঠ, তিনি শ্যামা শ্যাম দুই সঙ্গীতই গাইতেন, তখন তিনি ছিলেন খ্যাতির তুঙ্গে, 'রেকর্ড করবার সময় 'কে মল্লিক' ছদ্মনামে তাঁর অসংখ্য রেকর্ড করানো হতো। এঁরই জীবনের বিচিত্র কথা নিয়ে প্রখ্যাত লেখক গোলাম কুদ্দুস উপন্যাস 'সুরের আগুন' লিখেছিলেন।

কে. মল্লিকের গাওয়া একটি ছোট গান তুলে দিই—

হল মা দিবা অবসান। কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে মুদিতে নয়ান।
শুনগো মা ভবতারা, অজপা হইল সারা, কৃপা করে দে মা তারা ও চরণে স্থান ।।

বসুমতী থেকে রাগরাগিণীর ছবি অমৃতলাল বসুর মস্ত ভূমিকা আর প্রচলিত প্রায় সব গান দিয়ে 'বীণার ঝঙ্কার' নামে ছোট অভিধানের মত এক বই বেরিয়েছিল। কার মহলানবিশের দোকান থেকে কাপড়ে বাঁধাই সাড়ে সাতশো গানের সংগ্রহ।

বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা ভেঙে যাত্রা পালা হয়েছিল নবকুমার আর মতিবিবি সংবাদ তাতেই ছিল। অভিমন্যু উত্তরা পালা ছিল কাদের তা মনে নেই। চোঙ্‌দার গ্রামোফোন উঠে গিয়ে হিজ মাস্টারস্ ভয়েস বা এইচ এম ভি রেকর্ড হলো, শুনেছি দমদমের বাগানে রেকর্ডিং হত। ঝরিয়ার খনি অঞ্চলের কমলাদাসীর নাম হলো কমলা ঝরিয়া। যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী—গানটি সারা শহরের সর্বত্র জনপ্রিয় হয়েছিল। আঙুরবালা ইন্দুবালা আশ্চর্যময়ী পান্নাময়ীরা প্রায়শ চিৎপুর অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। ভদ্রঘরের মেয়েরা ঠিক কবে প্রথম গান রেকর্ড করালেন তা বলতে পারছি না।

চোঙ্‌দার গ্রামোফোনের ছবি রেকর্ড সঙ্গীতের মলাটে আছে। কার এণ্ড মহলানবিশ ১-২ চৌরঙ্গী রোড ওডিয়ন মেশিনের দাম লিখেছেন নব্বই টাকা ক্যাটালগের গায়ে তারিখ ১৯০৮ সাল।

কলকাতার ফেরিওয়ালার ওপরে এখানে একটি 'সরস' গান আছে।

রেকর্ড নম্বর ১১৪-৯৪৪৬০

ঐ পয়সা উড়ে যায়।
এ সহর কোলকেতায় কত আজগুবি বিকায়,
ছলে, বলে, কলাকৌশলে পয়সা উড়ে যায়।।
ফেরিওয়ালার দল যত, কানের কাছে অবিরত
যে যার বুলি ডেকে যায়।
ওগো রকম রকম তাদের সুর বড়ই মজার বড়ই মধুর
শুনিয়া কার জিহ্বা না জলে ভিজে যায়
নাকে মুখে তিলক কেটে পাহাড় প্রমাণ বোঁচকা পিঠে,
'এক টাকায় চারখানা কাপড়, একখানা ফাউ'
ওগো মোটা সোটা খোট্টা ভায়া হিন্দিতে চেঁচায়
কখন কখন শুনি, রমণীর মধুর ধ্বনি,
দাঁতের পোকা বার করি, কোমরের বেদনা আরাম করি
বাত ভাল করি আয়।
দুপুর বেলায় ঘুরে ঘুরে মাথায় ঝুড়ি বৃদ্ধ মিঞা

গম্ভীর স্বরে সে হাঁকে চুড়ি চাই বালা চাই আয়
চাই চানাচুর ঘুগনি দানা, চীনে বাদাম নকল দানা
অবাক জল পান কেহ বা চেঁচায়
সন্ধ্যাবেলা দেখি বেশ মালাই কুল্‌পি বরফ সরেস
বৈঠকখানায় বাবুদের লাগে ভাল তাই।
চাই বেলফুল বেলফুল ঘন ডাকে মালীকুল
একি জ্বালা দুপুর রাতে মন ভুলান ছড়া গেঁথে
জামাই তত্ত্ব লেডিকেনি দেখতে কালকিষ্কিন্ধ্যে,
ভাঙ্‌তে গেলে নানা রঙ্গে স্বাদ তার সঙ্গে সঙ্গে পায়॥

তারিখ ১৯০৮

শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ গুপ্ত মশাই 'কলকাতার ফিরিওয়ালার ডাক আর রাস্তার-আওয়াজ' নিয়ে যে অপূর্ব বইখানি লিখেছেন তার ১ম সংস্করণের তারিখ ১৩৯০-১৯৮৪, রেকর্ড সঙ্গীতটি তাহলে প্রায় তার পঁচাত্তর বছর আগে লেখা। কোনও মতে এখানে তুলে দিলুম তা থেকে দু'তিনটি গান। আমার সব লেখাই স্মৃতি-নির্ভর, বই হাতের কাছে পাইনে অগুনতি ভুল থাকে। মাথার মধ্যে ছবিগুলি সব ওলোট পালোট। পাঠক শুধরে নেবেন।

জয় জয় সম্রাট ৫ম জর্জ নামে
রে: কা: পৃ: ২১
বাঁটের মুখে খাটি দুধ পৃ: ১৬
গিরিশ ঘোষ রচিত
বিঘোরে বিহারে এক্কা চড়িনু ৯৫
ওগো তারেই বলে প্রেম—পৃ: ৯১
D. L. Roy
প্রথম যখন বিয়ে হল পৃ: ১১
দুটো মজাদার গান শুনুন—
সুখ নাই আর উকিল মহলে
ওকালতির প্যাঁচ লেগেচে উকিলের গোলে
কোর্টে নাইক মিছিল মামলা ভাবচে বসে যত আমলা
উকিলেরা বেচ্‌চে সামলা কিসে দিন চলে।
একাজে আর নাইকো জুত জুটেচে অনেক ভূত
হয়েচে ঘোর বেজুত কাঁদচে সকলে।
আগে ছিল প্রচুর আয় এখন পেট চলা দায়
কৃষ্ণ কিশোর রমাপ্রসাদ রায়ের আমলে।

হরিঘোষের গোয়াল গোয়াল যেমন
হাইকোর্টের লাইব্রেরী তেমন
কেউ ঢুকচে কেউ বেরুচ্চে নজীর বগলে
হাইকোর্ট সামলাময় উকিল সংখ্যা সহজ নয়
দলে দলে পালে পালে বেড়াচ্চে হলে।
যাদের না অন্ন জোটে সাইনিং নাইকো কোর্টে
ঢুকচে সব জেলা কোর্টে বোম্বেটের দল।
যাদের পসার হয়ে গেছে আয় তাঁদের সমান আছে
তাদের নেই হাজা সুখা বারো মাস চলে।
কি দুর্দশা কব কার কেউ হচ্চে বাপদাদার
পক্ষে বিপক্ষে মেলা গুজার
বাসা খরচ চলা ভার, কবিরত্ন বলে॥

এই গান গেয়েছিলেন মন্মথ নাথ রায় যাঁর কোনও পরিচয় জানা নেই।

(২) খাজা খুর্মা খাসা মণ্ডা—
এযে বড় ফলার চেগেছে নিতাই
যখন দ'য়ের আগে মণ্ডা ভাঙি
যেমন বানের আগে জেলে ডিঙি
লুচি আর মিঠে গজা, তার উপর পাঁপর—ভাজা
দে দৈ দে দৈ পাতে ওরে বেটা হাঁড়ি হাতে
বেটা পরিবেশদের কিছু জানে না।
ওদের পাতে দু'বার দিলি
আমার পাতে ভুলে গেলি
ওদিকে যে টান বড়ো
ওরা কি তোর বাবা খুড়ো
আমরা কি কেউ নইরে
এর নাম কীর্তন সুর খেমটা।

মিস্ গহরজান
জিলা—দাদরা।

আজ কেন বধু অধর কোণেতে
শুকাল হাসির রেখা।
পরাণের হাসি, চুরি কে করেছে
বল গো পরাণ সখা॥

কেন শূন্য আঁখি নেঁহারি,
ব্যাকুল চাহনি সব কি দিয়েছ
যা ছিল সরমে মাখা
মাল্‌কা জান
ঝিঁঝিট খাম্বাজ—পোস্তা।

আমার এ সাধের তরী প্রেমিক বিনা নিইনা কারে।
যে প্রেম জানেনা চড়তে মানা, ডোবে তরী একটু ভারে।
মনে মনে বুঝে দেখ, এস যদি প্রেমিক থাক,
কে ধর প্রেম পসরা, এস ত্বরা নে যাই পারে।
প্রেম-তুফানে তরী ভাসে, দেখ্‌লে প্রেমিক তীরে আসে,
ঢেউ দেখে যে ভয় পাবে না, অকূল পারে নে যাই তারে ॥

উৎস. অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সংকলিত রেকর্ড কাকলী থেকে, ২য় সংস্করণ ১৩২৮।

থিয়েটার সংগীতের বইগুলিতে প্রায়ই তারিখ নেই তবে বেশীর ভাগ এই শতাব্দীর প্রথম দশকে ছাপা। রেকর্ড কাকলী ১ম সং আমরা দেখিনি। কলের গান, কার অ্যাণ্ড মহলানবিশ চটি আর মোটা দুই সাইজ, সচিত্র ওডিয়ন গীতাবলী, বেকা গীতাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের সুবৃহৎ বীণার ঝঙ্কার এতে সব গানই পাওয়া যাবে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর অমৃতলাল বসু এঁদের গানই প্রধান।

বিঘোরে বিহারে চড়িনু এক্কা মজাদার গান—'এক্কা গাড়ি খুব ছুটেছে' হাসি-খুসিতে পড়লেও কজনই বা চড়েছিল? গাইত সকলে। দ্বিজেন্দ্রলালকে দ্বিজু রায় বা ডি. এল. রায় বলা হতো। 'প্রথম যখন বিয়ে হলো' আর 'ওগো তাকেই বলে প্রেম' এ দুটি গানের মত সর্বজন প্রিয় গান প্রায় ছিল না।

যখন থাকেনা ফিউচারের ভয় থাকে নাকো 'শেষ'।
ওগো তাকেই বলে প্রেম।

ডি. এল. রায়ের অতুলনীয় একটি গান দিয়ে আমার বকুনি শেষ করি

তোমায় ভালবাসি বলে তুমি বুঝি মনে ভাব
যে তোমার চন্দ্রমুখ না দেখিলে মরে যাব?
ঘুরু চরবে আমার বাড়ি, উনুনে চড়বে না হাঁড়ি,
বৈদ্যেতে পাবে না নাড়ি—এমনি দশায় খাবি খাব।
তুমি যদি ভাল না বাসোত আমার তবে বয়েই গেল।
ডাকলে তোমার পাইনে সাড়া, নেই কি কেউ তোমা ছাড়া
এই গোঁপ জোড়াকে দিলে চাড়া তোমার মত অনেক পাব।

তখনকার দিনের কর্তারা এই শেষ চরণটি ঘুরে ফিরে প্রাণের ফুর্তিতে খুব গাইতেন।

বাঁধন সেনগুপ্ত

—

রামপ্রসাদের প্রথম ও একমাত্র ছবি এবং ডেভিস

বাঙলার সারস্বত সাধনায় সাধককবি রামপ্রসাদ সেনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা অনস্বীকার্য। বাঙলার লোকজীবনের প্রথম রূপকার হিসেবেও তাঁর অবদান আজও স্মরণীয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর এই কবি ও গীতিকার যাকে নিঃসন্দেহে লোককবির মর্যাদা দেওয়া উচিত, তাঁর কোনো ছবি বা প্রতিকৃতি নেই। আমাদের দুর্ভাগ্য, হালিসহরের অর্থাৎ তদানীন্তন কুমারহট্টের এই লোককবির, যাঁকে বলা হয় বাঙলার প্রথম বা আদি কবি, যাঁর রচিত কবিতা বা গান লিখিত বা প্রকাশিত না হয়েও এতকাল ধরে লোকমুখে সারা দেশে প্রচারিত ও গীত হয়ে এসেছে, তাঁর কোনো ছবিই আমরা গত পৌনে তিনশ বছরেও দেখবার সুযোগ পাইনি। আমাদের নেহাৎই দুর্ভাগ্য যে, রামপ্রসাদের কোনো বিশ্বাসযোগ্য ফটো বা প্রতিকৃতি তুলতে বা আঁকতে এঁদেশের মানুষ তাঁর জীবিতবস্থায় সক্ষম হয়নি। অথচ সেকালে রাজা মহারাজারা শিল্পীদের দিয়ে নিজেদের বা সভাসদ্‌দের অজস্র তৈলচিত্র আঁকাতেন। রামপ্রসাদ সেকালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় বা মুর্শিদাবাদে নবাব সিরাজদৌল্লার প্রাসাদে যে যাতায়াত করতেন এবং নবাবের প্রাসাদে অতিথি হিসেবে অবস্থান করতেন সে তথ্যও আমাদের কারও অজানা নয়। অথচ মাত্র দুশো বছর আগে প্রয়াত রামপ্রসাদের কোনো প্রতিকৃতি বা মূর্তি নির্মাণে সেকালের কোনো শিল্পী বা ভাস্কর এগিয়ে আসেননি।

এ পর্যন্ত সাধক রামপ্রসাদের কেবলমাত্র একটি কল্পিত রেখাচিত্রের সন্ধান আমরা পাই। রামপ্রসাদ ও পত্নী যশোদার সেই চিত্রটি এঁকেছিলেন প্রতিবেশী এক পটুয়া বা পটশিল্পী। তাকে ডাকা হত 'ভোনা পোটো' বলে। রামপ্রসাদের মৃত্যুর অনেক বছর পরে গ্রাম্য শিল্পী ভোনা লোকমুখে রামপ্রসাদ সম্পর্কে শুনে তাঁর কল্পনাপ্রসূত ঐ রেখাচিত্রদ্বয় এঁকেছিলেন। কিন্তু তখন থেকেই সেই ছবিই রামপ্রসাদের একমাত্র ছবি বলে বাঙালীর কাছে পরিচিত। প্রায় একশো বছর আগে রামপ্রসাদের ছবির কথা এদেশে প্রথম অনুভব করেছিলেন 'বৃহৎ বঙ্গ' রচয়িতা শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন। ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৯৬) তিনি রামপ্রসাদ ও যশোদাদেবীর ঐ ছবিখানিই সর্বপ্রথম লোকসমক্ষে প্রকাশ করে দেন। তিনি

এ. ডবল্যু. ডেভিস -অঙ্কিত রামপ্রসাদের তৈলচিত্র

লিখেছিলেন, কবি রামপ্রসাদ সেন ও তাঁহার পত্নীর যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমি পাইয়াছি। একখানি স্বর্ণখচিত সমুজ্জল চণ্ডীমূর্তির দুই পার্শ্বে ভক্তিমান ও ভক্তিমতীর ছবি দুইটি দেওয়া হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, এই ছবি যখন অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পূর্বে রামপ্রসাদ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে ও আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে সেই গ্রন্থ লিখতে এগিয়ে এসেছিলেন দীনেশচন্দ্র। তিনি সাগ্রহে আরও লিখলেন, যে পটুয়া ছবি আঁকিয়াছিল, তাহার বাড়ী হালিসহর কুমারপাড়া, এই স্থানটি রামপ্রসাদের গৃহ ও 'পঞ্চমুণ্ডী' হইতে অর্ধ মাইল দূরে, এক পাড়া বললেই হয়। গোপেন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়িও এক মাইলের মধ্যে এবং তাহারই পূর্বপুরুষ ছবি আঁকাইয়াছিলেন।

উপরোক্ত বিবৃতি সম্পূর্ণ বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে যে শিল্পী তা এঁকেছিলেন তার নাম 'ভোনা'। 'ভোনা পোটো' বা 'ভোনা পটুয়া' বলেই তাঁকে ডাকা হত। রামপ্রসাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গোপেন্দ্র ভট্টাচার্যের পূর্বপুরুষের অনুরোধে তিনি ছবিটি এঁকেছিলেন তার কোনো প্রমাণ নেই। মনে হয়, রামপ্রসাদের মৃত্যুর অনেক পরে লোকমুখে রামপ্রসাদের বর্ণনা শুনেই সেই গ্রাম্য পটুয়া ঐ রেখাচিত্রটি এঁকেছিলেন। কল্পিত সেই রেখাচিত্রই এখনো রামপ্রসাদের পীঠস্থান হালিসহর প্রসাদপীঠ বা রামপ্রসাদের ভিটেয় অফিস ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো আছে। এছাড়া ক্যালেণ্ডারে বা রামপ্রসাদী গানের বইতে বিভিন্ন সময়ে রামপ্রসাদের বহুবর্ণ শোভিত ছবি গরাণঘাটা বা বটতলা থেকে ছাপা হয়ে আজও বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে যার সঙ্গে রামপ্রসাদের প্রকৃত ছবি বা প্রতিকৃতির কোনো মিলই নেই। রামপ্রসাদের জীবনীকার অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, রামপ্রসাদের বাবরি চুল ছিল। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন, গলায় স্ফটিক মিশানো রুদ্রাক্ষমালা ছিল, অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। এইসব বর্ণনায় শোভিত হয়েই রামপ্রসাদের অসংখ্য ছবি নানা গ্রন্থে ছাপা হয়ে এসেছে। কিন্তু এর কোনোটার সঙ্গেই তাঁর প্রকৃত অবয়বের কোনো মিল নেই। রামপ্রসাদের প্রকৃত রূপ বা অবয়ব সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদির সন্ধান সম্প্রতি পাওয়া গেছে।

রামপ্রসাদের প্রকৃত বা প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে মাত্র বছর পনেরো আগে। ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে লণ্ডন থেকে একটি শিল্প বিষয়ক সেমিনারে যোগ দিতে এসেছিলেন শ্রীমতী মাইলড্রেড আর্চার (Mrs. Mildred Archer)। তিনি তখন ছিলেন লণ্ডনের বিখ্যাত একটি শিল্পকলা মিউজিয়ামের চিত্রকলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না চিত্রকলা-বিশেষজ্ঞ হিসেবেই শ্রীমতী মাইলড্রেড সেই সেমিনারে আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে যোগদান করেছিলেন। সেমিনারে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে আমরা প্রথম জানতে পারি যে, রামপ্রসাদের

একটি ঐতিহাসিক তৈলচিত্র লণ্ডনের মিউজিয়ামে আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। ছবিটির অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রায় দুশো বছর এদেশের জনসাধারণ অবহিত ছিলেন না। তাঁর বক্তৃতা থেকে ও পরে আলোচনার মাধ্যমে রামপ্রসাদ ও তাঁর সেই প্রতিচ্ছবি সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য ও সূত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন অনুসন্ধিৎসু লেখক ও শিল্প সমালোচক শ্রীচম্পক চট্টোপাধ্যায়। এ বিষয়ে ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখে কলকাতার The Statesman পত্রিকায় তিনি একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। লেখকের সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী এবং শ্রীমতী মাইলড্রেড এর কাছ থেকে প্রাপ্ত বক্তব্য অনুসারে Arthur Willium Devis নামে জনৈক ইংরেজ শিল্পী প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে ঝঞ্ঝাঝড়ে আক্রান্ত একটি জাহাজে চড়ে ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছান এবং ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথম ভারতের মাটিতে পা ফেলেন।

ডেভিস ভারতবর্ষে ছিলেন প্রায় বারো বছর। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে ফিরে যান। জীবনের অন্তিম পর্বে লণ্ডনে থাকা কালে দেউলিয়া অবস্থায় ডেভিস কারারুদ্ধ হন (১৮০৪)। অবশেষে নিঃস্ব, রিক্ত অবস্থায় অসহায় শিল্পী ডেভিস ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

ভারতবর্ষে তার পরেও অনেক ইংরেজ শিল্পী এসেছিলেন। যেমন শিল্পী Zoffany, Thomas বা Willium Daniell ইত্যাদি। তাঁরা এসেছিলেন স্বেচ্ছায় অর্থোপার্জনের আশায়। Davis অর্থোপার্জনের আশায় ভারতবর্ষে আসেননি। ভারতে তাঁর আগমন নেহাৎই আকস্মিক ঘটনা। ভারতে বিশেষ করে কলকাতায় এসে তিনি নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে অজস্র ছবি এঁকেছিলেন। এর মধ্যে যেমন সেকালে এদেশে অবস্থানরত ইংরেজ সমাজের চলাফেরা বা জীবন-যাত্রার ছবি রয়েছে তেমনি ডেভিস পাশাপাশি মেদিনীপুর, নদীয়া ও অন্যান্য জেলা ঘুরে ঘুরে কয়েকবছর ধরে তাঁতী, কুমোর ও ছুতোর সম্প্রদায়ের অসংখ্য ছবি এঁকেছিলেন। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে ডেভিস স্বয়ং লর্ড কর্নওয়ালিসের একটি তৈলচিত্র এঁকে কলকাতায় কুড়ি হাজার সিক্কা টাকা পারিশ্রমিক পান। ঠিক এর এক বছর আগে (১৭৯২ খ্রিঃ) নদীয়ার শান্তিপুরে থাকাকালে ডেভিস রামপ্রসাদের কথা লোকমুখে শুনে আগ্রহী হয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার আশায় এবং রামপ্রসাদের একটি তৈলচিত্র অঙ্কনের সঙ্কল্প নিয়ে কুমারহট্ট অর্থাৎ হালিসহরে নৌকাযোগে শান্তিপুর থেকে এসে পৌঁছান। রামপ্রসাদের সঙ্গে পরিচিত হবার পর তাঁর অনুমতি নিয়েই রামপ্রসাদের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি অর্থাৎ একটি রঙিন তৈলচিত্র মুখোমুখি বসে এঁকেছিলেন শিল্পী ডেভিস। শ্রীমতী মাইলড্রেডের তথ্যানুযায়ী ডেভিসের অঙ্কিত সেই তৈলচিত্রটির কথাই সেই সেমিনারে উল্লেখিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, তখন এদেশে ফটোগ্রাফী প্রচলিত ছিল না। ফলে ডেভিসের সেই তৈলচিত্রটিকেই রামপ্রসাদের প্রথম ও একমাত্র ছবি বলা যেতে পারে। চম্পক

চট্টোপাধ্যায় সেই ছবির সম্পর্কে স্টেটসম্যানে লেখা নিবন্ধে জানিয়েছেন – In this project Devis proposed to inclued an engraving of an ascetic called Ramprasad out of the outpaiting already completed by him. A photograph of Ramprasad taken from the original work which is now in Britain is reproduced here (courtesy Mrs. Mildred Archer, the noted authority of art). It shows an ascetic with long hair, with a rosery, seated on a platform in front of a large tree. On the ground in the right hand corner is a stone sculpture....

১৭৮৬ সালে ডেভিস পাটনায় যান। সেখান থেকে ১৭৯০ সালে তিনি তমলুকে গিয়েছিলেন। সেখানে বছর দুই কাটিয়ে শিল্পী ১৭৯২ সালে আসেন শান্তিপুরে। সেখান থেকেই নৌকাযোগে সে বছর ডেভিস হালিসহরে এসে রামপ্রসাদের ছবিটি এঁকে নিয়ে যান। এই সময়ে তিনি আরো দুটি চিত্রও এঁকেছিলেন বলে খবর পাওয়া যায়। একটি দেবী সরস্বতী ও অন্যটি দেবী ভবানীর। দুই হিন্দু দেবীর ছবি স্বেচ্ছায় আঁকার ঘটনাটি একজন ইংরেজ শিল্পীর পক্ষে সেই আমলে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সমসাময়িক হিন্দুদের ধর্ম, দর্শন ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু প্রতিবিম্বকেই শিল্পী তাঁর ছবির মধ্যে ধরে রাখতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। Tilly Kettle-এর মত সমসাময়িক ইংরেজ শিল্পী এদেশে থেকেও এ জাতীয় প্রয়াসের সঙ্গে কখনোই যুক্ত হননি।

আগেই বলা হয়েছে, ডেভিসের ছবিতে রামপ্রসাদকে পাথরের একটি ভাস্কর্যের প্রতিকৃতি সহ (কালীর মূর্তি, পায়ের পাশে হেলান দিয়ে বেদীর গায়ে রাখা) তাঁর সাধনপীঠে গাছের তলায় উপবিষ্ঠ অবস্থায় দেখা যায়। তাতে রামপ্রসাদ দেখতে কেমন ছিলেন তা আমরা প্রথম জানবার সুযোগ পাই। তৈলচিত্রের অবয়বের সঙ্গে তাই অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বর্ণনার কোনো মিলই লক্ষ্য করা যায় না।

ছবিটি কিভাবে রক্ষা পেল এবং লণ্ডনের মিউজিয়ামে আজও তা অক্ষত রয়েছে সে ইতিহাসও কম চমকপ্রদ নয়। শোনা যায়, ডেভিসের বউ ছিলেন বেহিসেবী। দু'হাতে টাকা ওড়াতেই তিনি অভ্যস্ত। অন্যদিকে ডেভিস কখনো কাউকে তোষামোদ করে বেশী অর্থ রোজগার করা পছন্দ করতেন না। স্ত্রীর বেহিসেবী খরচের হাত থাকায় ভালো রোজগার থাকা সত্ত্বেও বিলেতে অভাব অনটন ছিল শিল্পী ডেভিসের নিত্যসঙ্গী। ভারত থেকে ১৭৯৭ সালে ইংলণ্ডে ফিরে যাবার পর ডেভিস এই কারণেই নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হয়ে অবশেষে দেউলিয়া বলে ঘোষিত হন। সেই দুঃসময়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বন্ধু Jhon

Biddulph of Ledbury। তিনি ডেভিসকে বিশাল পরিমাণ অর্থ ধার দিয়ে বদলে তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেন। ডেভিসের বহু ছবিই এইভাবে বন্ধুর কাছে বন্ধক রাখায় তা রক্ষা পায়। জনের সাহায্যেই ডেভিস তাঁর অসমাপ্ত বহু শিল্পকর্ম সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর সেই সময়েই একইভাবে ভারতবর্ষে আঁকা হালিসহরের রামপ্রসাদের তৈলচিত্রটিও জনের কাছে গচ্ছিত থাকার ফলে রক্ষা পায়। উৎসাহী জন পরে ডেভিসের সেই সব ছবির অজস্র ভাণ্ডার নিয়ে আপন খরচে ও উৎসাহে বিশাল এক ছবির অ্যালবাম প্রকাশ করেছিলেন। রামপ্রসাদের তৈলচিত্রটির Reproduction-টিও সেই অ্যালবামে সযত্নে স্থান পেয়েছিল। শ্রীমতী মাইলড্রেড সেমিনার শেষে লণ্ডনে ফিরে গিয়ে তাঁর মিউজিয়াম থেকে রামপ্রসাদের মূল তৈলচিত্রটির একটি ছবি চম্পক চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে তাঁকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই নিবন্ধের সঙ্গে সেই ছবিটির প্রতিলিপিই প্রকাশিত। চম্পক চট্টোপাধ্যায় ঠিকই লিখেছিলেন, That Devis was contemplating something more than a simple "occupation" project is perhaps also borne art by the singular title of his work. Economy of Human life, in which he had proposed to use the portrait of Ramprasad. আর ঠিক এই কারণেই ইংরেজশিল্পী ভারতপ্রেমিক ডেভিসের রামপ্রসাদ সম্পর্কে আগ্রহ এবং এই ঐতিহাসিক তৈলচিত্র সৃষ্টি ও নির্মাণের পরিকল্পনা।

বন্দনা সান্যাল

—

সিগি উ-অপ্ সাহেব

নামটা বিদ্‌ঘুটে সন্দেহ নেই, উ-অপ্ সত্যিকারের সাহেবও নয়। 'উ-অপ্'টা Webb-এর অপভ্রংশ, 'সিগি'টা যে কিসের তা এই গল্পের শেষে না এলে বোঝা যাবে না। এই অদ্ভুত চরিত্রটি সম্বন্ধে পড়া যায় R. E. Vernede-এর লেখা ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত Blackwood tales from the out posts' নামে একটি বই-এ। বইটির প্রকাশক William Blackwood and Sons Ltd. বইটি মূলতঃ শিকারের, কিন্তু এই বিশেষ রচনাটি শুধুই শিকারের নয়। এতে রয়েছে তদানীন্তন বাংলাদেশের মফঃস্বলে সংগৃহীত কতকগুলি অমূল্য আলেখ্য। বাংলার প্রকৃতি ও মানুষ সম্বন্ধে Vernede সাহেবের কৌতূহল ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা সত্যিই লক্ষণীয়। Vernede-এর পরিচয় সম্বন্ধে কোনও খবর বইটির আগাগোড়া খুঁজেও যোগাড় করতে পারিনি : বইমেলায় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের দোকান থেকে সংগৃহীত হওয়ায় বইটি কিঞ্চিৎ ছেঁড়াখোঁড়া এবং সবগুলি পাতা স্বস্থানে নাও থাকতে পারে। সেই কারণে এই লেখায় কিছু তথ্যগত অসম্পূর্ণতা এসে পড়েছে।

Vernede সাহেব তাঁর বন্ধু এক ইংরেজ কালেক্টারের সঙ্গে তখনকার বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে প্রচুর ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর লেখা কিছুটা পক্ষপাতদুষ্ট, তাঁর সাহেব-বাঙালী তুলনামূলক মন্তব্যগুলি মাঝে মাঝে যথেষ্ট আপত্তিকর। তবে সেটাকে উপনিবেশিক মনোভাবের অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে ক্ষমা করলে তাঁর সরস টিকাটিপ্পনীগুলি নিঃসন্দেহে উপভোগ্য এবং প্রণিধানযোগ্য তো বটেই।

লেখার শুরুতেই আমরা পাই বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের বর্ণনা। গ্রামের সজলশ্যামল রূপটি সাহেবকে খুব আকৃষ্ট করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। বন্ধুর সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে যেতে যেতে চারদিকে একই রকম ধানের ক্ষেত, ধোপার কাপড়কাচা, জলের ধারে মাছের খোঁজে বকের ঘোরাফেরা দেখতে দেখতে তিনি ক্লান্ত। প্রশ্ন করছেন, বাংলার প্রকৃতি কি বদলায় না? যতই চলা যাক, যেখান থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল, কয়েক ঘণ্টা পরেও মনে হয় সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি! তাহলে, ইংরেজ টমিরা কি করত, যখন তারা এরকম সব রাস্তা ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মার্চ করে যেত? কার মুণ্ডুপাত করতে করতে এগোতো তারা? এখন না হয়

রেলপথ হয়েছে, তারা ট্রেনে চেপেই যাতায়াত করে। এখন এ সব পথে ধুলো উড়িয়ে চলাফেরা করে 'নেটিভ'রা। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে উটের সারি। বিশেষ করে মুসলমানদের পরবের সময় কোরবানির জন্যে আনা প্রচুর উট চোখে পড়ে। ঘোড়ায় চেপে চলেছেন দুই সাহেব, আর এসব দেখছেন, ভাবছেন, আলোচনা করছেন। হঠাৎ চোখে পড়ল এক জমিদার বাড়ির দেউড়ির ফাঁক দিয়ে একটা সদ্যজাত হাতির বাচ্চা আর তাকে ঘিরে ছোটখাট এক জনতা। কৌতূহলী সাহেবরা ঘোড়া থেকে নেমে সেখানে ঢুকে পড়লেন। মুসলমান জমিদার তাঁদের সাদর সম্বর্ধনা জানালেন। তার লম্বা দাড়ি, শান্ত মুখমণ্ডল—দেখে মনে হয় কোনও ইহুদী ধর্মযাজক। এরপর Vernede-এর মন্তব্য 'পরে শুনলাম লোকটা ডাকাতের সর্দার আর প্রচণ্ড অত্যাচারী। দেখে কি বোঝা যায়!'

আবার যাত্রা শুরু। এবার হঠাৎ প্রকৃতির পট পরিবর্তন হল। পথ ক্রমশ উঁচু হচ্ছে, সামনে নিশ্চয়ই পাহাড়! দুই বন্ধু উৎসাহিত হয়ে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিলেন। দেশের কথা মনে পড়ে গেল বোধহয়। এখন আর বাংলার প্রকৃতিকে এক ঘেয়ে লাগছে না। হঠাৎ কালেক্টারের 'বাই জোভ্, দেখতে পাচ্ছ?' এই বিস্ময়বাচনে সামনে তাকিয়ে লেখক দেখলেন সত্যিই পাহাড়। বেশী উঁচু নয়, তবু পাহাড় তো!

ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে গিয়ে দেখলেন সুন্দর ডাকবাংলো। বারান্দায় বেতের আরাম কেদারায় জাঁকিয়ে বসে কালেক্টার চায়ের ফরমাশ করলেন। Vernede ততক্ষণে চারদিক দেখে নিচ্ছেন। নীচে চোখে পড়ছে 'নাহারুদা' নদী (এটি কোন নদী ঠিক বোঝা গেল না), তার পেছনেই গভীর জঙ্গল। এই নদীর বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক বাঙালীর চরিত্র সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করছেন। নদীর জল চড়ায় বাধা পেয়ে বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে গেছে। বাংলার নদী আর বাংলার লোকচরিত্রে নাকি অদ্ভুত মিল। সহজেই চড়া পড়ে যায় আর ধারা পরিবর্তন করে। একমাত্র ইংরেজই নাকি তাদের পথ কেটে একটি খাতে প্রবাহিত করতে সক্ষম। Vernede এর ভাষায়—

> "Bengal rivers are not unlike Bengal men, and if the Englishman wishes either to keep to one channel, he must dig it for then, removing all hindrances from start to finish. But this is to moralise, even as a 'Babu' might."

এরপর লেখাতে আসছে কয়েকটি মজার চরিত্র—এক সাব ইন্‌স্‌পেকটার, এক খিদ্‌মদ্‌গার, একজন বাঙালী মাস্টার মশাই এবং পরিশেষে উ-অপ্ সাহেব। প্রথম তিনটি চরিত্রের দরকার উ-অপ্ চরিত্রচিত্রণের উপক্রমণিকা হিসেবে, যদিও তাদের পৃথক বিশেষত্বও আছে।

বাংলোর বারান্দায় বসে তো কালেক্টার সাহেব সেখানকার সাব-ইন্‌স্‌পেক্টারকে তলব করলেন খাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে, ওখানে শিকার কেমন মিলবে এই সব জানতে। Vernede পাশে বসে সব শুনছেন। লোকটি প্রায় সব প্রশ্নের উত্তরই নেতিবাচক দিচ্ছে দেখে তিনি মনে মনে বল্লেন: 'এ ব্যাটা হয় কিস্যু জানেনা, নয়তো যেটুকু জানে তা পেটের মধ্যে রেখে দেওয়াই পছন্দ করে।'

ডিনারে মুরগী পাওয়া সম্বন্ধে সে কোনই আলোকপাত করতে পারল না। কালেক্টার তবু জোর করতে লাগলেন,

'কিন্তু শিকার নিশ্চয়ই ধারে কাছে আছে? হাঁসটাসও নেই?' (Vernede বারান্দা থেকেই দু'টি মোটাসোটা 'ব্রাহ্মণী ডাক্'কে নদীর জলে সাঁতার দিতে দেখতে পাচ্ছিলেন)

'আমার মনে হয় না, স্যার।'

'বাঘ? প্যান্থার?'

'মনে হয় না।'

'আশপাশের বাবুরা কেউ শিকার করে না?'

'মনে তো হয় না।'

ডাকবাংলোর চৌকিদার বা খিদ্‌মদ্‌গারটি ওখানেই ঘুরঘুর করছিল কিছু বলার জন্যে। এবার সে সাব-ইন্‌স্‌পেক্টারের দিকে তাচ্ছিল্যভরে তাকিয়ে বলল, 'সাহেব যদি আজ্ঞা দেন তো বলি, এখানকার জঙ্গলে মেলাই শিকার পাওয়া যায়। এখানে একজন ভাল শিকারীও আছে।'

কালেক্টারের মুখ এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কে সে?'

'উ-অপ্ সাহেব'।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—সিগি উ-অপ্ সাহেব। সে মেলাই চিতাবাঘ মেরেছে' এবার সাব-ইন্‌স্‌পেক্টারটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল। খিদ্‌মদ্‌গার দিব্যি ভাল ভাল কথা বলে সাহেবের মন জয় করে নেবে, এটা তার সহ্য হ'ল না। এবার মন্তব্য:

'এমনিই করে বাঙালীরা। যেই দেখবে অন্য কেউ বড় সাহেবকে বাগ মানিয়ে ফেলছে, ওমনি এগিয়ে এসে যা হোক কিছু একটা বলে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করতে চাইবে, অন্য লোকটিকে অক্লেশে ল্যাং মেরে।'

কালেক্টার কিন্তু তাকে মোটেই পাত্তা না দিয়ে খিদ্‌মদ্‌গারের কাছেই জানতে চাইলেন, 'উ-অপ্! সে আবার কেমন নাম? কোনও সাহেবের আবার এরকম নাম হয় নাকি!' তিনি লোকটিকে বললেন খোঁজখবর করে উ-অপ্‌কে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে।

ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে সাবইন্‌স্‌পেক্টার তাড়াতাড়ি মুরগীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নিজের দর বাড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু সাহেবরা তাকে আর বিশেষ পাত্তা

না দিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা আরম্ভ করায় সে মনে মনে খিদ্‌মদ্‌গারের মুণ্ডুপাত করতে করতে কেটে পড়ল।

কালেক্টার তখন বন্ধুকে এইসব নেটিভ চরিত্র সম্বন্ধে কিছু ওয়াকিবহাল করতে চাইলেন। বললেন,

'এদের বোঝা খুব মুস্কিল, বুঝলে হে? লোকটা হয় কিছুই জানেনা, নয়তো জেনেও চেপে যাচ্ছে। হয়তো ভাবছে বাঘের খবর পেলে আমরা দু'টো দিন থেকে যাব আর সেই ফাঁকে গ্রামের লোক আমার কাছে এসে ওর নামে লাগাবে। কিম্বা যদি জমিদারের সঙ্গে ওর ঝগড়া থাকে, জমিদার নির্ঘাৎ এসে বলবে ও ঘুষ খায়।'

এবার Vernede জানতে চাইলেন উ-অপ্‌ সাহেবটি কে হতে পারে।

কালেক্টার বললেন,

'এখানে বছর পঞ্চাশ আগে একটা বৃটিশ্‌ ক্যান্টনমেন্ট ছিল বটে কিন্তু এখন আর ধারেকাছে কোনও সাহেব আছে বলে তো আমার জানা নেই।'

'সেই তো! তাছাড়া 'সিগি' কখনও কোনও ক্রিশ্চান নাম হতে পারেনা।'

এবার সব জল্পনা-কল্পনার অবসান করে এসে গেল স্বয়ং উ-অপ্‌ সাহেবের একটা চিঠি। খিদ্‌মদ্‌গার ইতিমধ্যে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকবে। চিঠির বিচিত্র ইংরেজী পড়ে দুই বন্ধুর চক্ষু চড়কগাছ। চিঠিটা এই রকম:

"I have the one-ar inform you that

"Sir,

"Pleas let me know that you wish go out for shooting or not, if you wish to go then what time

"I get a khubber for a panther cloce near cross the re ve-ar side, I hope the you get it tomorrow.

Your most obduntly,

C. G. WEBB

সাহেব পরম বিস্ময়ে বলে উঠলেন,

'এ কি রকম ইংরেজী? এ কেমন সাহেব? অবশ্য চিঠি লেখার স্টাইলে জায়গায় জায়গায় কিছু সাহেবী ধাঁচ আছে বটে। লোকটি কি তবে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান?'

এখানে লেখক প্রসঙ্গত এদেশের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের অসহায় অবস্থার কথা লিখছেন,

'যে সব সাদাচামড়া এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে তাদের সম্বন্ধে এরা একটা সঙ্কোচমিশ্রিত দূরত্ব বোধ করে। হয়তো ভাবে এদেশে থেকে গিয়ে এরা স্বদেশের

প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আবার এদেশও তেমনভাবে এদের গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে, জীবন যেন এদের কাছে নিরাশার এক অতল গহ্বর। এদের উচ্চাশা, আত্মসম্মান কিছুই যেন থাকতে নেই। স্বজাতির সঙ্গে মেলামেশা, বন্ধুত্ব, স্মৃতিচারণ, স্বপ্ন দেখা—এসবই যেন এদের কাছে অতীত।'

এবার বর্ণনায় সশরীরে অবতীর্ণ হ'ল উ-অপ্‌ সাহেব। সে এলে সাহেবরা দেখলেন এ একেবারে পুরোপুরি 'কালা আদমী'—বাঙালীদের মতই ছোটখাট, কিন্তু পোশাকটা সাহেবী। মাথায় সোলার টুপি, পরনে নিকারবোকার, সাদা জ্যাকেট, পায়ে পট্টি। পোশাকটা একসময় সাদা ছিল হয়তো। কিন্তু এখন একেবারেই ধূলিধূসর। কতদিন ধোপার মুখ দেখেনি কে জানে! লেখকের হঠাৎ মনে হল—ওর গায়ের রংটাও ময়লা জমে কালো দেখাচ্ছে না তো? তিনি কাছে গিয়ে ভাল করে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন—এ একেবারে নিখুঁত ভারতীয় কালো। কিন্তু লোকটির মুখে এমন একটা চন্‌মনে ভাব আর হাবভাবে এমন একটা 'থোড়াই কেয়ার করি' ভাব যে একে পুরোপুরি এদেশী ভাবতেও মন চায় না। লেখকের মন্তব্য:

'বাঙালীদেরও মাঝে মাঝে এরকম চন্‌মনে দেখায় বটে, আর যারা তাদের চেয়ে মানে ছোট তাদের সঙ্গে ব্যবহারে তো রীতিমত উদ্ধত। কিন্তু বাঙালীরা অনেক সাবধানী, সবসময় খেয়াল রাখে যাতে নিজের কোনও ক্ষতি না হয়। এ লোকটিকে কিন্তু দেখে মনে হ'ল এর কিছুতেই কিছু আসে যায় না।'

কালেক্টারের সঙ্গে উ-অপের অনেক কথাবার্তা হল। তাঁর মনে হল সে এ অঞ্চলের বাঘ মেরে সাফ্‌ করে দিয়েছে। তবে সে জন্যে তার কোনও দম্ভ নেই। তার সঙ্গে এসেছেন একটি মোটাসোটা বাঙালী স্কুল মাস্টার। তিনিও প্রায় একই রকম বিচিত্র ইংরেজীতে উ-অপের শিকার দক্ষতার বর্ণনা দিতে লাগলেন। তাঁর সম্বন্ধে লেখক বলছেন:

'আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনা বাংলাদেশে স্কুল মাস্টারের ভূমিকাটা কি। সবসময় দেখছি এঁরা সাহেব দেখলেই পড়ানো ছেড়ে তাদের পেছন পেছন ঘোরেন। সে সময়টা কি ছাত্রদের বাড়ীতে পড়া শিখে নিতে বলেন? কিন্তু কেন? এঁরা কি সাহেবের সঙ্গে মিশে দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত করতে চান নাকি ইংলিশ-ইডিয়ম শেখার তাল করেন? এঁরা বোধহয় ভাবতেই পারেন না আমাদের কথাবার্তা ঠিক The cat eats rat. The cat is not a bat—এই লাইনে চলে না।'

উ-অপ্‌ ঐ মাস্টারমশাইকে বিশেষ পাত্তা না দিয়ে কালেক্টার সাহেবের সঙ্গেই জঙ্গল বিষয়ক কথাবার্তা শুরু করল। ঠিক হল পরের দিন সকালেই শিকারে বেরোন হবে। এবার কালেক্টার এত বড় শিকারীর বন্দুকটা একবার দেখতে

চাইলেন। সে তাচ্ছিল্যভরে যেটা দেখাল সেটা একটা নেহাৎই দেশী গাদা বন্দুক।

সাহেবরা তো অবাক!

শিকারের জন্যে পরের দিন দু'টো হাতি নেওয়া হবে ঠিক হল। কিন্তু সকাল-বেলায় একটি হাতি বাদ সাধল। তার মাহুত বলল, একটা পা জখম তাই শিকারে বেরোতে পারবে না। সে হাতিকে হাঁটিয়ে দেখিয়ে দিল কেমন তিনপায়ে হাঁটছে। সাহেবদের তো খুব মন খারাপ। তখন উ-অপ্ একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, মাহুতটা বদমাশ, ওর নিজেরই যাওয়ার ইচ্ছে নেই তাই ওরকম বলছে। সে সাহেবকে একটা কিছু শিখিয়ে দিল। এবার সাহেব মাহুতকে বললেন—তুমি ওর পিঠ থেকে নেমে ওদিকে গিয়ে দাঁড়াও। মাহুত সরে দাঁড়ালে বল্লেন এবার ওকে তোমার কাছে ডাক। হাতি এবার দিব্যি চার পায়ে হেঁটে চলে এল। আসলে মাহুত হাতির পিঠে বসে সাঙ্কেতিক চাপ দিয়ে তাকে খুঁড়িয়ে হাঁটাচ্ছিল। হাতিকে যা শেখান যায় সে তেমনি করে। সাহেবরা এই ঘটনাটি খুব উপভোগ করলেন।

এইবার শুরু হচ্ছে শিকারের বর্ণনা। ট্র্যাকিং শুরু হল—এতে নতুনত্ব কিছু নেই। তবে কিছু মনমুগ্ধকারী ভারতীয় জঙ্গলের কথা আছে। সেই গভীর জঙ্গলে সারাটা সকাল ঘুরে কাটিয়ে দিলেন সাহেবরা, শিকার কিছু পেলেন না। কিন্তু সাহেবরা পরম বিস্ময়ে শিকারী হিসাবে উ-অপ্-এর তৎপরতা লক্ষ্য করে চললেন। লোকটা শুধু দুঃসাহসী নয়, বেপরোয়া—নেকড়ের গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিতেও ভয় পায় না। জঙ্গলে অনেক ঘুরে সাহেবরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, আর বাঘের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন, তখন হঠাৎ উ-অপ্ নিষ্পৃহভাবে বলে উঠল 'প্যান্থার'। বলে কিন্তু সে গাদাবন্দুকটা কোলের উপরে ফেলে রেখে তেমনি অলসভাবেই পা ঝুলিয়ে হাতির পিঠে বসে থাকল যেন দু'জন নব্য শিকারীর ছটফটানিটা বেশ উপভোগ করছে পোড়খাওয়া এক দক্ষ শিকারী। ওকে লক্ষ্য করে Vernede-এর মনে হল 'এ যেন একজন চটপটে তরুণ ইংরেজ বনরক্ষী—এই জঙ্গলের উপর যার প্রশ্নাতীত প্রভুত্ব।'

এইবার গর্জন করে প্যান্থারটি সত্যিই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। মুহূর্তের মধ্যে জায়গাটা মাহুতের চিৎকারে, হাতির দাপাদাপিতে, জঙ্গলের আলোড়নে একটা রণক্ষেত্রের রূপ নিল। উ-অপের মাহুত চিৎকার করে বাঘটাকে দেখিয়ে দিলেও সে তেমনি নিরাসক্তভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকল। পরমুহূর্তে তার হাতি চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল, বাঘটা উ-অপের পা লক্ষ্য করে দিয়েছে এক ঝাঁপ। সাহেবরা চেঁচিয়ে উঠলেন—সামলে!! বাঘটা কিন্তু উ-অপের পাটা ধরতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল আর তাঁর গুলি খেয়ে মরল। এবার উ-অপ্ তেমনি উদাসীন ভাবে বলল, 'আমি জানতাম বাঘটা খোঁড়া, ঠিকমত লাফাতে

পারবে না।'

এবার সাহেবদের কৌতূহল আর বাগ মানল না। বিচিত্র নামের অধিকারী এই বিচিত্র মানুষটির সম্বন্ধে জানবার জন্যে বাড়ী ফিরেই তাঁরা স্কুল মাস্টারটিকে তলব করলেন।

সংগৃহীত তথ্য থেকে তাঁরা জানলেন সিগি উ-অপ্-এর বাবা ছিলেন একজন ইংরেজ টমি। কোন কারণে এই গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। বড় সিগি উ-অপ্ সিপাহী বিদ্রোহের সময় পাহাড়ী উপজাতিদের বিরুদ্ধে লড়াই জিতে ইংরেজ সরকার বা কোনও মহারাজার কাছ থেকে পুরস্কার স্বরূপ পাহাড়ের উপর এক টুকরো জমি পেয়েছিলেন। পাহাড় পছন্দ হয়নি বলে সেটা বদলে এই সমতলে জমি নিয়ে বাড়ি করেছিলেন। এখানে বৃটিশ ক্যান্টনমেন্টে তাঁর কিছু চেনা লোক থেকে থাকবে। তারা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেলেও সেই প্যারেড গ্রাউণ্ড, কর্নেলের বাংলো আর তাঁবুর খুঁটিগুলো দেখে বড় উ-অপ্-এর হয়তো অনেক কথা মনে পড়ে যেত—যুদ্ধে বিউগ্‌ল্-এর আওয়াজ, বন্ধু সৈনিকদের গাওয়া দু'-একটা গানের কলি। রণক্লান্ত উ-অপ্ এখানে জমির মালিক হয়ে বসে নিশ্চিন্তে সেসব কথা ভাবতেন। ইংল্যাণ্ডে থাকতে জমিদারের বাগানে খরগোস চুরি করে মারার জন্যে কতই না হেনস্থা হয়েছে। এখানে তিনি নিজেই ছোটখাট জমিদার। এখানে সারারাত শেয়ালের ডাক আর বড়মিঞাদের চলাফেরা। মাঝেমাঝেই তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করতেন। অবশ্য পরে কোনও একটি কালো মেয়েকে বিয়ে করে এখানে ভালই কাটিয়ে গিয়েছেন জীবনটা। কোথায় সেই কালো মেয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল তা কল্পনা করে নিতে Vernede-এর কোন অসুবিধে হয়নি। মেয়েটি হয়তো জল আনতে যাচ্ছিল, আর তার কাঁখে কলসী নিয়ে হাঁটার ছন্দ সাহেবকে আকৃষ্ট করেছিল। কুয়োর পাশে দাঁড়িয়ে নিজের ভাষাতেই তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন 'আমি কি তোমার জল তুলে দিতে পারি?' এ ভাষা বুঝতে কোন মেয়েরই অসুবিধে হয়না। টগ্‌বগে যুবকের দুষ্টুমিভরা চোখ সহজেই মেয়েটিকে কাছে ডেকেছিল। চলে যাওয়ার সময় সে বলেছিল, 'আবার এস!' সাহেব ফিরে এসেছিলেন এবং তাকেই বিয়ে করেছিলেন। তাঁদেরই সন্তান আজকের এই সিগি উ-অপ্। Charles Godfrey Webb না কি Christopher George Webb—আসলে নামটা কি? এসব নিয়ে জুনিয়র উ-অপ্-এর কোন মাথাব্যথা নেই। মৃত বাবা-মাকে সে হয়তো মনেই রাখেনি। শুধু বাবার নাম থেকে গেছে আর থেকে গেছে তার বাবার পরনের সেই টুপি, পট্টি, জ্যাকেট আর একটা পুরোন গাদা বন্দুক।

সুমিতা চক্রবর্তী

—

অমিতাভ গুপ্তর কবিতা

একটি পূর্ণ ঐশ্বর্যময় লিরিক কবিতার লক্ষণ কী হওয়া উচিত? প্রধানত কবির উপলব্ধির অন্তরতম তলের উন্মোচন। সেইসঙ্গে রূপ-নির্মিতির জন্যে চাই কল্পনা; আর চাই উপলব্ধির বহিরাশ্রয়। সেই বহিরাশ্রয়ের বৈচিত্র্যের যেমন শেষ নেই, তেমনি আবার কয়েকটি আদিরূপকল্পও ফিরে ফিরে আসে কবির কল্পনায়। কবি-কল্পনার পরিসর তার মাটি ও আকাশ একই সঙ্গে স্পর্শ করে সেই আদিরূপকল্প-গুলির সাহায্যেই। বেদসূক্ত রচয়িতা কবির চোখে সূর্যের উদয় আর উষার অন্তর্ধানের দৃশ্য পশ্চাদ্ধাবনকারী প্রেমিক পুরুষের কামনার কর-প্রসারণ থেকে চিরকালীন পলাতকা অঙ্গনার মতো দেখিয়েছিল। দৃশ্যটিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল নিসর্গরূপের সঙ্গে মানবীয় আকাঙ্ক্ষার মিলন। উপরন্তু উপলব্ধি কল্পনা আর অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত সময়-প্রবাহের অন্তর্গত এক অন্তহীন আততিও ধরা আছে এই বেদসূক্তে। চির-আকাঙ্ক্ষিত কোনো অপ্রাপনীয়কে অবিরাম অনুসরণের ইতিহাস। এই সময়-চাপের চতুর্থ মাত্রাটির সংযোজনেই বিকশিত হয় অস্তিত্বের পূর্ণ অবয়ব। গড়ে ওঠে রূপবান বাক্‌শিল্প।

লিরিক কবিতার আকার খুব বড় হয় না। কিন্তু তার দ্যুতিবৈভব উদ্ভাসিত হয় এই সর্বমাত্রিক সংশ্লেষের ফলে। অমিতাভ গুপ্তর 'দশটি কবিতা-চতুর্মাত্রা'-র অন্তর্গত ছোটো কবিতাগুলিতে এই সংশ্লেষ দুর্লক্ষ্য হবে না।

জীবন সম্পর্কে মননী মানুষের ঐকান্তিক উপলব্ধি শেষ পর্যন্ত এ-ই হয়ে দাঁড়ায় —জীবন বাঁচারই যোগ্য, বহু দহনের পরেও। তাই কবির উপসংহার-কবিতার অন্তিম দুই পঙক্তি—"দ্বিধা বিদীর্ণে ক্লান্ত দিনের / শেষে যেন প্রাণ প্রাণের আগুনে সাজে।" বহিরাশ্রয় রূপে কবি মূলত গ্রহণ করেছেন সেই আদি-মাতৃকা নিসর্গকে। যার বুকে মানুষের চোখ মেলে চাওয়া, যার বুকে মানুষের আত্মলালন, যার বাধা জয় করবার সংকল্পে মানবসভ্যতার অগ্রগতির বীজবপন, যার মোহন-ভয়াল রূপ দর্শনে মানুষের মনে প্রথম কবিতার জন্ম। 'মাতা ও মৃত্তিকা'-র কবি অমিতাভ গুপ্ত খুব স্বাভাবিকভাবেই এই আদি উপাদান ছেনে কবিতার রূপ নির্মাণ করেছেন। নদী, আকাশ, নক্ষত্র, জপাকুসুমসংকাশ সূর্য, ঝড়, ফুল, পাতা,

পাথর, বজ্র—এই দিয়েই গড়া তাঁর কবিতার বাক্‌-প্রতিমাসমূহ। প্রতিমাগুলিকে ঘিরে আছে সময়ধারার এক চলমান চালচিত্র। নদীর স্রোত, ঝড়ের গতি, অনন্ত ধাবমান পথ আর প্রধানত ঋতুচক্রের ইঙ্গিতে অভিব্যক্ত হয়েছে সেই গতিমান কাল। রৌদ্র-দহন-অন্তিক এবং আসন্ন আশ্বিন নীলাভার মধ্যবর্তী আষাঢ়-শ্রাবণ মাসকেই কবি প্রাধান্য দেন। সম্ভবত বর্ষণ-ধারা-নিহিত, প্রাণ-সম্ভাবিত উর্বরতার কারণেই। 'অনিশ্চয় জীবন' কিভাবে কখন সেই প্রাণস্পর্শে পূর্ণময় হয়ে ওঠে দহন ও বর্ষণ, জল ও আগুনের পরম মিলনে—তারই অনুভব-গানে গুঞ্জরিত এই চূর্ণ কবিতা-গুচ্ছ। পাঠক এ-ও দেখতে পাবেন—চিত্রকল্প, ছন্দ ও অন্ত্যমিলের রূপকৃতি এ-কবিতায় বহিরাবরণ নয়, অন্তর-রূপেরই উদ্ভাস।

অমিতাভ গুপ্তর দশটি কবিতা

১. কবিতাচতুর্মাত্রা

ভাঙাঝড়ের শেষে
আমরা যখন এসে
হারিয়ে গিয়েছিলাম সে কোন্ নিরুদ্দেশের দেশে

রাঙাঝড়ের আগে
কুড়িয়ে নিয়েছিলাম
ছিন্নপাতায় সাজানো অভিরাম

কে জাগে? কে জাগে?
এবার শ্রাবণ
কার মনে আজ বিদ্রোহে উন্মন

২. ভূমিকার পরে

এসেছ দহন মহাশ্রাবণের মতো
এসেছ শ্রেষ্ঠ জ্যৈষ্ঠের সব ক্ষত

এবার ছুড়িয়ে দিতে
এবার জীবন, দিগন্ত, মাঠ অর্থান্তরে নিতে
পথ চিনে রাখা অপূর্বে, চিহ্নে

৩. সামান্যলক্ষন

যদি বল
এই রাতের গভীর
হবে নক্ষত্রোজ্জ্বল

যদি রাখ
তবে নদীর দু'তীর
সমস্ত নির্বাক্

নিয়ে যাক
শুধু তরঙ্গদ্যুতি
প্রাণের আড়ালে থাক্

৪. প্রতিজীবিত

কখন হয়েছে সার্থক প্রতি প্রতিজ্ঞা, আর্ত
প্রতিটি প্রশ্ন, আভাসের
চেয়ে যা স্পষ্টতর মিলেছে সে' উত্তর
তাকে যদি ভালো না-বাসে
রৌদ্রদহন মুক্তি শুধু কোনো মৃদু উক্তির
মতন দীর্ঘশ্বাসে

একটি আকাশ নিয়ে একটি আকাশ দিয়ে
চলে যাব অনায়াসে

কবিতা চতুর্মাত্রিক ধ্বনিতীর্থের যাত্রী
আমি তাই অস্থির

পথের প্রতিমাটিকে সাজিয়েছি চারিদিকে
যে-পথ চলেছে পথহারা উচ্ছ্বাসে
সে, প্রতিফলন থেকে আবার উঠেছে ডেকে
শ্রাবণ অগ্নিভাষে

রাঙাধুলোভরা পথটি এখন জপার মতন কুসুমের সঙ্কাশে

৫. রক্ষণ

কীভাবে কখন
একটি জীবন
হয়েছে পূর্ণময়

আমারই মতন
সেও যে অনিশ্চয়

৬. উদ্ভাস

আবার কখনো শ্রাবণকথারই মতো
মেঘ হয়েছিল সংকেতমৃদু-নত
আবার কখনো অভিমানে ম্লান বৃষ্টি
নিয়ে এসেছিল তোমার নদীর দৃষ্টির
মতন কাজলে মহাঅশ্রুর ব্রত

৭. জীবিত

কোথায় হারাবে তোমার জন্মদিন
কোন্ আষাঢ়ের মতো মেঘার্ত ঋণ
যদি মুছে যায় অশ্রুর কৌতুকে

তবুও আবার আসন্ন আশ্বিন
অপেক্ষাতুর যে-নীলসিন্ধুবার
আকাশে আকাশে ছড়ালো মুক্তি তার

দুয়ার কী খুলে দেবে না এই আষাঢ়
শ্রাবণের মতো প্রত্যাশা-উৎসুকে
তীব্র ছড়িয়ে দেবে উপসংহার

তখন আবার ঝর্নার নির্ঝরে
জাতবেদা, সেই কথা যদি মনে পড়ে
জন্মদিনের মতো প্রতি ঋতুরীতি

যা ছিল নিঃস্ব পাথরের অনুধৃতি

৮. প্রিয়

আবার ক্ষিপ্র সন্ধ্যায়
একটি অসম্পূর্ণ
আমার আমিও ভেসে যায়

যেন তরঙ্গসন্ধ্যায়
নিষ্ঠুর নদীচূর্ণ

৯. প্রিয়তম

যখন গহন ঝড়ের মতো
প্রত্যাহত
তখনো বিস্ময়

বজ্র দিয়েই বজ্র গড়া হয়

এবং একটি কুসুমরত
ক্ষীণ কামনী
রাত্রিযামিনীর

সুগন্ধে আর সব নিভৃতে ছড়িয়ে দিল জয়

১০. উপসংহার

শুধু এ জীবন ছিল প্রত্যাশাহীন
তাকে নিয়ে বাঁচে
সামান্য চিরদিন

তবু মহাযুগ যুগান্তরের কাছে
সব প্রত্যাশা আছে

দ্বিধাবিদীর্ণে ক্লান্ত দিনের
শেষে যেন প্রাণ প্রাণের আগুনে সাজে

মল্লিনাথ গুপ্ত

—

কাজল চক্রবর্তীর কবিতা

কাজল চক্রবর্তী—এই নামটির সঙ্গে পরিচয় নেই এমন কবিতামনস্ক পাঠক পশ্চিমবঙ্গে আছে কিনা সন্দেহ। "সাংস্কৃতিক খবর" নামে একটি উভয়-বঙ্গ (বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ) পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে দীর্ঘকাল তিনি জড়িত। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় বাংলাদেশের সমস্ত কবি ও পাঠকসমাজের কাছে তার ব্যাপক পরিচিতি।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় তার কবিতা ও কবি-সম্ভাবনা নিয়ে তেমন লোক-লোচন আলোচনা হয়েছে খুব কমই। সম্ভবত কাজল নিজেও কবিতার জন্য যে পৃথিবী-এড়ানো সর্বস্বপণ একাগ্রতা দরকার তা আয়ত্ব করতে পারেননি এখনো।

অথচ তার প্রত্যেকটি কবিতা এক তীব্র আবেগে সিঞ্চিত, প্রকাশভঙ্গী একেবারেই নিজস্ব, কোন কোন জায়গায় অভিনব। শব্দ ব্যবহারে 'পড়ো বাড়ি আর ঝড়ো হাওয়া' বা শিলীত শব্দের সঙ্গে ব্রাত্যশব্দ সবই তিনি মেলাতে পারেন অবলীলায়। একই সঙ্গে মিতকথনের সঙ্গে অতিকথন এখনো শব্দে উঁকি দেয়। তবে এই সবই তার বাহিরদুয়ার। কাজলের কবিতার অন্দরমহলে এক খাঁটি, অনুভববেদ্য বিচ্ছুরণ তাকে প্রকৃত কবি বলে চিনিয়ে দিতে ভুল করেনা। কিছুদিন আগে সাতমাত্রায় রচিত তার একটি দীর্ঘ কবিতা পড়েছিলাম। ৭০-৭২ সালের সেই সন্ত্রস্ত দিনগুলির কথা কি অপরিসীম মমতায়, কি গহন সহানুভূতিতে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, তার বয়সের কোন কবির কলমে একই সঙ্গে এমন মেধাবী ও অশ্রুসঞ্চারী লেখা আমি খুব বেশি পড়িনি। তবু মনে হয় তিনি মাঝে মাঝেই কবিতার আবহ থেকে কেন জানি সরে আসেন। যে নিরন্তর অনুশীলন, যে সর্বস্বপণ জেদী দাম্ভিক আত্মক্ষরণ কবির অবশ্যকৃত্য—তা মাঝে মাঝে তার মধ্যে পাইনা। এটা কিন্তু ঠিক অভিযোগ নয়, আমাদের অর্থাৎ পাঠকদের এক ধরনের হতাশা। অবশ্য এও আমরা জানি যে একজন কবি যখন কবিতা রচনা করেন সেই মুহূর্তেই তিনি শুধু কবি, অন্যান্য সময় তিনি সামাজিক মানুষ। সমাজের ব্যবহারিক লাভ, ক্ষতি, প্রয়োজনের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে পড়তেই হয়। তবু একসময় আলাদা হয়ে শুধু একার হয়ে যেতেই হয় কবিকে। এই একা হতে পারাটাই কবিত্ব। শব্দসার্থক কাজলের একা হবার প্রয়োজনটা সম্ভবত একটু বেশি।

কাজল চক্রবর্তীর তিনটি কবিতা

আর এক উৎসবের দিকে

যদি এমন হতো—ওই গাঁটছড়া
এই গার্হস্থ্য—এই ছকের জীবন
ছেলেকে কাথা পাল্টে শোয়ানোর পর মাঝরাতে
একটু অবসরে একান্ত সময়কে কুচি কুচি ছেঁড়া
মাসান্তে বাড়ি ভাড়া, টেলিফোন-ইলেকট্রিক—
মেয়ের স্কুলের মাইনে—এইসব হিসেব
সপ্তর্ষির আলোকে এবং প্রখর অন্ধকারে
আশার আঙুল অজস্র গ্যাস বেলুনের মত
আকাশে ছড়ায়—তাদের গমনরেখা ছুঁয়ে
আরেক উৎসবের দিকে যদি একদম না যেতাম
তাহলে কি জীবনের ফেলে আসা
সবকিছু পরিশ্রম নষ্ট হয়ে যেত!

ভালোবাসায় না ডুবে গেলে
ওই চাঁদ যাকে নিয়ে লোফালুফি করতে করতে আমরা
নিজেদের আলোয় ভরাতে চেয়েছি
আরো দূরে ওই সব তারাদের
যাদের প্রায়শই বিভিন্ন নামকরণে
ব্যক্তিগত করে ফেলেছি—
এ যে ক্রমশ গড়ানো-ভালোবাসায়
স্মৃতি-বিস্মৃতির ফাঁকে উঁকি মারে যাদের মুখ
জোনাকিরা যারা বুড়ির বাগানে
সারারাত ঘোরাফেরা করে
হয়তো তাদের জন্য আমার লোভ ছিল দু'চোখে
দেয়ালঘড়িকে বড় বেশি হিংসে করে ফেলি আজ
করি রবাহুত বামাকণ্ঠের টেলিফোন
অথবা যখন নিজের জগতে ডুবে থাকো
তোমার ভেতরের অজগর আমাদের দিকে ধেয়ে আসে
ইচ্ছে করে, হ্যাঁ, ভীষণ ইচ্ছে করে

লণ্ডভণ্ড করে দিই সব –
ধুয়ে যাক, ধ্বংস হোক এই সব
কমবেশি লোক-চেনাচেনির অ-সভ্য জীবন যাপন

অবস্থা এখনো জটিল হয়ে ওঠেনি
যে ব্যর্থতাই ধ্রুব এবং অনিবার্য হয়েছে সর্বস্তরে
এখনো যুবক বয়েস ফুলময়-ফলবতী হয়
স্থিত হ'তে বলাটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ বোকামি
শনি ও রাহুকে ঠেকাতে যারা পাথুরে হবে হয়ে যাক
এ সমাজ আমাদের। মাঝে মধ্যে বৃষ্টি আসুক
ধুলো ধুয়ে ধুয়ে নেমে যাক যেখানে যাবার,
পরিস্রুত হোক মাধুকরী জীবন যাপন
দরজা-জানালা খুলে দেব গভীর নিষ্ঠায়
আর কোন তন্ত্র নয় মন্ত্র নয়, এমনটি প্রয়োজনহীন
ওই সব ধাতুর ঝংকারময় অদৃশ্য বাঙ্কার
ভেসে যাবে বৃষ্টিপাতে –
ছায়া-রোদের প্রাচুর্য আর সম্পন্নতা নিয়ে
বাঁচবে আত্মজা।

কাহিনী

চিবুক বেয়ে নেমে আসা ঢালে
মাটি ও সূর্য বারবার বদলে নিচ্ছিল অবস্থান
হ্রদ ও পর্বতময় ওই দেহে এত প্রত্নবিষ !
প্রকাশ্য সমাবেশে শরীর ও শুঁয়োপোকা
কিসের প্রতীক্ষায় আজো নিজ ধর্মে-লীন···

আমাদের স্বপ্নলালিত সেসব শিশুরা
গতির পশ্চাৎগামী স্থির বিন্দু কেন !
আর তোমার একান্ত বর্তমান রাত যে পুরুষের
অথবা ক্ষমতার কাছে বন্দী হয়ে আছে
বলো তাকে কোন গণতন্ত্র ভালোবাসা শেখাবে ?

মিছিলে মিছিল গমনকারী
সোঁদা-গন্ধ ও ক্ষমতার পুঁজরক্ত বেয়ে
বারবার পিছলে পড়ছে যে অনুজ কমরেড
বলো তাকে কোন দক্ষতায়
পুরুষের রৌদ্রছায়া দেখাবো !

তুমি নারী, তুমি মুক্তি, তুমি বারবার
আমার আঙিনা থেকে
উড়িয়েছো জোড়া জোড়া সুখ
আকাশকে লালন করেছ তোমার গর্ভে
প্রকৃতিকে তোমার শরীরে,
সভ্যতা তার মাতৃযোনি ছুঁয়ে
এসেছে তিন ভাগ জলের পৃথিবীতে···

যারা এসবে বিশ্বাস করবার ভয়ে
মূর্খ হয়ে আছে –
বলো তাদের কোন্ বিপ্লবের কাহিনী
অকপটে শোনাব।

বাস্তুশিল্প

ভাগের মাটি কেটে কেটে বিশাল নিচু উঠোন।
সার দিয়ে দাঁড়িয়ে লোহার দণ্ড। সাদা মাটি
হলুদ বালি আর কালো পাথরের মণ্ড
গুঁজে দেওয়া হচ্ছে প্রয়োজন মত। টাকায়
কেনা হয়েছে কর্মরত শ্রমিকের শ্রম।

তবু যদি সত্য হয় এই অবস্থান। শেষ হয় কর্মকাণ্ড।
আমি নিশ্চিত সেদিন থেকে নিজের ইচ্ছেমত দেখব আকাশ।
গাছেদের নিয়ে খেলব হা-ডু-ডু। আর চাঁদনী রাতে
উচ্চকণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গিয়ে মুখোমুখি হবো না
বাড়িওলার !

মল্লিনাথ গুপ্ত

—

অরুণ চক্রবর্তীর কবিতা

অরুণ চক্রবর্তী দিল্লী প্রবাসী কবি। ইতিমধ্যে সার্থক উপন্যাস ও গল্প লিখে আমাদের বিশেষ মনযোগের কেন্দ্রে এসেছেন। সাংবাদিক হিসাবেও বাঙালী পাঠকের কাছে তিনি অতি পরিচিত। অতীতে কবিতাও লিখেছেন। এই কবিতাগুলি অতি সাম্প্রতিক লেখা। বহুদিন পরে আবার কবিতায় ফিরে এসেছেন। তার প্রতিটি কবিতায় এক গভীর মরমী স্বর আমাদের আপ্লুত করে। আঙ্গিকের কণামাত্র ভণিতা নেই। যা বলেন তা সরাসরি বলেন এর জন্য ক্বচিৎ কখনো শৈথিল্যকেও প্রশ্রয় দিতে তার বাধে না। একই সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলে ব্যাঞ্জনার ব্যাপ্তি, অর্থাৎ শব্দকে অভিধানিক অর্থ থেকেও আর ব্যাপক দ্যোতনায় মুক্তি দেওয়া। ছন্দ থেকে সাধারণ আটপৌরে পয়ার বা গদ্যছন্দেই যে তার অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য এখানে প্রকাশিত কবিতাগুলি পড়লে তা পাঠকের অলক্ষ্য থাকবেনা। এক প্রকৃত কবির চরিত্রলক্ষণ এতে রয়েছে। তবে কবিতা তার কাছে আরো অনেক মনস্ক ধেয়ান দাবী করবে যদি তিনি সত্যিই কবিতায় স্থিতধী হতে চান।

অরুণ চক্রবর্তীর চারটি কবিতা

পুরানো দিল্লীতে সকাল

ছুটে যাই প্রতি ভোরে
আরাবল্লির পাহাড়-নির্জনতাকে পিছে ফেলে
দ্বাদশ শতাব্দীর তুঘলকাবাদ যখন পাপড়ি মেলে পাথরে পাথরে
ছুটে যাই
জুমার গম্বুজে বসি
সূর্যকে মেলে দিতে চাঁদনির প্রলম্ব বুকে

শিস দিয়ে গান গাই
নিচে গভীর গলিতে গলিতে
জানালা পাশে পলক-ভার চোখের ঘুম ভাঙাই
হ্রেষাধ্বনিতে মেশে ধূপের সুবাস
উদাস ফকির গেয়ে ওঠে সুর চুরি করে
ভোরের আলোয় ক্ষুধার্ত মুখ প্রশান্ত সাগরে
শহর জাগে ধীরে
কোলাহল আকাশে মেলে হাত
ধোয়ার কুণ্ডলীকে ঘিরে।

আমি উড়ি ফিরি
মশজিদ মিনার ছুঁয়ে কার্নিশে কখনো
ফোয়ারার বর্শা-দেয়ালে
সূর্যকে পায়ে পিষে ঝলসে ওঠে রূপালি শহর
ফিরে আসি
আরাবল্লির কাঁটাঝোপ বনে
রোজ।

তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে

তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে বোকা বনে গেছি
এখন দেখছি কোনদিকেই যাবার নেই
অন্তত প্রয়োজন নেই আর
রেললাইন দুটো এত সোজা দিগন্তমুখী
ভয় হয় বুঝি ফেরাই হবে না
নদীতেও চোরাস্রোত আছে
কাছের হাঁটুজলেও ভরসা নেই
নিজের তাগিদে ঘরের বাহির
তাতে কিছু হিসাব থাকে
বেহিসেবী হওয়াও তো এক রকম হিসেবী জীবন, নাকি ?

তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে তাই বোকা বনে গেছি,
চুপিচুপি বলো তো, সত্যিই কি দরকার যাওয়ার ?

অশ্লীল

তোমার কোমলতায় আঁচড় কাটেনি অনভিজ্ঞ আঙুল
আমার দেহলতা সবুজ আঁচলায় শিশির ঝরিয়ে টুপটাপ
মিথ্যে লতায়নি গাছের শরীর
মসলিন ছন্দে কেঁপেছে দীঘল পুকুর
উর্বরা ভূমিতে নেমেছে মেঘ জলজ শরীরে—
পাতা শাখাছিন্ন দু'টি গাছের গুঁড়ি।

অশ্লীলতা ছিল না কোথাও
কাশবনে ভুট্টার ক্ষেতে কিংবা দ্বিখণ্ড উপত্যকায়
অশ্লীলতা যা ছিল তোমার দুচোখে
আমার চার হাতে
শুদ্ধ দ্বিধায়।

ভালোবাসার পাঁচালি

বললে না তো একটিবারও ভালোবাসো
পারলে না তো বলতে তবু যেতেই পারো
ফিরে তোমার ঘরের মধ্যে
সরলো না তো চোখের মনি দীঘল জলে
ফেরেওনি সে আমার দিকে বুকের ভেতর
তিরতিরিয়ে মাছ নাচাতে—
বুঝিনা তুমি ভালোবাসো কি না বাসো
জানার পথ পাই না খুঁজে
উতল এ মন থিতু হবে কোন উপায়ে?

যখন দেখি পাতাশাখার ছিন্ন দু'টি গাছের গুঁড়ি
প্রকৃতিরই অঙ্গ হয়ে সৃষ্টিমাতন
তখনও কি রহস্যময় তোমার চিবুক
দূর পাহাড়ে গাঁইতি চালায় আমার মতন!
কিংবা যখন
ডোরাকাটা বাঘিনী তুই
নির্ভয়েতে পথ পেরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকিস নদীর পাড়ে
পাল তুলে কে বজরা ঠেলে আসবে বলে

অপেক্ষা তোর
তখনও কি স্পষ্ট হতে বাধা থাকে
ভালোবাসিস কি না বাসিস বলতে গেলে?

কিন্তু তবু জানতে হবে
কে চায় আমায় কে আর না চায়
ফয়সালাটি খুব জরুরী এই জীবনে
ভালোবাসা পায় না তো সব এলেবেলে!
ভালোবাসাকে পেতে গেলে
হতেই হবে একটা কিছু
কিছু মানে কিছুটা দাম এই জীবনে
সব হারানো উলঙ্গ কোন ভিক্ষুকই বা
রাজা হলেও ভালোবাসা মিলতে পারে
তেমন হিসেব মিলল না তো তোমার দ্বারে—
রইলে শুধু নিবাক তুমি
বললে না তো
আমায় তুমি ভালোবাসো কি না বাসো!

কাঁপছে নাতো আমার এ হাত
রক্ত পিছিল
টুপটুপিয়ে ঝরছে দেখো শিউলি ফুলের পাপড়ি-ধোয়া
লালচে শরীর
হাতের মধ্যে ধরে আছি হৃদয় তোমার
হৃৎপিণ্ড টুকরো করে দেখব নাকি
ভালো তুমি বাসবে কিনা ডুব বেলাতেও—
চোখটি তোমার খুবলে তুলি
যে চোখেতে আমার কাজল পায়নি রেখা
হাতটি তোমার মটকে দিলাম
গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরতে আর পাবে না
পা দু'খানি ভাসিয়ে দিলাম নদীর জলে
বজরা এবার যাবেই ফিরে উজান পালে

ও নিসঙ্গ গাছের গুঁড়ি
ভাসতে থাক তুই নদীর জলে।

কৃষ্ণা বসু

—

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কবিতা

ষাট দশকের এক স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত কবি ব্যক্তিত্বের নাম বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। বুদ্ধিদীপ্ত, অনুভূতিতীব্র তাঁর উচ্চারণগুলি কখনো বা স্মরণযোগ্যতাও লাভ করেছে। তাঁর কবিতা মূলত প্রতীক-নির্ভর। একধরণের সপ্রতিভতা তার এই প্রতীক নির্ভর কবিতাগুলিতে মিশে গিয়ে এগুলিকে স্বাদু ও লোভনীয় করেছে। তার এই প্রতীকে মিশে থাকে চাপা নাটকীয়তা, তাও বুদ্ধদেবের নিজস্ব মেজাজকে চিনতে সাহায্য করেছে। একটি কবিতায় প্রতীক থেকে প্রতীকান্তরে ছুটে যান না আমাদের এই কবিটি। একটি প্রতীককেই জোরালো করে পুনরাবৃত্ত করে, তীব্রতর করে ছড়িয়ে দেন এক একটি কবিতায়, তাতে পাঠকের কাছে সহজেই পৌঁছিয়ে যান তিনি। আমরা তার কবিতায় ব্যবহৃত হতে দেখেছি দাঁত, চোখ, ছাতা, হ্যাঙ্গার, জিভ, নাক, এইসব চেনা প্রতীককে, কিন্তু চেনা বস্তুগুলিই অচেনা ব্যঞ্জনার বিদ্যুতে চমকিয়ে ঝলসিয়ে উঠেছে বুদ্ধদেবের কবিতায়। মনে পড়ে 'হ্যাঙ্গার' নামের কবিতাটির কথা যেখানে বছরের পর বছর বন্দী সার্টের লম্বা হাত আলমারি থেকে বার হয়ে এসে একদিন মানুষটিকেই জড়িয়ে নিয়ে ঢুকিয়ে নেয় আলমারির পাল্লার ভিতর,—এই ধরণের নাটকীয় শক্তিশালী চিত্রকলাই বুদ্ধদেব, এই চমকই বুদ্ধদেব, এই সপ্রতিভতাই বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কবিতা। 'মনে পড়ে' কবিতাটিতে নখের চিত্রকল্পে সম্পর্কের ব্যাপ্তি ও গভীরতাকে চমৎকার ধরেছেন, শুধু নখের মধ্যে আলো পড়েছে সেই আলোয় কাঁপছে মায়া, জীবন, সঙ্গীছায়া, এবং অনুচ্চারিত ভালোবাসা; একটি মাধুর্যময় অনুভবে মনটি ভালোলাগায় ভরে ওঠে। 'খাম' কবিতাটি অনেকটা 'হ্যাঙ্গার' কবিতাটিরই মতো, চিঠি লিখতে লিখতে, উত্তর না পেতে পেতে ক্লান্ত মানুষটি নিজেই খামের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং একসময় খামের মধ্যে টেনে নেয় প্রিয় মানুষীকেও,—বাহির জগৎ পুরোনো হয়, পুরোনো হয় না খামের সংসার।—প্রতীক-নির্ভর এই ধরণের কবিতার আস্বাদ্যতা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে এক ধরণের সীমাবদ্ধতাও। একবার প্রতীকে, একটি নির্দ্দিষ্ট প্রতীকে নিজেকে বেঁধে ফেললে তার বাইরে বহুমাত্রিক যে জীবন সেখানে আর পৌঁছনো যায় না; প্রতীক সীমাবদ্ধ; জীবন তো অসীম অনন্ত। তাই এ ধরণের কবিতাগুলি প্রথম পাঠে চনক মুগ্ধতা তৈরি করে। তবে

প্রতীককে নানা অনুষঙ্গে ব্যবহার করবার বিচিত্রতা তার রয়েছে, এখানে 'দরজা' কবিতাটিতে যে সময়ের, মহাসময়ের প্রবাহের প্রসঙ্গ এসেছে তাতে এক অসহায় অনুভূতি আমাদের গ্রাস করে নেয়, 'হাজার অযুত হাজার নিযুত বছর পেরিয়ে শেষে / ছোট্ট একটা গ্রহের ভেতর ঢুকে নিচের দিকে চোখ রেখেছি যেই / দেখি শোঁ শোঁ ছুটে আসছে দরজা—' এই ধরণের অতিপ্রাকৃত আশ্চর্য সব প্রতীকী ছবিই বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কবিতার গরিমা এবং এখানেই তার নিজস্বতা। তবে একবার কোনো একটি প্যাটার্নে নিজেকে ছোট করে গুটিয়ে আনলে একজন কবির পক্ষে খুব শক্ত সেই প্যাটার্ন ভেঙে বেরুনো, বুদ্ধদেবের দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের পরের কবিতাগুলি হাতে নিয়ে পড়বার আগে এই প্রত্যাশা জেগেছিল যে নতুনত্বের কোনো স্বাদ পেয়ে যাব। না, সেই চিরসুন্দর ও অপরিবর্তিত বুদ্ধদেবই রয়ে গেছে আজো, এই নতুন কবিতাতে-ও। এখানেই তার স্বাতন্ত্র্য, এখানেই তাঁর সীমা।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের পাঁচটি কবিতা

দরজা

দরজাটা ছিল বন্ধ বহুকাল। তার ওপারে দাঁড়িয়ে ছিলে তুমি
অনেক বছর,
অনেক হাজার বছর। আমার সামনে ছিল
অন্ধকার এক নদী, নদীর ওপর, ঢেউ-এর ওপর
সময়, আমার
নড়বড়ে আর দিকহীন এক সময় আর সময়। হঠাৎ কখন
দরজা উড়ে গেল, হঠাৎ কখন
চোখের সামনে
নাকের সামনে
কানের সামনে
ঠোঁটের সামনে
এলে
বুঝতে বুঝতে দেখি ভেসে যাচ্ছে গ্রহমণ্ডল ছায়-পথ আর
আলোকবর্ষ।
হাজার অযুত হাজার নিযুত বছর পেরিয়ে শেষে

ছোট্ট একটা গ্রহের ভেতর ঢুকে
নিচের দিকে চোখ রেখেছি যেই
দেখি শোঁ শোঁ করে ছুটে আসছে দরজা,
পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি অন্ধকার ওই নদী ঘিরে ধরেছে
চতুর্দিক। তোমাকে আবার দেখতে গিয়ে···একি
তোমার মুখ গলছে
নখ গলছে
চুল গলছে
হাত গলছে
পা গলছে, গলছে শিরা, গলছে সময়, গলছে হাতের আংটি।

মনে পড়ে

কিছু নয় শুধু আলতো হাতের
নখের কথা মনে পড়ে।
মনে পড়ে না হিল্লি দিল্লি
মনে থাকে না বুকের ভার
মনে পড়ে না রাত্রি না দিন
কখন আঁধার ঢেকেছে দ্বার।
মনে পড়ে না মুখের ছবি
মনে পড়ে না নাভির তল
মনে পড়ে না খাট বিছানা
মনে পড়ে না চোখের জল।
কিছু নয় শুধু একলা হাতের
নখের কথা মনে পড়ে।
নখের মধ্যে আলো পড়ছে
নখের মধ্যে কাঁপছে মায়া
নখের মধ্যে একটা জীবন
চলছে কোথায় সঙ্গী ছায়া!

খাম

এক হাজারটা চিঠি লেখার পরও যখন
তুমি কোন কিছুই জানাও না
একটা লাইনও লিখতে চাও না
একটা কথাও জানাতে চাও না
শুধু ছিঁড়ে ফেলে দাও ছিঁড়ে ফেলে দাও চিঠির পর চিঠি,
আমি তখন এক হাজার এক নম্বর চিঠিটা লিখতে থাকি।
তারপর হাত বাড়িয়ে বিশাল লম্বা একটা খাম টেনে নিই
আর চিঠির বদলে খামের ভেতর শুয়ে পড়ে
ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে
বন্ধ করে দিই খামের মুখ। এ বাক্স থেকে ও বাক্স
এক হাত থেকে আর এক হাত ঘুরতে ঘুরতে
ঘুরতে ঘুরতে
শেষে একদিন
তোমার টেবিলের ওপর
তোমার হাতের ওপর
তোমার বিছানার ওপর
ঘাপটি মেরে বসে থাকি। আকাশময়
শান্ত মেঘের ওপর কালো মেঘ
কালো মেঘের ওপর ঘুরঘুট্টি মেঘ দাপাদাপি করতে থাকে।
তারপর যেই খামের ওপর তোমার আঙুল এসে থামে আর
খুলতে থাকে খাম,
আমি ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে
তোমাকে টেনে নিই খামের ভেতর।
হঠাৎ ওঠে ঝড় আর উড়িয়ে নিয়ে যায় আমাদের।
তারপর এক হাত থেকে অন্য এক হাত
এক বাক্স থেকে অন্য বাক্স অন্য বাক্স থেকে আর এক বাক্সে
ঢুকি, বেরিয়ে আসি তারপর আবার ঢুকে পড়ি আমরা।
সবাই ভুলে যায় সব কিছু
ভুলে যায় খামটার কথা, আমার কথা
সবাই ভুলে যায় তোমাকে,
খামটা পুরোনো হয় আর পুরনো হয়
শুধু কোনদিন পুরোনো হয় না আমাদের খামের সংসার।

হুশ্‌

সায়াহ্নে ওই চিবুকে হাত রেখে
বলেছিলাম যেও না খুব দূরে
কাছেই থেকো,
সঙ্গে সঙ্গে থেকো।
নামল গ্রীষ্ম, মেঘ ঘনালো
বৃষ্টি নামল চোখে
নামল শীত কাঁপলো স্বর
পাড়া জুড়ালো শেষে!
আস্তে আস্তে, আস্তে আস্তে, আস্তে, অবশেষে
হাতের মধ্যে
চিবুক নেই,
হাড়ের টুকরো এসে
বার করবো দুপাটি দাঁত, বললো হুশ্‌
ফুস্‌ মন্তর
গহনে যাও, গর্তে যাও, গভীরে যাও ভেসে।

মানিকপুর

হাসো এবং আমাকে হাসাও, ভাসাও
তোমার চোখের কোনে।
আমি এখনো মরে যাই নি,
সরে যাই নি অনেক দূরে।
এখনো আমার হাতের ওপর
তিনটে তাস লাফ্‌ দিচ্ছে
এখনো আমার নাকের ওপর
একটা মশা সুর ভাঁজছে
এখনো আমার চোখের ওপর
তুলসি পাতা দেয় নি কেউ
এখনো আমার পেনের ডগায়
শব্দ এসে ঠেলা মারছে।

এখনো আমার হাত পা জ্যান্ত
এখনো আমার ইচ্ছে হয়
কিন্তু তোমার চোখের পাতায়
মেঘ জমে কি, বৃষ্টি হয়?
ঐ দ্যাখো ঐ সিটি বাজছে
ট্রেন যাচ্ছে মানিকপুর
ভেতরে কাঁপছে অন্ধকার
কেউ কি যাচ্ছে অনেক দূর?

কবিদের প্রতি নিবেদন

বিভাবে মুদ্রণের জন্য বহু কবিতা আমাদের দপ্তরে আসে। আমরা আলোচনাসহ কবিদের গুচ্ছ কবিতা ছাপি। ফলে সারা বছরে পাঁচ ছ'জন কবির বেশি কবিতা ছাপা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। এ বিষয়ে নবীন ও প্রবীণ কবিদের চিঠি আমরা প্রতিনিয়ত পাই ও পাচ্ছি।

বিভাব সম্পাদকমণ্ডলী স্থির করেছেন এবার থেকে বছরে একটি করে সংখ্যা শুধু কবিতা ও কবিতাবিষয়ক আলোচনা নিয়ে প্রকাশিত হবে। একক কবিতা, গুচ্ছ কবিতা সবই ঐ সংখ্যার অন্তর্গত হবে।

প্রতিবছর কবিপক্ষে সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে। বিভাবের অন্যান্য সংখ্যাগুলিতে কবিতা প্রকাশিত হবে না।

বিভাব সম্পাদকমণ্ডলী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

—

রক্ত এবং অশ্রু

আকাশপথে মাত্র পঁয়তিরিশ মিনিট, বিমানটি নামল ঠিক সময়ে। ঢাকা থেকে কলকাতা। মজার কথা এই, দু'দিকের এয়ারপোর্টে চেকিং, ইমিগ্রেশন, কাস্টমস ইত্যাদির জন্য সব মিলিয়ে সময় লাগে অন্তত সাড়ে তিন ঘণ্টা। এসব আধুনিক জীবনের অঙ্গ। একদিকে দ্রুত গতিশীল যানবাহন, অন্যদিকে হরেক রকম অবান্তর ফর্ম ভর্তি করা, বেড়ার পর বেড়া, সময়ের অপব্যয়।

ট্রলিতে মালপত্র চাপিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো প্রকাশ, বিকেল সাড়ে চারটে। ঢাকাতে বৃষ্টি পড়ছিল, এখানেও টিপি টিপি বৃষ্টি। কেউ তার জন্য অপেক্ষা করে নেই, থাকার কথাও ছিল না। প্রকাশ বহুবার বিদেশ যায়, এবার সামান্য দূরত্বে বাংলাদেশ ঘুরে আসা, তাও অফিসের কাজে, এটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই নয়, এয়ারপোর্টে তাকে কে নিতে আসবে ?

অফিসের গাড়ি এসেছে অবশ্য। মালপত্র তোলার পর ড্রাইভার তাকে একটা চিঠি দিল। বিদিশা লিখেছে, আসবার পথে মায়ের সঙ্গে একটু দেখা করে এসো। ওঁর শরীরটা ভালো নেই। ভুলে যেও না কিন্তু। আমি মাকে বলে রেখেছি, উনি তোমার জন্য অপেক্ষা করবেন। তুমি না গেলে খুব খারাপ হবে।

পঁয়তিরিশ মিনিটের যাত্রায় জেট-ল্যাগের কোনো প্রশ্ন নেই। এর থেকে বম্বে-দিল্লি অনেক দূর, মাসে তিন চারবার যেতে হয় প্রকাশকে। ঢাকায় এক বাড়িতে লাঞ্চ খেয়ে এসেছে, পাঁচ রকমের মাছ, তিন রকম মাংসের রান্না, সব একটু একটু করে চাখতে গেলেও পেট ভরে যায়। শরীরে ক্লান্তি নেই, কিন্তু এখন একটু বিছানায় গড়িয়ে নিতে পারলে ভালো হতো। তাছাড়া, যে-কোনো বিমান-যাত্রার পর সরাসরি বাড়ি পৌঁছোতেই ইচ্ছে করে।

তা বলে কি মায়ের সঙ্গে দেখা না করে যাওয়া যায় ?

মা থাকেন নাগেরবাজারের কাছে, পথেই পড়বে। বাবা এক টুকরো জমি কিনে রেখে গিয়েছিলেন, অনেকদিন জমিটা এমনিই পড়েছিল। এখন প্রকাশরা

তিন ভাই মিলে সেখানে একটা বাড়ি বানিয়েছে। মেজ ভাইয়ের সঙ্গে মা এখন সেই বাড়িতে থাকেন। যোধপুর পার্কে প্রকাশের কম্পানির ফ্ল্যাট, বেশ বড়, মা সানন্দেই থাকতে পারতেন সেখানে। কিন্তু প্রকাশের বাড়িতে প্রায়ই নানারকম পার্টি হয়, মদ তো থাকবেই, অনেক সময় হৈ চৈ হয়, মা তাতে স্বস্তি বোধ করতেন না। সেইসব সন্ধেগুলোতে কোণের ঘরে চুপ করে বসে থাকতেন। অন্য দিনগুলোতেও প্রকাশ বেরিয়ে যায় সকাল নটায়, সরকারি অফিস নয়, ঠিক সাড়ে ন'টায় পৌঁছোতে হয়, ফিরতে ফিরতে রাত দশটা এগারোটা, মায়ের সঙ্গে কথাই হতো না প্রায়। বিদিশা কিছু কিছু সোশ্যাল ওয়ার্ক করে, কোনো দুপুরেই বাড়ি থাকে না। ওদের একটি মাত্র ছেলে খড়্গপুরে হস্টেলে থাকে। মা কথা বলার সঙ্গী পেতেন না সারাদিন। একে সানন্দে থাকা বলে না।

বরং নাগেরবাজারে নতুন বাড়িতে মা এখন বেশ খোশমেজাজে আছেন। তাঁর স্বামীর কেনা জমি, অর্থাৎ এটাই তাঁর স্বামীর ভিটে। এর আগে বহু বছর কেটেছে ভাড়া বাড়িতে, নিজস্ব ভিটে কিছু ছিল না। এ বাড়িতে থাকার আর একটা খুব বড় সাচ্ছন্দ্যের কারণ, আশেপাশের সব বাড়িগুলিই আত্মীয় স্বজনদের। মামাতো ভাই, পিসতুতো বোন, জ্যাঠতুতো দাদা কিংবা প্রাক্তন গ্রামের লোক। সকাল-বিকেল একসঙ্গে বসে গল্প-গুজব হয়। মা-ই অন্য মহিলাদের চেয়ে বয়েসে সবচেয়ে বড় বলে আপদে-বিপদে, ঝগড়া-ঝাঁটিতে উপদেশ, পরামর্শ, বকুনি দিতে পারেন।

এখন ন'মাসে ছ'মাসেও মায়ের সঙ্গে দেখা হয় না প্রকাশের। বিদিশাই যোগাযোগ রাখে, মাসে অন্তত দু'বার এসে মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে যায়। তাছাড়া টেলিফোনে কথা হয় প্রায় প্রতিদিনই। প্রকাশ খুব ব্যস্ত। অফিস যদি তাকে দুবাই কিংবা সিঙ্গাপুরে ট্রান্সফার করতো, তাহলে কি মায়ের সঙ্গে দেখা হতো? কলকাতার ব্যস্ততা বরং বেশি!

মায়ের বাড়ির সামনে গাড়িটা থামতেই দরজা খুলে গেল, তার মানে, গাড়ির শব্দের জন্য মা উৎকর্ণ হয়ে ছিলেন।

পাশাপাশি দুটি ঘরের মধ্যে ডানদিকের ঘরটি মায়ের শয়নকক্ষ। খাটের ওপর দু তিনটে বালিশ উঁচু করে আধ-শোওয়া হয়ে রয়েছেন মা, আর তিনটি মোড়ায় বসে আছেন তিনজন মহিলা, এক পাশে একটি খালি চেয়ার।

প্রকাশ পুরোদস্তুর স্যুট পরা, পায়ে জুতো-মোজা। জুতো পরে এ ঘরে ঢোকা ঠিক হবে কিনা, এই ভেবে সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে, মা বললেন, জুতো খুলতে হবে না, তুই আয়, বোস!

অনেকদিন পরে পরে আসে বলে প্রকাশ প্রত্যেকবারই মাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। এখন, আজ যে তিনজন মহিলা বসে আছেন, এঁদেরও প্রণাম করা

উচিত। এ এক ঝামেলা। প্রকাশের এখন পঞ্চাশ বছর বয়েস। যে ধরনের জীবন সে যাপন করে, তার সঙ্গে প্রণাম-টনামের কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু মাকে প্রণাম করতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু অন্য বয়স্কা মহিলারা কেউ পিসি, কেউ মামী, তাও দূর সম্পর্কের, এঁদেরও পায়ে হাত দিতে হবে? উপায় নেই, প্রকাশ জানে, মা ঠিক চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করবেন।

শেষ মহিলাটির দিকে ঝুঁকতেই তিনি পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, থাক থাক, আমাকে না, আমাকে না। তুমি পাকিস্তানে গিয়েছিলে?

এঁরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে দেশত্যাগ করে চলে এসেছেন। পরবর্তী ঐতিহাসিক পরিবর্তন এঁদের মনে এখনো ঠিক দাগ কাটে নি। ওদিককার খোঁজ-খবরও কেউ রাখে না বিশেষ।

প্রকাশ বললো, না, পাকিস্তান তো অনেক দূরে। আমি গিয়েছিলাম কাছেই, এই বাংলাদেশে।

মা বললেন, একটু আগে একটা এরোপ্লেনের শব্দ পেলাম। তুই সেই প্লেনটাতেই এলি, তাই না?

প্রকাশ নেমেছে প্রায় দেড়ঘণ্টা আগে। তারপর নিশ্চয়ই আরো প্লেন উঠেছে, নেমেছে। তবু সে মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, হ্যাঁ। তুমি কেমন আছো, মা?

মা বললেন, ভালো আছি। কেন, বিদিশা বুঝি কিছু বলেছে? সে কিছু না, একটু জ্বর হয়েছিল, এখন ঠিক হয়ে গেছি।

মা অসুখ নিয়ে আদিখ্যেতা করতে চান না। তা ছাড়া, অসুস্থ হয়েছেন বলেই ছেলে দেখতে এসেছে, না হলে আসতো না, এটা তিনি অন্যদের সামনে বোঝাতে চান না।

প্রকাশকে ডাক নামে ডাকবার মানুষ অনেক কমে গেছে। এই তিন মহিলার মধ্যে দু'জন প্রকাশকে শুধু ডাক নামে নয়, তুই তুই বলতেন—এখন প্রকাশের ভারিক্কী চেহারা ও সাজ-পোশাকের জন্য সমীহ করে তুমি সম্বোধন করছেন।

তৃতীয় মহিলাটির দিকে প্রকাশ আর একবার তাকালো। এই অমলা কাকিমাকে সে দেখেছে প্রায় সাত-আট বছর পর। সে রকম কোনো আত্মীয়তা নেই, ক্ষীণ সম্পর্কের এক কাকার স্ত্রী, এঁরা নতুন বাড়ি করে উঠে গেছেন বেহালায়। নাগেরবাজারে আজ বেড়াতে এসেছেন।

প্রকাশের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। মাত্র দু'দিন আগে, বাংলাদেশের এক গ্রামের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে এই অমলা কাকিমার কথা সে একজনের মুখে শুনেছে বেশ কয়েকবার। তখন প্রকাশ ঠিক খেয়াল করেনি। ভেবেছিল, সে অমলা অন্য কোনো মহিলা। না তো, ইনিই। অদ্ভুত যোগাযোগ। কাকতালীয় বলা যেতে পারে।

অন্য দু'জনই মামীমা। মেজো মামী আর নতুন মামী। নতুন মামী এখন রীতিমতন বৃদ্ধা। যাদের নাম তরুণ, তারাও তো এক সময় বৃদ্ধ হয়। অনেক ঝড়ঝাপটায় নতুন মামীর মুখের চামড়া কিছুটা অকালেই মলিন হয়ে গেছে। সে তুলনায় মেজো মামী এখনো অনেকটা আঁটোসাঁটো। বাল্যকালে প্রকাশ এই নতুন মামীর বেশ ন্যাওটা ছিল। তিলের নাড়ু খেতে দিতেন। সে যেন গত জন্মের কথা। এখন প্রকাশ তিলের নাড়ু মুখেও ছোঁয়াবে না। মিষ্টি খাওয়া তার বারণ।

মেজো মামী জিজ্ঞেস করলেন—অ কুশু, কেমন দ্যাখলা ঐ দ্যাশটা? আগেকার মতনি আছে? আমাগো বাড়ি ঘরগুলান আছে না কিছু নাই?

মা তাড়াতাড়ি বললেন, ঐ সব গ্রাম-ট্যামে কি ও যায় নাকি? ওর কাজ তো ঢাকায়।

প্রকাশ ভেবেছিল, মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে, এক কাপ চা খেয়ে, মিনিট পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যেই চলে যাবে। সন্ধেবেলা একটা পার্টি আছে। বাড়ি ফিরে স্নান-টান করে, পোশাক বদলে বেরুতে হবে সাতটার সময়। কিন্তু এখানে এই প্রাচীন আত্মীয়াদের সামনে তাড়াহুড়ো করাটা ভালো দেখায় না।

তা ছাড়া এই মহিলাদের খানিকটা চমকে দেবার ইচ্ছেটাও তাকে পেয়ে বসলো।

সে বললো, না, মা। এবার আমাকে গ্রামেও যেতে হয়েছিল। অন্যান্য বার ঢাকা আর চট্টগ্রামেই যাই শুধু। এবার যেতে হয়েছিল বরিশাল। আমাদের কম্পানির সঙ্গে বাংলাদেশের একটা কম্পানির জয়েন্ট ভেঞ্চারে একটা কারখানা হবে ঝালোকাঠিতে। সেই সাইট দেখতে গিয়েছিলাম।

তারপর অন্য মহিলাদের দিকে ফিরে বললো—বরিশাল কী করে গেলাম, শুনে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। ঢাকা থেকে সোজা গাড়িতে। টানা রাস্তা।

নতুন মামীমা চোখ কপালে তুলে বললেন, কস কী? গাড়িতে? রাস্তা হইলো ক্যামনে? নদীগুলা গেল কোথায়?

এই মহিলারা এখন ট্রামে-বাসে, দোকানে-বাজারে আর বাঙাল ভাষায় কথা বলেন না। কলকাতার ভাষা শিখে নিয়েছেন। শুধু নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে সেই গ্রামের ভাষা বেরিয়ে পড়ে।

বরিশাল পুরোপুরি জল ঘেরা জেলা। চতুর্দিকে নদী-নালা, খাল-বিল। নৌকা বা স্টিমার ছাড়া যাওয়া আসার কোনো উপায় ছিল না। নতুন মামীমার বাপের বাড়ি ছিল বরিশালে। তিনি সেই ছবিটাই ধরে রেখেছেন। তারপর কত যে পরিবর্তন হয়েছে, তা তিনি কল্পনাও করতে পারবেন না। ঢাকা থেকে কংক্রিটের মসৃণ রাস্তা। নদীগুলো উধাও হয়ে যায় নি, সব নদীই আছে। কিন্তু প্রত্যেক নদীতেই গাড়ি সমেত ফেরিতে পার হওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা। প্রকাশকে এরকম

ছ'খানা নদী পার হতে হয়েছিল। পদ্মা পার হতে সময় লেগেছিল পৌনে দু' ঘণ্টা, অন্য নদীগুলোতে দশ-পনেরো মিনিটের বেশি লাগে না।

বরিশাল সম্পর্কে কিছুক্ষণ গল্প করার পর প্রকাশ বার করলো তার তুরুপের তাশ। মায়ের দিকে ফিরে সে সহাস্যে বললো, জানো মা, ফেরার সময় এক জায়গায় চা খাওয়ার জন্য গাড়ি থামানো হয়েছিল। দেখি যে সেই জায়গাটার নাম ট্যাকের হাট!

অচলা কাকিমা ছাড়া আর তিন মহিলাই রুদ্ধশ্বাসে বললেন—ট্যাকের হাট?

মা জিজ্ঞেস করলেন, তুই চিনতে পারলি না? রজনী হালদারের কত বড় দোকান।

প্রকাশ বললো, আমার কী মনে আছে নাকি? তখন কত ছোট ছিলাম। রজনী হালদারের দোকান এখনো আছে কি না জানি না। তবে আরও অনেক দোকানপাট হয়েছে। বাস চলে।

নতুন মামী ম্লান গলায় বললেন, ট্যাকের হাট থেকে সুবুদ্ধিগঞ্জ মাত্র আট-নয় মাইল।

প্রকাশ বললো, আমার মনে আছে। ছোট বেলায় মনে হতো, অনেক দূর। নৌকোয় যেতে হতো।

মেজ মামী বললেন, নৌকায় ছাড়া যাবি ক্যামভায়?

প্রকাশ নিজে আর ফরিদপুরের ভাষা বলতে পারে না। কিন্তু শুনে বুঝতে পারে। 'ক্যামভায়' অর্থাৎ কেমন ভাবে। মেজ মামীরা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে এসেছিলেন পঁয়ষট্টি সালে, সেই সময়কার ছবি তাঁদের মনে একটুও বদলায় নি।

প্রকাশ বললো, আমার সঙ্গে ঢাকার তিনজন লোক ছিল। আমি চা খেতে খেতে তাদের বললাম, এই দিকেই সুবুদ্ধিগঞ্জ নামে একটা গ্রাম আছে না? সেখানে আমার মামার বাড়ি ছিল। প্রত্যেক বছর পুজোর সময় আসতাম। তা শুনে আনিজ নামে একজন বললে, হ্যাঁ, সুবুদ্ধিগঞ্জ বেশ বড় গ্রাম। যান না, দেখে আসুন না, ওখানে এখনো কিছু কিছু হিন্দু আছে।

মা বললেন, গেলি? তুই গেলি?

প্রকাশ বললো, যাওয়া খুব সহজ, দুটো নদীর ওপর ব্রীজ হয়ে গেছে, গাড়িতেই যাওয়া যায়। বেশিক্ষণ লাগে না। আগে নৌকোয় অনেক ঘুর পথে যেতে হতো। আমাদের সঙ্গে দুটো গাড়ি ছিল, অন্যরা দ্বিতীয় গাড়িটায় ঢাকায় ফিরে গেল, আমার সঙ্গে বীরেন সরকার নামে একজন হিন্দু ভদ্রলোককে দেওয়া হলো। ঐ দিকেই আর একটা গ্রামে বীরেন সরকারের শ্বশুর বাড়ি।

নতুন মামী গালে হাত দিয়ে বললেন, ওমা, সুবুদ্ধিগঞ্জে ফিরে যাওয়া যায়? সত্যি নাকি?

এ যেন গতজন্মে ফিরে যাওয়ার মতন এক অসম্ভব প্রস্তাব।

মা বললেন, আমাদের বাড়িটা তো আর নেই, তাই না?

প্রকাশ বললো, শোনো না। অনেকক্ষণ তো মামার বাড়ি খুঁজেই পাইনি। লোককে জিজ্ঞেস করি, রায় বাড়ি, কেউ বলতে পারে না। মেজ মামীমা, আপনাদের তো চ্যাটার্জি বাড়ি ছিল? তাও কেউ চেনে না। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর কেটে গেছে, ঐসব নাম আর কে মনে রাখবে? তখন আমি ড্রাইভারকে বললাম, ইস্কুলটা খুঁজে বার করো। ইস্কুলটার কথা আমার বেশ মনে আছে। অন্যান্য গ্রামের তুলনায় সুবুদ্ধিগঞ্জের ইস্কুল বেশ বড়। সামনে খেলার মাঠ, পেছন দিকে মস্ত একটা দিঘি, লাল সিমেন্টের ঘাট বাঁধানো।

মা বললেন, আমার ঠাকুর্দা ঐ ইস্কুল করে দিয়েছিলেন। আমাদেরই এক পূর্ব-পুরুষের নামে গ্রামের নাম। সুবুদ্ধিনারায়ণ রায়। তাঁর প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত।

প্রকাশ বললো, ইস্কুলটা দেখেই চিনতে পারলাম। তখনই মনে পড়লো, দিঘিটার পাশ দিয়ে একটা রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসতাম ইস্কুলে। আসার পথে চৌধুরীদের একটা বড় বাড়ি ছিল। লোহার গেটওয়ালা বাড়ি। সেই বাড়ির সামনে দিয়ে আসতে রোজ ভয় ভয় করতো। সে বাড়িতে একটা মস্ত বড় কুকুর ছিল। আমরা বলতাম ডালকুত্তা। তার মেঘের ডাকের মতন ঘাউ ঘাউ শুনলে বুক কাঁপতো।

মেজমামী বললেন, হ্যাঁ, ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীদের বাড়ি। ঐ গ্রামের সবচেয়ে বড় বাড়ি। সেখানে কেউ আছে এখনো?

প্রকাশ বললো, ভূতুড়ে বাড়ির মতন পড়ে আছে। অতবড় বাড়ি, ওঁরা এক্সচেঞ্জ করেন নি কেন, কে জানে! দরজা-জানলা সব চোরেরা খুলে নিয়ে গেছে। লোহার গেট নেই, বাগান ভর্তি আগাছা, তবু বাড়িটা দেখলে চেনা যায়।

মেজমামী বললেন, সব বাড়িগুলারই ঐ দশা?

প্রকাশ বললো, হিন্দুদের কিছু কিছু বাড়ি এদিককার মুসলমানদের সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করা হয়েছে, সেগুলোতে লোক থাকে। অনেকটা আগের মতনই। কিছু বাড়ি জবরদখল হয়েছে শুনলাম। ছোট ছোট বাড়িগুলো জরাজীর্ণ হয়ে ভেঙে মাটিতে মিশে গেছে। সেই জমি যে পারে সে নিয়ে নিয়েছে। ফাঁকা জমি কি পড়ে থাকে? পশ্চিমবাংলা থেকেও অনেক মুসলমান বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে গেছে, সেগুলো কি আর ফাঁকা পড়ে আছে?

মেজমামী বললো, এদিকে ওরা বিক্রি করতে পেরেছে, ওদিকে বিক্রি করতে দেয় নি!

নতুনমামী কিছু না বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ক্ষোভের কারণ তাঁরই

বেশি। তাঁদের বাড়িটা বিশেষ বড় ছিল না। কিন্তু ফলের বাগান, পুকুর সমেত সম্পত্তি ছিল অনেকখানি। সব ফেলে চলে আসতে হয়েছে, কিছুই পান নি। পশ্চিমবাংলায় আসার পর বেশ কিছু বছর তাদের দিন কেটেছে চরম দারিদ্র্যে, এক মেয়ের সারাজীবন বিয়েই হলো না। এখন অবশ্য ছেলে দুটি দাঁড়িয়ে গেছে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, শেষপর্যন্ত আমাদের বাড়ি খুঁজে পেলি?

প্রকাশ বললো, হ্যাঁ পেলাম, কিন্তু সে বাড়িকে আর কেউ রায় বাড়ি বলে না। ওটা মুস্তাফা সাহেবের বাড়ি। বড়মামা ঐ বাড়ি এক্সচেঞ্জ করে বর্ধমানের গ্রামের একটা বাড়ি পেয়েছিলেন না? এখন সেখানে মুস্তাফা সাহেবের পরিবার থাকে। দোতলা বাড়িটা প্রায় এক রকম দেখতে আছে। শুধু তিনতলায় একটা ঘর উঠেছে। পাশের শিবমন্দিরটা ভেঙে ফেলেনি, তবে প্রকৃতিই সেটাকে আর কয়েক বছরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। বড় বড় বট-অশথ গাছ গজিয়ে মন্দিরের দেওয়াল ফাটিয়ে ফেলেছে। মাথাটা হেলে গেছে খানিকটা। দরজা নেই, ভেতরে মনে হয় মা মনসার চ্যালাদের বাসা। মন্দিরের চাতালে ঘুঁটে শুকোচ্ছে দেখলাম।

—রোজ সকালে ঐ মন্দিরে আমরা তিন বোন পুজো দিতে যেতাম। শিউলি গাছ দুটো নেই?

—চোখে পড়লো না। একটা বড় বেল গাছ আছে।

—তখনো ছিল।

—আর একটা মজার ব্যাপার দেখলাম। বাড়ির সামনে তুলসীমঞ্চ ছিল, সেটা নষ্ট হয়নি। তুলসী গাছ এখনো আছে। ও বাড়ির কেউ রোজ সেখানে প্রদীপ জ্বালে!

—মুসলমানরাও তুলসীমঞ্চ মানে!

—হয়তো ভাবে তুলসীমঞ্চ ভাঙলে অমঙ্গল হয়। এটা একটা বাঙালি সংস্কার।

—তোকে বাড়ির মধ্যে যেতে দিল?

—দেবে না কেন? এটা আমার মামার বাড়ি ছিল শুনে মুস্তাফা সাহেব খাতির করে ভেতরে নিয়ে বসালেন। বললেন একরাত থেকে যেতে। সেটা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। জোর করে অনেক মিষ্টি খাওয়ালেন। সবচেয়ে ভালো লাগলো কী দেখে জানো তো মা। তোমাদের বাড়ির পাশে যে বিশাল দিঘি, যার নাম ছিল কমল দিঘি, সেটা এখনো একই রকম আছে। সেই বিশাল ঘাট, যেখানে কুড়ি-পঁচিশজন লোক বসে গল্প করতে পারে, সেই ঘাটের পৈঠায় বসে রইলাম বেশ খানিকক্ষণ। অনেক পদ্মফুল ফুটে আছে। ঐ দিঘিতেই তো আমি সাঁতার শিখেছিলাম, তাই না?

মা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লেন। এই দিঘিরই অন্য পাড়ে ছিল মেজমামী আর নতুন মামীদের বাড়ি। আমার মা কুমারী অবস্থায় ঐ দিঘিতে সাঁতার দিয়েছেন। মেজমামী আর নতুনমামী পনেরো-ষোলো বছর বয়েসে নববধূ হয়ে গিয়েছিলেন ঐ গ্রামে, তাঁরাও স্নান করেছেন ঐ দিঘিতে। হয়তো এই তিন রমণী স্নানের আগে ঘাটটায় বসে অনেক গল্প করতেন। স্মৃতি-মেদুর হয়ে গেল তাঁদের মুখ।

শুধু অমলা কাকিমার সেরকম প্রতিক্রিয়া নেই। তিনি সুবুদ্ধিগঞ্জে কখনো যান নি, ঐ গ্রামেরই ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বটে, কিন্তু তা কলকাতায় আসবার পর।

একটু পরে মা জিজ্ঞেস করলেন, রফিকুল সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো?

প্রকাশ বলল, না। তিনি মারা গেছেন অনেকদিন আগে। তার ছেলেরা লেখাপড়া শিখে বিদেশে চলে গেছে। তাঁর বাড়িতেও বিশেষ কেউ নেই।

মা বললেন, আহা, মানুষটা বড় ভালো ছিলেন।

এই রফিকুল সাহেবের কাহিনী আমি অনেকবার শুনেছি। পঁয়ষট্টি সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় গ্রামে-গঞ্জে মুসলিম লিগের দৌরাত্ম্য খুব বেড়েছিল। সে দলের ছেলেরা থানা-পুলিশ কিছুই গ্রাহ্য করতো না। তাদের উৎপাতে অনেক হিন্দু পরিবার দেশত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছিল। নতুন মামীদের বিশেষ ভয়ের কারণ ছিল, কারণ ও বাড়িতে ছিল দুটি কুমারী মেয়ে। একবার মেয়ে দুটিকে লুট করবার চেষ্টাও হয়েছিল। নতুন মামীরা তাই একদিন ভোরবেলা চুপি চুপি সবাই পালালেন। ঘরে ঘরে মশারি টাঙানো, রান্না ঘরে উনোন জ্বলছে, বাইরে কয়েকখানা শাড়ি ঝুলছে, যেন সবাই মনে করে সবাই বাড়িতেই আছে। হিন্দু পরিবার দেশত্যাগ করলে কেউ বাধা দিত না, তবু ঐরকম গোপনীয়তার কারণ এই যে পালাবার খবর জানতে পারলে রাস্তায় হামলা করে গয়নাগাঁটি, টাকা-পয়সাও কেড়ে নিত, অল্পবয়েসী মেয়েরাও নিস্তার পেত না। ঐ গ্রামের রফিকুল ইসলাম ছিলেন সৎ, উদারহৃদয় মানুষ। হিন্দুরা দেশ ছাড়া হয়ে যাচ্ছে বলে তিনি দুঃখ পেতেন, তাদের অসহায় অবস্থার কথাও বুঝতেন। তিনি নিজে নৌকো এনে নতুন মামীমার পরিবারের সবাইকে নিরাপদে মাদারিপুর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে স্টিমারে তুলে দিয়েছিলেন।

নতুন মামীমাদের বাড়িটা যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তা আর প্রকাশ বললো না। সে বরং উঠে দাঁড়িয়ে বললো, দাঁড়াও, তোমাদের একটা জিনিস দিচ্ছি।

বীরেন সরকার জোর করে দু'খানা পাটালি গুড় দিয়েছিল। সুবুদ্ধিগঞ্জের গুড় নাকি বিখ্যাত। প্রকাশ গাড়ি থেকে একটা গুড় এনে বললো, এই ছাখো, তোমাদের গ্রামের জিনিস। একটু করে খেয়ে দেখ।

কেউই সেই গুড় খাবার জন্য ব্যগ্র হলো না। শুধু গন্ধ শুঁকে দেখলো।

নতুনমামীমা বললো, আমাগো একুইশটা খাজুর গাছ আছিল। কত রস হইত। পোলাপানরা গাছে উইঠ্যা চুরি কইরা রস খাইত!

মেজমামী বললো, আমি তো আর গুড়ই খাই না। এইখানকার গুড় আমার মুখেই রোচে না।

মেজ ভাই বা তার স্ত্রী বাড়িতে নেই, কাজের মেয়েটি এর মধ্যে লুচি আর বেগুন ভাজা করে ফেলেছে। এসব এখন প্রকাশকে খেতে হবে। পেট ভর্তি, তবু না বলার উপায় নেই। মা আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছেন। অনেকদিন পর ছেলে দেখা করতে আসছে, মা তাকে কিছু খেতে দেবেন না, তা কি হয়! প্রকাশের পেটের মধ্যে যে এখনো বাংলাদেশের চিংড়ি, কই, চিতল মাছের পেটি, পাঙাস মাছের পেটি হজম হয়নি, সে কথা মাকে বোঝানো যাবে না।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে অমলা কাকিমার মুখের দিকে কয়েকবার চকিতে তাকালো। তার মনে পড়লো বীরেন সরকারের কথা।

বীরেন সরকার একজন মধ্যবয়স্ক, মাঝারি ধরনের অফিসার শ্রেণীর মানুষ, প্যান্ট-শার্ট পরা। মাথায় অল্প টাক, এমনি কথাবার্তা শুনে বোঝা যাবে না এর জীবনকাহিনীটি সাঙ্ঘাতিক রোমাঞ্চকর। সুবুদ্ধিগঞ্জে ঘুরতে ঘুরতে বীরেন সরকার শুনিয়েছিল সেই গল্প।

একসময় গায়ের জামাটা তুলে বীরেন সরকার বললো, এই যে দেখুন, পাকিস্তানের মিলিটারি আমাকে গুলি করেছিল। তবু বেঁচে গেছি। এখনো এক এক সময় বিশ্বাস করতে পারি না যে আমি বেঁচে আছি।

বীরেনের বুকের ডান পাশে একটা গাবলা মতন বেশ বড় গর্ত। একজন হাতুড়ে ডাক্তার অপারেশন করে গুলিটা বার করে দিয়েছিল, তবু ঐ রকম গর্ত হয়ে আছে।

একাত্তর সালের সাতাশে মার্চের ঘটনা। বীরেন তখন ঢাকার জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল বটে, কিন্তু তার প্রধান ভূমিকা ছিল গায়কের। মিছিলে সে গানে নেতৃত্ব দিত।

পঁচিশে মার্চের গণহত্যা শুরুর কারণটাই প্রথমে সে বুঝতেই পারেনি আরও অনেকের মতন। শেখ মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের আলাপ-আলোচনা চলছে, এর মধ্যে সামরিক বাহিনী হঠাৎ গুলি চালাতে শুরু করবে কেন? পরিস্থিতির গুরুত্ব তখনো বীরেনদের মগজে ঢোকে নি। কিছু বোঝবার আগেই তার ছোট ভাই মারা গেল। মিছিল থেকে রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে সে দেখল তার বাবা কনিষ্ঠ সন্তানের মৃতদেহ কোলে নিয়ে বসে আছেন! একটু আগে বাড়ির সামনেই পাক বাহিনী ছোট ভাইটিকে গুলি করে ফেলে রেখে গেছে। সেই অবস্থায় বাবা-মায়ের কোনো দায়িত্ব নেওয়াও সম্ভব হলো না তার পক্ষে, বাবা-মাই কাঁদতে

কাঁদতে জোর করে বীরেনকে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে বললেন।

বীরেনের মতন আরও কিছু যুবক গোপনে আশ্রয় নিয়েছিল একটা গির্জায়। সেখান থেকেও নিষ্কৃতি পেল না। পাকিস্তানী সৈন্যরা গির্জার মধ্যে ঢুকে ধরে নিয়ে গেল সবাইকে।

শুধু যে হিন্দুদেরই ধরছে, মারছে তা নয়। যুবকদের দেখলেই ধরে আনছে। বিশেষত আওয়ামি লিগের কর্মীদের। যতীনের সমবয়েসী বাইশ জনকে টেনে হিঁচড়ে এনে ফেলে রাখা হলো জগন্নাথ হলের একটা ঘরে। সে ঘরের দেওয়ালে তখনো রক্তের ছিটে লেগে আছে। এদের মধ্যে ছিল যতীনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফরহাদ। ফরহাদও ভালো গান গায়, গানের টিউশানি করে; দারুণ প্রাণবন্ত যুবক। বাইরে তখন কী ঘটছে জানে না। ফরহাদের ধারণা, শেখ মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর একটা কিছু সমঝোতা হবেই, তখন তারা ছাড়া পেয়ে যাবে। একজন কর্নেল এসে মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে কথা বলে যায়, প্রত্যেককে জেরা করে, তার ব্যবহার কর্কশ নয়। সে শুধু প্রত্যেকের রাজনৈতিক পরিচয় জানতে চায়। ফরহাদের পরামর্শে যতীন নিজের নাম লিখেছিল ফজলুর রহমান। সে রসুলের নাম বলতে পারে, নামাজ পড়তে পারে, সেদিকে কোনো খুঁত ছিল না। তাদের কিছু খাবার দেওয়া হতো না বটে, কোনো শারীরিক অত্যাচারও হয় নি।

দু'দিন পর ভোরবেলা সবাইকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হলো সামনের মাঠে। সার বেঁধে তাঁদের দাঁড় করিয়ে দেবার পর দেখা গেল রাইফেল হাতে নিয়ে মার্চ করে আসছে কয়েকজন পাক-সৈন্য। চোখের সামনে মৃত্যু দেখলেও বিশ্বাস হয় না। মনে হয়, এখনো কোনো অলৌকিক ঘটনায় সব কিছু বদলে যাবে। সৈন্যরা অন্য সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। এই কয়েকজন নিরীহ যুবক, যারা কোনোদিনও বোমা-বন্দুক ছোঁড়েনি, তাদের শুধু শুধু মেরে ফেলবে?

সেই মিষ্টভাষী কর্নেলটিই সৈন্যদের রাইফেল তুলে দাঁড়াবার নির্দেশ দিচ্ছে। এখনো মনে হচ্ছে, সবটাই তামাশা, নিছক ভয় দেখাবার জন্যই এই আয়োজন।

রাইফেলধারী মাত্র তিনজন, তারা সত্যিই গুলি চালালো, তিনটি লাশ পড়ে গেল মাটিতে। এইভাবে তিনজন তিনজন করে মারবে? বীরেন আর ফরহাদ দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি, চোদ্দ পনেরো জনের পরে। তাদের মৃত্যুর আর কয়েক মিনিট বাকি। ফরহাদ নিজের বুকে হাত বুলিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। বীরেন কাঁদতেও ভুলে গেছে। সত্যিই মরে যেতে হবে?

ফরহাদ বীরেনের হাত চেপে ধরে ফিসফিসিয়ে বললো, ভাই—তুই যদি বাঁচিস আমার জন্য একটা কাজ তোকে করতে হবে।

সবটা না শুনেই বীরেন বললো, আর তুই যদি বাঁচিস, আমার বাবা-মাকে

দেখবি কথা দে? বুড়ো-বুড়ির আর কেউ নেই, আমার ভাইটাও নেই।

ফরহাদ বললো, আমি বাঁচলে তোর বাবা-মাকে নিজের জান দিয়েও বাঁচাবো। আর তুই, তুই যদি বেঁচে যাস, তাহলে অমলাকে একটা কথা বলবি? তোদের পাশের বাড়ি থাকে অমলা, তাকে গান শিখিয়েছি। ভাই বীরেন, আমি অমলাকে ভালোবাসি। তার সঙ্গে আমার বিয়ের সব কথা ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ওদের বাড়িতেও রাজি ছিল। কথার খেলাপ হয়ে গেল। অমলা যদি আমার খবর না পায়, ভাববে, আমি বেইমান, আমি পালিয়ে গেছি। বলিস, অমলাকে ছাড়া জীবনে আর কারুকে ভালোবাসিনি। মরার আগেও শুধু তার কথা—অমলা, অমলা।

অন্যরা অনেকে চেঁচিয়ে কাঁদছে, ওদের কথা আর কেউ শুনতে পেল না। গুলি লাগলো দু' জনের বুকে। ঝুপ করে পড়ে গেল মাটিতে। এর মধ্যেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নেমেছিল, কাজ শেষ করে পাক-সৈন্যরা চলে গেল। সব মৃতদেহগুলো পড়ে রইলো সেখানে, কেউ কেউ সাঙ্ঘাতিক আহত হয়ে কিছুক্ষণ গুঙিয়ে গুঙিয়ে তারপর মরলো। বৃষ্টি হলো সারাদিন।

সন্ধ্যের সময় বীরেনের জ্ঞান ফিরে এলো। বুকের ডান দিকে অসহ্য ব্যথা, কিন্তু সেই ব্যথাই প্রমাণ করে দিল সে মরে নি। গুলি তার বুক ফুঁড়ে গেছে, তবু তার প্রাণ আছে। তার গায়ের ওপরই পড়ে আছে ফরহাদ, তার শরীর একেবারে শক্ত, ঠাণ্ডা।

কাছাকাছি কোনো মানুষজন নেই। বন্ধুর মৃতদেহটা জোর করে সরিয়ে দিয়ে বীরেন উঠে দাঁড়িয়েছিল। বুকের মধ্যে বুলেটটা ঢুকে আছে, সেই জায়গাটা চেপে ধরে সে হাঁটতে আরম্ভ করলো।

শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছে বীরেন। এখন চাকরি করছে, সংসারী মানুষ। কাহিনীটা শোনাবার পর সে বলেছিল, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফরহাদের শেষ অনুরোধটা আমি রাখতে পারিনি। অমলা ছিল আমাদের পাশের বাড়ির ভটচাযিদের মেয়ে। তাকে চিনতাম। বেঁচে ওঠার পর আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম ইণ্ডিয়ার ত্রিপুরায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ঢাকায় ফিরে এসে আর সেই ভট্টাচার্যিদের দেখতে পাইনি। তাদের বাড়িতে আগুন জালিয়ে দিয়েছিল। শুনেছি, অমলা আর তার দুই কাকা পালিয়ে গিয়েছিল কলকাতায়। অতবড় শহর কলকাতা, সেখানে অমলাকে কোথায় খুঁজবো? কলকাতায় আমাদের আত্মীয়-স্বজন সেরকম নেই। আমার বিশেষ যাওয়া হয় না। তবু মাঝে মাঝে অপরাধ-বোধ হয়। অমলাকে ফরহাদের শেষ কথাটা জানানো হলো না, ফরহাদ পালিয়ে যায় নি, অমলার নাম বলতে বলতে সে প্রাণ দিয়েছে।

চা শেষ হয়ে গেছে। এবার একটা সিগারেট ধরাতে হবে, মায়ের সামনে

সিগারেট খায় না প্রকাশ। সে বারান্দায় গিয়ে অমলা কাকিমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো।

বিয়ের আগে অমলা কাকিমা ভট্টাচার্য ছিলেন। এখন চক্রবর্তী। অমলা নামটা খুব বেশি মেয়েদের হয় না। অমলা এখন প্রৌঢ়া, রূপ ঝরে গেছে, তিনটি সন্তানের মা। ক্লান্ত চোখের দৃষ্টি দেখলে মনে হয়, সংসার তাকে তেমন কিছু সুখ শান্তি দিতে পারে নি।

প্রকাশ জিজ্ঞেস করলো, অমলা কাকিমা, আপনি তো বিয়ের আগে ঢাকায় পড়াশুনো করতেন, তাই না?

অমলা কাকিমা মাথা নাড়লেন।

—আপনি গান শিখতেন, আপনাকে একজন গান শেখাতো।

—সে এমন কিছু না।

—একাত্তরের পঁচিশে মার্চের পর চলে আসেন, আর যান নি?

—নাঃ! আর কোনোদিন যাওয়া হবে না। যেতে চাইও না।

—আপনার ফরহাদকে মনে আছে?

অমলা কাকিমা আমার দিকে চোখ তুলে চাইলেন। মুখখানা কেমন যেন বদলে যেতে লাগলো। যেন তিন সন্তানের জননী নয়, ঢাকার সেই উজ্জ্বল তরুণী, একজন মুসলমান যুবক যার পাণিপ্রার্থী, নিশ্চয়ই দু'পক্ষের বাড়িতেই ঘোর আপত্তি উঠেছিল, তবু সব কিছু উপেক্ষা করে ওরা ঘর বাঁধতে চেয়েছিল।

প্রকাশ বললো, এবার গিয়ে একজনের কাছে ফরহাদের কথা শুনলাম। সে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছে। মনে আছে সেই ফরহাদের কথা?

অমলা কাকিমার দু' চক্ষু দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে আমার সঙ্গে অন্য একটাও কথা না বলে চলে গেলেন ঘরের মধ্যে।

পঁচিশ বছর আগে অকারণে ঘাতকের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে ফরহাদ। তবু এতদিন পর একজন তার জন্য দু'ফোটা চোখের জল ফেললো। রক্তের দাগ মিলিয়ে যায়, বুকের মধ্যে অশ্রু জমা থাকে এতদিন?

* * *

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

—

কোথায় পালাবে তুমি

সুখময় সারা গায়ে একটা লোশন মেখে বের হয়। এই লোশনটি একজন রসায়নবিদের কাছ থেকে পাওয়া। অত্যন্ত তেতো, বিস্বাদ এই লোশন। ওর স্ত্রীর সঙ্গে ওর দাম্পত্য বন্ধ। সুখময় একটি তেল-চিটচিটে জিনিসের সঙ্গে অত্যন্ত তেতো একটি সাদা পাউডার মিশিয়ে একটি লোশন তৈরি করেছে। সুখময়ের গায়ে মাছিও বসে না।

সুখময় শোবার সময় দরজা বন্ধ করে, জানলা বন্ধ করে শোয়। খিল চিটকিনি তালা সব কিছু দিয়ে শোয়। শোয়, কিন্তু ঘুমোয় না। ওর বৌ বলে তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? সুখময় এতদিন গোপনে, বৌকে না জানিয়ে যে টাকাটা জমাচ্ছিল, সেটা ফাঁস করে দেয়, বৌকে ব্যাংকে নিয়ে গিয়ে জয়েন্ট একাউন্ট করে। একদিন বলে ওগো, আমি মরে গেলে বিধবার মত থেকো না, মুরগি-টুরগি সব খেয়ো। আমি হলাম বিজ্ঞান যুগের লোক। ইলেকট্রনিক্সের লোক। সুখময়ের হাতে বাঁধা একটি মাদুলী আছে। মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ। ইংলেণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ কর্তৃক প্রশংসিত হাওড়ার ঈশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে পাওয়া। মাদুলীটি শার্টের তলায় থাকে। চিটচিটে লোশনটাও সুখময় জানবাড়িতে নিয়ে গিয়ে মহারক্ষা 'ফু' দিয়ে নিয়ে এসেছে। ওটাই মাথে।

ও এখন যাচ্ছে তন্ত্রবিজ্ঞানীর কাছে। তন্ত্রবিজ্ঞানীয় বি. সি. বটব্যাল এম.ডি. এফ ডব্লু টি বৈজ্ঞানিক কায়দায় তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ করতে পারেন। তিনি কবচের বদলে ইনজেকশন দেন। হোম যজ্ঞের পরিবর্তে অপারেশন করেন। তাঁর ইনজেকশনের নাম—পরমশান্তি ইনজেকশন, কামদায়িনী ইনজেকশন। মহাশক্তি ইনজেকশন, বশীকরণ ইনজেকশন, এরকম সব। হাওবিল বিলি করান তিনি। হাওবিলে বিস্তারিত থাকে। যেমন—: স্বামী স্ত্রী উভয়েই চাকুরী করেন। অথচ সন্তান দুরন্ত। তাকে শান্ত রাখার জন্য মাসে একদিন লুলুপুপু ইনজেকশনেই কাজ হয়। লজ্জালজ্জা ভাব? জড়তা? নিজেকে প্রকাশ করতে অনিচ্ছা! মমতা ইনজেকশন (এটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে)। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত চনমনে থাকার

জন্য জ্যোতি ও উদয় থেরাপি। এ ছাড়া দুর্য্যোধন ক্যাপসুল, নৃসিংহ অবতার ইনজেকশন, দ্রোপদী থেরাপি ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

সুখময় এখন যাচ্ছে ঐ তন্ত্রবিজ্ঞানীর কাছে। ওর খুব ভয়। সবসময় ভয়। ওর সাহস চাই।

বিজ্ঞানী বটব্যাল যে সমস্ত তান্ত্রিক কাজ করেন, তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। তিনি বিভিন্ন হরমোন এনজাইম ইত্যাদি মিশিয়ে-টিশিয়ে একধরনের পাঁচন ইনজেকশন তৈরি করেন। এই তন্ত্রবিজ্ঞানীর সঙ্গে আগে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগে। প্রথমে টেলিফোনে কথা বলে নিয়েছিল সুখময়। উনি আগে জেনে নিতে চান কেসটা কি, পছন্দ হলে টেকআপ করেন। সুখময়ের কেসটা তন্ত্রবিজ্ঞানীর পছন্দ হয়েছিল। উনি বলেছিলেন একটা কেস হিস্ট্রি ভাল করে লিখে নিয়ে যেতে। সুখময় একটা কেস হিস্ট্রি লিখবে। অফিসে পারেনি। এই কেসের হিস্টি অফিসে বসে লেখা যায় না। বাড়িতেও নয়। বাড়িতে এসব বললে ওর বৌ ভয় পাবে। তখন আবার ভয় বিতাড়নী ইনজেকশন দেয়াতে হবে।

যে লোশনটা সুখময় গায়ে মাখে তার একটা নাম দিয়েছে সুখময়। জীবনামৃত। আসল নামটা ডাই মিথাইল মনো সালফো হাইড্রো কুইনোলিন। বিষাক্ত নয়। কিন্তু খুব তেতো। বাঘাকে দেখেছে সুখময়, খাবার আগে না চেটে খায়না। ওকে যদি কেউ খেতে যায়—আগে একবার জিভ দিয়ে চাটবে না? তখনি তো তেতো লাগাব—ভীষণ তেতো। সুখময়ের বৌ একদিন চুমু খেতে গিয়ে মুখ বিকৃতি করেছিল। ওর মুখে নাকি পুরোটা দিন তেতো ভাব ছিল।

সুখময় এখন একটা ছোট চায়ের দোকানে ঢুকলো। ভিতরে টেবিল চেয়ার আছে। একটা দু নম্বর খাতায় সুখময় কেস হিস্ট্রি লিখতে থাকে :—

আমার নাম সুখময় সাহা। বয়স ৩২—ডিপ্লোমা ইনজিনীয়ার। ইলেকট্রনিক্স। চাকরি করি একটা কম্পিউটার চালিত ফার্ম হাউসে। ঐ ফার্ম হাউসে অনেক কম্পিউটার আছে। আর আছে একটা মাস্টার কম্পিউটার। কম্পিউটার খারাপ হলে সারানোই আমার কাজ। আমাদের ফার্মে গরু, ভেড়া, মানুষ. এসব পোষা হয়। ওদের শরীরে বায়োটেকনিক করা আছে। যেমন ধরা যাক ইনসুলিন গরু। মানে কয়েকটি গরুর মধ্যে বায়োইনজিনীয়ারিং করে এমন করা হয়েছে, ওদের প্যাংক্রিয়াস থেকে প্রচুর পরিমাণে ইনসুলিন বেরোবে। এবার ঐ গরুদের মধ্যে বিট করিয়ে নতুন গরু প্রজাতি করা হ'ল, যার শরীরে প্রচুর ইনসুলিন।

এবার ঐ গরুর দুধ ও প্রস্রাব থেকে আমরা ইনসুলিন সংগ্রহ করি। কম্পিউটারে ঐ গরুর দুধ দু ফোঁটা ফেলে দিলে কম্পিউটার বলে দেয় কত পার্সেন্ট ইনসুলিন আছে। এই ভাবে এভার এড্রিনালিনের ভেড়া, পিটুইটারির ছাগল, থাইরয়েডের মানুষ এইসব রয়েছে। টেষ্টোষ্টোরেনের জন্য পুরুষ, ইস্ট্রেজেন

প্রজেষ্টেরণের জন্য নারীও রয়েছে আমাদের ফার্ম হাউসে। তাদের ইনজেকশনের মাধ্যমে রোজই উত্তেজিত করে যৌন মিলনে বাধ্য করা হয়। উপযুক্ত সময় তাদের ফটাকসে পৃথক করে নিয়ে ডাইল্রেটার এবং সাকারের সাহায্যে পুরুষদের শুক্ররস সংগ্রহ করা হয়। মেয়েদের কৃত্রিম ভাবে মাসে দু তিন বার ঋতুস্রাব করানো হয়। তাদের ঋতুরক্ত থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করা হয়। আপনি স্যার আমাদের কোম্পানীর কথা ভালভাবেই জানেন। আপনি আমাদের কোম্পানীতে এসেছিলেন, কিন্তু আমাদের কোম্পানী খুচরো বিক্রী করেনা শুনে আপনি দুঃখিত হয়েছিলেন। দু তিন হাত ঘুরে আপনার কাছে এই জিনিশগুলো যায়। ফলে দাম বেশি পড়ে। আপনি স্যার, আমার উপকারটা করে দিলে মাঝে মাঝে আপনাকে স্যাম্পেল পেঁাছে দেব। আমার কাজ, আগেই বলেছি মাস্টার কম্পিউটারটার মেনটেনেন্স আর টুকটাক গণ্ডগোল করলে দ্যাখা। অপারেশনটাও আমাকেই করতে হয়। আমার আণ্ডারে একজন হেল্পার আছে। মোটামুটি ভালই। কথা বললে শোনে। স্টেটমেন্টে একটু ভুল হয়ে গেল। হেল্পারটি ছিল। এখন নেই। স্যাড কেস। কেন নেই সব খুলে বলব। বছর খানেক আগেকার একটা ঘটনা বলি। কম্পিউটারে স্যাম্পেল দিয়ে টি. ওয়াই টিপেছি, স্ক্রিনে দেখি কিছু মাছ খেলা করছে। ওয়াইপ আউট করে দিলেও আবার ঐ মাছ। এরকম কি করে হয়? আগে কখনো এ ধরনের সমস্যা হয়নি। আমার যা বিদ্যেবুদ্ধি সে অনুযায়ী কম্পিউটারটা খুলে সার্কিটে কোন গণ্ডগোল পাইনি। আমার উপরে একজন ইনজিনীয়ার আছেন। তিনি খড়্গপুর আই আই টির ইনজিনীয়ার। হেভি স্মার্ট, পাইপ খান। আজকাল খবর কাগজে হে পুরুষ বলে একটা চ্যাপ্টার থাকে, ওখানে মুনমুন সেন-টেনরা লেখেন, ঐ সব পড়ে গায়ে আজকাল খুব ও. ডি. কোলন. মাখেন। ওকেই আমার ভয়। পরে আসছি। সব বলব। কিচ্ছু গোপন করবনা।

ঐ ইনজিনীয়ারকে ডাকা করালাম। উনি আলমারী থেকে ব্লু শীট বার করে দেখলেন, কম্পিউটারটা খুলে অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছু হ'ল না। মাছ কি করে আসবে? কোন সফটওয়ারেই মাছ সম্পর্কে কিছু ইমপুট দেয়া নেই। যে-কোন ফ্লপি দিলেই মাছ। মাছ ঘুরছে। এ্যানজেল, গোল্ডফিস্, গাপ্পি, মলি···।

ভাবছি এটা কি? কি করে হচ্ছে। কোন কম্পিউটার ভাইরাস?

আমি ভেবেই বা কী করব? আমি ভাববার কে? বস আছেন ভাববেন।

বস বল্লেন এর লিটারেচার সব বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, কালে দেখব। কম্পিউটারের ডালা খোলা। আমাকে তো থাকতেই হবে। মেশিন খারাপ হলেও ডিউটি তো আছে। আমি বসে আছি। কম্পিউটার রুমের উল্টো দিকে একটা ছোট ঘর আছে। ওখানে সব স্পেয়ার, ব্যাটারি, ট্রানজিস্টার, আইসি, সিলিকন চিপ্‌স,

এসব থাকে। হঠাৎ দেখি ঐ ঘর থেকে একটা ইঁদুর এল। এসেই টুক করে কম্পিউটারের পেছন দিয়ে ঢুকে পড়ল। আমি তাড়া করে তাড়ালাম। এরপর পিছনের ডালাটা আটকে দিলাম। চালালাম দেখি আবার আগের মত। কোয়াইট নরমাল। স্পার্মকনটেন্ট—10^{14} পার MM^2…। সব ঠিক ঠিক বলছে। তাহলে কি ইঁদুরটাই ঠিক করে দিল?

এরপর মাঝে মাঝেই খারাপ হ'ত মেশিনটা। মেশিনটা খারাপ হলে স্রেফ ডালাটা খোলা রেখে বসে থাকতাম, ইঁদুরটা ঠিক চলে আসতো। সারিয়ে দিয়ে চলে যেত। এরকমও দেখেছি, ষ্টোরে গিয়ে বেছে বুছে একটা আই. সি. এনেছে ঠোঁটে করে। ইঁদুর তো সোলডারিং করতে পারে না, দাঁত দিয়ে গর্ত করে…যা পারে আর কি…। আমরা পরে সোলডারিং করে দিয়েছি।

এই ব্যাপারটা আমি আর আমার হেল্পার ছাড়া আর কেউ জানতো না। প্রথমদিনের ঘটনার পর দিন ইনজিনীয়ার সাহেব ফুলো ফুলো চোখে কম্পিউটার রুমে এসে বলেছিলেন খুলুন, আবার একটু দেখি। বোঝাই যাচ্ছিল সারারাত ঘুমোন নি। আমি বলেছিলাম স্যার ওটা আমি ঠিক করে নিয়েছি। উনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি হয়েছিল? আমি বলেছিলাম একটা মাইনর ব্যাপার। একটা ছোট্ট আই.সি. চেঞ্জ করে দিলাম…। ইনজিনীয়ার আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছিলেন।

এরপর যন্ত্রটা মাঝে মাঝেই বিগড়োতো। স্ক্রীনে কখনো মাছ, কখনো প্রজাপতি, কখনো কড়া কিয়া গণ্ডা কিয়া, কখনো কাটাকুটি খেলা। ইঁদুরটা এসে ঠিক করে দিয়ে যেত। আমাদের ফার্মে তো জিলেটিক্স-এর কাজ কারবার চলে, আর ঐসব পরীক্ষার জন্য ইঁদুরটিদুর লাগে। এই ইঁদুরটা হয়তো ল্যাবরেটরি থেকে পালিয়ে এসে এই কম্পিউটার রুমে থাকছে। কি খাচ্ছে কে জানে। বাক্সে লাল ওমস্-এর ট্রানজিস্টার থাকে। একদিন দেখি কয়েকটা নেই, কয়েকটা ঠুকরে খাওয়া। কে খেল? ইঁদুরটা? কে জানে? মাঝে মাঝেই ইনজিনীয়ারের সঙ্গে একটা খেলা করি। ষ্টোর রুমের দরজাটা আটকে রেখে ইনজিনীয়ার সাহেব কে ডাকি, উনি কিছু করতে পারেন না। আমি তখন জিজ্ঞাসা করি আই আই টিতে বিরাট ক্যাম্পাস, তাই না? ওদের পড়াশুনোর ইণ্টার-ন্যাশানাল ষ্ট্যাণ্ডার্ড, তাই না। প্রচুর এ্যাডভান্স্ স্টাডি হয়, তাই না! উনি চলে যান। পরে ষ্টোরের দরজাটা খুলে দিতেই ইনজিনীয়ার ইঁদুর এসে ওটা সারিয়ে দিয়ে চলে যায়।

একদিন হ'ল কি, ষ্টোর পরিষ্কার করতে ঝাড়ুদার এল। ওর নাম বুধা। বুধা পরিষ্কার-টরিষ্কার করে চলে গেল। এরপর যন্ত্র বিগড়োলে ইঁদুরটা আর আসতো না। একদিন এরকম একটা ঘটনা হ'ল। স্ক্রীনে প্রজাপতি উড়ছে। ইঁদুরের

ভরসায় এক ঘণ্টা বসে আছি, ইঁদুর ইঞ্জিনীয়ার আসছে না। বস ইনজিনীয়ারের কাছে সারেণ্ডার করব কিনা ভাবছি, এমন সময় উদভ্রান্তের মত ঘরে ঢুকল বুধা। বুধার পায়ে নোংরা। আমাদের ঘরে ঢুকবার আগে পা মুছে আসার নিয়ম, বুধা জানে, কিন্তু বিচ্ছিরি অবস্থায় বুধা ছুটে এল। বুধা সোজা কম্পিউটারের পিছনে চলে গেল। ডালাটা খুলল। খুটখুট করে কি যেন করল, এবং বেরিয়ে গেল।

এরপর চালিয়ে দেখলাম সব ঠিক আছে। আমি আর আমার হেল্পার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। ব্যাপারটা কিছু বোঝা গেল না। ক'দিন পরে আবার যন্ত্রটা খারাপ হয়ে গেলে একই ভাবে বুধা এল, সারাই করল। আমি বুধাকে আটকালাম। জিজ্ঞাসা করলাম বুধা, কি হয়েছে সত্যি করে বল। বুধা বলল কী হচ্ছে আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। জিজ্ঞাসা করলাম কী হয় তোমার? বুধা বলল মাথার মধ্যে কিরকম বিপ্ বিপ্ শব্দ হয়। এখন, একটু আগে বড় সাবের কমোড পরিষ্কার করছিলাম, হঠাৎ মাথার মধ্যে বিপ্ বিপ্! তারপর কিছু জানিনা। কিরকম একটা নেশার মত, এখন দেখি আমি এখানে। বলি—কম্পিউটারে কি করলে তুমি? ও বলে জানি না; ওর চোখ মুখ দেখে মনে হ'ল না মিথ্যে কথা বলছে। তারপর ওকে বললাম বুধা সত্যি কথা বল—ঐ স্টোর রুমের ইঁদুরটা কি তুমি খেয়েছ? বুধা বলল হ্যা স্যার খেয়েছি, তাতে কি হয়েছে, আমরা জাতে 'কোরা', ইঁদুর তো পেলেই খাই, ইঁদুর খেতে খুবই ভাল। আমি বলি, ইঁদুর খাও ভাল কথা, কিন্তু ঐ স্টোর থেকে ইঁদুর ধরেছিলে? বুধা খুব সহজ ভাবেই বলল—হ্যাঁ, কী হয়েছে? ঐ ঘরে তিন-চারটে ইঁদুর পেয়েছিলাম। মা আর তিনটে বাচ্চা…।

ইশ্ একটা ইনজিনীয়ার প্রজন্ম নষ্ট করে দিলে…।

বুধা আমাদের ফার্মহাউসেই থাকে। একদিন খারাপ হ'ল মেশিন, ও তখন মদ খাচ্ছিল, এসে ঠিক করে দিয়ে গেল। একদিন ও দূরে কোথায় ছিল, সেদিন কিছু হ'ল না, পরদিন সকালেই ঠিক করে দিল। বলছিল—সারারাত ঘুমোতে পারেনি। মাথার মধ্যে বিপ্ বিপ্ শব্দ হয়েছে।

এ-রকম সময় আমার বৌয়ের ডেলিভারী। দিন দশেক ছুটি নিয়েছিলাম। ফিরে দেখি আমার হেলপারের জয়জয়াকার। মেশিনপত্র খারাপ হলেই সারিয়ে দিচ্ছে। কোম্পানী বলছে এরকম একটা ট্যালেণ্টকে সুখময় সাহা এতদিন বাড়তে দেয়নি! ছি। আমি দেখলাম সত্যিই। আমার হেলপারটি খুব তাড়াতাড়ি মেশিন সারাচ্ছে। ক'দিন পরে জানতে পারলাম বুধা নেই। ও এরকম মাঝে মাঝে ডুব মারে। কাউকে না জানিয়ে। ছুটি না নিয়ে হঠাৎ হঠাৎ দেশে চলে যায়। কিন্তু খুব 'কাজের' বলে চাকরি যায় না।

বুধার দেশের ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠানোর পর বুধার খুড়তুত ভাই এসে

জানাল—বুধা আদৌ দেশে যায়নি। তার মানে বুধা নিখোঁজ।

আমি আমার হেলপারকে জিজ্ঞাস করলাম—বল বৃন্দাবন, বুধার ব্যাপারটা কি? তুমি কি ওকে...বৃন্দাবন কিছুতেই স্বীকার যাবে না। একদিন ওকে মাল খাওয়ালাম। মালের ঘোরে ও বলেছিল তন্ত্রবিজ্ঞানী ডাঃ বটব্যাল ইণ্টারভেনাস ইনজেকশন—নৃসিংহ অবতার ইনজেকশন নিয়ে বুধার কোয়ার্টারে গিয়ে বুধাকে খেয়ে ফেলেছে।

তারপর স্যার আমিও। আমিও আপনার চেম্বারে আসি। চারমাস আগে। নৃসিংহ অবতার ইনজেকশন আমিও ধারণ করি, এবং আমার হেলপার বৃন্দাবনকে খাই।

কেস হিস্ট্রিটা লিখে ভাঁজ করি। পকেটে পুরি। ডঃ বটব্যালের চেম্বারে যাই। চেম্বারের সামনে মারুতিটা দাঁড়িয়ে আছে। আমার বস, ইনজিনীয়ার বস-এর গাড়িটা। আমি দূরে দাঁড়াই। বস চেম্বারের পাশের কাউণ্টার থেকে বেরুচ্ছেন...। বসও কি নৃসিংহ অবতার ইনজেকশন নেবেন এবার?

আমি পালাই। পালাই। পালিয়ে কতদূর যাব?

এষা দে

—

শেষ বাঙালি

ফাইলটায় সই করে প্রবাল ঘণ্টি বাজায়। রামলাল বেয়ারার প্রবেশ। প্রবাল ইঙ্গিতে ফাইলটা দেখিয়ে বলে 'মিশ্র সাহেবকে'। 'জী' মাথা হেলিয়ে রামলালের ফাইল হাতে প্রস্থান। অতঃপর চাকাওয়ালা চেয়ারটাকে পিছিয়ে নিয়ে পা দুটো টানটান মেলে দেয় বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার ফোকরে রাখা কাঠের পাদানিতে। হাত দুটো ব্যায়ামের ভঙ্গিতে মাথার ওপরে তোলে, নামায়—তোলে, নামায়। ঘাড়টা ঘোরায় ডাইনে বাঁয়ে, ডাইনে বাঁয়ে। সাত আট বছরের চাকরিতে এখনো সারাদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ারে বসে থাকা অভ্যাস হল না।

'স্যার', দরজার গোড়ায় তার অধঃস্তন ইনকাম ট্যাক্স অফিসার মিশ্র, হাতে সেই ফাইলটা।

'কাম ইন।' প্রবাল জানত ঠিক এমনটি হবে, মনে মনে শক্ত হয়।

'স্যার, বলছিলাম কি এই প্রফেসার লীলা চক্রবর্তীর কেসটা। ওটাতে তো স্যার সেরকম কিছুই নেই। শুধু ট্যাক্স ডিডাকশান অ্যাট সোর্সের সার্টিফিকেট ভুল ফর্মে দিয়েছেন। ফর্ম নাম্বার সিক্সটি-এ দরকার। মালিক মাইনে থেকে ট্যাক্স কাটে, সার্টিফিকেটও সেই দেয়। এখন সে যদি ভুল ফর্ম ব্যবহার করে তো অ্যাসেসির দোষ কী? বরং ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর, যিনি সই করেছেন, তাঁকে লিখলে হয় না? কারেক্ট ফর্মে সার্টিফিকেট দিলেই তো ব্যাপারটা মিটে—

'না, না। আমরা ওসব ঝামেলায় কেন যাব। অ্যাসেসির দায়িত্ব রিটার্নের সঙ্গে সব ডকুমেণ্ট ঠিকঠাক দেওয়া। ইগনোরেন্স অফ ল ইজ নো এক্সকিউজ।'

'অফ কোর্স স্যার অফকোর্স। তবে কিনা অ্যাসেসি একজন লেডি, সাধারণত স্যার লেডিরা অত ট্যাক্সের ব্যাপারটা বোঝেন না, অফিসের কেরানী যা করে দেয় তাই মেনে নেন আর কি।

'বোঝা উচিত। পুরুষের সঙ্গে এক কাজ করবেন, এক মাইনে পাবেন, আর ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করার সময় লেডি বলে এই বুঝি না সেই বুঝি না। সি শুড লার্ন। দিন, ডিমাণ্ড নোটিশ পাঠিয়ে দিন।'

'আপনি যা বলবেন স্যার,' অপ্রসন্ন মুখে ফাইল হাতে মিশ্রর বিদায়।

গডরেজ কোম্পানি নির্মিত এক্সিকিউটিভ চেয়ারের দোদুল পিঠে প্রবাল পুরো শিরদাঁড়াটা এলিয়ে দেয়। একটু দোলও খায়। মিশ্রটা নিজেকে খুব চালাক মনে করে। লেডি অ্যাসেসির জন্য যেন প্রাণ কাঁদছে। ভেবেছে অ্যাসেসি বাঙালি, সাহেবও বাঙালি, অতএব বিশেষ সুবিধা আদায় করতে পারবে। রাঁচীর মত সহরে স্যালারি সেকশানে আইটিও ক'টাই বা কেস পায়। তারই মধ্যে একটু ফাঁক পেলে দু'চার পয়সা বাড়তি রোজগারের চেষ্টা। প্রবাল চাকরির শুরু থেকেই অত্যন্ত নীতিনিষ্ঠ, নিয়মকানুন ভাবার্থে নয়, একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালনই তার পন্থা। ইণ্ডিয়ান রেভেনিউ সার্ভিসে চট করে বদনাম হয়ে যায় কিনা। আইটিওকে তো কেউ দোষ দেবে না, সবাই বলবে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার কী করছিল। সইটা তো তার।

'আসতে পারি।' দরজার মুখে সহাস্যে দণ্ডায়মান শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ সাহু। লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ চেহারা, রঙ বেশ ময়লা, পরনে ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবী, বয়স ষাটের কোঠায়। দোল থামিয়ে সোজা হয়ে বসে প্রবাল। 'আসুন, আসুন, বসুন।'

'সাড়ে পাঁচটা বাজতে চলল, এখনো ওঠেন নি?' ভেতরে এসে প্রবালের মুখোমুখি চেয়ারটায় বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করেন গঙ্গাপ্রসাদ।

'এই উঠব আর কি। চা খান এক কাপ।' প্রবালের হাত যায় ঘণ্টিতে।

'না না, চা থাক। বাড়ি ফিরব এখনি। এ বিল্ডিং-এ এসেছিলাম, ভাবলাম সাহেবের ঘরে একবার ঢু' মেরে দেখি আছেন কিনা। তা স্যার—ভাল আছেন তো? বৌমার খবর কী? দিল্লিতে বাবা মা কেমন আছেন?'

'ভাল ভাল, সব ভাল। তা এদিকে কী মনে করে? কেসটেস ছিল বুঝি?'

'কেস তো সর্বদাই থাকে। আমরা ব্যবসাদার, সরকারের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক। রোজ ঠোকাঠুকি।' হা হা করে হেসে ওঠেন গঙ্গাপ্রসাদ। প্রবালের মুখেও মৃদু হাসি।

'আপনার উকিল বি আর প্রসাদ না? সে গেল কোথায়? তার তো খুব নামডাক।'

'কোথায় আর যাবে, আমারই কাজকর্ম করছে। কাগজপত্র ওরই সব তৈরি। তবে জানেন তো আমি উকিলের হাতে ট্যাক্সের ব্যাপারটা পুরোপুরি ছেড়ে দিই না। হিয়ারিং টিয়ারিং-এ নিজেও থাকি।'

'আপনি তো দিব্যি ট্যাক্স এক্সপার্ট হয়ে উঠছেন। ব্যবসা ছাড়া আর একটা লাইন হয়ে গেল আপনার।' হাসেন গঙ্গাপ্রসাদ, 'তা যা বলেছেন।'

'আজকের মত তো কাজ শেষ, ভাবছি উঠব।' 'চলুন, একসঙ্গে বেরোই।'

এই একসঙ্গে বেরোনোটাতেই প্রবালের প্রবল আপত্তি। তিন বছরের রাঁচী পোস্টিং-এ এক অদ্ভুত ঝামেলা জুটেছে—তার জীবনে গঙ্গাপ্রসাদের প্রবেশ। সে ইনকাম ট্যাক্সের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, গঙ্গাপ্রসাদ স্থানীয় ব্যবসায়ী। তাদের ঘনিষ্ঠতা কি স্বাভাবিক, না কি ভাল দেখায়। তার ওপর ভদ্রলোকের একটা বিদঘুটে বাঙালিবাই আছে। সব সময় বাঙালি মাহাত্ম্য আলোচনা। বিহারে স্থায়ী বাঙালিদের মধ্যে কে কোন ক্ষেত্রে বিখ্যাত হয়েছেন; তাঁদের গৌরবোজ্জ্বল বংশলতিকা, বঙ্গসংস্কৃতিচর্চা, চালচলনের সভ্যতাভব্যতা বড়মানুষী। শুনে শুনে প্রবাল আর স্ত্রী নীলার কান ঝালাপালা।

প্রবাল নিজে বাঙালিয়ানার বিশেষ ধার ধারে না। তার জন্ম বরোদায়, শিক্ষা নাগপুর, ভূপাল ও পরে দিল্লিতে। বাংলা ভাষা বা সংস্কৃতির উল্লেখে তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে ছেলেবেলার ক'টি বিভীষিকা—ছুটির দিনে যখন তার বন্ধুরা সব খেলাধুলা হুটোপাটিতে ব্যস্ত, তার মুখের সামনে ধরা 'ছোট খোকা বলে অ আ, শেখেনি সে কথা কওয়া'—কলকাতা থেকে আনানো সহজপাঠ প্রথম ভাগ নিয়ে মা তাকে জোরজার করে পড়তে বসিয়েছেন; অথবা কোলের কাছে হারমোনিয়াম নিয়ে তার দিদির রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা ও পদে পদে মায়ের বকুনি—'মাদালা ঘানা কি, ঠিক করে উচ্চারণ কর 'মদলো ঘনো' বা 'ফের আভিমাআন, বল্ ওভিমান।' ভাগ্যিস বাবার দুতিনটে বদলির ঝামেলা আর স্কুলে পাঠ্যবিষয়ের চাপ বেড়ে যাওয়ায় তাদের দুই ভাইবোনের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা থেকে রেহাই লাভ। অতঃপর আধুনিক ভারতে আর পাঁচটা উচ্চ-শিক্ষিত উচ্চপদস্থ স্থিতিহীন চাকুরের ছেলেমেয়েদের মত তারাও মাতৃভাষায় নিরক্ষর রয়ে গেছে। ইংরিজি মাধ্যমে পড়াশুনা, আধুনিক ভারতীয় ভাষা বলতে হিন্দি ও তৃতীয় ভাষা সংস্কৃত। তাও কোনক্রমে স্কুলের গণ্ডী পর্যন্ত। তারপর তো বাংলা দূরের কথা, কোন ভাষা চর্চারই প্রশ্ন ওঠে নি। প্রবালের বিষয় ছিল অর্থ-নীতি, তার দিদির ইতিহাস। রিটায়ার করে বাবা যখন দিল্লিতে চিত্তরঞ্জন পার্কের বাড়িতে স্থিতু হলেন তখন তাদের কাছে বাঙালিয়ানা মানে মাছ খাওয়া ও টাঙ্গাইল শাড়ি, বঙ্গসংস্কৃতি হল রবীন্দ্রনাথের দাড়িওয়ালা আলখাল্লাপরা ছবি, দুর্গাপুজো ও তদোপলক্ষে গুটিকতক বাংলা সিনেমা, এক আধটা বাংলা নাটক। হ্যাঁ, বাংলা বুঝতে মোটামুটি পারে, তবে তেমন কথ্য ভাষাটাষা হলে হোঁচট খায়। দিদি বেচারী কলকাতায় বিয়ে হয়ে কী নাজেহাল! দু-চারবার শ্বশুরকে পরিবেশন করতে গিয়ে বলে ফেলেছিল, বাবা, আর একটু চাল দেব? অর্থাৎ আউর থোরা চাওল? এমন আনকালচার্ড ফ্যামিলি যে ঠাট্টা করে! 'তোমাদের দিল্লিতে তো শুধু চালেই আছে।' ভাগ্যিস জামাইবাবুর চাকরি বাঙ্গালোরে, বাঙালিয়ানার অত্যাচার বেশিদূর গড়াতে পারে না।

নিজের বিয়ের সময় প্রবাল কলকাতার বাঙালি বিয়ে করার ভুলটা করেনি। তার শ্বশুর দিল্লিতেই ক'পুরুষের স্থায়ী বাসিন্দা, কাজ কারবার বাজার সীতারামে, ট্যাগোর পার্কে বাড়ি। তাদের বাংলা একেবারে কেজো, অর্থাৎ ফাংশানাল। আসব যাব করব খাব। ব্যস। তার বেশি বাংলা দরকার কী। তাই রাঁচীতে বদলি হয়ে আসার পরপরই যখন একদিন বেলা তিনটে নাগাদ অজানা অচেনা কে এক গঙ্গাপ্রসাদ সাহু কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললেন, 'শুনলাম নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার সাহেব বাঙালি, তাই আলাপ করতে এলাম', তখন প্রবাল রীতিমত বিরক্তই হয়েছিল। বিরসমুখে প্রশ্ন করেছিল, 'আমি বাঙালি জানলেন কী করে?' ভদ্রলোকের কী হাসি। 'ভাল কথা বলেছেন। প্রবাল মিত্র নাম বাঙালি ছাড়া আর কোন জাতের হয় নাকি? বরং আমার মত গঙ্গাপ্রসাদ সাহু হলে আলাদা কথা ছিল।'

এক্কেবারে গায়ে পড়ে আলাপ। প্রবালের তো প্রথমেই চেষ্টা কাটিয়ে দেবার। কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদের উৎসাহ ও আন্তরিকতার বানে কোথায় ভেসে গেল তার শুকনো অনিচ্ছা। প্রথমেই গড়গড় করে নিজের নামধাম জাতকুল পেশার ফিরিস্তি। বর্ধমান কম্পাউণ্ডে বাড়ি। পুরুষানুক্রমিক জাতব্যবসা মহুয়া থেকে দিশি মদ তৈরি ও বিক্রি। আদিবাসী অঞ্চলে প্রায় একচেটিয়া। বিহার ওড়িশার লাগোয়া সব জেলায় শত শত ভাঁটিখানা। বলতে গেলে বিশাল কারবার।

প্রবাল অবাক হয়ে শুনছিল ভদ্রলোকের বাংলা। একেবারে পরিষ্কার ঝরঝরে, এতটুকু হিন্দি টান নেই, নির্ভুল তো বটেই। শেষে থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, 'এত ভাল বাংলা শিখলেন কী করে? আপনি তো দারুণ বাংলা বলেন।' ভদ্রলোক প্রবালের বিস্ময় গায়েই মাখলেন না। 'আরে, আমি তো সিংভূমের লোক, আমার দেশ সিলি'। তারপরই আবার চলে গেলেন আত্মজীবনীতে, 'বুঝলেন মিত্র সাহেব, আমি তখন কলকাতার সিটি কলেজে পড়ি, দিনরাত বাংলা সিনেমা, বাংলা থিয়েটার, বাংলা গল্পের বই। কী দিনই ছিল। সেসব কি আজকের কথা, আপনার জন্মের আগে। থাকতাম বৌবাজারের এক মেসে। ও অঞ্চলে অনেকগুলো পাইস হোটেল আছে। গেছেন কখনো? না? দারুণ রাঁধে। এখনো আমি কলকাতায় গেলে ওয়েলিংটনের উত্তরপুব কোনায় যে বিষ্টুর হোটেল আছে, সেখানে একবেলা অন্তত না খেয়ে আসি না। জানেন আজও, হ্যাঁ, এই আজও তেমনি মোচার ঘণ্ট করে। এত বড় ইলিশ মাছের পেটি সর্ষে বাটা দিয়ে। কি তার স্বাদ! কলকাতার কিছুই বদলায় নি।'

ভদ্রলোকের চোখেমুখে স্বপ্নের আমেজ। প্রবাল তো বিস্ময়ে হতবাক। জন্ম ইস্তক শুনে এসেছে স্বাধীনতার পর থেকে কলকাতার আর কিছু নেই। ইংরেজ আমলের ঠাঁটবাট তো কবেই চুলোয় গেছে, এখন চারিদিকে শুধু ধ্বংসস্তূপ।

যেমন কুশ্রী বাড়িঘর, তেমনি জঘন্য রাস্তাঘাট। সব পুরনো ঝরঝরে, ভাঙাচোরা, খয়া। যেখানে সেখানে ময়লা, ভদ্রপাড়ার চারিপাশে ছোটলোকের বস্তি। একটা জীবন্ত নরক। নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না, চলাফেরা দায়। যে দু'চারবার প্রবাল বাড়ির সবার সঙ্গে অনুষ্ঠানাদিতে কলকাতায় গেছে, একটাই অনুভূতি নিয়ে ফিরেছে। যত তাড়াতাড়ি এ সহর ছাড়া যায় ততই ভাল। আর এই ভদ্রলোকের কিনা সেই কলকাতাকে ঘিরে এত মধুর স্মৃতি!

'ক বছর ছিলেন কলকাতায়?'

'বেশিদিন আর থাকতে পারলাম কই। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, আমি বড় ছেলে, কারবারে লেগে গেলাম। অন্য দায়দায়িত্বও ঘাড়ে পড়ল। আমার মা মারা যান ছোটবেলায়। বাবা পরে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন। সৎমা আছেন, সৎভাইরা অনেক ছোট। বাবার অবর্তমানে আমাকে পরিবারের কর্তা হতে হল, অতএব স্বর্গ হইতে বিদায়।'

'বাংলা তো ভোলেন নি।'

'পাগল! ওটা ভুলব? কী যে বলেন,' চওড়া কব্জিতে ফুটে ওঠা শিরা দেখিয়ে বললেন, 'এর ভেতরে, বুঝলেন মিত্র সাহেব, এর ভেতরে বয়ে যাচ্ছে, রক্তের মধ্যে রয়েছে ভাষাটা।'

কেমন নাটুকে ডায়ালগ। প্রবালের একটু অস্বস্তি হয়। মাথায় ছিট-ফিট আছে নাকি।

কথাটা ঘুরিয়ে নিতে জিজ্ঞাসা করে—

'আপনার ছেলেমেয়েদেরও কি কলকাতায় পড়িয়েছেন নাকি?'

ভদ্রলোকের সমস্ত উৎসাহ হঠাৎ চুপসে গেল। একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে উত্তর দিলেন, 'না, ওদের পড়াশুনা সব এখানে। বড় হয়ে গেছে। এক ছেলে আমারই সঙ্গে কারবারে। আরেকজন সিভিল ইঞ্জিনীয়ার, নিজের ফার্ম খুলেছে, কনট্র্যাকটারি করে। এক মেয়ে, বিয়ে দিয়েছি ধানবাদে। জামাই পারিবারিক ব্যবসায় আছে, আবার নিজে একটা হোটেলও খুলেছে। আপনি বিবাহিত?'

'হ্যাঁ। বিয়ের পরই এখানে পোস্টেড হয়েছি।'

'ওহো, নতুন বিয়ে। বাঃ খুব ভাল', ভদ্রলোকের গলায় আবার উৎসাহের ছোঁওয়া লাগে, 'বাড়ি-টাড়ি পেয়ে গেছেন নিশ্চয়ই? গুছিয়ে বসুন, একদিন মেমসাহেবের সঙ্গে আলাপ করে আসব। কোন কিছু দরকার হলে আমাকে টেলিফোন করবেন', পকেট থেকে কার্ড বের করে দিতে দিতে যোগ করেন, 'সংকোচ করবেন না কিন্তু।'

প্রবাল এবারে ভদ্র হেসে এড়িয়ে যায়, 'না না, তেমন কোন দরকার হবে

না। অফিসের স্টাফেরা খুব সাহায্য করছে।' 'তবুও। ওদের করা তো চাকরির খাতিরে, কর্তব্য। আর আমার? আর আমার হচ্ছে যাকে বলে প্রাণের তাগিদে। চলি।' হা হা করে আরেক প্রস্থ হেসে বিদায় নেন।

প্রবাল তৎক্ষণাৎ স্থির করে ফেলে গঙ্গাপ্রসাদকে মোটেও পাত্তা দেবে না। সে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স, আশা দু'এক বছরে ডেপুটি কমিশনার হবে। তার পক্ষে একজন বড়লোক শুঁড়ির সঙ্গে মেলামেশা সামাজিক আদানপ্রদান শোভন নয়। বাড়ি ফিরে নীলাকে সব বলতে সেও একমত। 'কোথাকার লোক বললে? সিংভূম? সেটা আবার কোথায়?' 'কে জানে। ওয়েস্ট বেংগলে বীরভূম নামে একটা ডিস্ট্রিক্ট আছে শুনেছি। কিন্তু সিংভূম...ঠিক প্লেস করতে পারছি না।'

ক'দিনেই অবশ্য প্রবাল জেনে গেল সিংভূম বিহারের একটি প্রান্ত জেলা। তাতে গঙ্গাপ্রসাদের আত্মপরিচয় ঘোষণাটা প্রায় হেঁয়ালির মত দুর্বোধ্য রয়ে যায়, পরে অফিসের এক ঘাগু আইটিও চতুর্বেদীকে ধরে ঠারেঠোরে গঙ্গাপ্রসাদ সম্পর্কে খোঁজখবর করে। ভদ্রলোক টাকার কুমীর। বছরে ইনকাম ট্যাক্স দেন ৬০।৭০ লাখ টাকা। তার প্রশ্ন শুনে চতুর্বেদী কি একটু ত্যারছা চোখে হাসি হাসি মুখে তাকাল? নাহ্, গঙ্গাপ্রসাদের সঙ্গে মাখামাখি চলবেই না।

অথচ অদৃষ্টের কি বিচিত্র গতি, সপ্তাহ যেতে না যেতে প্রবালের ব্যাচেলর জীবনের অবলম্বন, একান্ত বিশ্বস্ত চাকরটির কর্মে ইস্তফা দান ও তৎক্ষণাৎ বিদায় গ্রহণ। বেহাল গৃহস্থালির সঙ্কটে ব্যাকুল প্রবাল যখন রামলাল বেয়ারার কাছে গৃহভৃত্য যোগানের স্থানীয় উৎসের সন্ধানে ব্যস্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে গঙ্গাপ্রসাদের আবির্ভাব। ব্যাপারটা শুনতে না শুনতে ভদ্রলোক হামলে পড়লেন, 'সে কি, চাকর চলে গেছে, কই আমাকে তো কিছু বলেন নি। আহা, মেমসাহেবের তো বড্ড কষ্ট হচ্ছে। কিচ্ছু ভাববেন না, আমি লোক দেব। অচেনা কাউকে খবরদার রাখবেন না কিন্তু। এটা বিহার, মনে থাকে যেন।'

ক'দিনের মধ্যেই তাঁর গাঁয়ের কাছাকাছি এক মিশন থেকে একটি মাঝবয়সী খৃস্টান স্ত্রীলোক সঙ্গে নিয়ে একেবারে প্রবালের বাড়িতে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে নীলার মন জয়। প্রথম আলাপেই মেমসাহেব বৌমায় পরিণত।

প্রবালের সংসারে সেই যে ভদ্রলোক এন্ট্রি নিলেন, ব্যস—একেবারে গেড়ে বসলেন। প্রবাল থাক বা না থাক তিনি যদৃচ্ছ তার বাড়ি আসেন। সঙ্গে কখনো দেশের পুকুরে ধরা ইয়া বড় রুই, কখনো এক ঝুড়ি খেতের টাটকা শাকসব্জী, অন্যদিন হয়তো বাড়ির গরুর দুধে তৈরি এক বোতল ঘি। কতবার ছোট ছোট কাঁচের বোয়মভর্তি রকমারি আচার। এছাড়া বাংলা নববর্ষ, দোল, দুর্গা পুজো, দেওয়ালি, বড়দিন ইত্যাদি যাবতীয় দিশি বিলিতি পালা-পার্বনের ছুতোনাতায়

ফলে মিষ্টি বাদাম পেস্তার এলাহি উপচার। প্রথম প্রথম প্রবাল আপত্তির চেষ্টা করেছিল, 'আমরা তো দুটি প্রাণী, এত কে খাবে?' গঙ্গাপ্রসাদ গ্রাহ্যই করলেন না। 'কী যে বলেন মিত্রসাহেব। এই তো খাবার বয়স আপনাদের? এখন একটু খাবেন দাবেন না তো কি আমার বয়সে খাবেন? তখন তো প্রেসার, সুগার এসবই আপনাকে খাবে।' হা হা করে হেসে প্রবালের আপত্তি উড়িয়ে দেন।

অস্বীকার করা যায় না প্রবালের আন্ত্রিক রোগে, নীলার ভাইরাস ফিবারে তিনিই সবচেয়ে আগে দুড়ুমদাড়ুম করে ডাক্তারবদ্যি ওষুধপথ্যির ব্যবস্থায় এগিয়ে এসেছেন। নীলার সন্তান-সম্ভাবনার প্রাথমিক পর্বে অসুস্থতায় তাঁরই মারফৎ সহরের সেরা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলাপ। বলাবাহুল্য পদাধিকারে সরকারের কাছ থেকে সবরকম সুবিধেই প্রবালের ন্যায্য পাওনা। তাহলেও নতুন জায়গায় একজন প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় ব্যক্তির সহায়তা অমূল্য। মোট কথা এই তিন বছর ধরে তাদের চলার পথে প্রতিটি বাঁকে গঙ্গাপ্রসাদ মোতায়েন। যেন অদৃষ্টের কোন পূর্বনির্ধারিত ছক। প্রায়ই প্রবালের মনে হয়েছে, আচ্ছা তাদের প্রতিটি অসুবিধা, প্রতিটি বিপদের কথা ভদ্রলোক জানতে পারেন কী করে? নজর-টজর রাখছেন না কি? কিন্তু কেন? কী উদ্দেশ্য হতে পারে? প্রবালের ক্ষমতার পরিধি রাঁচী সহরের শুধু বেতনভোগীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গঙ্গাপ্রসাদ তো বেতনভোগী নন, শত শত কর্মীর বেতনদাতা। তাহলে? মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে প্রবালের কেমন ভয়ভয় করে। নীলার সঙ্গে আলোচনা করে লাভ নেই। মেয়েদের কাছে জিনিসপত্র আদর-যত্নটাই বড়। গঙ্গাপ্রসাদের দৌলতে ফেরায়েলাল থেকে কাশ্মীরি বস্ত্রালয়, রাঁচীর সব বড় বড় দোকানে নীলার ডিসকাউন্ট প্রাপ্তির বন্দোবস্ত চালু; তার দৈনন্দিনের হাজারটা খুঁটিনাটি তুচ্ছতায় গঙ্গাপ্রসাদের সস্নেহ মনোযোগ, তার নতুন পদ রান্না বা শীতের সময় সোয়েটার বোনায় তিনিই অকৃত্রিম প্রশ্রয়দাতা। প্রবাল ক্ষুব্ধ চিত্তে চেয়ে চেয়ে দেখে, গঙ্গাপ্রসাদের অপছন্দ, তাই নীলার পরনে প্রায়ই সালোয়ার কামিজের বদলে শাড়ি ব্লাউজ। নাহ্, নীলা পুরোপুরি গঙ্গা ক্যাম্পে, অর্থাৎ শত্রুপক্ষে। এমন কি গঙ্গাপ্রসাদের সম্ভাব্য ধান্দা সম্পর্কে প্রবালের উৎকণ্ঠিত জল্পনা-কল্পনায় হেসে ঠাট্টা করে বলে, দ্য মিস্ট্রি নেমড্ গঙ্গাপ্রসাদ। গঙ্গাপ্রসাদ নামে রহস্য।

প্রবালের ঘরে একদিন 'পশ্চিমে' বাঙালি বাবুদের হাওয়া বদলের শখ ও তার ফলে তৈরি সৌখিন বাড়িগুলোর বর্তমান দুরবস্থা নিয়ে আলোচনা চলছে। বলাই বাহুল্য গঙ্গাপ্রসাদ প্রধান বক্তা। কথায় কথায় বললেন—এই রাঁচী সহরে মোরাবাদী হিল্‌সের মত খাস জায়গায় রায়বাহাদুর এস. কে. মুখার্জির চমৎকার বাংলো আছে, রায়বাহাদুর যতদিন বেঁচে ছিলেন, নিয়ম করে বছরে ক'মাস কাটিয়ে যেতেন। তিনি গত হওয়ার পর তার ছেলে ক'বছর আনতেন-

টাসতেন, ক্রমে আর যাতায়াত নেই। ভাড়া দিয়ে দিলেন। কখনো ভাড়া পান, কখনো পান না। এখন নাতি মালিক, ভাড়াটে তুলতে চায়, হলিডে হোম খুলবে প্ল্যান। তা তুলতে পারছে কই। কার না কার সূত্রে গঙ্গাপ্রসাদকে ধরেছে। খোঁজখবর নিয়ে তিনি সাফ বলে দিয়েছেন—'দেখ বাপু, তোমার ভাড়াটে কুর্মী, ওখানে থানার ও সি কুর্মী। ঐ কনস্টিটিউন্সির এম এল এ কুর্মী। আর তুমি হচ্ছ গিয়ে কলকাতার বাঙালি। ইলেকশান পর্যন্ত নো হোপ। তারপরেও যে বিশেষ কিছু ভাল হবে তেমন মনে হয় না। কী বলেন মিত্রসাহেব—ঠিক বলি নি?

প্রবাল মাথা হেলিয়ে সায় দেয়। মনে মনে ভাবে এসব গঙ্গার কিছু একটা অনুরোধের ভূমিকা! নিশ্চয়ই জেনে গেছে অ্যাডিশনাল এস পি রাজস্থানের এস আর সিং তারই ব্যাচের আই পি এস। বুড়ো নির্ঘাৎ এঁচে এসেছে প্রবালের মারফৎ তাকে ধরবে। প্রবাল অপেক্ষা করে, মনে মনে চট করে গুছিয়ে নেয় কী বলে অনুরোধ এড়াবে।

আশ্চর্য! গঙ্গাপ্রসাদ সেসব কথাতেই গেলেন না। সেই পঞ্চাশের দশকের কলকাতা, উত্তম সুচিত্রা জুটি, হেমন্তের গান, এইসব ফালতু 'বেঙ্গ' কালচার ব্যাখ্যানায় মেতে গেলেন। মাঝখান থেকে প্রবালের ক'রাত 'কামপোজ' খাওয়া ও নীলার সকৌতুক মন্তব্য, দ্য মিস্ট্রি থিকেন্‌স, গঙ্গাপ্রসাদ নামেরহস্যটি ঘনীভূত হ'ল।

এরপরে গঙ্গাপ্রসাদ তাদের বাড়ি এলেন নেমন্তন্ন করতে, তাঁর ৬৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ছেলেমেয়েরা পার্টি দিচ্ছে। প্রবাল ও নীলা যেন অতি অবশ্য আসে। প্রবালের একটু কিন্তু কিন্তু ছিল, একে বিহারী তায় শুঁড়ি, এদের পার্টি কে জানে কী পদের হবে। নীলার আগ্রহে যেতে বাধ্য হ'ল। গিয়ে দেখে কিছু বয়স্ক ধুতি পরা টিপিক্যাল সেকেলে ব্যবসাদার আছেন বটে কিন্তু অনেক অল্পবয়সী ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টও মজুত। অর্থাৎ সমাজের মেধাভিত্তিক উচ্চশ্রেণীতেও এঁরা আসন করে নিচ্ছেন। তবে হ্যাঁ, খুব রক্ষণশীল। পুরুষদের জন্য ব্যবস্থা বৈঠকখানায়, পানীয় প্রিমিয়াম স্কচ। মেয়েরা অন্দরমহলে, বরাদ্দ ফলের রস। খাওয়া এলাহি। ফেরার সময় গাড়িতে নীলা বলল, 'জানো, ভদ্রলোকের বাড়ির সকলে পুরো হিন্দুস্থানী, কেউ বাংলা জানে না। মজার, না? আমরা এদিকে ভদ্রলোককে বাঙালির মত ট্রিট করি। তবে দে আর ভেরি নাইস পিপল। আমাকে খুব খাতির করল। উনি নাকি আমাদের কথা বাড়িতে সবাইকে গল্প করেন।'

পার্টির মধ্যে একান্তে প্রবাল গঙ্গাপ্রসাদকে সেই মোরাবাদি হিলসে রায়-বাহাদুর মুখার্জীর বাড়িটার কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিল। 'ও হ্যাঁ, ওটার একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছি। ছেলেটিকে বললাম, দেখ—কলকাতায় বাস করে তুমি এখানে সম্পত্তি রাখতে পারবে না, ব্যবসা তো দূরের কথা। এখন তো আর

ইংরেজ আমল নেই যে আইনকানুন খাটবে। বরং বেচে দাও, আর সে টাকাতে বেংগলে কিছু করার চেষ্টা কর। আর ঐ ব্যাটা কুর্মীকে একটু নরমগরম দেওয়ালাম। শেষমেষ মোটামুটি ন্যায্য দামেই রফা হয়েছে।'

'কে কিনছে?' 'কেন, ঐ কুর্মী। ও তো আবার উকিল। আমাদের প্রসাদ জানেন তো উকিলদের নেতা? ওকে দিয়েই ব্যাটাকে মোচড় দেওয়ালাম আর কি। যাক ফয়সালা হয়ে গেছে।'

প্রবাল একটু অপ্রস্তুত বোধ করে। এঁদের টাকাপয়সা বিষয় সম্পত্তি তো আছে বটেই, সঙ্গে লোকবল প্রভাবপ্রতিপত্তিও কিছু কম নয়। প্রবাল তো চুনো-পুঁটি, সেরকম প্রয়োজন হলে খোদ কমিশনারকেও এঁরা পকেটে পুরে রাখতে পারেন। হয়তো রাখেনও। কিন্তু নীলা বা প্রবালের প্রতি তাঁর এত টান যে কেন তাতো বোঝা গেল না। নাঃ, গঙ্গাপ্রসাদ নামে রহস্যটি সেই রহস্যই রয়ে গেল।

উপরন্তু আজকাল প্রবাল একলা, নীলা দিল্লিতে, বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত থাকবে। কাজেই গঙ্গাপ্রসাদকে নিয়ে প্রবালের অস্বস্তি থেকে থেকেই মাথা চাড়া দেয়। এই তো আজই গঙ্গাপ্রসাদের সঙ্গে বেরুবার সময় সেকশানের একপাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখে—কর্মচারী সংঘের চাঁই যাদব আর সিন্‌হা প্যাটপ্যাট করে তার দিকে চেয়ে আছে। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে, এরা কী মতলবে রয়েছে এখনো কে জানে। গঙ্গাপ্রসাদের কিন্তু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে নীলার স্বাস্থ্যের খবরাখবর নিয়ে 'দাদুভাই' বা 'দিদিমণি' অর্থাৎ প্রবালের সংসারে ভাবী আগন্তুকটির র'াচী পদার্পণ মাত্রই তাঁর সঙ্গে কত মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে তার কাল্পনিক চিত্রাঙ্কনে মেতে গেলেন।

প্রবাল এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু রাশ টানতে চেষ্টা করে।

'আপনার বৌমা নেই বলে আর আমার বাড়ি-টাড়ির দিকে আর পা বাড়ান না বুঝি?' তার মৃদু অনুযোগের ভঙ্গিতে একটু মৌখিক অভিমানের আভাস।

'না, না, তা ঠিক নয়। আসলে শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। বুঝলেন মিত্রসাহেব—উত্তরাধিকার বড় সাংঘাতিক জিনিস, শুধু তো সম্পত্তি বা ব্যবসা নয়, ডায়বেটিস ও হাই ব্লাডপ্রেশারও আবার পুরুষানুক্রমে পাওয়া।' হা হা করে হাসেন।

প্রবাল উৎকণ্ঠা দেখায়, 'ওষুধপত্র ঠিকমত খান তো? আজকাল শুনি খাওয়া-দাওয়া, অন্যান্য নিয়মকানুন মেনে চললে এ সব রোগ সামলে রাখা যায়।'

'আমাদের ব্যবসায় অত মানা-টানা যায় না। কোথায় দূর দূর গাঁয়ে জঙ্গলে সব ভাঁটিখানা, দেখতে যেতে হলে রাত্রিবাস ছাড়া উপায় নেই। কাজেই বাইরে খাওয়া দাওয়া গাড়িতে যাতায়াত। এ সবে নিয়ম রাখা যায় না।'

'কেন, ছেলে তো আপনার বড় হয়েছে। তাকে এ সব কাজ দেন না?'

'হ্যাঁ, দিই। তবে কিনা আমাদের কারবারে সবই কাঁচা টাকার লেনদেন, আর বহু টাকার ব্যাপার। নিজে না গেলে সব দিকে নজর রাখা যায় না। ছেলে আমার সঙ্গে গিয়ে গিয়ে শিখছে আর কি।'

'তবু, বয়স তো হচ্ছে, এবারে একটু ঘোরাঘুরিটা অন্তত কমান।'

প্রবালের বাড়িতে খানিকক্ষণ বসে চা-টা খেয়ে তাঁর সেই খ্রিস্টান কাজের স্ত্রীলোকটিকে প্রবালের দেখাশুনা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে উঠে পড়লেন। আজকে খালি হাতেই এসেছিলেন। প্রবাল হাঁফ ছাড়ে।

কয়েক সপ্তাহ গঙ্গাপ্রসাদের পাত্তা নেই। প্রবাল ভাবল হয়তো কাজকারবার দেখতে ওড়িশা গেছেন। খানিকটা শান্তি বোধ করে। একদিন সকালে গঙ্গাপ্রসাদের ছেলে কিশোর হাজির। ম্লান মুখে জানায় পিতাজীর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, দিন সাতেক হল হাসপাতালে। বিপদটা সামলে উঠেছেন তবে এখনো ইনটেনসিভ কেয়ারে। প্রবালকে একবার দেখতে চান। সাহেব কি দয়া করে আজ বিকেলে একবার আসবেন। প্রবাল মুহূর্তের জন্য ইতঃস্তত করে রাজী হয়। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবে।

হাসপাতালে গিয়ে দেখে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের সামনে বিশাল ভিড়, গঙ্গাপ্রসাদের পরিবারের সদস্যরা তো বটেই, তাছাড়া ঘনিষ্ট আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কর্মচারী—সব মিলিয়ে রীতিমত জমায়েৎ, প্রায় হাসপাতাল জুড়ে রয়েছে। এদের মধ্যে প্রবাল কেমন বেখাপ্পা। তবে তাকে দেখামাত্র কিশোর নার্সের অনুমতি নিয়ে আই সি ইউ-তে নিয়ে যায়। একজনকেই শুধু ঢুকতে দেওয়া যেতে পারে, অতএব প্রবাল একলাই ঢোকে।

যে রুগীর ক'দিন আগে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে তার চেহারা স্বাভাবিক থাকার কথা নয়। তবু চোখ বুজে শোওয়া গঙ্গাপ্রসাদকে দেখে চমকে যায় প্রবাল। কী চেহারা হয়েছে, যেন একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। এত বড় শরীরটা বিধ্বস্ত, এখানে ওখানে নল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, বিপ বিপ আওয়াজ হৃদযন্ত্রের অবস্থা সমানে জানান দিয়ে চলেছে। কাছে গিয়ে প্রবাল আস্তে আস্তে বলে, 'গঙ্গাপ্রসাদবাবু, কেমন আছেন?'

ধীরে ধীরে চোখ মেলেন গঙ্গাপ্রসাদ, চোখের কোলে গভীর ক্লান্তি। ম্লান হেসে মাথা হেলান।

'কিছু ভাববেন না। সামলে তো উঠেছেন, এখন শুধু একটু ধৈর্য দরকার।'

আবার মৃদু হাসির চেষ্টা দেখা যায় গঙ্গাপ্রসাদের মুখে।

'আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন?' যথাসম্ভব মোলায়েম গলায় প্রশ্ন করে প্রবাল।

এবারে গঙ্গাপ্রসাদের গলায় স্বর ফুটল—'হ্যাঁ'।

'কেন? কিছু দরকার আছে? বলুন না কী দরকার। আস্তে আস্তে বলুন, সংকোচের কিছু নেই।' নীলার কথা ভেবে প্রবাল প্রায় জোর করেই বলে ফেলে। ভদ্রলোক আবার হাসেন, 'আপনার মুখের কথা শুনতে চেয়েছিলাম।'

'কী কথা?' 'যে কোন।'

'ও'। প্রবাল মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না। একমুহূর্ত চুপ করে থাকে, ভদ্রলোক এত বড় একটা ধাক্কা খেয়েছেন, কী বলছেন বোধহয় খেয়াল নেই।

গঙ্গাপ্রসাদ তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলেন—

'বাংলা শুনতে চেয়েছিলাম তাই।'

'আপনি যে বিহারী হয়েও বাংলা এত ভালবাসেন তা আমাদের সত্যি খুব ভাল লাগে।' নীলার খাতিরে আজ প্রবাল অসুস্থ গঙ্গাপ্রসাদের 'বেঙ্গ' সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিতেও রাজী।

গঙ্গাপ্রসাদের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। কেমন টানটান হয়ে ওঠে মুখের পেশি। 'আমি সিংভূমের ছেলে, আমার মা মুর্শিদাবাদের মেয়ে, আমরা বাঙালি ছিলাম।' একটু চুপ করে আবার বলেন, 'আশ্চর্য হচ্ছেন, না? আজকের ছেলে আপনারা, অতীতকে তো জানেন না। আপনার বাপ-দাদারা আমাদের বাংলা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।'

'মানে?' বিস্ময়ে হতভম্ব প্রবাল জিজ্ঞাসা করে।

'ইতিহাস পড়ুন, মানে বুঝতে পারবেন। কত লড়াই করেছিলাম আমরা, বঙ্গভাষী সিংভূম বাংলার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আপনাদের নেতারা কেউ গা-ই করলেন না। শত শত বছরের নাড়ীর বন্ধন কলমের এক আঁচড়েই শেষ। চোদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি রাতারাতি হয়ে গেল পরদেশ।'

ভদ্রলোকের চোখের কোণে জল, মুখ বেদনায় শীর্ণ।

প্রবাল ততক্ষণে থতমত ভাবটা সামলে নিয়েছে।

'ক্ষতি তো তেমন কিছু হয় নি। এই তো আপনাদের কাজ কারবার দিব্যি চলছে। ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজন সকলে এখানে ওয়েল এস্টাব্লিশড্। আপনার তো কোন অসুবিধা, কোন লোকসান হয়নি। তাছাড়া বিহারী হয়ে গেলেন তো কী? বিহার তো ইণ্ডিয়ায়, আফটার অল উই আর অল ইণ্ডিয়ানস।'

প্রবালের কথা শুনতে গঙ্গাপ্রসাদের মুখেচোখে তীব্র কষ্টের ভাব ফুটে ওঠে। ক'বার জোরে নিঃশ্বাস নিলেন। আস্তে আস্তে বললেন—

'ক্ষতি যে কী হয়ে গেল বোঝাতে পারব না। আমি তো আর আমিই রইলাম না। স্ত্রী ছেলেমেয়ে নাতিনাতনী সব আছে, কারো মুখে আমার মায়ের ভাষা শুনতে পাই না। আমি সেই মাতৃহারা, অনাথই রয়ে গেলাম। চিরকাল। নিজের পরিবারে অচেনা, অপরিচিত। মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে আসে, দম বন্ধ—' প্রবাল ব্যস্ত হয়ে বাধা দেয়—

'থাক থাক, এত কথা বলা আপনার উচিত নয়। পরে আলোচনা করব না হয়। এখন পুরো রেস্ট নিন। ওসব একেবারে ভাববেন না।' গঙ্গাপ্রসাদ সজল চোখে চেয়ে থাকেন। আবার খুব আস্তে আস্তে বলেন, 'আমাদের বংশে আমিই শেষ বাঙালি। আমার পরে আর কেউ নিজেকে বাঙালি বলে না, আর কোন-দিন বলবেও না!'

নার্স ঘরে ঢোকে, একজনের সঙ্গে রুগীর কথা বলার নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ। 'চলি গঙ্গাপ্রসাদবাবু। মন ভাল রাখুন। সব ভাল হবে। আবার আসব।' বাইরে বেরিয়ে এসে কিশোরের কাছে গঙ্গাপ্রসাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রথাগত খোঁজখবর নিয়ে ও তাকে কিছু উপদেশ দিয়ে প্রবাল বাড়ি ফেরে। নাহ্ ভদ্রলোক বড় স্নেহ করতেন নীলাকে। পরক্ষণই খেয়াল হয় কখন অজান্তে সে গঙ্গাপ্রসাদকে অতীতকালে জিম্মা করে দিয়েছে।

পরদিন অফিসে পৌঁছানো মাত্র আইটিও মিশ্র ও চতুর্বেদীর একযোগে সহাস্য অভিবাদন, 'স্যার, কংগ্র্যাচুলেশানস।'

'কী ব্যাপার?'

'স্যার, আপনার প্রোমোশনের অর্ডার এসে গেছে। ডেপুটি কমিশনার, মীরাট। আমাদের ছেড়ে স্যার চলে যাবেন সেটা কিন্তু ভাল হবে না।'

'এখনো অর্ডার হাতেই পাই নি। পেলে তো যেতেই হবে, উপায় কী।'

টেবিলে বসতে না বসতেই কমিশনারের টেলিফোন, অর্ডারও হাজির। যাক, এতদিনে প্রত্যাশাপূর্ণ। দিল্লিরও অনেকটা কাছে এগুনো গেল। এসটিডি-তে নীলাকে লাগায়, সুখবরটা দেয়।

'বোঝাই যাচ্ছে আমাদের সংসারে যে তৃতীয় ব্যক্তিটি আসছে সে অত্যন্ত অসপিশাস। পয়মন্ত। কী বল?'

'সে তো একশ' বার! জান, আমি একটা লম্বা লিস্ট করেছি ভাল ভাল নামের।'

'কিচ্ছু দরকার নেই। নাম আমি ঠিক করে ফেলেছি, রাকেশ অথবা নেহা।'

'রাকেশ মিত্র, নেহা মিত্র শুনতে ভাল লাগবে?' নীলার গলায় দ্বিধা।

'নো মিত্র, নো মিত্র। ওসব বাঙালি-ফাঙালি চিহ্ন আর থাকবে না। স্রেফ মিস্টার রাকেশ, মিস নেহা।'

'হিন্দি ফিল্মের মত?' এখনো নীলার স্বরে সংশয়।

'কেন, পছন্দ হচ্ছে না? বেশ বাবা, তাহলে এম রাকেশ, এম নেহা।'

'এম আবার কী?'

'কেন, দক্ষিণী ঢং। পদবী 'মিত্র' সংক্ষেপে ও সামনে। বেশ অল ইণ্ডিয়া টাচ।

'হাম হ্যায় হিন্দুস্তানী', স্বামী-স্ত্রী দুজনে একসঙ্গে হেসে ওঠে।

মৃত্যুঞ্জয় সেন

—

দাহ

প্রচণ্ড খিদে। খিদের দাপটে লখমন অস্থির। অসহ্য খিদেতে লখমনের পেটে বারেবারে কামড় দিচ্ছে। কলকল করে একটা শব্দ পেটের এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যাচ্ছে। নদীর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে লখমনের কখনও মনে হচ্ছে এখানেই শুয়ে পড়ি। কখনও মনে হচ্ছে, এখানকার জল-বালি একটু খেয়ে ফেলি। অগস্ত মুনির মত নদীর জলটা গিলে ফেলি। তবু সে নদীর জল খায় না। ঘোলা জলে নুন। সে টের পায়, খিদের নাম বাবাজী। মনে মনে ভাবে, দুদিন খায়নি সে, তাতেই এই-ই। এর আগেও এমন হয়েছে। এত কষ্ট হয়নি তখন। তার আফশোস, বড় সুখে ছিল সে এ-কদিন। অন্যসময় হলে সে এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে চলে যেত। এখন কিন্তু আর সে যেতে পারছে না। তার সে মনই নেই।

অথচ এই লখমন এই কদিন আগেও এমনটি ছিল না। এ পৃথিবীতে তার নিজের বলতে আর কেউ নেই। বস্তুত সে তার বাবা-মা বা অন্য কারুর নামধামও জানে না। তার মনে হয়, সে যেন হঠাৎ বড় হয়ে কোথাও থেকে চলে এসেছে। তার শিশুকাল, কৈশোরকাল বলতে কিছু ছিল না। আর তার নামটাই বা কি করে লখমন হল, তাও সে জানে না। সে যে একটা মানুষ, তার যে একটা কাজ-কর্ম আছে—এসব সে বুঝতে পারে বলে মনে হয় না।

সুন্দরবনের অজ কোন এক গাঁয়ে এক সময় সে থাকত। একটা ছোট্ট ঘরে। সে ঘরটা ছিল আবার এক চৌকিদারের। তখনকার দিনে সে গ্রামের ধনীরা ধনিয়া বলে এক চৌকিদারকে গ্রামের শেষপ্রান্তে এক চিলতে জায়গায় থাকতে দিয়েছিল। চৌকিদার তো কবেই মরে গেছে। তার ভিটেতে কিভাবে লখমন এসে উঠেছিল, তাও সে জানে না। লখমনের কথার টানে বিহারী ভাষার টান। সে কথা বললে মনে হয়, বিহারে প্রবাসী কোন বাঙালি কথা বলছে। তবে তার মুখ চৌ-আকৃতির, বড় বড় চক্ষুদ্বয়। টান টান চওড়া বুক। ঈষৎ খর্বাকৃতি। দেখে মনে হয়, এক যোদ্ধা। পোশাক খুলে দাঁড়িয়ে আছে।

লখমন ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে নদীর জল, নদীর ঢেউ, নদীর ওপরে ঢেলে দেয়া জহ্লাদ

রোদ তল্লাসী করতে করতে চলে। এই চরাচরে নদী, নদীর পাড়, পাড়ের গাছ-পালা আর সে। সে খুঁজছে একটি মৃতদেহ।

মৃতদেহ খুঁজতে খুঁজতে ভাবছে সে, নাঃ, আবার কোন গ্রামে চলে যাই। পরক্ষণে ভাবে—না, যাবো না। লঝমন এমনই। সাধারণত কোথাও দশ-পনের দিনের বেশি সে থাকতে পারে না। তার কোন পিছুটান নেই। সে এক উদাসী পুরুষ।

লঝমনের সঙ্গে এক গ্রামীণ মেলায় দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিল শহরের এক সাংবাদিকের। সেই-ই তখন তাকে বলেছিল, তুমি হচ্ছো আসল মুসাফির। যাযাবর। একথা বলার কারণও ছিল। সাংবাদিক তাকে প্রথম দেখেছিল কুলতলি গ্রামের হিমাংশু পুরকাইতের বাড়িতে। সে বছরকয়েক আগের কথা। পুরকাইতের বিশাল এলাকা নিয়ে তৈরি কাঁচা-পাকা বাড়ির সামনে একটা বড় জায়গায় তখন ধান ঝাড়াই হচ্ছে। চার পাঁচটি দল একসঙ্গে চার পাঁচটা মাড়াই বিছিয়ে কাজ করছে। খর রোদ, ভরদুপুর। হঠাৎ লঝমনের আবির্ভাব। যে যেন কতদিনের চেনা। লেগে গেল ওদের সঙ্গে কাজে। বাড়ির লোক ভাবছে মুনিষদের কেউ, মুনিষদের লোকেরা ভাবছে সে বাবুদের কেউ। সকলে দেখল, লঝমন নিষ্ঠার সঙ্গে সব কিছু করে যাচ্ছে। এক সময় কাপড় গুটিয়ে মালকোচা মেরে নিজেই ধান ঝাড়তে শুরু করল। সে দাপট কী! ধানের বিড়ে পড়ছে মাড়াইয়ের পাটাতে। ফটাফট তার হাত ঘুরছে, যেন ঘূর্ণিচাকা। মুহূর্তে ধানের গাদার হাফটা সাবাড়। ধানের বিড়ে থেকে ধান খড় আলাদা হয়ে যাচ্ছে লঝমনের অলৌকিক ক্ষমতায়। সকলে এমন কুশলী মুনিষ কোনদিন দেখেনি। তারা খুশি। নিজেরাই বিড়ি এগিয়ে দেয় লঝমনের দিকে।

সেই সন্ধেতেই লঝমন হয়ে গেল সেই বাড়ির আর একজন সদস্য। সন্ধেতে লঝমন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দলে মিশে গেল। তাদের নিয়ে ভূত-পেতের গল্প শুরু করল। রাত যখন গভীর, বাড়ির সকলে যখন ঘুমে অচেতন তখন গোয়ালঘরের পাশে পুকুরপাড়ে বসে লঝমন তার ঝোলা থেকে বের করল একটা বেহালা। বাঁ কাঁধে বেহালা ছুঁয়ে বাঁ ঘাড় বেঁকিয়ে সে তুলল বেদনার সুর।

সকাল হলে শুরু হয়ে যায় তার কাজ। কেউই তাকে বলে না কোন কাজের কথা। লঝমন কিন্তু জানে তাকে কি করতে হবে। সে গোয়াল থেকে গরু নিয়ে যায় মাঠে। মাঠ থেকে ফিরেই ধান মাড়াইয়ের জায়গা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলে। তারপর গোবর-জল মাখিয়ে লেপে দেয় সেই উঠোন। এর ফাঁকে পুর-কাইত গিন্নি মানদা নিজে থেকে ডেকে তাকে পান্তা খেতে দেয়। অন্যেরা তখন রান্নাঘরের সামনে বসে পান্তা খাচ্ছে। পান্তা নিয়ে সে চলে যায় লম্বা বারান্দার

এক কোণে। সেখানে বসে খেয়ে নেয় সে। তারপর পুকুরে নেমে থালা মেজে এনে রান্নাঘরের সামনের রোয়াকে রেখে দেয়। পুরকাইত বাড়ির ছোট ছোট ছেলেরা কোন স্কুলে পড়ে তা জেনে নেয় সে। ছেলেদের এনেই লেগে যায় ধান মাড়াইয়ের কাজে। হিমাংশু পুরকাইতের মুদির দোকান গঞ্জের হাটে। বাজারে হাজার লোক দেখা তার। কিন্তু এমন কাজের লোক দেখেনি সে। এ যেন মেঘ চাইতেই বৃষ্টি। বারান্দায় বসে বসে ধান ঝাড়াই দেখে সে তৃপ্তির সঙ্গে।

এর কয়েকদিন পরের কথা। বারো বিঘের মাঠে কেটে রেখে দেয়া ধান আনতে গিয়ে হিমাংশু পুরকাইতের চোখ ছানাবড়া। সব ধান তুলে নিয়ে গেছে তার চিরদিনের শত্রু ভুলু নস্কর আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা। ভুলু নস্করদের চোলাই তৈরি কাজ। কদিন আগে পুলিশ এসে লণ্ডভণ্ড করে গেছে। তাদের ধারণা হিমাংশুরা থানা-পুলিশ করে তাদের অমন ক্ষতি করল। হিমাংশুদের দোকানে নাকি গঞ্জের থানায় পুলিশ-দারোগাদের খুব যাতায়াত। ধান নেই মাঠে মানেই মান নেই হিমাংশু পুরকাইতের। সেও শলাপরামর্শ করল নানাজনের সঙ্গে। তারপর ঘটল সেই নৃশংস অত্যাচার। পুরকাইতের বাড়িতে আগুন। খড়ের গাদায় আগুন। গোয়ালে আগুন। আর সেদিনই যেন খেল দেখাল লঝমন। সে যেন নিজেই এক সমুদ্র। কত দ্রুত বাড়ির আগুন নিভাতে পারল সে। সে এর ফাঁকে বাড়ির মধ্যে ঢুকে হিমাংশু পুরকাইতের দু বছরের ছেলেটাকে দু তিনটে ঘরের ভিতর থেকে বের করে এনেছে। ছোট ছেলেটাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালেও মানদাকে পারেনি। মানদার মৃত্যুতে পুরকাইতদের বাড়িটা যেন শ্মশান হয়ে গেল। ঐ ঘটনা প্রায় সব সংবাদপত্রের শিরোনামে আসে। আসে লঝমনের কথা। সাংবাদিক রতন এসেছিল সংবাদসংগ্রহে। তখনই লঝমনকে দেখে সে। তখন জেনেছিল যে, লঝমনের কোন নির্দিষ্ট ঠিক-ঠিকানা নেই। তার বছরখানেক পরে সেই সংবাদের সালতামামি করতে গিয়ে রতন শুনেছিল, লঝমন হাওয়া। ঘটনার যে নায়ক, সেই-ই বেপাত্তা। ঘটনার দিনকয়েক পরে। সে যেমন এসেছিল হঠাৎ, তেমন হঠাৎই চলে গেছে। হিমাংশু পুরকাইতের দুঃখ সে কারণেও। ঘটনার পরে বাড়ির কচিকাঁচাদেরকে লঝমন মায়ের স্নেহ দিয়ে খাইয়েছে, স্নান করিয়েছে। ভালবেসেছে। এতদিন ছিল, মুনিষের কাজ করল, একটা পয়সাও নেয়নি সে।

লঝমন পথ চলতে চলতে শুনল কান্নার আওয়াজ। কাছে গিয়ে দেখল, এক বয়স্ক পুরুষ মারা গেছে। তাকে খাটে শোয়ান হয়েছে। তাকে ঘিরে ক্রন্দনরত নানা বয়সের শিশু-পুরুষ-মহিলা। অনেকে নিষ্কর্মার মত বসে নতমুখে। লঝমন সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে নিয়ে এল এক বাণ্ডিল নারকেল পাতা। মৃতের খাটের চারিদিকে একগুচ্ছ করে ধূপ জ্বালিয়ে

বেঁধে দিল। তারপর এক সময় তাড়া দিল। বডি যে নষ্ট হতে চলেছে। সকলের সম্বিৎ যেন ফিরল।

লঝমন একাই একশ। শেষের দিকে কাঠ কম পড়ে যায়। তখন লঝমন মৃতের মাথাটি লাঠি দিয়ে ফাটিয়ে দেয়। মাথার ঘিলুতে আগুন দাউ দাউ করে উঠল। এজন্যে মৃতের পাশের বাড়ির বাসিন্দা পঞ্চানন বৈদ্য একটু আপত্তি করেছিল। এটা পাশবিক। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি এসে পড়ায় অন্যেরা ভাবল, ভালই হয়েছে। নাতো একটা বডি পোড়াতে পাঁচ ঘণ্টার বেশি লেগে যেত।

লঝমন তারপর থেকেই সেই বাড়ির বাসিন্দা। শ্রাদ্ধের সব ব্যবস্থা সেই-ই করে। লিস্ট তৈরি, নিমন্ত্রণ, বাজার-হাট, বামুন-পুরোহিত, দানসামগ্রী—সবেরই ব্যবস্থা তাকে করতে হয়। মৃতের বড় ছেলের সারের হোলসেল এজেন্সি। সেই-ই সব ভার তুলে দিয়েছিল লঝমনের হাতে।

শ্রাদ্ধের দিন লঝমনকে দেখে মনে হচ্ছিল সেই-ই যেন পিতৃদায়গ্রস্ত মানুষ। সব কাজেই সে। সবই করছে দায়িত্বের সঙ্গে। গ্রামের নিমন্ত্রণ। একশ বাড়িতে বললে এক হাজার জন চলে আসে। রবাহূত অনেকে। সকলকে সামাল দিচ্ছে লঝমন।

নিজেই উৎসাহী হয়ে বাড়ির লোকজনকে সে নিয়ে গেল স্থানীয় জাঁতালের মেলায়। পনের দিনের জমজমাট মেলা। সারের হোলসেল ডিলার মণ্টুর নির্দেশে তার বউ আর বাচ্চাদের জন্যে রিক্সা ভ্যান করে নিয়ে গিয়েছিল লঝমন। রিক্সা ভ্যানের সঙ্গে সঙ্গে সেও ছুটেছিল। আর সেই মেলাতে লঝমনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সাংবাদিক রতনের। রতন এসেছিল মেলার খবর সংগ্রহের জন্যে। সে ঠিক চিনে ফেলেছে লঝমনকে। লঝমনের চৌ-আকৃতির মুখ। দেখে মনে হয় সে একজন যোদ্ধা। তাকে তাই একবার দেখলে পরের বার আর চিনতে অসুবিধা হয় না। রতন বলেছিল—কি, তুমি আর কুলতলির পুরকাইতদের বাড়িতে থাক না?

লঝমন হতবাক। তার হাবভাবে সে বোঝাল, সে কোনদিন কোন পুরকাইত-দের বাড়িতে ছিল না। আর কোন বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা তার মনেই পড়ছে না। সে থাকে সারের ব্যাবসা করে, একটা মোটা মত লোক, তার বাড়িতে। ঐ তো তার বউ আর ছেলেমেয়ে। ঐ যে মনোহারী দোকানে দাঁড়িয়ে। টিপ কিনছে। লালশাড়ী পরা বউটা। ওদের বাড়িতে।

ব্যস্ত রতন একথা শুনে অবাক। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পুরকাইতদের বাড়ি, আগুন লাগা, একটা ছেলেকে বাঁচানো, তার ছবি খবরের কাগজে ছাপানোর কথা বলল। কোনতেই কিছু জানে না শুনে রতন বলল, তুমি আসলে একজন মুসাফির যাযাবর। কোন জায়গাই তাই তোমার মনে থাকবার কথা নয়।

সেই লঝমন এখন খিদের চোটে অস্থির। সে এই কদিন আগেও জামাই আদরে খেয়ে দেয়ে দিন কাটাচ্ছিল। প্রথমে গিয়ে উঠেছিল আশাবুল হকদের বাড়িতে। আশাবুলদের বাড়ির সামনে তখন শামিয়ানা টাঙানো হচ্ছে। তার মেয়ের বিয়ে। লঝমন লেগে গেল ম্যারাপ তৈরির কাজে। তারপর যথারীতি টুকিটাকি কাজ। কাজ করতে করতে সে হয়ে উঠল বাড়ির একজন।

আশাবুলের মেয়ের বিয়েও হয়ে গেল! বিয়ের পরে সে তার স্বামীকে নিয়ে বার দুই যাতায়াত করল। সেও প্রায় মাসখানেক। লঝমন তখনও আশাবুলের বাড়িতে। আশাবুলের মেয়ের শ্বশুরবাড়ি কাছের এক নদী পেরিয়ে। শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় মেয়ের সঙ্গে আশাবুলের বাড়ির প্রায় সকলে নদীবাঁধে গিয়ে দাঁড়ায়। লঝমনও। যতক্ষণ না দৃশ্যের বাইরে চলে যায় ততক্ষণ লঝমন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আশাবুল তখন হয়ত বাড়ির পথ ধরেছে।

লঝমন এখন খুবই ব্যস্ত। আলু ওঠার সময় হয়ে গেছে। অন্য জমিতে আরো কিছু খন্দ চাষ শুরু হয়েছে। লঝমন সকালে মাঠে যায়। সারাদিন কাজ আর কাজ। তার আর খাবার সময় নেই। আশাবুল নিজেই যায় তাকে ডাকতে। আশাবুলকে সে বাপজান বলে ডাকে। বলে—বাপজান, আকাশের অবস্থা ভাল নয়। একবার ঢাললে সব আলু পচে যাবে। যতটা পারি, তুলে ফেলি। রাতে বেশি করে খাবখন।

সে-রাতে বৃষ্টি এল ঝেঁপে। অসময়ের বৃষ্টি। নদীর জলও স্ফীত। আশেপাশের গ্রামের মানুষের মধ্যে সুখ নেই। সামনের সপ্তাহে শুরু হচ্ছে হাজীসাহেবের মেলা। সে মেলায় বিদেশ থেকেও লোকজন আসে। পীরের দরগায় ফুল চড়াতেই সকলের আনন্দ। এতে নাকি মানুষের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। কিন্তু বৃষ্টিতে সবই যে বানচাল হয়ে যাবে। লাখ লাখ লোকের ভিড়। যেন ছোটখাটো গঙ্গা-সাগরের মেলা। তাই প্রশাসনিক ব্যবস্থাও উঁচু পর্যায়ের। তবে মেলায় বড় বাধা হল ঐ নদী। নদীর ওপারে বিরাট চর। বর্ষায় সে চর ডুবে যায়। শীতে উল্টো কচ্ছপের পিঠ। সেখানেই মেলা। তবে হাজীপীরের থান নাকি বর্ষাকালেও ডোবে না। ঘোর বর্ষায় কেউ ঐ নদীর চরার আশেপাশে যায়নি, তবু মুখে মুখে প্রচার হয়েছে পীরের থান না ডোবার মাহাত্মের কথা।

টানা তিনদিন তিন রাতের বৃষ্টি। বৃষ্টি থামল। রোদ উঠল। রাস্তাঘাটের কাদা শুকাল। আকাশ-বাতাস বেশ খটখটে। গ্রামের মানুষের মনে খুশির ভাব। দল বেঁধে নৌকো করে চলল হাজীসাহেবের মেলায়। সাতদিনের এই মেলায় পুলিশই দিতে হয় কয়েক হাজার। আলাদাভাবে জলের ব্যবস্থা, রাতে বিজলীর ব্যবস্থা। সরকারী ব্যবস্থাপনায় মানুষের থাকার জন্যে বড় বড় ত্রিপল টাঙিয়ে তৈরি হয়েছে যাত্রীনিবাস। নানান দোকানপাট। কদিন আগে বৃষ্টি হওয়ায় শীতটাও পড়েছে

বেশি। মেলায় ঘুরে বেড়ানো মানুষদের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এই মেলায় এক রাত বেড়ানোর আনন্দই তাদের সারা বছরের অপেক্ষার ফসল।

সারা রাতদিন নৌকো যাচ্ছে, আসছে। মেলার সময় কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু লঞ্চ দেয় ফেরির জন্যে। বছর দুয়েক হল সঙ্গে জুটেছে ভুটভুটি। এত মানুষের ভিড়ের কাছে সেসবই অপ্রতুল। তিনদিনের মাথায় মেলায় এক রাত কাটিয়ে পরের দিন ফিরছিল কিছু মেলা ফেরত লোক। জয়গঙ্গা নৌকো করে ফিরছিল তারা। নদীর মাঝ বরাবর এসে দখিন দিকে ঘুরতে হয় নৌকোগুলোকে। নদীতে ছিল চণ্ডাল ঢেউ, আবার তার আগে একটা স্টীমার তীব্রগতিতে চলে গিয়েছিল সমুদ্রমুখী হয়ে। তার ঢেউও গিয়ে লাগল জয়গঙ্গার গায়ে। কোনভাবেই সামলাতে পারেনি নৌকোর মাঝিমাল্লারা। দূর থেকে যেসব লঞ্চ, ভুটভুটি, নৌকো যাচ্ছিল তারা প্রথমে স্তম্ভিত হলেও ডুবন্ত নৌকার কাছে যেতে সাহস পায়নি। তাদেরও তখন যাত্রীভর্তি। তাছাড়া নৌকোটা যেন ঘূর্ণির বেগে ঘুরতে ঘুরতে ডুবে গেল। সেই চোরা ঘূর্ণির কাছে যাওয়া তাদের সাহসে কুলোয়নি।

মুহূর্তে খবর রটে গেল আশেপাশের দশগ্রামে। নদীর পাড়ে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। হাজির কজন মন্ত্রী। পুলিশ তাদের সঙ্গে ছোটাছুটি শুরু করেছে। নেতারাও মন্ত্রীদের গায়ের ঘ্রাণ নিতে নিতে কর্মব্যস্ত মন্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলছে। নদীঘাটে মাইক লাগানো হয়েছিল আগেই। আগে সেখানে নৌকো, লঞ্চ ছাড়ার ঘোষণা করা হচ্ছিল। এখন সেখানে ঘোষণা করছেন স্বয়ং পরিবহনমন্ত্রী। তিনি জনগণকে অযথা ভীত হতে নিষেধ করছেন। পরিবেশনও করছেন কিছু তথ্য। বললেন, ইতিমধ্যে সতের জন ডুবুরি এসে গেছে। মাদ্রাজ থেকে প্রখ্যাত ডুবুরি আয়েঙ্গারও যে কোন সময় চলে আসবেন। স্বেচ্ছাসেবকরা স্পিডবোর্ড আর রবারের নৌকো নিয়ে স্পটে যাচ্ছেন। জলপুলিশের লঞ্চ জায়গাটা ঘিরে রেখেছে। সেখানে আলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উদ্ধারের কাজ কোনভাবে ব্যাহত হতে দেয়া হবে না। প্রয়োজনীয় সব পরামর্শ আমরা সরকারের তরফ থেকে দিচ্ছি। ব্যবস্থাও নেয়া হচ্ছে যথাযথ। আপনারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

সে ঘোষণা কারুর মনে তৃপ্তি আনছে না। সকলেই ম্রিয়মান। বাতাসে দুঃখের শোকের গন্ধ। নদীর ঘাটের কাছে ঘাটজমা নেবার অফিস। সেখানকার বারান্দাটা বেশ বড়সড়। অনেকটা জায়গা সেখানে। সেখানেই গ্রামের মানুষরা জড় হয়েছে। ইতিমধ্যে কান্নার রোল শুরু হয়ে গেছে। কয়েকটি শীর্ণকায় মহিলার বুক ফাটা কান্না সমস্ত পরিবেশটাকে কেমন যেন ছন্নছাড়া হতচ্ছাড়া ভাব এনে দিয়েছে। লঝমন সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।

দূরের বাস স্ট্যাণ্ডে বাস থামতেই গলগল করে লোক নেমে নদীঘাটের দিকে ছুটছে। তার মধ্যে অনেকে উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে হাঁটছে নদীর দিকে। তার

মধ্যে কারুর কারুর হাঁটার শক্তিটুকু নেই। কেউ কেউ তাদের ধরে নিয়ে চলেছে। এরই মধ্যে রটে গেছে নৌকোর মাঝিকে পাওয়া গেছে। সে নাকি সাঁতার কেটে পাড়ের দিকে আসার চেষ্টা করছিল। তাকে উদ্ধার করে এনেছে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী। তাকে মেলা হাসপাতালে রেখে দেয়া হয়েছে। তার নাকি হুঁশ নেই। লোকেরা ছুটেছে অভিশপ্ত নৌকোর মাঝিকে দেখতে। লঝমন হাসপাতালমুখী জনস্রোত দেখতে দেখতে ভাবছিল, লোকগুলো কেমন করছে যেন। জনস্রোত, না জনঘূর্ণী বোঝাই দায়। আর তখনই লঝমনের চোখে পড়ল আশাবুলের নতুন জামাই লতিফের দিকে। সে একটা লঞ্চ থেকে নামল। লঞ্চে সর্বসাকুল্যে জনা চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের লোক। মেলা ফেরত। নৌকোডুবির পরে এখন কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। লোক গুনে তবে একমাত্র লাইসেন্স দেয়া লঞ্চে, নৌকোতে তোলা হচ্ছে।

লঝমন ছুটে গেল লতিফের দিকে। গিয়ে বলল, কিগো দাদা, তুমিও মেলাতে গেছিলে নাকি?

লতিফের চোখ যেন রক্তজবা। অনেক কষ্টে একটা কান্না চাপছে। বলল, তোর দিদি আর আমার মা ওখান থেকে মেলায় গিয়েছিল। তার বাপের বাড়ি হয়ে ফেরার কথা। তা মেলা থেকে বাপের বাড়ি ফেরেনি শুনে সোজা চলে গেছিলুম মেলাতে। সেখানে ওদের দেখা পেলুম না। মাইকে কত ঘোষণা করলুম, কত খুঁজলুম, পেলুম না। ওরা কি ফিরেছে?

লঝমন কোন কথার উত্তর না দিয়ে এক ছুটে আশাবুলের বাড়ি। তারপর বাড়ি কাঁপিয়ে তার কী কান্না!

ঘটনা ঘটার পর দুটো দিন চলে গেল। মুখে মুখে নানান গুজব। শহুরে কাগজে লেখা এই নৌকোডুবির খবর নিয়েই নদীপাড়ে আলোচনা হচ্ছে। নানান জায়গায় জটলা। একদল সাংবাদিক। তাদেরও ছোটাছুটি। কজনের কাঁধে ক্যামেরা। মাঝে মাঝে উন্মুখ জনতার ছবি তুলছে তারা। পুলিশ এসে নদীর পাড়ের একাংশ থেকে লোকজন সরিয়ে দিচ্ছে। উদ্ধারকারী নৌকোগুলো ওখানে এসে দাঁড়াবে। জনস্রোত মাঝে মাঝে পুলিশী বেষ্টন ভেঙে ফেলছে। তারা কেউ কেউ চিৎকার শুরু করেছে। পুলিশ, মেলা কর্তৃপক্ষ, প্রশাসনের বিরুদ্ধে ভেসে আসছে তাদের কটূক্তি। কেউ কেউ রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে। তারা প্রশাসনের গাফিলতির জন্যে সরকারের জবাব চাইছে। চারিদিকে হুলুস্থুলু কাণ্ড। পুলিশের বড় কর্তাদের দু'একজন তাদের বোঝাবার চেষ্টা করছে। তাদের কথাবার্তায়, ব্যবহারে আশ্চর্য রকমের সংযম।

দূরে সম্ভবত মারপিট শুরু হয়েছে। কয়েকজন পুলিশ ছুটল সেদিকে। কিছু কিছু লোকও। খবর রটে গেছে, প্রতিজন মৃতের পরিবারকে পঁচিশ হাজার টাকা

করে ক্ষতিপূরণ দেবে সরকার। সেই খবর শোনার পরে নিজেদের কেউ মারা গেছে ঐ নৌকোডুবিতে বলে দাবী করছে অনেকেই। দাবীদারের সংখ্যা হিসেব করলে দেখা যাবে তখন প্রায় শ তিনেক ছাপিয়ে গেছে। কয়েকজন লোক একজন মেকি দাবীদারকে ধরে ফেলেছে। তার প্রতি তাই গণপ্রহার শুরু হয়েছে।

অপেক্ষাকৃত দূরে কিছু লোক চুপচাপ বসে আছে নদীর দিকে মুখ করে। কোনদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা নদী দেখছে না। নদীর জল নয়। নদীর ঢেউ নয়। নদীর সৌন্দর্য তাদের কাছে বড় ঘৃণার। নদীতে কেউ ভেসে যাচ্ছে কিনা প্রখর দৃষ্টিতে তা ধরতে চাইছে তারা।

ইতিমধ্যে হাটবাবুর ঘরের পাশের বড় মাঠে ছাউনি তৈরি হয়ে গেছে। হোগলা দিয়ে তৈরি শ তিনেক লোক বসার মত ঘর। ওপরে ত্রিপল। নিচে খড় পাতা। তার ওপরে হোগলা পাতা। এই হল যাদের প্রিয়জন ঐ অভিশপ্ত নৌকোতে ছিল তাদের জন্যে সাময়িক আচ্ছাদন। প্রশাসন বহু আগেই এই আচ্ছাদনের কথা ঘোষণা করেছে। সেখানে পানীয় জল দেবার ব্যবস্থা। চা চাইলে চাও পাওয়া যাচ্ছে। পাশেই তৈরি হয়েছে একটা লঙ্গরখানা। একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সেই লঙ্গরখানা খুলেছে। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। যারা চাইবে তারা গিয়ে বিনা পয়সায় খেয়ে আসতে পারবে। সাময়িক আচ্ছাদনের উল্টোদিকে ব্যবস্থা হয়েছে জলে ডোবা মৃতদেহ আনবার। কারণ ঘটনার দুদিন পরে আর কেউ বেঁচে নেই বলে সকলের ধারণা। এখন শুধু মৃতদেহ এনে সনাক্তকরণ। তাই মৃতের প্রিয়জনের থাকার ব্যবস্থা। আর সেখানে মৃতদেহের সন্ধানে প্রথম দলের ভিড়ে মিশে গেল লখমন।

একটা উদ্ধারকারী নৌকো এসে নির্ধারিত ঘাটে দাঁড়াল। লাইফ সেভার জ্যাকেট পরে জনা পাঁচেক লোক স্পিটবোর্ডে। তাতেই শোয়ান আছে এক মহিলার মৃতদেহ। শাড়ী নেই। তার পেট ফুলে জয়ঢাক। শক্ত করে বাঁধা শায়ার দড়িটা যেন সেই ঢাকটাকে টুকরো করে রেখেছে। নদীঘাট থেকে সনাক্তকরণ জায়গা পর্যন্ত এঁকেবেঁকে জনস্রোত। দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন কোন ফণিমনসার একটানা ঝাড়।

মৃতদেহ আচ্ছাদনের সামনে আনতেই শ তিনেক লোকের বৃত্ত তৈরি হল মৃতদেহ ঘিরে। যারা ঠিক মত দেখতে পারছে না তারা ভিড়ের পিছন থেকে নুঁয়ে পরা মানুষের ওপরে উঠে যাবার উপক্রম করল। তারপরেই দুই পুরুষ আর এক মহিলা চিল চেঁচানো ক্রন্দন। মহিলাটি তার কথা শেষ করার আগেই মূর্ছা গেল।

অন্যেরা আবার নিজেদের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল। কারুর কারুর মাথা

নিচু। তারা মনে মনে কাঁদছে। প্রচণ্ড শীত থেকে বাঁচার জন্যে কেউ কেউ গরম চাদরে মাথা পর্যন্ত মুড়ে ফেলেছে। এসব চাদর শহরের কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিতরণ করে গেছে। কেউ কেউ চলে গেল নদীঘাটে। কোন নৌকো এদিকে আসছে কিনা তার আগাম আভাস নিচ্ছে।

এখন নদীর পাড় বরাবর টাঙানো মাইকে ঘোষণা হচ্ছে। ঘোষণা করছে এক বাজখাঁই গলার পুরুষ। এখুনিই নাকি নদীর ওপর থেকে উদ্ধারকারী পার্টি খবর দিয়েছে তারা তিনটি পুরুষ আর একটি শিশুর মৃতদেহ তাদের বোর্ডে তুলেছে। তারা পাড়ের দিকে রওনা হচ্ছে।

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যেন জনসমুদ্রে ঢেউ উঠল। চারিদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলো উদ্ধারকারী নৌকো এসে দাঁড়াবার জায়গায় এসে জড় হল। ভিড়ের ঠেলাঠেলি।

মৃতদেহ এনে রাখা হচ্ছে ত্রিপল বিছানো একটা জায়গায়। ঘেরা পুলিশের মধ্যে ডাক্তারবাবুরা সেসব মৃতদেহ পরীক্ষা করছেন। তারই ফাঁকে যাদের প্রিয়জন হতে পারে—বুক ধড়ফড় করা মন নিয়ে তাদের কেউ কেউ মৃতের মুখ দর্শনের চেষ্টা করছে। নিজেদের কেউ না হলে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে আবার অপেক্ষা করা। উৎসাহী জনতার ভিড় বৃত্তের বাইরে থেকে দেখার প্রাণপণ চেষ্টায়। অনেকেই ভিড়ের ফাঁক দিয়ে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তারাই তিনটে মৃতদেহ এলে বাইরে প্রচার করছে নটা মৃতদেহ এসেছে বলে।

লখমনের এ মুহূর্তে দম ফেলার সময় নেই। সে যে সেই আশাবুলের বাড়ি থেকে এসেছে আর ফিরে যায়নি। যাদেরই মৃতদেহ আসে সে তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ করে সঙ্গ দেয়। কাউকে কাউকে স্তোকবাক্য শোনায়, কারুর চোখের জল মুছে দেয়।

এদিকে মৃতদেহ সনাক্তকরণ হলেই কাজ শেষ হয় না। প্রশাসনের কাজ বেড়ে গেছে। মৃতের নাম ঠিকানা বয়স সব লিখে টাঙিয়ে দেয়া হচ্ছে। কাছেই পুলিশের ক্যাম্প বসেছে।

তার বাইরের দেয়ালেও টাঙানো হচ্ছে মৃতের সবিশেষ পরিচয়। তার কাছেই সাময়িকভাবে তৈরি করা হয়েছে মর্গ। সেখানে মৃতের ফোটো তোলা হচ্ছে তিন চার দিক থেকে, বিভিন্ন কোণ থেকে। মৃতের তালিকা এক কপি সংগ্রহের জন্যে সাংবাদিকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছে।

এভাবে দুর্ঘটনার পাঁচদিন কাটল। ইতিমধ্যে সাতচল্লিশ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। উনত্রিশ জন পুরুষ তেরজন মহিলা আর পাঁচটি শিশু-কিশোর-কিশোরী। উদ্ধারকারীরা ক্লান্ত। উদ্ধার কাজেও একটু ঢিলেমি এসে গেছে। তবু অনেকের ধারণা, আরো মৃতদেহ পাওয়া যাবে।

অভিযোগ উঠছে সকল দিক থেকে। স্থানীয় বিরোধিদলের নেতা প্রকাশ্য জনসভায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে। প্রশাসন নাকি ঠিক সময়ে সাহায্যে এগিয়ে আসেনি, উদ্ধারকার্যে গাফিলতি, মৃতদেহ আত্মীয়স্বজনদের হাতে তুলে দেবার আগে অনাবশ্যক হয়রানি করা হচ্ছে...ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রশাসন কর্তৃপক্ষও অন্যদিকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছে। সাহায্যের নাম করে কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিজেদের সংস্থার নামপ্রচারে নেমে গেছে। খবরের কাগজেও মৃতের সংখ্যার খতিয়ান নিয়ে নানান বিভ্রান্তি। তারা খবরের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে সরকারী বেসরকারী সূত্র। তাতে বিস্তর ফারাক। ভিন্ন ভিন্ন সংবাদপত্রে আবার ভিন্ন ভিন্ন তথ্য। নদীর পাড়ে উপস্থিত দর্শকদের সঙ্গে তাই নিয়ে কূটকচালি আলোচনা। নদীতে যত মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে অনেকই নাকি ইচ্ছা করে তোলা হচ্ছে না। তুললে তো সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এদিকে প্রশাসনও বিপর্যস্ত। কিছু কিছু মৃতদেহের দাবীদার নেই, কিছু কিছু মৃতদেহের একাধিক দাবীদার। কোন কোন মৃতের শরীরের অনেকটা অংশ নেই। গলিত অর্ধাংশ তুলে এনেছে উদ্ধারকারী দল। আংটি, শাঁখা বা অন্য কিছু দেখে সেসব সনাক্ত-করণ করা হচ্ছে।

নবম দিন। লঝমন এই ন' দিনে বিশ্রাম পায়নি। প্রথম তিন-চার দিন সম্ভাব্য মৃতের আত্মীয়স্বজনরা সব সময় উপস্থিত থাকত। তারপর কেউ কেউ মৃতদেহ পেয়ে চলে গেছে। কারুর কারুর অধীর অপেক্ষার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। ফিরে গেছে বাড়িতে। মাঝে মাঝে এসে বা লোক মাধ্যমে খবর নিচ্ছে। অনেকের মধ্যে আত্মীয়স্বজনের বিয়োগ ব্যথার ওপরে সময়ের প্রলেপ পড়েছে। কান্নার আওয়াজ আর বাতাসকে ভারি করে তুলছে না। সবদিক দিয়েই যেন একটা গা-ছাড়া গা-ছাড়া ভাব। নদীপাড়ে আর সাংবাদিকদের দেখা যায় না। শহরের সংবাদপত্রগুলো কেবল সর্বশেষ মৃতের পরিসংখ্যান লিখে দিয়ে কাজ সারছে। প্রশাসনও ঘোষণা করেছে আগামীকাল থেকে উদ্ধারকার্য বন্ধ করে দেয়া হবে। আর কদিন আগে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা নিয়ে একটা বিভাগীয় তদন্ত হবে বলে বিধানসভায় বক্তৃতা দিয়েছেন বিভাগীয় মন্ত্রী।

বস্তুত চারিদিকে যেন ভাঙা হাট। তার মধ্যে লঝমন অচঞ্চল। সে এই কদিনে ছিল ভয়ঙ্কর ব্যস্ত। প্রিয়জনের মৃতদেহের জন্যে যারা আচ্ছাদনের তলায় অপেক্ষা করছিল তারা যখন স্নান-খাওয়া বা অন্য কাজে বেরুচ্ছিল, তখন লঝমনই তাদের হয়ে হাজিরা দিচ্ছিল। সে প্রত্যেকের হারিয়ে যাওয়া মানুষজনের চেহারার বর্ণনা শুনে রেখেছে। কে কোথায় থাকছে জেনে নিয়েছে। মৃতদেহ এলে তাকে চিনে ফেলতে পারবে এমন একটা ধারণা তৈরি করেছে সে। সে এখন পরিবর্ত-মানুষের কাজ করছে। এই কদিনেই লঝমন প্রিয়জনহারা মানুষগুলোর খুব কাছে চলে

এসেছে। লঝমন হয়ে উঠেছিল তাদের হারানো প্রিয়জনের বিকল্প। তাদের দুঃখ লঝমনের দুঃখ। তাদের কান্নায় লঝমনের চোখ ভিজে যায়। তারা খেলে তবেই লঝমন খাচ্ছে।

উদ্ধারকাজের শিবির ভেঙে দেয়া হয়েছে। নদীঘাট এখন শুনশান। যে যার মত বাড়ি ফিরেছে। প্রশাসন শেষের দিকে কেবল জানিয়েছে নদীতে নজর রাখা হবে। যদি কেউ ডেডবডি পায় তবে যেন থানাতে খবর দেয়া হয়।

লঝমন আর আশাবুলের বাড়ি ফেরে না। সে হেঁটে চলেছে নদীর পাড় ধরে। যদি কোন মৃতদেহ দেখে সে, সেই আশায়। মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে সে যদি কোন দাবীদারহীন মৃতদেহ পায় তবে সে তার আত্মীয় বলে চালিয়ে দেবে। সরকার থেকে তাকে তাহলে অনেক টাকা দেবে। সে ভাবে সেই টাকাতে সে রাজা হয়ে যাবে। রাজার মত বসে বসে সে খাবে। আর কোন কাজ করবে না সে।

মৃতদেহের সন্ধানে দুদিনের পথ চলছে সে। কখনও নদীতে ভেসে আসা পোড়া কাঠের একটু বড় টুকরো দেখলে সে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। কখনও খিদের দাপটে নদীর জল খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

মৃতদেহের সন্ধানে ক্লান্ত হয়ে লঝমন নদীর পাড় থেকে একটু দূরে একটা দীর্ঘ শিরিষ গাছের গোড়ায় গিয়ে আশ্রয় নিল। আর আশ্চর্য, রোদের তেজ কমে যেতেই তার নজর গেল সোজাসুজি নদীর মাঝরাবর। কি যেন একটা ভাসছে। লঝমনের খিদে তখন কমে এসেছে। এমন মাঝে মাঝে হয় লঝমনের। দু'তিনদিন না খেলে তার খিদেটা চলে যায়। সে এক দৌড়ে নদীর পাড়ে। উফ্, সত্যিই একটা মৃতদেহ। তবে দেখে মনে হচ্ছে, তাজা। এ কদিনে লঝমন অনেক মৃতদেহ দেখেছে। সদ্য মৃত্যু হয়েছে এমন মৃতদেহ থেকে একেবারে গলে খসে পড়া, কামোটে পা কেটে নেয়া বা বড় মাছের কামড়ে পেটের নাড়িভুঁড়ি উধাও হয়ে যাওয়া মৃতদেহ দেখেছে সে। তাই এই মৃতদেহটিকে তার তাজা তাজা মনে হল।

এক হাঁটু জলে নেমে সে মৃতদেহটি তুলল। উলঙ্গ এক যুবতীর দেহ।

মৃতদেহ টেনে এনে সেই শিরিষের নীচে লুকানো ভঙ্গিতে রেখে দিয়ে লঝমন ছুটল থানায়। দু' ক্রোশ দূরে থানা। থানায় যখন পৌঁছল তখন রাত। হাঁফাতে হাঁফাতে লঝমন সেই মৃতদেহের বর্ণনা দিল। এখন লঝমন অন্যরকমের। সে দাবী করল, ঐ মৃতাই হল তার স্ত্রী।

থানার ওসির নির্দেশে সেই রাতেই নদীর পাড় ধরে একদল পুলিশ নিয়ে এসে মেজ দারোগা সেই মৃতদেহ তুলে নিয়ে গেলেন। মৃতদেহ ছুঁয়ে লঝমনের সে কী কান্না। লঝমন বলছিল, কদিন আগে মেলায় যাবে বলে বেরিয়ে আর ফেরেনি

তার বউ। কিন্তু মৃতদেহ দেখে অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসারের সন্দেহ জাগে। তাঁর মতে, এটা নৌকোডুবির কেস নয়। অন্য কিছু। তিনি কোন কোন সময় স্থানীয় হেল্‌থ সেন্টারের বড় ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করেন। বড় ডাক্তার মৃতদেহ দেখে বলে গেলেন, তাঁর মনে হচ্ছে, এ কেস অফ গ্যাং রেপিং। তারপর মেরে ফেলে জলে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে। একে পোস্টমর্টেম করতে পাঠান।

লঝমনের অভিনয় শুরু হয়। ভয়ঙ্করভাবে কেঁদে পড়ে মেজবাবুর পায়ে। তার এমন সর্বনাশ কেউ করতে পারে বলে সে ভাবতে পারে না। পোস্টমর্টেম করার পর মহকুমা হাসপাতাল থেকে তার বউয়ের মৃতদেহ আনার মত তার সামর্থ্য নেই।

ইতিমধ্যে পুলিশের তরফ থেকে যা যা করণীয় তা করা হয়েছে। তরুণ এক পুলিশ অফিসারের মন ভিজে যায় লঝমনের কান্নায়। সে লঝমনের পকেটে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট ঢুকিয়ে দেয়। তারপর একটা কাগজে খসখস করে মহকুমার যে হাসপাতালে যেতে হবে তার ঠিকানা লিখে দিয়ে বলল, বডি আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেখানে সব কাজ হয়ে গেলে বডি তোমাকে তারা রিলিজ করে দেবে। তারপর ফিরে এসে দেখা করবে।

লঝমন সেই টাকা নিয়ে আবার মুসাফির। না, এবার আর কোন বাড়িতে নয়। সোজা নদীর পথ ধরে। যাবার পথে বাজারে বসে পেট ভরে সে খেয়ে নেয়। তারপর রাতের জন্যে এক ঠোঙা মুড়ি আর তার পছন্দমত কিছু তেলেভাজা কিনে নিয়ে কোমরে বাধা গামছায় মুড়ে বেঁধে ফেলে। তারপর সেটা কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে ঝুলিয়ে দিয়ে গামছার অন্যপ্রান্তটা ধরে হাঁটা শুরু করে। উদ্দেশ্য সেই শিরিষ গাছতলা।

শীতের রাত। নদীর পাড়ে শিরিষ গাছতলায় লঝমন একেবারে কুঁকড়ে যায়। স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানের দেয়া গরম চাদরটি তার ভরসা। শীতে তার ঘুম আসে না। দূরের এক শ্মশানে তখন গনগনে আগুন। লঝমন উঠে পড়ে। চলে যায় শ্মশানে। মুহূর্তে সে শ্মশানবন্ধু। লেগে গেল সৎকারে। চিতার আগুনে তার শরীর তেতে যায়। সেখানে সে শংকর বামুনকে পুনর্বার দেখল। যখন জয়গঙ্গা নৌকোয় ডুবে মরা মানুষদের তুলে আনা হচ্ছিল তখন সেখানে এই শংকর বামুনকে ঘুরঘুর করতে দেখেছিল সে। তাকে দেখে তখন অনেকে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তাকে দেখা মানে মৃত্যুকে দেখা, এমন কথা চালু আছে এ অঞ্চলে। কিন্তু আজ সেই শংকর বামুনকে কেমন নির্লিপ্ত মনে হচ্ছে। তার চোখে জল। এক নব্বুই একানব্বুই বয়সের প্রবীণের মৃত্যুতে সেও বাকহারা। তার কাছে সব ধরনের মৃত্যু এক হলেও এই বৃদ্ধের মৃত্যুতে সে বেশ পীড়িত। এই দীর্ঘ বয়স পাওয়া মানুষটি এ তল্লাটে জীবন্ত কিংবদন্তী ছিলেন। কত পুরনো দিনের কথা

তাঁর জানা ছিল। তাঁর মৃত্যুতে সেই ইতিহাস মুছে গেল। তাই এই মুহূর্তে শংকর বামুনকে লঝমনের বেশ ভাল লেগে গেল।

গাছতলায় ফিরে গিয়ে শুরু হল লঝমনের আর এক চিন্তা। সে কেবল পেটের জন্যে, ক্ষুধার জন্যে দারোগাবাবুর কাছে এমন মিছে কথা বলল? অথচ কোন মানুষ যদি সকলের অলক্ষ্যে কিছু করে থাকে তবে তার জন্যে কেউ না কেউ ভাবে। তার কাজের হিসেব থাকে। শ্মশানের পুরোহিতকে যারা মরা-পোড়ানো বামুন বলে ঘৃণার ভাব দেখায় সেই লোকটিও একটি বৃদ্ধের মৃত্যুতে কেঁদেছিল। আর লঝমন কেবল পেটটার কথা ভাবল? নিজের প্রতি তার ঘৃণা জাগল। সে এই সিদ্ধান্তে এল, তার ক্ষুধাই তাকে বিপথগামী করেছে। ওই যে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘোরা, তাও নিশ্চয় ঐ পেটের জ্বালার জন্যে। নিজের প্রতি ঘৃণায় লঝমন ছটফট করে ওঠে। সে গতদিনের বাসী মুড়ি, তেলেভাজার ঠোঙা খুলে সেসব দেখতে লাগল। মনে হল, ঠোঙার মধ্যে তার বাঁধন ছাড়া জীবনটা আটকে আছে।

লঝমন ওপরমুখো হয়ে শিরিষগাছের দিকে তাকাল। একটা শুকনো কাঠ অনেকটা ধনুকের আকৃতি নিয়েছে। লঝমন ঝটপট গাছে উঠে শুকনো ডালটা ভেঙে এনে মাটিতে পেতে দিল। মুড়িগুলো দিল ছড়িয়ে। তেলেভাজার ঠোঙাটা একটা মানুষের মাথার আকার তৈরি করে রেখে দিল কাঠটার একদিকে। তারপরে তার ওপরে চাপা দিল তার গরমের চাদরটা। দূর থেকে দেখলে এখন মনে হবে একটা মৃতদেহ বা ওরকম কিছু চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে।

রাতের কাজ শেষ করে নদীর পাড় ধরে শংকর বামুন ফিরে যাচ্ছে। পাশের গ্রামে তার বাড়িতে। এখানকার ব্যবস্থা এমন যদি কারুর সৎকার করতে হয় তবে শংকর বামুনের বাড়ি গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হয়। তাই এই শ্মশানে কারুর থাকার প্রয়োজন হয় না।

শংকর বামুনকে দেখে লঝমন নদীপাড়ে ছুটে এল। শংকর বামুনের সামনে হাত জোড় করে বলল, ঠাকুরমশাই গো, আমার একটা ডেডবডি আছে। দাহ করতে হবে।

তোর? তোর ডেডবডি? বিস্ময়ে শংকর বামুন বলল।

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, আমার। লঝমন উত্তর দেয়।

তা তুই কোন্ গাঁয়ের লোক? শংকর বামুন প্রশ্ন করেই সঙ্গে সঙ্গে বলল, কিন্তু সব মিলিয়ে চল্লিশ টাকা পড়বে। আমার দক্ষিনে পনের টাকা। আছে তো?

লঝমন তার কাপড়ের খুঁট খুলতে আরম্ভ করে। তারপর কিছু নোট, কিছু খুচরো গুনে শেষ করে বলল, একটু কম হচ্ছে। সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা।

দে, বলে টাকার জন্যে হাত পাতল শংকর বামুন। টাকাটা গুনে নিয়ে বলল, শ্মশানে নিয়ে আয় বডি।

লঝমন বলল, এই তো কাছেই। আসুন না।

রাস্তায় বডি রেখে দিয়েছিস? কি ব্যাপার, গণ্ডগোলের কিছু নাকি? আমি বাব্বা ওসব ঝামেলার মধ্যে নেই। সতর্কিত শংকর বামুন।

শংকর বামুনের দু' হাত ধরে কাকুতি মিনতি করে লঝমন। বলে—নাগো না, তেমন কোন কিছু নয়। এসে দেখই না।

তারপর গাছতলায় শংকর বামুনকে নিয়ে এসে সেই গরম চাদর ঢাকা দেয়া জায়গাটা দেখাল লঝমন।

এটা বডি? বাব্বা, এত রোগা? কিরে—বাচ্চা, না শুঁটকে বুড়ো? একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে শংকর বামুন।

লঝমন ধীরে ধীরে গরম চাদরটা সরায়।

সেটা দেখে বিস্মিত হয়ে শংকর বামুন বলে, এটা কী? এটা বডি নাকি? ইয়ার্কি হচ্ছে?

অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গি করে লঝমন বলল, হ্যাঁ, ঠাকুরমশাই। এটাই বডি। এটাকে দাহ করুন। এর নাম ক্ষুধা।

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

—

ধর্মের কল এবং কলের ধর্ম

ধর্মতলার ন তলার খোপে এই জুনে ফুল স্পীডে পাখা ঘুরছে। বেশী ঘাম হওয়া মানুষেরা মুখে রুমাল ঘষছে ঘন ঘন। দেয়াল ঘেঁষা টেবিলে টেবিলে কমপিউটার বিন বিন করছে। এ ঘরের সামনে করিডোর। ওখানে একজোড়া পাখা। প্রকাণ্ড সব পেতলের ভাস আর আধপুরু কার্পেটের মাঝখানে সোফা সাজানো। ডান হাতের কাঁচে রিসেপশন। তিন তিনটে টেলিফোন, ইন্টারকম। আর এখানে এই দুপুরের চটি ফট্‌ফট্ ধুলো ঝাপটানো পায়ে হাঁটা পঞ্চায়েতের ব্রিক সোলিং রাস্তায় অসীম চক্রবর্তীর ফোলিও ব্যাগের গায়ে সোসিও ইকনমিক ইনফরমেশন টেকনলজি গরমে গলে পড়তে চাইছে। ন তলার খোপের ওধারে করিডোর পেরনো ঝাপসা কাঁচের ঘরে কোম্পানীর এম ডি মিস্টার ত্রিবেদী রিটায়ার্ড সরকারি অফিসার। এ জাতীয় কাজের কায়দা কসরত তাঁর নখদর্পণে। একসিকিউটিভদের মিটিঙে সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন কাজটা অর্থাৎ প্রোজেক্টটা কতদিনের; সরকারের সঙ্গে চুক্তি মাফিক এই নাইনটিসিকস্-এর ডিসেম্বরে প্রিলিমিনারি রিপোর্ট দিতে হবে। ফলে এনিউমারেটরদের ভাগে ভাগে নেমে পড়তে হয়েছে ধর্মতলার খোপ ছেড়ে। অসীমেরই এক কলিগ ব্রজলাল চৌধুরী বর্গী নামার সঙ্গে ব্যাপারটার তুলনা করেছিল। অর্থাৎ বেরিয়ে পড়ো গ্রামে-গঞ্জে, খুঁজে বেড়াও আতিপাতি করে আরটিজানদের, কে কোথায় ভাগ্যহত লোকশিল্পী পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে তাকে কোম্পানী প্রদত্ত প্রোফরমা কষে দেয়া ফর্মে বন্দী করে নিয়ে এসো, ঢেলে দাও তোমার যাবতীয় অনুসন্ধানমালা যথাস্থানে। সেসব ঝাড়াই বাছাই হয়ে চলে যাবে ত্রিবেদী সাহেবের টেবিলে। অবশেষে ডিসেম্বর। ছিয়ানব্বই সালও শেষ। প্রাথমিক সার্ভে রিপোর্ট চুক্তি মতন যথাসময়ে সরকারের কাছে জমা।

ধুলোর ভেতরে পা চালাতে চালাতে অসীম মনে মনে আর একবার ভুলটা শুধরে নেয়। গ্রামের নামটা আনোখা হবে আনখা নয়। মাত্র ছ মাস এই কোম্পানীতে জয়েন করে সুকিয়া স্ট্রিটের জন্মগত জিভ বা জিভের স্বভাব কিছুতেই প্র্যাকটিক্যাল হতে পারছে না। এর মাঝে অনেক দিনের জন্যে কোম্পানী দার্জিলিং পাঠিয়েছিল। সেখানে মাত্র একজন লোকের বায়োডাটা ইত্যাদি ফর্মে

কজা করতে হয়েছিল। ওটা একটা স্পেশাল কেস স্টাডি। জায়গাটার নাম ছিল বিজনবাড়ি। বস্তি এলাকার আরটিজান লাকৃপা শেরিং। বিজনবাড়ি নামটার সঙ্গে শীত দেশের হিমেল নির্জনতার কিরকম অদ্ভুত একটা সম্পর্ক আছে। সেই সঙ্গে লাকৃপা শেরিং অনেকটা কনকনে ঠাণ্ডার মাঝখানে, কুয়াসা কুয়াসা পাহাড়-দেশে একটি পাহাড়ি কাঁটা ফুলের গাছ। আর উত্তর চব্বিশ পরগণার এই নদীয়া জেলা ঘেঁষা গ্রামটির নাম আনথা নয় আনোখা। নখের সঙ্গে সম্পর্ক বিরহিত নাকি সেই কবিতার লাইনটির কাছাকাছি—আনখ সুন্দুর—কিম্বা কিছুই হয়ত নয় এখনই এক মনে মনে অযথা কাব্যিক হয়ে যাওয়া। এক একটা নাম হয়ত এরকমই এসে যায় যার ভেতরে অকারণ রহস্যময়তা লুকিয়ে থাকে। এ সব নিয়ে প্রোফর্মা রিপোর্টে বলার কোনো স্কোপ নেই। যেমন এই কতকটা কাকতালীয় ভাবে উঠে আসা এই আনোখা গ্রামের এক আরটিজান সনাতন কায়পুত্র—যার সন্ধানে কমপিউটার টেকনলজির গ্রামে ছেড়ে দেয়া সমীক্ষক অসীম চক্রবর্তীর এই ভর দুপুরে বারাসাত হোটেলে খাওয়া মাছ ভাতের বদ ঢেঁকুর গিলতে গিলতে হেঁটে চলা। সেই সঙ্গে ফোলিওর মধ্যে গজগজ খসখস ফর্ম-এর দিস্তে। বারাসাত ডি আর ডি এ অফিস—দারিদ্র দূরীকরণ তথা স্বনিযুক্তিকরণ যাদের মূল লক্ষ্য—সঙ্গে বাড়তি হিসেবে গুঁজে দিয়েছে আরো কিছু লিফলেট-কাগজ। তাদেরও এই ব্যাগের ভেতরে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি। প্রাইভেট কোম্পানির সঙ্গে সরকারি প্রতিষ্ঠানের চাপা বিরোধজনিত এক ধরনের হুতাশ। অসীম ভেবে পায় না—না চাইতেই এতগুলো রঙীন লিফলেট-কাগজ ওরা দিল কি করে! না কি ওগুলো দিয়ে ব্ল্যাক মানি হোয়াইট করা, অথবা, বাঁচা গেল—কিছু মাল তো গেল।

বারাসাত জেলা অফিস থেকে বলে দেয়া হয়েছে প্রয়োজনে লোকাল বি ডি ও অফিসে যোগাযোগ করতে। এ ছাড়া স্থানীয় অঞ্চল প্রধান তো আছেনই। অসীম প্রথমেই সরাসরি মানুষটির কাছে যাবার কথা মনে মনে স্থির করে নেয়। কেন জানি তার মনে হয় তা না করলে হয়তো অকারণে জটিলতার উপদ্রব জুটতে পারে। এই মনে হওয়ার পেছনে হয়তো জেলা সরকারি অফিস থেকে বিদেয় করা ওই কাগজের বোঝার আতঙ্ক কাজ করেছিল।

সরাসরি যাওয়ার রাস্তাটি পায়ে হাঁটা, ধুলো ওড়া। জুন মাসের দুপুর ধাঁধানো আকাশে ইতস্তত মেঘের আণ্ডিল। ছোট গঞ্জ মতন জায়গাটিতে গুটিকয় চা আর মুদি দোকান। একটি সারের দোকানও। তার পাশে টিউবওয়েল মেরামতি। চা দোকানে টেপ রেকর্ডারে হিন্দি গানের ধকল। একটি জীর্ণ ষাঁড় উদাস ঘুরছে। ওধারের কামারশালে হাপর বইছে। ফেলে আসা পিচ রাস্তা বরাবর ট্রাক দৌড়োচ্ছে। পেছনে নিঃসঙ্গ এক অটো। রাস্তার এ মাথা থেকে সে মাথা সদ্য শেষ হওয়া নির্বাচন-জনিত ছেঁড়া রঙচটা শালু। অমুককে অমুক চিহ্নে ভোট

দিয়া জয়যুক্ত…। প্রার্থীটি কি বিপুল ভোটে পরাজিত? সে যাই হোক, ধর্মতলার টেকনলজি আর সুকিয়া স্ট্রিট-এর বনেদি বাসা বাড়ির থেকে রাফলি পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন কিলোমিটারের মধ্যে এই গ্রাম, পশ্চিম বাংলার এক অপ্রত্যন্ত অঞ্চল যার বাসিন্দা জনৈক গ্রামীণ পটশিল্পী সনাতন কায়পুত্রের নামধাম কমপিউটারে ভরা আছে হরেক সূত্র থেকে সংগ্রহ করে। এখন সেই নামের শিকড়টির সঙ্গে কাণ্ড, ডালপালা ইত্যাদির রঙ চড়াতে হবে। টেনে বার করতে হবে পেটের তত্ত্ব থেকে যাকে বলে আঁতের কথা। আসলে পেটই তো আসল বস্তু। পেটে না পড়লে শিল্প বাঁচবে কেমন করে! আবার অসীমের কাজটাও কতকটা পুরনো কালের হোটেলে পেটচুক্তি খাওয়া গোছের। কোম্পানির পেটের খোঁড়প তো কম নয়।

গ্রামের নাম আনোখা। বারাসাত সদরের আণ্ডারে এ পর্যন্ত বাসে আসতে সময় লেগেছে প্রায় এক ঘণ্টা। তারপর থেকে হাঁটা চলেছে। রাস্তার মুখে চায়ের দোকানে জেনে নিয়েছিল প্রথমে পড়বে বৈকুণ্ঠগাছা। ওখানেই অঞ্চল অফিস। তারপর আর খানিকটা গেলে আনোখা হাই মাদ্রাসা। তার পাশ দিয়ে ডান হাতে যে সরু পথ, ওটা চলে গেছে কাহারপাড়া। ওই পাড়ার মুখে সরকারি নলকূপের সামনে সনাতন কায়পুত্রের ঘর।

হুবহু না হলেও মোটামুটি সবই মিলে গেল। গ্রামপঞ্চায়েত অফিস পাশ কাটাতে গিয়ে অসীম দেখল খাঁ খাঁ দুপুরে পাকা কোঠা অফিসের সামনে একটি গাছের নিচে চেয়ার পেতে দু'জন লোক। একজনের হাতে পাখা, অন্যজন ঝিমোচ্ছে। অফিসের টঙে গ্রামীণ সোলার টেলিফোনের অ্যান্টেনা। উল্টোদিকের নয়ানজুলিতে জল নেই, খটখটে কাদা। একজন মাথায় গামছা বাঁধা লোক পাশ দিয়ে সাইকেল ছ্যাড়ছেড়িয়ে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে দ্রুত গলায় অসীমের জন্যে রেখে গেল, ঘর সে নিকলতে হি, কুছ দুর চলতেহি…।

নলকূপের গায়ে সরকারি কথাটা তো লেখা থাকে না। তবু চা-দোকানীর বলে দেয়া অনুযায়ী সরু পথ পেরিয়ে রাস্তার পাশে একটি টিউবওয়েল এবং তার উল্টোদিকে একটি পাড়া মতন। এক দঙ্গল কুচো-কাঁচা, হয়তো টিফিন বেলার মাদ্রাসার দিক থেকে ছুটে এল। হ্যাচাং হ্যাচাং টিউবওয়েলে পাম্প। জল ছোঁড়াছুঁড়ি। দুপুরের ঝাঁঝে হঠাৎ রামধনু। দূর মাদ্রাসার দোতলা বারান্দা থেকে মৌলবি সাহেবের পিচিক্ পিক ফেলা। ফোলিও ব্যাগে সরকারি-বেসরকারি কাগজপত্রের চাপা সমঝোতা। এরই মধ্যে কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক অসীমের সামনে প্রায় দৈববাণীর কাছাকাছি, বাবু কোন বাড়ি যাবেন?

প্রায় চমকে পেছনে তাকায় অসীম। পাঁক মেটে পাঁক মেটে রঙা মাঝবয়সী যে লোকটি এইমাত্র কথা বলল তার মাথায় গামছা চাপানো, খালি গা আর এঁটে পরা হাঁটু কামড়ানো ধুতি।

অসীম বলে, এখানে সনাতন কায়পুত্রর বাড়ি কোনটা ?

লোকটি চোখ কুঁচকে ভালো করে দেখে অসীমকে। তারপর তার হাতের ব্যাগটির দিকে অনাবশ্যক আঙুল তুলে বলে, বাবু কি ব্যাঙ্ক থেকে এয়েছেন ?

অসীম মাথা নাড়ে। লোকটি কতক হতাশ মুখে বলে, বাবুরা বলেছিলেন এ হপ্তার মধ্যেই আমার এনকুয়ারিটা সেরে দেবেন।

আর একবার চমকে ওঠে অসীম এবং সঙ্গে সঙ্গেই মানেটা বুঝে ফেলে। সরকারি টিউবওয়েলে কুচোদের জল পান ও জল ছোঁড়ার উল্লাস কাজ করে যায়। মাদ্রাসার স্কুল বারান্দায় আর এক মৌলবির গলা-খাঁকারি চমকায়। লোকটির কথার রহস্যে থৈ খুঁজতে খুঁজতে অসীমের মনে হয় তদন্ত কমিটির সঙ্গে কুমারীঘটিত কোনো সূত্র আছে নাকি !

অসীম আর একবার সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে যাবার আগেই লোকটি একটু বুঝি হাসি হাসি মুখে বলে ওঠে, আজ্ঞে আমিই সেই বেক্তি বাবু। আমার নামই হচ্ছে আপনার সনাতন কায়পুত্র।

অসীম হাতের ফোলিওটা অকারণে চেপে ধরে। না, এমন কিছু ডালভাঙা পথ হাঁটতে হয়নি। বড় রাস্তা থেকে খুব বেশি হলে কুড়ি মিনিট। কমপিউটারের নিরাপদ দূরত্বে এই গ্রাম আনোখা, যার সঙ্গে নখের কোনো সম্পর্ক নেই এবং ওই সনাতন কায়পুত্রের সামনে ব্যাঙ্কবাবুদের 'এনকুয়ারির' অপেক্ষা ধক্‌ধক্ করছে। এই রকম এক অবস্থার ভেতরে দাঁড়িয়ে অসীম কি আগে ভাগেই ঘোষণা করে দিতে পারবে—ব্যাঙ্কবাবুদের চেয়ে আমি কিছু কম নই। আমার কাজটার পেছনেও হয় কম সুদে সরকারি লোন কিম্বা কোনো অনুদান—পেনশন ঘাপটি দিয়ে বসে আছে। এই আশা কোনোমতে ফর্মগুলো পূরণ করে ফেলতে পারলেই যেন অনেকটা ফলে যাবে। সে পর্যন্ত রাস্তাটা যেন বাস স্টপ থেকে বড় জোর মিনিট কুড়ির দূরত্বে।

অসীম হেসে বলে, আপনার কাছেই এসেছি আমি।

সনাতন কায়পুত্র আর এক ধাপ চড়িয়ে হাসে, সে আমি বাবুর রকমসকম দেখেই বুঝেছি।

—রকমসকম মানে ?

—সে আপনি বুঝবেন না বাবু। আপনি যদি সনাতন হতেন আর আমি যদি আপনি হতাম তাহলে জানতে পারতেন।

এই বলে লোকটি সামনে হাত দেখায়। তারপর চলতে শুরু করে।

রাস্তার উল্টো দিকে পাড়া মতন। কয়েক পা যেতেই তার একেবারে সামনের দিকে একটি টিনের চালওয়ালা দু-তিন কামরার বাড়ি। দেয়াল পাকা হলেও এখনো প্লাস্টার হয়নি। সামনে একটু রোয়াক। তারপরে খানিকটা উঠোন।

কচার বেড়া। উঠোনে তুলসীমঞ্চ। একটি জবা গাছ। বেড়ার ধারে একজোড়া নারকেল গাছ। একটি বউ হাতে বালতি নিয়ে রাস্তা পেরিয়ে টিউবওয়েলের দিকে চলে গেল। সনাতন বাড়ির দিকে গলা তুলে বলল, ওরে একটা টুল দে দিকি।

তুলসীমঞ্চের পাশে অসীম। সামনে রোয়াকের দিকে মুখ তুলে সনাতন কায়পুত্র। রাস্তার ওপারে কল পাম্প করার হ্যাচাং হ্যাচাং। দূর মাদ্রাসায় টিফিন বেলা ফুরনোর ঘণ্টা। সমস্বর ছেলেদের হৈ হৈ। সনাতনের হাত রোয়াকে এইমাত্র রেখে যাওয়া কাঠের নিচু টুলের দিকে। মাথায় আধখানি ঘোমটা তুলে যে বউটি সেটি রেখে গেল তার মুখের আদল এইমাত্র কলে জল আনতে যাওয়া বউটির কাছাকাছি।

অসীম টুলে বসে চারদিকে চোখ চালায়। সনাতন বিনীত মুখে একটু আসছি বলে ঘরের ভেতরে যায়। খোলা দরজার ওপারে সাদামাটা ঘরের কুলুঙ্গিতে সিঁদুর লেপা পেতলের এক মূর্তির সামনে ঘট। তাতে আম্রপল্লব। দেয়ালে গাদাখানেক ক্যালেণ্ডার। দড়িতে কিছু জামাকাপড়। তক্তপোশে বিছানা পাতা। গম্ভীর-মুখ এক মাঝবয়সী মহিলার মুখ উঁকি দেয় দরজার পাশ থেকে। মাথার চুলে জটা। সেই জটা মাথার মাঝখানে চূড়ো করে বাঁধা। কপালে ধ্যাবড়ানো সিঁদুর টিপ। অসীমের দিকে খানিক ভ্রূ কোঁচকানো দৃষ্টি রেখে মুখটি সরে যায়। অসীম রোয়াকের চারদিকে তাকায়। নিপাট সংসারীর ডেও-ঢাকনা। একটি পুরনো সাইকেল। দড়িতে মেলে দেয়া গামছা। সেনসাস অফ হ্যাণ্ডিক্রাফটস্ আরটিজানস্-এর প্রোফরমা রিপোর্ট অনুযায়ী কোশ্চেনেয়ার পূরণ করার প্রাথমিক কিছু উপাদান অথবা প্রমাণ এই মুহূর্তে কোথায় ! কমপিউটার বলে দিয়েছে সনাতন কায়পুত্রেরা তিনপুরুষের পটুয়া। ঠাকুর্দার নাম প্রশ্ন নেই। তবে বাবা নীলকুমার কায়পুত্র যে ডাকসাইটে পোটো ছিল এ খবরটা জানা। তার ছেলে সনাতন কায়পুত্র। পটুয়ার ঐতিহ্য কেমন করে রক্ষা করে চলেছে তার কোনো নজির চোখের সামনে পাওয়া যাচ্ছে না। শহরের বুদ্ধিজীবি-শিল্পীদের কাজের বহর যেটুকু হোক না কেন, বসার ঘর থেকে বেডরুম অবধি প্রাণপণ চেষ্টায় তার নমুনা সাজানো থাকে। ঘরে ঢোকা মাত্র প্রোফরমা ষাট সত্তর ভাগ পূরণ করা হয়ে যায়।

যে বউটি টুল পেতে দিয়েছিল তার হাতে চায়ের কাপ। পেছনে সনাতন। রাস্তার কল থেকে দ্বিতীয় বউটি জল নিয়ে উঠোন পার হয়। অসীম দুজনের মুখের মিল আর একবার ঝালিয়ে নেবার মাঝখানেই সনাতন হাসি মুখে বলে ওঠে, ওরা যমজ ভগ্নী বাবু। আমার দু' ছেলের সঙ্গে দুটিকে বেঁধে দিয়েছি। একেবারে ঘরে ঘরে কাজ আর কি।

সনাতন উবু হয়ে অসীমের সামনে বসে পড়ে ফ্যাকেল টিপে বিড়ি ধরায়। ফুরফুর ধোঁয়া ছাড়ে। অসীম বুঝতে পারে না কোথা থেকে প্রশ্ন শুরু করবে।

যদিও ফর্মগুলো যে বইয়ের আকারে সেলাই করা তার মাথায় লেখা আছে কনফিডেনসিয়াল, এই সনাতন কায়পুত্রের কাছে কি নিজের কিছু গোপনীয় কথা রাখা আছে! অসীম কতকটা আলটপকা বলে ওঠে, কায়পুত্র পদবীটা এর আগে কখনো শুনিনি।

সনাতন চোখ বড় বড় করে তাকায় অসীমের দিকে, আমরা হলাম জাতিতে উগ্রক্ষত্রিয় বাবু। আপদে আপনাদের সরকারের খাতায় নমশুদ্দুর—মানে এস সি আর কি।

প্রোফরমার একটি কলমে ভাইটাল ধাক্কা। দরজার পাশ থেকে আর একবার জটাধারিণীর উঁকি। সনাতন বলে, ছেলেদের মা আজ বিশ বছর ক্ষেপে আছেন বাবু। আমার সুখের সংসারে ওই এক ক্যারা।

ছেলেদের মা দরজা গলে বাইরে চলে আসে। তারপর রোয়াক বেয়ে নেমে যায় উঠোনে। সনাতন নিজেকে শোনানোর ধাঁচেই বলে, কোনো ভয় নেই। এখন আর বাইরে বেরোবে না। আবার সেই সন্ধেবেলা।

অসীম অবাক হয়ে বলে, বাইরে বেরিয়ে যান নাকি?

—হ্যাঁ বাবু। দিনের মধ্যে দু টাইম। যাকে বলে কাক ভোরে আর সেই সন্ধেবেলা। আর এই দু বেলাই আমার কাজ তাকে খুঁজতে বেরনো।

অসীম যেন আসল প্রশ্ন করার উপায় পেয়ে যায়। সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, তাতে তো অনেক সময় চলে যায়। তাহলে নিজের কাজকর্ম কখন করেন?

কায়পুত্র মাথা হেঁট করে। তারপর নিজের মালাইচাকির ওপর হাত ঘষতে ঘষতে বলে, ঘরের পরিবার বাইরে গেলে তাকে খুঁজে আনাই যে পয়লা কাজ বাবু। এ বাদে আর কি কাজ আমার বলুন। দুটি ছেলে লায়েক হয়েছে। একজন টিটাগড় কাগজ কলে কাজ করে, ছোটজনা ট্রেনে হকারি করে। একটি মেয়ে ছিল। বিয়ে দিয়ে দিয়েছি আজ চার বছর।

সনাতনের খেপি পরিবার উঠোনে নারকেল তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে মাথার জটার মাঝখানে একমনে আঙুল চালায়। ভারী যত্ন করে একটু একটু করে দুর্ভেদ্য জট ছাড়াবার বৃথা চেষ্টা করে। অসীম ভাবে কায়পুত্র পদবীটির সঙ্গে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করার কোনো অনুষঙ্গ লুকিয়ে আছে কি না। কিন্তু ওই অসংলগ্ন পরিবার ছাড়া এই সংসারটিতে তো সেরকম কোনো প্রবল ক্লেশ চোখে পড়ছে না। বরং সনাতনের কথায় মোটামুটি চলে যাওয়া একটি পরিবার বলেই তো মনে হচ্ছে।

সনাতন গলা খাঁকারি দেয়, তবে হ্যাঁ বাবু, একেবারে বসে থাকলে যে শরীর পড়ে যাবে। তাই টুকটাক কাজ করি বৈকি।

অসীম নড়ে বসে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই কথাই তো জানতে চাইছিলাম।

সনাতন হাসি হাসি চোখ তুলে তাকায় অসীমের দিকে, আপনি তো ব্যাঙ্কের বাবু নন। ঠিক বলেছি কি না?

অসীম বলে ওঠে, ব্যাঙ্ক না হলেও আপনি যে জন্যে বলছেন আমাদের কাজটাও সেই ব্যবস্থা করা। আমরা রিপোর্ট বানিয়ে সরকারের কাছে জমা দিলে—

সনাতন তার মুখের কথা পূরণ করে, লোনটোন মিলবে তো বাবু?

—অবশ্যই। সরকার তো আপনাদের উন্নতির জন্য ভাবছেন। আর আমরা সে ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য করব বলে কাজটা হাতে নিয়েছি।

সনাতন বিড়বিড় করে, ব্যাঙ্কের বাবু নন অথচ লোন দেবে, সাহায্য করবে, এমনটি তো এর আগে কখনো শুনিনি।

অসীম বলে, আপনি কি টুকটাক কাজের কথা বলছিলেন?

সনাতন আর একটি বিড়ি ডিবে থেকে বের করে হাতে নিয়ে দু' আঙুলে টিপে ঘোরাতে থাকে। কিন্তু ধরায় না। নারকেল তলায় জটাধারিণী একমনে জটের জঙ্গলে আঙুল চালায় আর কি যেন বিড়বিড় করে। একটা রাস্তার কুকুর বেড়ার ওধারে দাঁড়িয়ে তাকে নিরীক্ষণ করে। উঠোনের ও মাথায় হেঁসেল ঘরে ভাতের মাড়গালার গবগব শব্দ হয়। সনাতন বলে ওঠে, তা বাবু যখন দুপুর রোদে এসেছেন দুটি ডাল ভাত না খেয়ে যেতে পারবেন না।

অসীম ব্যাগ থেকে কাগজপত্র বার করতে করতে বলে, সে জন্যে ব্যস্ত হবেন না। আমি বারাসাত থেকে খেয়ে এসেছি।

সনাতনের মুখে কেমন একটি পলকা ছায়া চমকে মিলিয়ে যায় তখনি। সে শুধু বলে, অ।

অসীম ডট পেন খোলে, বলুন, কাজের কথা কি বলছিলেন?

হাতের বিড়ি পাকাতে পাকাতে সনাতন কথা বলে, হ্যাঁ বাবু, সংসারে আয় বলতে তো এমন কিছু নয়। তাই ভাবছিলাম মিছিমিছি বসে না থেকে কটা মুরগি কিনে ছোটখাট একটুখানি পোলট্রি করা যায় কি না।

অসীম স্থির হয়ে যায়। ইনফরমেশন টেকনলজির ছক কাটা বইটির ওপরে লেখা হাউসহোল্ড এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট। ভেতরে ঠাসা কুতুহলী প্রশ্নমালা। কোম্পানির কোনো হিসেবে একটি গ্রাফের অবতল বাঁ দিক থেকে ডাইনে ওপর দিকে অগ্রগতির আড়াআড়ি রেখা। কিছুটা উঠে একজায়গায় থমকে আছে। কিন্তু এগিয়ে যাবার লক্ষণ আঁকা আছে উর্দ্ধগামী তীরের ফলায়। তিন নম্বর সিডিউলে বিশেষ শিল্প-জীবিকাটি কি তা জানাতে হবে। জানতে হবে এটি ট্রাডিশনাল শিল্প কি না। কাজের পদ্ধতিটি কি রকম। কাঁচামাল কোথা থেকে আসে। কোম্পানি যে শিল্পীর পীঠস্থান তথা বাসস্থল সম্পর্কেও খবরাখবর দিতে উৎসাহী তার নমুনা

হিসেবে—আলোর কি ব্যবস্থা, পানীয় জল, হাসপাতাল কিম্বা বাজার হাট কত দূরে, নিকটবর্তী রেলস্টেশন ও বাস স্ট্যাণ্ড কোথায়। এই সব যাবতীয় কৌতূহলের সামনে সনাতন কায়পুত্রের মুরগির পোলট্রি করার বাসনা, একজন পুরুষানুক্রমিক পটশিল্পীর হঠাৎ বাঁক ফিরে দাঁড়ানো, কমপিউটার টেকনলজির মুখের সামনে সপাটে থাপ্পড় মারার চেয়েও বেশি কিছু বুঝি। কায়পুত্রর সঙ্গে কায়ক্লেশে দিন কাটানো কতখানি জড়িত সে কথা মনে হওয়ার আগে পিছে কোথায় প্রলাপ আর কোনখানে কিঞ্চিৎ বাস্তবতা সে সব মনে করার এই কি উপযুক্ত সময়! অসীম টের পায় বারোসাত হোটেলে ভাতের সঙ্গে কড়া মাছের ঝোলের ঢেঁকুর। অনুভব করে দূর ধর্মতলা অঞ্চলের বহুতল বাড়ির একটি খোপে পাখা ঘুরছে। কমপিউটারের বিচিত্র সব আলোর চোখ বিন বিন, বিপ বিপ করছে। উঠোনে নারকেল তলায় কায়পুত্রের খেপি পরিবার একমনে মাথার জটে আঙুল চালাচ্ছে, বিড়বিড় করছে। হেঁসেলে ডাল ফোটার সুগন্ধ উঠছে। আর তার সামনে নির্বিকার মুখে বিড়ি ধরাচ্ছে পটশিল্পী সনাতন। ছবি আঁকিয়ে মানুষটির চোখে মুখে মুরগির পোলট্রি করার বাসনার নিরেট ছবি।

অসীম সনাতনের মুখের দিকে সোজা তাকায় এবং সোজাসুজি প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে, আমি কিন্তু মুরগির পোলট্রি নিয়ে আপনার কাছে জানতে আসিনি।

সনাতন চোখ বড় বড় করে তাকায়, তাহলে কি জানতে এসেছেন বাবু?

হেঁসেলে ফুটন্ত ডালের সুবাস, দুপুরের তাপ আর দূর মাদ্রাসা থেকে ভেসে আসা কলরোলের মাঝখানে যথাসম্ভব গলা নামিয়ে অসীম বলে, আপনার পট আঁকার কথা। আপনার পূর্বপুরুষের আমল থেকে যে কাজ চলে আসছে তার কথা।

সনাতন কায়পুত্র আলগোছে বাইরে তাকায়। দু' চোখ একবার দুপুরের রোদ আর একবার নারকেল তলায় আপন মনে জট ছাড়ানো পরিবারের দিকে বুলিয়ে নেয়। তারপর আস্তে আস্তে বলে ওঠে, পটের কথা বলছেন বাবু! আমাদের তিনপুরুষের পট আঁকার কথা!

অসীম ভেতরের উত্তেজনা চেপে রেখে বলে, হ্যাঁ, সে কথা জানতেই তো এতদূর এসেছি।

—কি জানবেন বাবু? সেসব কথা এককালে জানবার মতন ছিল। এখন কি আর সে অবস্থা আছে!

অসীম বলে, এই সব খবরাখবর জানাতে পারলে হয়তো আপনার কিছু উপকার হলেও হতে পারে।

—উপকার!

—হ্যাঁ, মুরগির পোলট্রি করার চেয়ে কিছু কম নয়। কিন্তু ওসব কথা থাক।

তার চেয়ে আপনাদের তিনপুরুষের এই পট আঁকার কথা একটু বলুন।

সনাতন মৃদু হাসে, সেই কোন কালে ঘি খাওয়া হত, এখনো নাকি গোঁফে তার বাস লেগে আছে! বাপ ঠাকুর্দার কথা বলে কি হবে।

—কেন, একথা বলছেন কেন? আপনার নিজের কাজকর্মের কথাও তো জানতে হবে। সেটাই তো আসল।

সনাতনের মুখে হাসি ছড়িয়ে যায়, তাহলে বাপ ঠাকুর্দার কথা বুঝি নকল?

অসীম একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে ওঠে, না না, তা হবে কেন। আসলে আপনার কাজকর্মের ওপরেই যে আমার কাগজপত্র তৈরি করতে হবে।

সনাতন চোখ নামায়। মুশকিলটা কি জানেন বাবু, ও সব পট-চিত্তিরের কথা শুনলে আমার ছেলেরাই হাসে তা বাইরের লোকের কি দোষ। আর বলবই বা কোন মুখে। এক ছেলে কলে খাটে আর একজনা রেলে ফিরি করে।

উঠোন ছেড়ে কায়পুত্র পরিবার গুটি গুটি রোয়াকে উঠে আসে। একধারে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ে সামনে তাকিয়ে থাকে। বেড়ার মাথায় কাক ডাকে। সনাতন কথা বলে, বলছিলাম না বাবু, আমার সুখের সংসারে ওই এক ক্যারা। ছেলে-পুলেদের মা আজ বিশটি বছর অমনধারা।

অসীম বুঝতে পারে না থেকে থেকে বাঁক নেয়া কথার সূত্র কিভাবে টেনে ধরা যায়। ওদিকে হেঁসেলের পাট বুঝি এইমাত্র চুকল। কাঠে জল ঢালার ভসস্ শব্দের সঙ্গে রাস্তা বরাবর মাটির হাঁড়ি পাতিল বোঝাই একটি ভ্যান রিকশা। দুপুরের রোদে সামান্য বাঁক। মাদ্রাসায় পিরিয়ড শেষের ঢং ঢং। কোলের ওপর বিছিয়ে রাখা একটি কলামও না পুরণ হওয়া ফর্ম-এর দিস্তে। সনাতন বলে যায়, পট আর আঁকি না বাবু। মিথ্যে কথা বলে কি হবে। তবে হ্যাঁ, মনে মনে একটু আধটু ইচ্ছে যায় বৈকি। যদি বলেন ওই পট আঁকা আমার ধর্মের কল তো তাই সই।

—ধর্মের কল!

—বুঝলেন না বাবু, আমার বাপ ঠাকুর্দা ছিল পোটো। পট আঁকাই যে আমাদের জাতধর্ম। কিন্তু এই কলের যুগে ওসবের কি দাম আছে বলুন। ঘরে ঘরে এখন কিনা টি ভি। ছবি নড়ছে চড়ছে, কথা কইছে। আমাদের পটের ছবি তো নড়ে না, কথা কয় না। অনেকটা আমার ওই খেপি পরিবারের মতন।

বুকের মাঝখানে সংক্ষিপ্ত একটি ধাক্কা। গ্রাফের বাঁ দিকের অবতল থেকে ডাইনে আড়াআড়ি উঠে যাওয়া প্রগতির রেখাটিও এ মুহূর্তে বুঝি আর এক অচলতার কথা বলছে। এত সব ছাপানো কাগজ, খোপকাটা হরেক প্রশ্নের প্রোফরমা। গরমদিনের এই নিঝুম দুপুরে বলতে গেলে হঠাৎই এসে হানা দিতে চায় বিজনবাড়ির সেই কাঠখোদাই শিল্পী লাকপা শেরিং। শীত নিথর পাহাড়-

তলির সেই বস্তি এলাকার অন্ধকার অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে জোলো খুপরি ঘরে দিনের বেলাতেও কেরোসিন ডিবে জেলে খুট খুট হাতুড়ি নড়ছে, বাটালি নামছে কাঠের বুকে। আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে একটি ড্রাগনের মুখ। ছুঁচলো দাঁতের সার, লকলকে জিভ। সে জিভে আগুন ঝরার কল্পনা আছে। অথবা আগুন নিথর হয়ে গেছে। অনেকটা এই গ্রাফবদ্ধ প্রগতির রেখার কাছাকাছি। অসীম কোনো কথা বলার আগেই আবার সনাতনের মুখ সচল হয়। সে বলে ওঠে, আমার বাবা একখানি রামায়ণের পট করেছিলেন বাপু। নাম ছিল সীতার বনবাস। মোট চব্বিশখানা ছবি ছিল তাতে। রোয়াকের এ মুড়ো থেকে ধরলে ও মুড়োতেও কুলোবে না। যেমন বাহার বাবার হাতের তেমনি বাহার তাঁর কণ্ঠের। হাটে হাটে, গঞ্জে গঞ্জে বাবা ওই বনবাসখানি দেখিয়ে যে কি সুখ্যোতিই পেয়েছিলেন।

অসীম চুপ করে বসে বসে সনাতন পটুয়ার কথা শোনে। মুরগির পোলট্রি করার ধাক্কায় পড়লে কি হবে কথকতার ভঙ্গিটি এখনো সরেনি। বিজনবাড়ির সেই শিল্পীর হাতে ধরা এখনো না-সম্পূর্ণ হওয়া ড্রাগনের জিভের লকলকে আগুনে হাত না পুড়লেও অনুভব করা যাচ্ছে তার ঝলসানি। পাহাড়ি হাওয়ার বিপরীতে এই দারুণ গরমের দুপুরে সনাতন কায়পুত্রর গলায় অকস্মাৎ সেই অদেখা আগুন উস্‌কে ওঠে। কায়পুত্র গলা খাঁকারি দেয়।—সোনার বরণ জানকি স্বর্ণ চাঁপা বনে, চক্ষের স্বর্ণ বুকে ফেলে বিজন বিপিনে। সেই সোনার বীজগুলি ধান্য হইয়া ফুটে, বসুন্ধরা নিত্য সেই অন্ন খায় খুঁটে॥—আহা, কি সুন্দরই না পট বর্ণনা করতেন বাবা। যেমন পদ তেমনি কণ্ঠ।

রোয়াকের ও-প্রান্তে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা জটাধারিণী মুখ ফেরায় এই দিকে। তার সদাই আনমনা চোখ দুটিতে একপ্রস্থ পলকা বিস্ময়। অচল গ্রাফ-বন্দী রেখার মুখে এক টুকরো হঠাৎ ঝিলিক। অসমাপ্ত ড্রাগন মূর্তির মুখে শীত ভেদ করে অলীক আগুন।

হেঁসেলের ঝাঁপ ভেজিয়ে রেখে জোড়া বোনের একজন ঘড়া নিয়ে রাস্তার সরকারি কলের দিকে চলে যায়। এক টুকরা মেঘ মাদ্রাসার ওপাশে ঘন গাছ-পালার পেছনে ভেসে ওঠে। অনেক দূরের বাস রাস্তা থেকে ঝাপসা হর্ন গড়িয়ে আসে দুপুর ভরসা করে। এক ঝাঁক শালিক সমস্বরে ডাকতে ডাকতে উঠোন ছুঁয়ে ধাঁ করে উড়ে যায়। সেই উড়ে যাওয়া এবং সমবেত ক্যাটর ক্যাটর এক মুহূর্তে এলাকায় নতলার খোপবন্দী পাখা ঘোরা আর কমপিউটারের বিন বিন নীরবতা রচনা করে দেয়। কলকাতা থেকে মাত্র কিছু দূরের এই আনোখা গ্রামের এক আরটিজান পটুয়ার সন্ধানে ফেলে দেয়া জাল অজস্র প্রশ্নে ঠাসা সুতোগুলো কিরকম যেন এলিয়ে পড়ে থাকে। দারিদ্র্য সীমারেখায় নিচ এবং ওপরের দুটি দাঁড়ির বাইরে—একটু তফাতে আর একটি অলীক দাগ ভেসে বেড়ায়। সেই

দাগের রঙ পূর্বপুরুষের রচনা করা সীতার বনবাস পট বর্ণনার অতীত অথচ এখনো না হারানো মুগ্ধতার ভেতর থেকে গুছিয়ে না বলতে পারা একটি মাত্র হাহাকারের সুরের কাছাকাছি যেতে গিয়েও পারে না। এত কথার পর অসীম তো এই কথাটা ধরতে পেরেছে যে সনাতন কায়পুত্র এমন কিছু কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করে না। বৃত্তিচ্যুত আর হয়তো বাস্তব ছেলেদের দৌলতে সংসারে ডাল ভাত জুটে যায়। তবু ওই দুটি বাঁধাধরা সীমারেখায় অদূরে এক ঢিলতে পরাজিত দাগ পটুয়ার অস্তিত্বে কাঁটা খচ খচ করে। এর হাত থেকে বাঁচার কোনো রাস্তাই যে তার সামনে এখন খোলা নেই। আপাতত রোয়াকের ও-মাথায় পটুয়ার খেপি পরিবারের এক ঝলক অবাক চাউনি একমাত্র ভরসার একটি আলগা দিগন্ত হাট করে বসে থাকে। আর সেই ফাঁকে সনাতন বলে চলে, ঠাকুর্দার কথা তো বলতে পারব না। তবে কিনা যাকে চোখে দেখেছি, যার সঙ্গ করেছি সেই বাবার কথা ভুললে যে মহাপাতকি হতে হবে বাপু। এমনিতেই তো আমার অপরাধের সীমা নেই।

—কেন, একথা বলছেন কেন?

—না বলে যো কি বাবু। বাবা করেছিলেন সীতার বনবাস আর আমি শেষমেশ করতে চেয়েছিলাম সীতার পাতাল প্রবেশ। তার আগে তো হাজার কিসিমের কাজে রামায়ণ মহাভারত আরো কত কি থেকে। সেই সঙ্গে সরকারের সঙ্গে তাল রেখে জন্মনিয়ন্ত্রণ, সঞ্চয়, বীমা এমনি সব দায়ে পড়া কাজ। কিন্তু ওই সীতার পাতাল প্রবেশ—ওটাই তেমন করে রপ্ত করে উঠতে পারলাম না।

—রপ্ত করতে পারলেন না?

—না বাবু, পারলাম না। আসলে আমার মাথায় একটি ভূত চেপেছিল যে। মা জানকি সকলের চোখের সামনে—তাঁর রামচন্দ্র স্বামী, লব কুশের মতন ছেলে, রাজ্যবাসী সবাইকে ছেড়ে মাথায় শেষ পরীক্ষার একটি দায় নিয়ে মা বসুমতীর পেটের ভেতরে চিরকালের জন্য চলে গেলেন। এরকম ছবি সবাই জানে। সবাই আঁকে। কিন্তু ওই যে বললাম, আমার মাথায় ভূত চেপেছিল।

—কি রকম শুনি?

সনাতন এবার থেবড়ে বসে পড়ে মাটিতে। ডান হাতে লম্বা লম্বা নখ দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতে কাটতে চিন্তিত মুখে বাইরে তাকায়। তারপর আস্তে আস্তে বলে, এ কথা তো সবাই জানে বাবু সীতার মা হলেন সাক্ষাৎ বসুমতী। তা যে মা মেয়েকে পেটে ধারণ করেছিলেন, গর্ভ থেকে বাইরে ঢেলে দিয়েছিলেন, সেই মেয়েকেই আবার নিজের গর্ভে তুলে নিলেন। মা জানকি বাইরের সব হেনস্থা জুড়োতে আবার মায়ের পেটেরই পাতালে ঠাঁই নিলেন। আমার মুশকিলটা হয়েছিল ওইটাই বাপু। আমি চেয়েছিলাম মায়ের পেটের সেই

পাতালের অন্ধকারটাকেই আঁকতে।

একটু আগে উড়ে যাওয়া শালিকের ক্যাটর ক্যাটর, ধু ধু রোদ আর কমপিউটারের বিন বিন নেপথ্যচারিতা এই সব নির্জনতার বুকের মাঝখানে এক গন্ধমাদন কালো পাথর চেপে বসে আস্তে আস্তে। সেই শিলাখণ্ডের বাইরেটা যেরকম কালো ভেতরের পরতে পরতে তার চেয়ে বেশি কিছু কালো লুকিয়ে আছে কি না সেটাই প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াতে চায়। প্রশ্ন হতে চায় সনাতন পটুয়ার এই ভূতগ্রস্ত পট আঁকতে চাওয়ার নেপথ্যে কোন নিখাদ কালো উঁকি দিচ্ছে পাতালের আবডাল সরিয়ে। সনাতন কায়পুত্র বিন বিন সুর ধরে ভাঙা ভাঙা গলায়, জানকি জানকি করি ডাকে বসুমতী, আয় মা গো ফিরে গর্ভে তোরে করি গো মিনতি। সংসারের আলো চেয়ে দেখলি অন্ধকার, ফিরে আয় মায়ে ঝিয়ে হই একাকার— মা গো হই একাকার—

অসীম দেখে রোয়াকের ওধারে জটাধারিণী মৃদু মৃদু টলছে এধার ওধার। কে জানে, হয়তো বহুদিন পর হারানো আলোর এক টুকরো সে দূর থেকে টের পেতে পেতেও হারিয়ে ফেলছে। পটুয়া আবার অনেকদিন পর সুর দিয়ে পট আঁকছে। পট দিয়ে সুর বুনছে। সেই সুর কিম্বা পট তার নিত্য সকাল সন্ধ্যায় বার টানের একজোড়া রেখার সামান্য কিছু দূরে এইমাত্র জেগে উঠেছে। সেই অনখ রেখাটির কি নাম হতে পারে? কিরকম রঙ হতে পারে ওই রেখাটির? সীতার বনবাসের পথ ধরে অবশেষে পাতালের রসাতলের দিকেই কি তার অভিমুখ? সেই শেষের সীমানায় কি সনাতন কায়পুত্রের পোলট্রি করার বাসনাটি থমকে আছে।

অসীম নিচু গলায় বলে, ছবিটা কি আঁকা শেষ হয়েছিল?

সনাতন উদাস ভ্যালভেলে চোখে চারদিকে তাকায়। শূন্য আকাশে, ধূসর দুপুরে, বাতাসহীন উত্তাপ নেঙড়ানো সংসারে চোখ ভাসিয়ে বসে থাকে। ঘরের ভেতরে শিশুকে থাবড়ে ঘুম পাড়াবার চুড়ি ঝিনিৎকার ওঠে। সামনের রাস্তায় এক দল মানুষ ঝুড়ি মাথায় গল্পগাছা করতে করতে চলে যায়। হাইমাদ্রাসায় আর একটি পিরিয়ড শেষের ঢং ঢং বাজে। রাস্তার টিউবেলের নিচে একজোড়া কাক ভাগাভাগি করে জল পান করে। সনাতন বলে ওঠে, না বাবু, সেটা আর হয়ে উঠল না। পাতালের ওপরতলা অবধি বেশ ছিল, কিন্তু তারপরে তুলি আর চলতে চাইল না। কে জানে, হয়তো পাতাল কোনদিন দেখিনি বলেই কি না সেখানে কালো রঙ দিতে মন চাইল না। বাবার কাছে সব বিদ্যেই মোটামুটি পেয়েছি। শুধু ওই রসাতলের রঙটি জানা হয়নি। সেই যে রঙ তুলি রেখেছি আর হাত দিইনি।

অসীম বলে, এতদিন ধরে কাজ করে হঠাৎ এ রকম মনে হল কেন?

কায়পুত্র হাসে, হয়তো কলের যুগ বলেই। আর তাছাড়া আগে তো সকাল-সন্ধে খেপি পরিবারকে খুঁজতে বেরোবার কাজ ছিল না। এখন সব কাজ ফেলে

আগে ওইটি সারতে হয়। ছেলেদের অনেক ঝামেলা তো!

যে গলায় একটু আগে পাতাল প্রবেশের সুর বাজছিল তার মোড় ঘুরে যায় ভিন্ন দিকে। কায়পুত্রের বেসামাল পরিবারের মুখ এবার অন্যত্র ঘুরে যায়। এতক্ষণ যে মুখে কথা বন্ধ ছিল আবার তার গলা খুলে যায়। সে আবার যথারীতি বকবক শুরু করে দেয়। সনাতন আবার বলে, একটি কথাও তো সত্যি বাবু, এই কলের যুগে কে আর পট দেখবে, ভ্যানভ্যানানি গান শুনবে। মানুষের সে সময় কি আর আছে!

—কিন্তু আমরা তো চাইছি আপনি পট আঁকুন। শিল্পটা বাঁচুক।

সনাতন এক গাল হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে, বাবুর মনটা সত্যিই ভারী সরল।

অসীমের মাথার জালিকাটা খোপে প্রগতির রেখাটি কেঁপে ওঠে। স্বনিযুক্তিকরণ সংক্রান্ত সমীক্ষার পেছনে ঠাসবন্দী তত্ত্ব আর টেকনলজিক্যাল চিপস্‌গুলো তালগোল পিণ্ড পাকিয়ে জুথুবু হয়ে পড়তে চায়। অথচ বিজনবাড়ির সেই কাঠ খোদাই শিল্পীটি এখনো কি নিবিষ্টতায় কাজ করে চলেছে। স্যাঁতসেঁতে বস্তি ঘর, শীতের জড়তা, কোনো কিছুর দিকে তার মন নেই। এখানে এসে হিসেবটা মিলতে চায় না। সনাতন কায়পুত্রের কলের যুগে পুনর্বাসনের ইচ্ছেটা বিজনবাড়ির সেই মানুষটির নির্বিবাদী অবস্থানের সঙ্গে মাথা ঠোকাঠুকি করে। কে জানে, হয়তো বিজনবাড়ির সেই শীতল মানুষটির একমনে মাথা হেঁট করে থাকার অনুভবের সঙ্গে সনাতনের রসাতল অন্ধকারের কোনো তফাৎ নেই। আসলে এই লোকটি হল আস্ত সেয়ানা, ধূর্ত। পূর্বপুরুষের সরল শিল্প প্রকৃতি যে আসলে একটি বোকা ফাঁদ এটা বুঝতে তার ভুল হয়নি। বাদবাকি আর সব কথা হল এক একটি ছল অথবা ওজর।

অসীম উঠে দাঁড়ায়। কাগজপত্রগুলো ব্যাগে ভরতে ভরতে বলে, আমার জন্যে আপনার অনেক বেলা হয়ে গেল।

সনাতন দুই হাঁটুতে হাত রেখে উঠে দাঁড়ায়।

—বরং আপনারই খামোখা অনেকখানি সময় গেল। আমার মতন কাজ নেই মানুষের আবার বেলা অবেলা।

অসীম বলে, কাজ করা না করা তো আপনার হাতে।

সনাতন ম্লান হাসে পড়তি দুপুরের ঝাঁঝালো রোদের ওপার থেকে, বললাম তো বাবু, বাবার কাছে ওই রসাতল আঁকার বিদ্যেটি শেখা হয়নি।

রোয়াক থেকে নামতে নামতে অসীম বলে, শিখলেও সেটা কি কাজে এখন লাগত?

সনাতন নিচু গলায় বলে, একটি ছোটমোটো মুরগির পোলট্রি করতে বেশি লাগবে না। হাজার পঁচিশেক টাকা হলেই চলবে।

সুনীল দাশ

—

ভূমিকা নেই

ঘুম ভেঙে গেছে অনেক সকালে। বিছানায় কিছুটা শুয়ে কিছুটা বসে, বুকের কাছে বালিশটা নিয়ে ভাবতে শুরু করে প্রথমেই মনে হল—আজ কোনো কাজ নেই; কিছু করার নেই সারাটা দিন। ভাবনার ভেতরটাও বড্ড ফাঁকা ফাঁকা। আলস্যে আড়মোড়া ভেঙে—সকাল পেরিয়ে, দুপুর ডিঙিয়ে, সন্ধে উজিয়ে, আবার অথৈ রাতে ঝাঁপিয়ে পড়া শুধু।

পরমুহূর্তেই মনে পড়ে যায়—অসংখ্য কাজ পড়ে আছে। বুকের থেকে বালিশটা সরিয়ে রাখতে রাখতে ভাবি, কাজের শেষ নেই অথচ মনে হল কেন—কোনো কাজই নেই হাতে? কেন?

ডোরবেলাটা বেজে উঠল।

উঠে গিয়ে বাইরের দরজাটা খুলে দেবো ভাবলাম বা ভাবতে শুরু করলাম যখন, তখনই দরজাটা খোলার শব্দ কানে এলো। বিশ্রী রকমের গরম চড়ছে। তবে খানিক আগে থেকে শেষ বৈশাখের ভোরের হাওয়াটা দিতে শুরু করেছে। খালি গায়ে ছিলুম। এতো সকালে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো নাকি? হ্যাঙার থেকে সুতির পাঞ্জাবিটা নিয়ে গায়ে চাপাতে চাপাতে মনে হল—মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ রায়—বিখ্যাত বহু বাঙালির খালি গায়ে কোনো ফটো নেই। অন্তত আমি দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না। গত সপ্তাহে আমার এক বন্ধু-লেখক শাপমোচনের সমালোচনা করতে গিয়ে পুরুষ নৃত্যশিল্পীদের মঞ্চে খালি গায়ে নাচাটাকে অত্যন্ত অভব্য বলে কড়া মন্তব্য করেছে। আবার এবছরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বাংলা প্রশ্নপত্রে ভাবার্থ লিখতে দেওয়া হয়েছে যে প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধার করে, তাতে আছে "কাপড় পরিয়া পরিয়া এমনি করিয়া তুলিয়াছি যে, কাপড়টাকে নিজের চামড়ার চেয়ে বড়ো করা হইয়াছে।...এখন আমরা ইংরেজের নকল করিয়া শিশুদেহের জন্যও লজ্জা বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছি।...শেষকালে কোন একদিন দেখিব, চৌকি-টেবিলের পায়া ঢাকা না দেখিলেও আমাদের কর্ণমূল আরক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।"

শোয়ার ঘর থেকে ড্রয়িংরুমের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মনে মনে রামকৃষ্ণ

আর গিরিশ ঘোষের খালি গা পোর্ট্রেট আর মৃত্যুদৃশ্যে বিদ্যাসাগরের আদুড় গায়ের ফটোগুলো পরপর ভাবলাম। বাইরের ঘরে এসে দেখলাম আমার স্ত্রী উপমা দরজা খুলে দিয়েছে।

দরজায় আমার বন্ধুর এক সহকর্মী ভদ্রলোক। ছেলের কলেজে ভর্তির ব্যাপারে এর আগেও বার কয়েক এসেছেন। ভদ্রলোককে দেখামাত্র মনে পড়ে গেল—ইস্! এর ব্যাপারটা একেবারেই ভুলে গেছি। পুরোপুরি মাথার থেকে বেরিয়ে গেছে। ইদানিং দেখছি বেশ ভুল হচ্ছে। এখন কি উত্তর দেবো ভদ্রলোককে ভেবে পেলাম না। ভেতরের অস্বস্তি আড়াল করে বললাম, 'আসুন। ভেতরে এসে বসুন। একেবারে ঘুম থেকে উঠেই চলে এসেছেন—এতো সকালে।'

কি যেন নামটা এই ভদ্রলোকের। মনে পড়ল না। তবে এ মুখমণ্ডল একবার দেখলেই বরাবর মনে রাখার মতো। কিছু মুখচ্ছবি প্রথম দর্শনের পর হারিয়ে যায়। স্মৃতি হাতড়ে হুবহু জোড়া লাগানো যায় না। এই পূর্ণ গোলাকার মধ্যবয়সী মুখটি তা নয়। ভদ্রলোকের নাকের ডগায় কম্পাসের কাঁটা বসিয়ে দিলে চিবুক ছুঁয়ে ব্যাসার্দ্ধ নিয়ে পুরো একটা বৃত্ত টানা যাবে ওই মুখমণ্ডলের পরিধিতে। বড় বড় চোখ দুটো স্টিলফ্রেম চশমার কাঁচের ওপাশে ফ্যালফেলিয়ে থাকে। ফাটা কাঁসার মত না হলেও গলার ধাতব স্বরটিও একবার শুনলে মনে থাকবে।

আজ কত তারিখ? মনে পড়ে গেল; তাই তো—গতকালই লিস্ট টাঙিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। বেরিয়ে গেছে নিশ্চয়। তদ্বির করবো করবো করেও শেষ পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। অবশ্য অনুরোধ করলে যে কাজ হবেই এমন নিশ্চয়তাও নেই। আবার হয়ে যাওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। ইস্, কেন যে মনে পড়ল না! ফোনেও যদি অনুরোধটা করতে পারতাম, হয়তো হয়ে যেতো।

কি বলবো এখন ভদ্রলোককে? সত্যি কথাটা বলা যায় নাকি? বলতে পারি, দেখুন ভাই, আজকাল কলেজে ভর্তির ব্যাপারটায় আমাদের, মানে অধ্যাপকদের কথায় কোনো কাজ হয় না। সত্যিকথা বলতে কি আমাদের হাত-পা বাঁধা একেবারে। উপমা ভেতরে চলে গেল।

পাঞ্জাবির ঝুলে চশমার কাচটা মুছে নিয়ে আমি চশমাটা আমার নাকের ব্রিজে রাখলাম। প্রকৃতপক্ষে একটা বয়সের পর বোধহয় মানুষের আর নতুন কোনো ভূমিকা থাকে না। পুরোনো অভ্যেসে দাগ বুলিয়ে যাওয়া শুধু। সক্রিয়তা শব্দটাই তখন বেঁচে থাকার অভিধান থেকে হারিয়ে যায়। তখন শ্বাসপ্রশ্বাস নিছক নিষ্ক্রিয়তার সমর্থনে।

দুদিন আগে নির্বাচনী সংবাদ শুনতে শুনতে আমাদের এক বন্ধু মন্তব্য করেছিল, 'শিক্ষকদের প্রতি সাধারণ মানুষের আর কোনো আস্থা নেই।

'কাদের প্রতি আছে? ডাক্তারদের? আইনজীবীদের?' 'দেখা যাচ্ছে

এবারের ইলেকশনে বেশির ভাগ অধ্যাপক বা অধ্যাপিকারাই কুপকাৎ হয়েছেন। আমাদের সাউথ ক্যালকাটাতেই তো গোটা পাঁচেক। আসলে জনসাধারণ কলেজ কিংবা য়ুনিভার্সিটি টিচারদের আর সমাজের কাছের মানুষ বলে মনে করে না।'

'বাকিদের করে? অন্য প্রোফেসনের সবাই সমাজের কাছের মানুষ হয়ে গেছে?'

গোলমুখ ভদ্রলোক ততক্ষণে ভেতরে এসে ড্রয়িংরুমের সোফায় বসতে বসতে বলছেন, 'তা একটু বেশি সকালেই এসে পড়েছি আজকে। ভাবলাম আপনি আবার বেরিয়ে যান যদি।' বলার সময় লক্ষ্য করি, ভদ্রলোকের পাকা পেয়ারার মতো গোল মুখখানাতে খুশি থিকথিক করছে।

'ঠিক ধরেছেন, আজ সকালেই আমার একটু বেরোনোর তাড়া আছে।' তাহা মিথ্যে বললাম, যাতে ভদ্রলোক না বেশিক্ষণ বসে থাকেন। ওঁর ছেলের ভর্তির ব্যাপারটা যে পুরো আমার মাথা থেকে বেরিয়ে গেছিল—সেটা তো আর ওঁর কাছে কবুল করা যায় না। অথচ ভদ্রলোকের ছেলের নাম, মার্কসিটের জেরক্স, ফর্ম নাম্বার সবই রাখা আছে আমার অ্যাটাচির মধ্যে। নিজের ভুলো মন এবং নির্ভুল আলস্যকে মনে মনে দুষতে থাকি!

আমার কথা শেষ হতে না হতে দেখি ভদ্রলোক তার কাঁধের কাপড়ের ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা বেশ বড় সাইজের মিষ্টির প্যাকেট হালকা নীল পলিথিন ব্যাগে ঝুলিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা দয়া করে ভেতরে দিয়ে দেবেন। আমার স্ত্রী মানে সুজয়ের মা এটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। লিস্টে বেশ ওপর দিকেই রয়েছে সুজয়ের নাম। আপনাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই।'

'না, না, এসব এনেছেন কেন? আপনার ছেলের নাম্বারের জোরেই তার নাম এনলিস্টেড্ হয়েছে। এটা নিতে বলবেন না।'—আমি একান্ত বিব্রত হয়ে আপত্তির স্বরে বলি। 'আজ ভোর রাতে সুজয়ের মা কালীবাড়িতে পুজো দিতে ছুটেছিলেন। কালীবাড়ি থেকে ফিরেই এটা পাঠিয়ে দিয়েছেন—আপনাদের জন্যে। দয়া করে আপত্তি করবেন না।'

আচমকা মনে পড়ে গেল সুজয়ের বাবার নাম স্বর্ণকমল মিত্র। একে তো মিত্রমশাই গত দু'সপ্তাহ ধরে বারবার আসছেন, টেলিফোন করছেন—তা সত্ত্বেও আমি সুজয় মিত্রের ভর্তির ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে বসে আছি। খোঁজ নিইনি। কোনোরকমের তদবির করিনি। করিনি বলে দিন পার হয়ে যাওয়ার পর ঈষৎ বিবেকদংশন হচ্ছে। এরপর আমার কোনো রকম চেষ্টা ছাড়াই সুজয় মিত্রের ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায় যাও-বা একধরনের স্বস্তি পাওয়া যেতো—সেটা এই মিষ্টির প্যাকেটে বড্ড বিড়ম্বনার কারণ হচ্ছে। স্বর্ণকমল মিত্র বাড়ি বয়ে আমায়

মিষ্টিযোগে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসে খুব অস্বস্তিকর জায়গায় ঠেলে দিয়েছেন।

এখন কি করে বলি, আমার নিষ্ক্রিয়তার এই তিরস্কারটি না নিতে পারলেই বেশি খুশি হতাম।

ইদানিং যতদিন যাচ্ছে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, পুনরাবৃত্তি করে যাওয়া ছাড়া আমার বেঁচে থাকাটা কোথাও কোনো কাজে লাগে না। এমন কি ছাত্রছাত্রীদের অসহায় মুখ দেখেও কিছু করতে পারি না।

এই তো গত সপ্তাহেই আমার অনার্সের একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে ঠিক পরীক্ষার মুখোমুখি কি বিপাকেই না পড়েছে। নিয়মিত ক্লাস করে ওরা দুজন। মেধাবী না হলেও বেশ পরিশ্রমী। মাঝে মধ্যে এক আধটা উত্তর লিখে দেখিয়েছে। অভ্যেসমাফিক বারেক চোখ বুলিয়ে দিয়েছি। বোঝা যায় ক্লাসে মোটামুটি যা বলি সেগুলো শুনেছে ঠিকঠাক। দেড় যুগ ধরে একই লেকচার তো কপচে আসছি প্রতি বছরে। ওই ক্লাস লেকচারে কোনো পরিশ্রম নেই। পুনরাবৃত্তি পরম্পরা। অদৃশ্য একটা সুইচ টিপে দিলেই মেকানিক্যালি বাজতে থাকে। চর্যাপদের ভুসুকপাদ থেকে উটপাখির সুধীন্দ্রনাথ—কোনো দ্বিধা থরথর সাতটি অমরাবতী ভর করে না সেখানে। এর জন্যে আলাদা কোনো সক্রিয়তার দরকার হয় না। ফুরফুর করে বলে যাই, ঘাম হয় না।

পার্টওয়ান অনার্স পরীক্ষার এডমিট কার্ড এসেছে কলেজে। একটি ছাত্র এবং একটি ছাত্রীর এডমিট কার্ডে পাস্ সাবজেক্টে গণ্ডগোল। ওরা ক্লাস করেছে পলেটিক্যাল সায়েন্সের। য়ুনির্ভার্সিটির একজামিনেসন ফর্ম ফিলাপও করেছে সেই মত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এডমিট কার্ডে পাস্ সাবজেক্টে পলেটিক্যাল সায়েন্স কেটে লিখে দেওয়া হয়েছে ফিলজফি। বোঝা যাচ্ছে কলেজ থেকেই কেটেকুটে এসব করা।

'কি করবো স্যার? কলেজের অফিস থেকে বলছে—এডমিট কার্ডে যেরকম যেরকম লেখা আছে সেরকম সেরকমই বসতে হবে পরীক্ষায়। এ ছাড়া উপায় নেই।'

'অফিসের কে বলেছে?'

'হেড ক্লার্ক। কি হবে স্যার? আমরা পড়েছি, ক্লাস করেছি—পলেটিক্যাল সায়েন্সের। ফিলজফি তো কিছু জানি না।' এইসব সংকটের মুহূর্তে একেবারে নির্বাক, নির্বিকার থাকা অভ্যেস হয়ে গেছে। কলেজ অফিসের কাণ্ডকারখানায় আমাদের নিষ্ক্রিয় দর্শক হওয়া ছাড়া আর কোনো ভূমিকা নেই।

থাকি কলকাতায়, চাকরি করি মফস্বল কলেজে। যাতায়াতে ট্রেনে-বাসে অটোরিক্সায় পাঁচ ঘণ্টা। কলেজ চত্বরে যে তিন-সাড়ে তিন ঘণ্টা থাকি—তার পুরোটাই কেটে যায় ক্লাসে ক্লাসে। কলেজ অফিসে যতটুকু সময় ঢুকি—ঢুকি

নিছক নিজের দরকারে। ছাত্রছাত্রীদের দরকারে একটা বাড়তি মুহূর্ত খরচের উপায় কোথায়? সেটা করতে গেলে ঠিক ট্রেনটা ধরতে পারবো না। ক্লাসটি হয়ে গেলে তাই আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করার উপায় থাকে না। ট্রেন ধরার জন্যে বেরিয়ে পড়তে হয়। একটা ট্রেন ধরতে না পারলে পরেরটার জন্যে একঘণ্টা সোয়া ঘণ্টা স্টেশনে বসে থাকা। এই টেনসনেই সুজয় মিত্রের মত কারোর অনার্সে ভর্তি হওয়ার লিস্টে নাম তোলার জন্যে খোঁজ খবর নেওয়া বা কোনো রকমের তদবির করা স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে যায় মাথার থেকে।

একই কারণে চোখের সামনে ওই ছাত্রছাত্রী দুটির মতো অসহায় বিপাকে পড়া ছেলেমেয়েদের আমাদের দিক থেকে সত্যিকারের কোনো সহায়তা দেওয়ার থাকে না। নিষ্ক্রিয়তাটুকুই একমাত্র অনড় হয়ে থাকে। নিজেও জানি, ছাত্র-ছাত্রীরাও জানে, এসব ব্যাপারে অফিসের লোকেরাই যা করার করবে। এটা তাদেরই কারো না কারোর গাফিলতিতে ঘটেছে। আবার এটা শুধরোবার জন্যে তাদেরই হাতে কিছু না কিছু গুঁজে দিতে হবে—এটা একটা অলিখিত নিয়ম হয়ে আছে বহুদিনের।

আমরা এসব জেনেও জানি না। শুনেও শুনি না। দায় এড়াতে এড়াতে নিজেদের গুটিয়ে নিতে নিতে নিজেদের এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছি, যেখানে শুধু সুজয়দের অভিভাবকদের হাত থেকে মিষ্টির প্যাকেট নিই চুপচাপ।

ভদ্রতা করে, নিজের সৌজন্যবোধের পরিচয় দিতে স্বর্ণকমল মিত্রকে বসতে বলতে হয়। ভেতরে মিষ্টির প্যাকেট রেখে, উপমাকে বলি দু'কাপ চা পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। তারপর পেয়ালার চায়ে চুমুক দিতে দিতে যতটুকু গল্প করা যায়, সেরে নিয়ে, উঠে পড়ে নমস্কার জানিয়ে স্বর্ণকমলই বলেন, 'আবার আসবো। ফোন করে আসবো। আমার নামটা মনে রাখবেন কিন্তু—স্বর্ণকমল মিত্র। আপনার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি স্যার। সুজয় অনার্সে চান্স পেয়ে যাওয়ায় কতবড় দুশ্চিন্তা থেকে যে মুক্ত হয়েছি আমি, সে আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না। লিস্টে নামটা দেখেই আমি আপনার বন্ধু অরুণাংশুবাবুকে ফোন করে দিয়েছি। আজ খানিক পরেই উনি আপনাকে কোন করবেন—সম্ভবত। আপনাদের কাছে আমি চিরঋণী হয়ে থাকলাম স্যার।'

'না না, এ কথা বলবেন না। অরুণাংশুর মাসতুতো দাদা ডাক্তার সুখেশ ব্যানার্জী আমার স্ত্রীর অপারেশনের সময় যেভাবে সাহায্য করেছেন—সত্যি ভাবা যায় না।'

স্বর্ণকমল মিত্র চৌকাঠ পার হতে হতে বিগলিত স্বরে সোচ্চার হল, 'স্যার—এটাই তো মনুষ্যত্ব—আর আপনাদের মতো মানুষেরাই তো'—পর্যন্ত বলে একধরনের কৃতজ্ঞতা জড়ানো হাসিতে বাক্যটা অসম্পূর্ণ রাখলেন। বোধহয়

ভদ্রলোক নিজেই টের পাচ্ছিলেন ওর বিনয় বচনের মাত্রাটা বেশি হয়ে যাচ্ছে। শেয়ানা মানুষ মাত্রই আমড়াগাছির ডোজ সম্পর্কে সচেতন থাকেন। বেশি উপ্‌চে দিলে পুরোটাই লেবড়ে যায় যে।

এই সময়টাই হল যে যা পাওয়ার যোগ্য নয়, তার সেটা পেয়ে যাওয়ার বা ছুটিয়ে নেওয়ার। যার যা পাওয়া উচিত নয়, তদবিরে প্রাপ্তিযোগ ঘটে যাচ্ছে তার। জীবনটাকে দেখার ধরনটাই পুরোপুরি বদলে গেছে যে। আমাদের তরুণ বয়সে, নিজের উপার্জিত টাকাকেই সবচেয়ে বেশি গৌরবের আসন দিয়েছি। 'স্বোপার্জিত' শব্দটাই সেরা আনন্দের ছিল। আন্‌আর্নড্ (unearned money)-কে ঘৃণা করতে শিখেছিলাম। যদিও অনুপার্জিত অর্থের লোভ বা উত্তরাধিকার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও তৃপ্তি মানুষের সভ্যতার সমবয়েসী। এখন ধারে-কাছে একজন মানুষকেও খুঁজে পাওয়া মুশকিল—সেই মানুষ, যে অনুপার্জিত অর্থ গ্রহণ না করে কোনো রকমের আত্মমর্যাদায় তৃপ্ত থাকে। আমি যেটা পাওয়ার যোগ্য নই সেটা যখন সহজেই পেয়ে যাচ্ছি, তখন বুঝতে হবে পাওয়ার যোগ্যতা যার ছিল সে বা তারা বঞ্চিত হচ্ছে নির্ঘাৎ। কিছু ক্রয় করলে কিছু 'ফাউ' পাওয়া যেতে পারে কিন্তু এ যে কিছু কেনার দাম না দিয়েই ফাউ পাওয়া! আশ্চর্য! আর তাতেই মজা! নিতে কি কোনো রকমের অস্বস্তি নেই? সত্যি, বিবেকদংশন শব্দটাই কিরকম সেকেলে হয়ে গেছে!

স্বর্ণকমল মিত্রের মুখের ওপর সরাসরি বলে দিলাম না কেন—না মশাই, আপনার ছেলের অনার্সে নাম তোলার ব্যাপারে আমার কোনো ভূমিকা ছিল না। আমি কোনো রকমের তদবির করিনি। কাউকে ফোন করে কিছু বলে দিইনি পর্যন্ত। না, করে দেবো না—এমন কোনো অনীহা ছিল না তা ব'লে। বলছি বলবো করতে করতে আর শেষ পর্যন্ত বলে ওঠাটা হয়নি। আপনার ছেলে চান্স পেয়েছে স্রেফ তার নিজের যোগ্যতায়। ক্রেডিটটা যা কিছু সব আপনার ছেলেরই প্রাপ্য। এতে আপনার আরো বেশি আনন্দিত হওয়া উচিত; তাই না?

কিন্তু কেন যে বলতে চাইলেও কথাগুলো বলতে পারলাম না। ভেতর থেকেই বলাটা কেন যেন উঠে আসতে চাইল না। এটাকে তো আর অন্তর্গত নিষ্ক্রিয়তা বলবো না। বলতে পারতাম যদি, তাতে কি স্বর্ণকমল মিত্রের কাছে কাছে আমার গুরুত্ব কমে যেতো? কমে গেলেই বা কি যায়-আসে? তাতে আর কিছু না হোক, নিজের নিষ্ক্রিয়তাকে অন্তত স্বীকার করে নেওয়া যেতো। তাতে এই সাধুবাদ এবং মিষ্টির প্যাকেটের উপঢৌকনটি নেওয়ার বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পেতে পারতাম।

স্বর্ণকমল মিত্র চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে অরুণাংশুর ফোন এলো।

'থ্যাঙ্ক ক্যু ভাই! সো মেনি থ্যাঙ্কস্।'

'অরুণ, ওটা আমায় না দেওয়াই ভালো। কেন না সত্যি বলছি ভাই, তোমার ওই কলিগের পুত্রের লিস্টে নাম তোলার ব্যাপারে আমি মানুষটা কিছুই করিনি। বলছি না—সুজয় তার নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে।'

'সে যাই হোক ভাই।' বলে অরুণাংশু শব্দ করে হাসল। বলল, 'আরে বাবা তোমায় নিজে মাঠে নেমে তদারকি করতে হয় নাকি! তুমি ফোন তুলে একবার বলাটাই তো যথেষ্ট! যাক ওসব কথা। এখন বলো, আছো কেমন? শুনেছো, আমাদের হিরণ্ময়—হিরণ্ময় রক্ষিতকে য়ুনির্ভাসিটি কি রকম বড় চেয়ারে নিয়ে যাচ্ছে? একে বলে ভাই কপাল, বুঝেছো? আচ্ছা, পার্টির জন্যে হিরণ্ময়ের কন্টি বিউশনটা কি শুনি? ওপরওয়ালাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য দেখানো ছাড়া আর কোন কাজটা হিরণ্ময় করেছে এতকাল ধরে?'

হেসে বলি, 'তার মানে সেরা কাজটাই তো করেছে। ঠিক জায়গায় তেল মারলে তো আর অন্য জায়গায় কিছু করার দরকার পড়ে না। নইলে নর্থ বেঙ্গলে ও যখন প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিল, নিজের পার্টির স্টুডেন্ট ফ্রন্ট ওর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেনি? ওকে ঘেরাও করেনি? লোকমুখে তো শুনেছি, খিস্তিখেউড়, এমনকি পিটুনিও নাকি খেয়েছে সেখানে।'

এবার অরুণাংশু হাসে শব্দ করে, বলে, 'আঘাত সে যে পরশ তব—সেই তো পুরস্কার। রামকৃষ্ণদেব ধাঁ করে রানী রাসমণিকে একটা চড় কষিয়ে ছিলেন না?'

'সত্যি, তুমি মেলাতে পারো বটে অরুণ।'

'আমি কেন? সে তো অমিয় চক্রবর্তী কোনকালে মিলিয়ে দিয়েছেন—একেবারে কবির দীর্ঘদৃষ্টিতে।'

এরপর সুজনেই কিছুটা সময় টেলিফোনে জোরে শব্দ করে করে হাসতে হাসতে মাপা সময়ের টুং আওয়াজটা শুনে বললাম, 'আহ! কতদিন পরে এমন করে হাসলাম ভাই। ইদানিং তো জোরে হাসতেই ভুলে গেছি। রামগরুড়ের ছানার যুগে প্রাণখোলা হাসিটুকুও যে হাইজ্যাকড্ হয়ে গেছে।'

যাইহোক, সেদিনের ব্যাপারটা ওই পর্যন্ত নেহাৎ বিচ্ছিন্ন একটা ঘটনামাত্র ছিল, সেটা অন্য একটা মাত্রা পেয়ে গেল—এর বেশ কিছুদিন পরে পাতালের এক সন্ধেবেলায়।

দমদমে মেট্রো ধরেছিলাম। কালিঘাটে নামবো। ঠিক তিরিশ মিনিটের হিশেবের পথ। সাড়ে চারটেয় দমদম ছেড়েছে। কালিঘাট প্ল্যাটফর্মে পা দেবো কাটায় কাটায় পাঁচটায়। পার্ক স্ট্রীটে এসে ঝামেলা হল। দরজা বন্ধ হচ্ছে না ঠিকমত। দাঁড়িয়ে থাকল গাড়ি। অন্যদিনের মতো বারকয়েক খোলাবন্ধ হওয়ার

পর আবার চলতে শুরু করবে বলে মনে হচ্ছে না আজ। কতক্ষণ যে ওইভাবে পাতাল-বন্ধ হয়ে থাকবো—বুঝে উঠতে পারছিলাম না। পাঁচটা থেকে আমার বাড়িতে এক ভদ্রলোক এসে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। আমার পৌঁছনোটা জরুরি। ভাবছি ওপরে উঠে সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি পেয়ে গেলে ভালো, কিন্তু না পাই যদি?

ট্রেনের কামরা থেকে নেমে যাবো ভাবছি। সেই ভাবনা মতো ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছিলাম দরজার দিকে, তখনই গাড়ি চলতে শুরু করল। মাথার ওপরের বারটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। যাত্রীদের মধ্যে আমার আগের আগের জন—তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীর সঙ্গে বেশ জোরগলায় গল্প জুড়েছে। এই শব্দ-ব্রহ্মের সংস্কৃতিতে আমরা একটু বেশি ধ্বনিপ্রিয় বলেই কিনা কে জানে—কলকাতার পাতালরেল সবচেয়ে ধ্বনিময়। চলন্ত গাড়িতে স্বাভাবিক সংলাপ অন্য যাত্রীদের কাছে তেমন স্বচ্ছ থাকে না সাধারণত। কিন্তু ফাটা কাঁসার মত গলার আওয়াজটার প্রতিটি শব্দই কানের পর্দায় ধাক্কা মারছিল। তাছাড়া কথার মধ্যে জায়গা বিশেষে ঝোঁক দেওয়ার ব্যাপারটাও পরিচিত মনে হওয়ায় আমার আগের ভদ্রলোকের কাঁধের ফাঁক দিয়ে বক্তাকে দেখে নিলাম এক ঝলক। বক্তার মুখের একটা অংশমাত্র দেখেই স্বর্ণকমল মিত্রকে চিনে নিতে পারলাম। কান খাড়া থাকল এই কারণে যে মিত্রমশাই যে কথাগুলো বলছেন—সবই আমার সম্পর্কে—সুজয় মিত্রের অনার্স ক্লাসে নাম ওঠা সংক্রান্ত।

'তা দাদা, আমাদের সোমনাথদার বন্ধু, ওই প্রোফেসর ভদ্রলোকের তদ্বিরে কোনো কাজ হয়নি তাহলে? শেষমেষ আপনি গিয়ে হেড ক্লার্ক ভদ্রলোককে ধরলেন!'

'প্রোফেসর তদ্বির করেছে নাকি? কি দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকরে ভাই। ক'দিন কলেজে যাননি ভদ্রলোক—সে তাঁর দরকারমত নাও যেতে পারেন। কিন্তু একটা ফোন করে তো দেখবেন, জানাবেন! পুরো ব্যাপারটাই বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছেন। ভাবা যায়।'

'তা এই ভুলে যাওয়ার কথাটা আবার কবুল করেছেন তোমার কাছে?'

'তা আর করে? ওটা আমার অনুমান। ছেলের লিস্টে নাম বেরোনোর পর তো মিষ্টি নিয়ে হাজির হয়েছি, গদগদ গলায় বলে এসেছি—'স্যার, আপনার দয়াতেই হল, আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকলাম।' বলে ফাটা কাঁসার মত আওয়াজ বেরলো হাসির মধ্যে। ভিড়ের মধ্যে আমি আরো চুপসে গেলাম।

'তোমার আবার বেশি বেশি। কি দরকার ছিল ওইরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন অধ্যাপকের কাছে আবার আমড়াগাছি করতে যাওয়ার? আমি হলে উল্টে ফোনে মিষ্টি মিষ্টি করে দু'চার কথা শুনিয়ে দিতুম বরং! বেশি শিক্ষিত লোকেরাই

বেশি ইরেস্‌পনসিবল হয়—এটা জেনে রেখো।'

'সেটা ভালোরকমই জানি। আবার এও জানি—বেশি শিক্ষিত লোকেরাই বেশি ভিন্‌ডিক্‌টিভ। প্রতিহিংসা নেওয়ার ব্যাপারে এরা দারুণ সক্রিয়। আগে এতোবার গেছি, ছেলের নাম ওঠার পর একবারটি যদি না যাই, ভাববেন—ওনাকে পাত্তা দিলাম না। উপকার করতে পারেননি বলে যে অপকারও করতে পারবেন না সেটা ভাববো কেন? লোকে তো ভক্তিতে শনিপুজো করে না, ভয়ে করে। এবার বুঝলে, কি বলতে চাইছি?'

মিত্রমশাইয়ের সহযাত্রী বন্ধু লোকটি কি বুঝলেন আর জানার চেষ্টা করলাম না, ততক্ষণে আমি যা বুঝবার বুঝে গিয়েছি। ভিড়ের মধ্যে আরো ঢুকে গিয়ে একেবারে দরজার গায়ে সরে গেছি।

দরজা বন্ধ হচ্ছে। দরোয়াজা বনধ্‌ হো রাহা হ্যায়। ডোরস্‌ আর ক্লোজিং। কালিঘাটের পাতাল স্টেশনে ঝুপ করে নেবে ভিড়ে ভাসতে শুরু করেছি। পাতালের দেওয়ালের পটের প্রাণেশ্বরী আর লাউডস্পিকারে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় শুনতে শুনতে এস্‌ক্যালেটরে দাঁড়িয়ে ভাবছি—চলন্ত সিঁড়িটা বেশি উঁচুতে ওঠে না এই স্টেশনে। বেশিটাই পায়ে হেঁটে উঠতে হয়। পুরোনো অভ্যেস পা দুটোকে ঠেলতে থাকে তাই রক্ষে, নইলে পা আর চলতে চায় না যে!

কামাল হোসেন

—

অন্বেষণ

"Painters, do not fear perfection. You will never achieve it! If you are mediocrities, you may try as you will to paint terribly badly, but people will still see that you are mediocre."

Salvador Dali

একটা ব্যালকনি। রাত্রি। একটা লোক ব্যালকনির ধারে দাঁড়িয়ে ক্ষুরে শান দিচ্ছে।

লোকটা জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকায়···
পূর্ণিমায় চাঁদের উপর দিয়ে একটা হালকা মেঘ ভেসে যাচ্ছে।
তারপর বিস্ফারিত দু'চোখসহ এক যুবতীর মাথা ভেসে ওঠে।
ক্ষুরের ফলাটা তার একটা চোখের দিকে এগিয়ে যায়।
হালকা মেঘটা চাঁদের সামনে দিয়ে চলে যায়।
ক্ষুরের ফলাটা যুবতীটির চোখটিকে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

তারপর আবার পূর্ণিমার চাঁদ, হালকা মেঘ, একটা বড় আকাশ বিশাল ডানা ছড়িয়ে আমার চারপাশে ছুটে এল। কোথাও কোনো রঙ নেই। ঠিক যেন সাদা-কালো নির্বাক ফিল্ম দেখছি শুনশান নির্জন মাঠে একা বসে বসে।

ক্রমশ নির্জনতা আরো গাঢ় হয়। চোখের সামনে সেই ভয়ংকর দৃশ্য আবার দেখতে পেলাম। আবার···আবার···

আতঙ্কে আমার গোটা শরীর ঘামে ভিজে গেল। আমি কি এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডর একক সাক্ষী হয়ে রইলাম? ওই নিষ্ঠুর খুনী কি আমাকে আদৌ রেহাই দেবে? বোধহয় বেঁচে থাকার রিফ্লেক্‌সের তাগিদেই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করলাম। পায়ের নীচে সবুজ মাঠ রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের আলো থেকেও ঝরে পড়ছে তীব্র অ্যাসিডের বৃষ্টি। কাজেই ছুট···ছুট··· এই শবগন্ধময় কবরখানাকে উন্মুক্ত প্রান্তর ভেবে কেন ঢুকে পড়েছি, এই ভেবে নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে না-ছুটে উপায় নেই, কারণ পেছনে টের পাচ্ছি

হিংস্রজিহ্বা শিকারী কুকুরের বলদর্পী অনুসরণের শব্দ…

ঘুমটা ভেঙে যাওয়ার পর অন্ধকার ঘরে খানিকক্ষণ সময় লাগল বাস্তব জগতে ফিরে আসতে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, বেশ ভয় পেয়ে গেছলাম। আমার স্ত্রী শীলা একপাশে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। গভীর ঘুমের সময় তার নিশ্বাস বেশ জোরে জোরে শোনা যায়।

আসলে হয়ত মধ্য চল্লিশের রমণী যখন নিশ্চিন্তে ঘুমায়, যৌবনের অন্তিম প্রহরে এক উৎকণ্ঠিত ব্যাধের নিভৃত পদধ্বনি ঠিকই টের পাওয়া যায়। শিহরণহীন স্তনচূড়া, ওষ্ঠের নিঃসাড় মৃত্তিকা, শরীরী ভূভাগে ছড়িয়ে আছে ভাষাহীন শ্মশানের ছাই।

আলো জ্বালালাম। বাথরুম থেকে ঘুরে এলাম। দরজাটা খুলে দোতলার ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ঘুমটা তাহলে হঠাৎ ভেঙে গেল। এখন হাসি পাচ্ছে। দিন-রাত্তির সিনেমা-সিনেমা করে মগজের ভিতরে স্বপ্নের মধ্যেও কী ভাবে ঢুকে পড়েছেন লুই বুনুয়েল। অ্যান আন্দালুসিয়ান ডগ-এর প্রথম দৃশ্য। সতেরো মিনিটের নির্বাক ছবি। ১৯২৯ সালে তোলা ফ্রান্সে। সালভাদর দালির সঙ্গে একত্রে চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন বুনুয়েল। যাজকের ভূমিকায় দালি, জেম মিরাভিলে এবং ক্ষুর হাতে লোকটি স্বয়ং বুনুয়েল।

নাঃ ঘুম বোধহয় আর এখন আসবে না। শেষ রাত্রি। দূরে কোথাও মসজিদ থেকে আজানের ক্ষীণ স্বর ভেসে আসছে। আর ঘুমোনোর দরকার নেই। ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা আনলাম।

ঠাণ্ডা বাতাস চোখ মুখ জুড়িয়ে দিচ্ছে।

আমি যখন এই বাড়ি বানাই, প্রথমে কষ্টেসৃষ্টে একতলাই, এদিকটা তখন কত ফাঁকা ছিল। নীচু ধানী জমি। মাটি ফেলে উঁচু করতে হয়েছে। ধীরে ধীরে কোথা থেকে গাদা গাদা মধ্যবিত্ত মানুষ এসে জমি কিনে বাড়ি করতে শুরু করল। ঠিক যেন স্ল্যাপষ্টিক-কমেডির মতো দ্রুত ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রবাহ। চোখের সামনে একটা প্রায় আধা-মফস্বল শহরের এত রূপান্তর ঘটে যাওয়াও রীতিমতো অবিশ্বাস্য ঘটনা। অবশ্য এই দ্রুততার মধ্যেই এক মায়াবী আয়না ফুটে ওঠে বুঝি। নিজেকে দেখে নিজেই চিনতে পারি না।

পনের বছর বয়সে বাবা মারা গেলেন। ছোট দুই ভাই বোন মা ঠাকুমা। মাথার উপরে আকাশ ভেঙে পড়েছিল। এমনিতেই খুব গরীব ছিলাম আমরা। সামান্য কিছু ধানের জমি আর হাইস্কুলের শিক্ষক বাবা। তখন মাইনেপত্র খুব খারাপ ছিল। প্রাইভেট ট্যুইশনিতেও সেসময় এমন কিছু রোজগার হত না শিক্ষকদের।

আমি পড়াশুনোয় ভালো ছাত্রই ছিলাম। কিন্তু শিরে সংক্রান্তি—একটা নির্দিষ্ট উপার্জন না হলে সংসার চলবে কী করে? অতএব খেয়ে-না-খেয়ে, সামান্য মাইনের দু'চারটে ট্যুইশনি—এসব সম্বল করে কোনো রকমে ইস্কুলের গণ্ডি পেরোলাম।

তারপর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়েই এই সরকারি চাকরিতে ঢুকলাম। এখন এই দোতলা বাড়ির দক্ষিণ দিকের ব্যালকনিতে ভোর রাত্তিরে বসে পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ফ্ল্যাস ব্যাকের পর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

চাকরিতে ঢোকার পর প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে বোনের জন্য শাড়ি আর এক হাঁড়ি মিষ্টি।

প্রাইভেটে বি এ পাশ। এম এ পাশ। ঠাকুমার মৃত্যু।

ভাই সুজিত বি কম পাশ করে পরীক্ষা দিয়ে ব্যাঙ্কের চাকরি।

বোন জয়ার কলেজের পড়া শেষ হলে সম্বন্ধ করে বিয়ে। পাত্রর সরকারি চাকরি। একটি কন্যা ও মধ্যবিত্ত সুখ নিয়ে বেশ তৃপ্ত জয়া। মাঝে-মাঝে বেড়াতে আসে সপরিবার।

অফিসের প্রোমোশনের পরীক্ষাগুলো ভালোভাবে দিয়ে আমি বেশ তাড়াতাড়ি তথাকথিত জব স্যাটিসফ্যাকশনের একটু উঁচু জায়গায় উঠতে পেরেছি।

কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিয়ে করলাম। শীলা। কেরানীর মেয়ে। নিজেও একটা মেয়েদের ইস্কুলের দিদিমণি। আমার বাবার মৃত্যুর স্মৃতি আমাকে এখনো বিচলিত করে। আমি হঠাৎ মারা গেলে ছেলে-মেয়েরা অন্তত একেবারে ভেসে যাবে না। চাকরি-করা মা সামলে নেবে।

সময় মতো আমার দুটি ছেলে-মেয়ে জন্মাল। সুবীর আর সুদেষ্ণা।

আমার ভাইও বিয়ে করেছে। ওর ব্যাঙ্কের ট্রান্সফারের চাকরি। ওর এক ছেলে।

মা কিছুদিন ওর কাছে, কিছুদিন আমার কাছে। দুই ভাইয়ের বউ শাশুড়িকে যত্ন করে। নাতি-নাতনীদের নিয়ে মায়ের দিন এখন সত্যিই ভালো কাটছে।

তো এরকমই সব ছবির পর ছবি। ধীরে ধীরে স্যিলুয়েটের রহস্যলোকে অতীত-কাতর অস্পষ্ট স্বপ্নগুলি নিঃশব্দে মিলিয়ে যায়। অস্তিত্বের ভিন্ন স্তরে পাতা ওড়ে অ্যালবাম থেকে। ভোর-রাত্তিরের আকাশের অন্ধকার ঝাপসা হয় আসছে। অস্পষ্ট আলোর বুক চিরে ইতিমধ্যেই একদল পাখি উড়ে চলেছে আরো দক্ষিণের সীমানাকে লক্ষ্য করে।

'এত ভোরবেলায় উঠে পড়লে? ঘুম হয়নি ভালো?'

শীলা আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পেরে বললাম, 'রাত্রে একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখলাম জানো! ঘুমটা ভেঙে গেল।'

পাশে এসে দাঁড়াল সদ্য ঘুম থেকে উঠে আসা আমার বউ।

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'শুনলে তুমি হাসবে, আজকে বুনুয়েলের একটা ফিল্মের সামান্য অংশ স্বপ্নের ভিতরে অদ্ভুত চেহারায় এসে গেছল।'

কপট গাম্ভীর্য এনে শীলা বলল, 'আসলে সিনেমা হচ্ছে তোমার একটা অবসেসন। উঠতে বসতে খেতে ঘুমোতে সব সময় সিনেমার গপ্‌পো ভাবো।'

আমি খুব অসহায় গলায় বললাম, ঠিক গপ্‌পো না শীলা। বলতে পারো, কিছু কিছু দৃশ্য—কিছু ফ্রেম—কমপোজিসন—মোমেণ্ট—আমাকে তাড়া করে।'

'তুমি জানো, এসব আমি ভালো কিছু বুঝি না। তোমার ছবি আঁকার মতো এই সিনেমা নিয়ে পাগলামোটাও আমার বুদ্ধির বাইরে।'

'তোমার ভালো লাগে না, অথচ কোনোদিন বাধাও দাওনি!'

'ভালো লাগে না, এটা তো বলছি না। আসলে বুঝি না। আমার মনে হয়, এসব কিছু বুঝতে গেলে নিজস্ব আগ্রহ নিয়ে ওই বিষয়ে একটু শিক্ষিত হওয়া দরকার। যেহেতু আমার আগ্রহ নেই, সুতরাং—'

'আসলে হয়ত আমি খুব সাদামাটা সাধারণ মানুষ। তবু সমস্যা হয়েছে, আমার বুকের ভেতরে রক্ত ঝরে, আমি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি।'

'দেখা তো ভালোই। ক'জন এসব দেখতে পায় বল? এও তো এক ধরনের সৌভাগ্য।'

শীলার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকি আমি। মাঝে মাঝে ওকে ভীষণ রহস্যময়ী মনে হয়।

আমি একটু লজ্জা পাওয়া গলায় বললাম, 'পুরো ব্যাপারটা ছেলেমানুষী। আই ক্যান ফিল। পঞ্চাশ বছর বয়েস হল আমার—'

কৌতুকপূর্ণ চোখে শীলা তাকায়। বলে, 'পঞ্চাশ বছর বয়েস মানে ছেলেমানুষী করতে বুঝি মানা?'

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললাম, 'না। আমি তা মনে করি না।'

'তাহলে!'

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। দূরের পাকা রাস্তা ধরে স্বাস্থ্যবিলাসী মানুষেরা হাঁটতে শুরু করে দিয়েছেন।

'মর্নিং ওয়াকে যাবে না?'

'ইচ্ছে করছে না।'

'আজ তো অফিসও যাবে না। আগের দু'দিনও যাওনি।'

'একদিন। পরশু রবিবার ছিল।'

'তুমি বাড়িতে না থাকলেই মনে হয় বুঝি সপ্তাহের কাজের দিন। অথচ পরশু আমার স্কুলও বন্ধ ছিল। খেয়াল করা উচিত!'

ওর মজা করে বলার ধরনে দু'জনেই হেসে ফেললাম। শীলা বুদ্ধিমতী মেয়ে, কিন্তু ঘোরপ্যাঁচ কম। বিয়ের পর আমাদের সংসারটা পুরোপুরি দাঁড়ানো পর্যন্ত অনেক ঝড়-ঝাপটা হাসি মুখে সহ্য করেছে। আমার ভাই বোন মা সকলের কাছেই ও নিজের মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছে।

'আজকে ভাত খেয়ে বেরুবে না?'

'না-না, ওরা লাঞ্চের প্যাকেট দেবে।'

'দেখো, কী হয়। একটা এক্‌সপিরিয়েন্স।' শীলা খুব সহজ গলায় বলল।

'জীবনটাই তো একটা অভিজ্ঞতার পুঁথি শীলা! আমার মতো শালা একটা মিডিওকার লোক, অল্পবয়েসে বাবা যেদিন মারা গেলেন, শ্মশানঘাট থেকে ফিরে আসার সময় মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর এইখানে শেষ। তবু শেষ তো হল না।'

'শেষ বলে কিছু নেই গো। জীবন তো গড়িয়ে চলে।'

'আজকে দেখো, কত লড়াই করে আমি একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি ডাইরেক্টর, তুমি স্কুল মিস্ট্রেস, ছেলে শিবপুর—মেকানিক্যাল ইনজিনিয়ারিং-ছাত্র, মেয়ে সামনের বছর হায়ার সেকেণ্ডারি দেবে। সময়মতো বোনের বিয়ে। ভাইয়ের চাকরি-বিয়ে। কষ্ট করে লোন নিয়ে কলকাতার কাছেই এই শহরতলীতে দোতলা নিজের বাড়ি। আমার মনে হয়, পঞ্চাশ বছর বয়েসে দাঁড়িয়ে এতগুলো হিসেব ঠিক মতো মিলিয়ে পরপর সাজানো অবশ্যই সাকসেস নামক সেই অদেখা বস্তুটির ছবি।'

আমার উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ গলায় শীলা বলে, 'নিশ্চয় তুমি সাকসেসফুল। একই সঙ্গে কর্তব্যপরায়ণ। আর সব কিছুই তুমি নিজের যোগ্যতায় নিজের পরিশ্রমে অর্জন করেছ।'

'তাহলে কেন মনে শান্তি নেই শীলা? তুমি জানো, ছোটবেলা থেকে ছবি আঁকার নেশা ছিল। মাঝে অভাবে-দারিদ্র্যে অভ্যেসটা কোথায় হারিয়ে গেছল। সংসারটা একটু গুছিয়ে নিয়ে নতুন করে রঙ তুলি নিয়ে বসলাম।'

'তুমি তো আমার গর্ব। পয়সা-কড়ি হলে লোকে নেশা করে, খারাপ জায়গায় যায়। তোমার বন্ধুবান্ধব কম। তাই একা একা বসে কত বিচিত্র ছবি আঁকো।'

'তোমাকেও আঁকার চেষ্টা করেছি।'

'যাও। তুমি ভারি অসভ্য ছিলে তখন।' কী মনে হতে লজ্জা পায় শীলা। সুশিক্ষিত শিল্পী আমি। তবু সেই এক বয়েসে শীলার শরীরের সন্ধ্যাভাষার রেখায়িত অনুবাদ করার চেষ্টা করতাম সাদা ক্যানভাসের বুকে।

ভারি শ্বাস ফেলে বললাম, 'সময় সত্যি দ্রুত ফুরিয়ে যায় শীলা।'

শীলা ম্লান ভাবে হাসে। বলে, 'সাত সকালে মন খারাপ করো না। জল গরম করে দিচ্ছি। দাড়ি কামিয়ে স্নান করে নাও। আজ তোমার কী পরীক্ষা

আছে যেন ?'

'ভাইবা ভোসি ! এটার উপরই বোধহয় ফাইন্যাল সিলেকশন।'

একটু কৌতূহলী গলায় শীলা শুধায়, 'ধরো সিলেক্টেড হলে, তারপর ? কিছু ঠিক করেছ ?'

'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।'

'তবু যদি বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে ?'

'বলছ ? ফ্র্যাংকলি স্পিকিং—আমি এখনো একটা ঘোরের মধ্যে আছি। আজকের খেলাটা হয়ে যাক, তারপর ঠাণ্ডা মাথায় তোমাদের সকলের সঙ্গে বসে ভেবে দেখতে হবে।'

শীলা চিন্তিত মুখে আমার মুখের ভাবসাব লক্ষ্য করার চেষ্টা করছিল। আমি বেশ বুঝতে পারছি, হঠাৎ আমার এরকম এলোমেলো ছেলেমানুষীপনায় ওর বুকের মধ্যে দুই বিপরীতমুখী নদী বইতে শুরু করেছে। ও নিজেও তো মধ্য-চল্লিশে পৌঁছে গেছে। এ বয়েসে সংসারে সকলেই একটা গাছের ছায়া নামক নিরাপত্তার ঘেরাটোপে বসে থাকতে পছন্দ করে। তার জন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না।

২

বাড়ি ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গেল। ওদের ওখানে মৌখিক পরীক্ষার পাট চুকিয়ে একটু বারাসাত গেছলাম। আমাদের অফিসের এক কলিগ—আমার বন্ধু সুখেনের বাড়ি। আমরা প্রায় এক সময়েই অফিসে ঢুকেছিলাম। ও আমার মতো এত লড়িয়ে বা জেদী ছিল না কোনোদিনই। তাই চাকরির পদমর্যাদায় ও এখন অনেক নীচের ধাপের সহকর্মী !

তবে সে-ভাবে তো আমি মানুষকে কোনোদিন দেখিনি। ও অবসর সময়ে কবিতা লেখে। লিট্‌ল ম্যাগাজিনে ছাপা হয়। আমার বাড়িতে এসে ছবি দেখে। মতামত জানায়। বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা।

শীলা দরজা খুলে দিল।

বাইরের কাপড়-জামা ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে খাবার টেবিলে এলাম। ওরা তিনজনে অপেক্ষা করছিল।

শীলার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'সুখেনের বাড়ি ঘুরে এলাম।'

'বারাসাত ?' সুদেষ্ণা শুধাল।

আমি মাথা নাড়লাম।

'কেমন আছেন সুখেনকাকু ?' সুবীর শুধাল।

ম্লানভাবে হাসলাম। কীই বা বলা যায়।

শীলা বলল, 'ভালো নয় ?'

'এ রোগ আজকাল এমন কিছু নয়। টি বি-কে কেউ এখন রাজরোগ বলে না।' আমি বললাম।

'তবু দেখা করে এসে ভালো করেছ। খুব খুশী হয়েছেন নিশ্চয়ই।' শীলা বলল।

'ভীষণ। ছেলেমানুষের মতো লাফালাফি করছিল। অনেক নতুন কবিতা পড়ে শোনাল। ওর বউ ছন্দা লুচি আলুর তরকারি খাওয়াল।'

'ফাইন। নাও—সব খেতে বসে যাও তাড়াতাড়ি।' শীলা বলল।

খাওয়া শুরু করে শীলা হঠাৎ মজা করা গলায় শুধাল, 'আজ কেমন ব্যাট করলে ?'

কিছুটা নীরস গলায় বললাম, 'এটা একটা মজার খেলা। ব্যাট করছি ঠিকই। কিন্তু জানি না কত রান উঠছে স্কোরবোর্ডে।'

সুদেষ্ণা অধৈর্যভাবে বলল, 'কী তোমরা হেঁয়ালি কর বুঝি না বাপু। যা বলবে ক্লিয়ার-কাট বলবে।'

শীলা তার গলায় মজাটা অক্ষুণ্ণ রেখেই বলল, 'তোমাদের বাবা ইন্টারভিউ দিতে গেছল।'

'ইন্টারভিউ মানে আবার নতুন চাকরি ?' সুবীর শুধাল।

'ধুর, চাকরি কেন হবে, এটা একটা কলেজে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে।' শীলা বিষয়টা পরিষ্কার করতে গিয়ে আরো জটিল করে ফেলল।

দুই ছেলেমেয়েই ভ্যাবাচ্যাকা মুখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

আমি আরো একটু সরল করে বললাম, 'এটা একটা নতুন সরকারি ফিল্ম ইনস্টিট্যুট। আমি ডিরেকসন নিয়ে পড়াশুনা করব ভেবে অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়েছি। আজ ভাইবা ছিল।'

'তুমি তো ফিল্ম নিয়ে আগেও তো কোথায় কী-সব শিখছিলে।' সুদেষ্ণা বলল।

'হুঁ, কলকাতায় ছোটখাটো এতকাল যা শেখবার জায়গা ছিল, সব জায়গাতেই সিরিয়াসলি ঢুঁ মেরেছি। চেষ্টা করেছি, যদি ভালোভাবে এই ব্যাপারটা শেখা যায়।' আমি বললাম।

'তুমি ছবি আঁকতে ভালোবাস, ছোট থেকে দেখে আসছি। হঠাৎ ফিল্ম তৈরির নেশা কবে মাথায় চাপল ?' সুবীর শুধাল।

'আমি সবটা হয়ত তোদের ঠিকমতো বোঝাতে পারব না। ছবি আঁকতে আঁকতে হঠাৎ অনুভব করলাম, এর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে পারলে বেশ হয়। এমন একটা মাধ্যম যেখানে কথা থাকবে, সুর থাকবে, ছবি থাকবে,

আমার অনুভূতির দূরত্বটা অনন্তে নিয়ে যেতে পারব। অফিসের এক বন্ধু বিমল—সিনেমা-পাগল লোক, আমাকে এক সিনে ক্লাবের মেম্বার করে দিল। নিয়মিত দেশী বিদেশী ভালো ভালো ছবি দেখতে দেখতে একদিন হঠাৎ ভাবতে শুরু করলাম, সেলুলয়েডের বুক চিরে আমিও কবিতা লিখতে পারি।' আমি বললাম।

'কেমন হল পরীক্ষা-ইণ্টারভিউ ?' সুদেষ্ণা শুধাল।

নিজের টাক মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, 'পরীক্ষা, ইণ্টারভিউ ভালোই দিয়েছি—এ বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু আসল জায়গায় বিট্রে করেছে—আমার বয়েস ?'

'বয়েস ? শীলা শুধাল।

'হ্যাঁগো, এক প্রশ্নকর্তা তো বলেই ফেললেন, আপনার বয়েস পঞ্চাশ, ভালো চাকরি করেন, শখের ফিল্ম-ছবি চালাচ্ছেন ঠিক আছে, কিন্তু শুধু শুধু আপনাকে একটা সিট দেওয়া মানে কোনো ইয়ং ছেলেকে ডিপ্রাইভ করা। কাজেই যদিও ওদের আইন-কানুনে কোনো বয়েসের সীমা দেওয়া নেই, তবু মনে হয়, আমি নির্বাচিত হব না।'

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বললাম না।

একমনে আমরা খেয়ে যেতে থাকলাম।

হয়ত একটা অন্যমনস্কতা ক্রমশ আমাদের গ্রাস করছিল।

পরিবেশ হালকা করার জন্যই বোধহয় শীলা বলল, 'চান্স পেলেও তোমার বিপদ। তোমার চাকরিতে কি স্টাডি লীভ দেবে ?'

আমি হয়ত বে-খেয়ালে বলে ফেলি, 'পে কমিশনের রিপোর্ট সামনের মাসে বেরোবে।'

হঠাৎ আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কহীন এরকম ধরনের কথা শুনে ওরা তিনজনেই আমার মুখের দিকে তাকায়।

আস্তে আস্তে বলি, 'রিপোর্ট বেরোলে আমাদের মাইনে অনেকখানি বেড়ে যাবে। ভাবছি তখন ভলাণ্টারি রিটায়ারমেণ্ট নিয়ে নেব। ওই যাকে গোল্ডেন হ্যাণ্ডসেক বলে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে তিনজনে আবার আমরা খেয়ে যাই।

আমি আবার বলি, 'টাকাগুলো ইনভেস্ট করা থাকবে। তার সুদ মাসে মাসে পাব। শীলাও বেশ কিছুদিন চাকরি করবে। তোরা কেউ জলে পড়বি না।'

শীলার চোখে বোধহয় জল টলটল করে। বলে, 'তোমাকে আদৌ হয়ত এরা সিলেক্ট করবে না। তুমি নিজেই তো বললে।'

'সে তো আমি ভালো করেই জানি। ওদের ভরসা আমি করছি না।' আমি বলি।

'তাহলে ?' সুবীর শুধায়।

'আমি তোদের বুঝিয়ে বলি। আমি নিজেও জানি—আমি একটা মিডিওকার লোক। জিনিয়াসদের মতো অসাধারণ প্রতিভা আমার নেই। তবু তোদের কাছে স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, আমি স্বপ্ন দেখি, আমি একটা ফিল্ম নির্মাণ করছি, যার স্রষ্টা আমি নিজে।'

'একটু ভেবেচিন্তে ডিসিশান নিও।' সুদেষ্ণা বলে।

'সেই অল্প বয়েসে বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে ভেবেচিন্তে এক পা এক পা করে এত দূরে এসে পৌঁছলাম। দায়িত্ব-কর্তব্যে কোনোদিন বিচ্যুত হইনি।'

'তুমি রাগ কোরো না, তুমি যেটা ভাবছ সেটাই করবে। কিন্তু এটা কি এক ধরনের গ্যাম্বলিং নয় ?' সুবীর শুধাল।

'ধরে নে বুড়ো বয়েসে একবার জুয়া খেলার শখ হয়েছে।' আমি মজা করে বলি।

শীলার চোখের তারায় অভিমান অনুভব করছিলাম। সকালেও কেন ওকে বলিনি কিছু, এটাই ও ভাবছে হয়ত। কিন্তু ইণ্টারভিউ বোর্ডে যাবার পরই তো এই জেদটা মনের মধ্যে ভীষণ চেপে বসেছে, একা একাই লড়ব আমি। তখনই এই সব সিদ্ধান্ত নেবার কথা ভেবেছি।

আমি হঠাৎ শীলার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়েছে বলে কি আমি বাতিল ঘোড়াদের দলে নাম লিখিয়ে ফেললাম নাকি ?'

শীলা আমার পরিশ্রমী জীবনের প্রতি চিরকালই শ্রদ্ধাশীল। আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যই বোধহয় বলল, 'বালাই ষাট, কে বলল আমার বরকে বুড়ো ?'

ছেলে-মেয়েরা হেসে উঠল মায়ের কথায়।

আমি বললাম, 'আমি বিশ্বাস করি, মানুষ যে-কোনো বয়েসে নতুন কিছু শুরু করতে পারে। বাদল সরকার তাঁর ইনজিনিয়ারিং প্রফেশন ছেড়ে খানিকটা বেশি বয়েসেই নাটকে ঢুকেছেন। মানছি, উনি গ্রেট মানুষ, আমার কোনো প্রতিভা নেই, কিন্তু একজন মাঝারি মাপের মানুষও তো স্বপ্ন দেখে, বন্য ঘোড়ার কেশর ধরে নদী-নালা-খাল-বিল পেরিয়ে ছুটে বেড়াতে চায়—'

নতুন করে আর কিছু কথা আমরা কেউ খুঁজে পেলাম না।

হাত-মুখ ধুয়ে, দাঁত ব্রাশ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে দক্ষিণের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালাম। চারপাশের বাড়ি ঘর থেকে ছিটকে আসা সন্নিহিত আলো। মাথার উপরে আকাশ। অসংখ্য নক্ষত্র। সহৃদয় বন্ধুর মতো আমার দিকে কত দূর থেকে তাকিয়ে আছে। হয়ত শাশ্বতকালের কোনো প্রতিশ্রুতি পৌঁছে দিচ্ছে।

'তুমি যদি সিনেমা বানাও, প্রথম সিনেমাটার গল্প ঠিক করেছ ? শীলা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। রোজ রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা এরকম দাঁড়াই।

গল্প করি।

'ঠাট্টা করছ ?'

'বিশ্বাস করো—' আমার হাতটা চেপে ধরে শীলা।

আমি মৃদু গলায় শোনাতে বসি একজন মানুষের গল্প। তার চারপাশে বড় বাঁধন। সংসারের। কর্তব্যের। দায়িত্বের। বিবেকের। আশৈশব সে একটা বড় পৃথিবী দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু একটা জীবন বৃথায় কেটে গেল, কোনো আলোকিত উন্মোচনে ভরে উঠল না তার অস্তিত্বের খাঁচা।

শুনতে শুনতে শীলা কেঁদে ফেলে। ফিস ফিস করে বলে, 'লোকটা যেন হেরে না যায়—লোকটা যেন শেকল ছিঁড়ে উড়তে পারে। দূরের মাঠ ধরে হাঁটতে হাঁটতে লোকটা চলে যাক সেই বড় পৃথিবীর আঙিনায়…'

মনে মনে আমি বলি, 'দেখো, সে ঠিক ঘরে ফিরে আসবে।'

হারুন হাবীব

—

বৃক্ষ-বন্দনা

অদ্ভুত সেই ভাবনাগুলো স্বর্ণলতার মতো জাপটে ধরে আদীলকে। সেই কবেকার একটি গাছ। না, গাছ নয়, বৃক্ষ। বৃক্ষ নামে না ডাকলে একদম মানায় না ওকে। সেই কত বছর দেখা নেই। আদীল অথবা আদীলুজ্জামান গাছ-লতাপাতার জীবনেতিহাস পড়ে দেখেনি কখনো। ওদের কে কতো বছর বাঁচে তার খোঁজ একদম সে রাখে না। এতো বছর পর দেখা হবে কি হবে না—তাও সে নিশ্চিত নয়। তবু ঘর থেকে বেরিয়েছে আজ সে। অনেক দূরে তাকে যেতে হবে। এই ঢাকা নগরী থেকে অনেকটা পথ।

ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলগুলি ঢাকা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে গেলে আড়াই কি তিন ঘণ্টা। সিলেটের দিকে পাঁচ থেকে ছয়। ময়মনসিংহ-জামালপুরের পথে চার থেকে পাঁচ। যশোর-খুলনা হয়ে গেলে দশ কি বারো। দিনাজপুর-রাজশাহী পেরিয়ে এক-দু'ঘণ্টা আরো বেশি হলেও হতে পারে। কি আশ্চর্য, এখনো তার সবটাই মনে আছে। পঁচিশ বছরেও সে কিছুই ভোলেনি। সব স্পষ্ট মনে আছে।

বৃক্ষটির নাম সে জানে না। তবে স্বদেশী ওটা। অজানা বিদেশী যে নয় বলাই বাহুল্য। ওর ডালপালা বিস্তার করা ঘন সবুজ পাতাগুলি যেন কাজী নজরুলের ঝাঁকড়া বাবরির মতো চুলের অরণ্যে ঠাঁসা। বিপুল বিদ্রোহের তারুণ্যে ভরা সেই অরণ্য। ভোর বেলায় অথবা দিনান্তের অবসানে ও বৃক্ষ ঠিক যেন একজন রবীন্দ্রনাথ। উঠতি অথবা পড়ন্ত সূর্যের লাল আভায় ঘন পাতা সমেত ঝুলে পড়া ডালগুলো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের লম্বিত সোনালী চুল। মহান বাঙালি সাধক পুরুষ। এই বঙ্গের হৃদয়।

বিস্ময়কর হলেও সত্য, ঠিক দুপুরে, কঠিন রৌদ্রকরোজ্জ্বল দুপুরে, ওই বৃক্ষ আদীলুজ্জামানের কাছে একজন কবি সুকান্ত। দেখে বোঝা যায় না কী গোবেচারা, সাদাসিধে, অথচ কি প্রচণ্ড ক্ষোভ আর বিদ্রোহ। ন্যায্য হিস্যা নেয়ার কী অসাধারণ প্রত্যয়! আদীলুজ্জামান ভেবে পায় না, ওই বৃক্ষটির মাঝে সে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল কিম্বা সুকান্তের শরীরকে কেন আবিষ্কার করেছিলো সেদিন। না, ওটা একদম জোর করে আবিষ্কার নয়, ও বৃক্ষ যা তাই সে দেখেছিলো।

বাসটা ছুটছিলো। বেশ দ্রুতই ছুটছিলো। ইদানিং ঢাকা নগরীর দু'ধারে দুটো বড় ব্রীজ হওয়ায় মিনিট দশেকের মধ্যেই রিকশার ব্যারিকেড মুক্ত হয়ে বাসগুলো সব কালো পিচের টানা হাইওয়েতে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। একাত্তর সালে অবশ্য এমনটা হতো না। ঢাকা নগরী এই পঁচিশ বছরে বিপুল বদলেছে। কাঁচপুর বা মিরপুরের ব্রীজ দুটো তখনো হয়নি। ফেরি পারাপারের ভীষণ সংকট ছিল তখন। এ ছাড়া রাতের বেলা সন্ত্রস্ত হয়ে মেশিনগান উঁচিয়ে টহল দিতো হানাদার পাকিস্তানি সৈন্য। সঙ্গে থাকতো দেশি রাজাকার আর হিংস্র জামাতি মোল্লার দল। গানবোট থেকে সার্চ লাইট মেরে ওরা চারদিকে নজর রাখতো। কে যায় আর কে আসে। সীমান্তের ক্যাম্পগুলি থেকে দলে দলে গেরিলা যোদ্ধারা ঢুকছে তখন দেশে। বিদেশি হানাদারদের ওপর বোমা হামলা বেড়ে গেছে। পাকিস্তানি সৈন্যদের ক্যাম্প আর টহল গাড়িতে আক্রমণ হচ্ছে।

তবু এই সুরক্ষিত শীতলক্ষা পেরিয়ে ঢাকায় ঢুকেছিলো আদীলেরা। একবার নয়—পাঁচ ছ'বার। স্টেনগানগুলো খুলে চট দিয়ে বস্তায় পেঁচিয়ে নিয়েছিলো। গ্রেনেডগুলো ভরে নিয়েছিলো বাজারের আলুপটলের ব্যাগে। একজন গেরিলা কমাণ্ডার আর একজন কৃষক শ্রমিকের চেহারায় কোনো তফাৎ ছিলো না। এ বাড়ি ও বাড়ি করে ঢুকে যেত ওরা ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে। এ শহরের বাড়িগুলি ছিল তাদের নিরাপদ আশ্রয়। বাঙালি বাঙালিকে কতটা ভালবাসে ১৯৭১ তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। প্রতিবারেই আট-দশটা অপারেশন। গুলি। বিস্ফোরণ। এ্যাটাক। রক্ত। মৃত্যু···। সব, সব মনে পড়ে এখনো আদীলের, এতগুলি বছর পরও।

সত্যিই এক ভয়ংকর ভালোবাসার জীবন ছিলো তখন। একবার দেখা দিয়েই সেটা পালিয়ে গেলো চোখের পলকে। হঠাৎ একদিন তাদের উড়ে বেড়াবার যেন পাখা গজালো। দীর্ঘ পিঞ্জরবন্দি পাখির মুক্তির উন্মাদনা। উড়ে উড়ে বাজপাখি ধরার এক রক্তাক্ত রোমাঞ্চকর খেলা। আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আনন্দিত হবার প্রতিযোগিতা। তারপর আবার একদিন বাঁশি বাজলো। মাত্র নয় মাস। রাক্ষুসে বাজগুলো সাময়িক বন্দি হলো। স্বপ্নের অনিন্দ্য পাখাগুলো সব খসে পড়লো ওদের। সুখের মধ্যেও মুছড়ে পড়লো ওরা তীব্র এক যন্ত্রণায়।

ক'দিন আগে সন্ধ্যেবেলায় আদীলের এক বন্ধু এসেছিল বাসায়। স্মৃতিময় সেই বৃক্ষ ভ্রমণের পরিকল্পনাটা দু'জনে মিলেই ভাবছিলো ওরা। কিন্তু বাসায় ঢুকেই সেদিন পরিতোষ বলে দিল, সে যাবে না। ওকে রীতিমতো ক্ষ্যাপা লাগছিল তখন। চোখ দুটো লাল হয়ে ওঠেছিল। সচরাচর অমন দেখায় না পরিতোষকে।

* * *

—কি ব্যাপার! যাবিনে মানে।

রীতিমত বিস্মিত আদীল। এই পঁচিশ বছরে অনেকেই এবং অনেক কিছুই বদলেছে। সমাজের বিবর্তন ঘটেছে বিস্তর। অনেক মুক্তিযোদ্ধার স্খলন হয়েছে। অনেকেই এবং অনেক কিছুই বদলেছে। কিন্তু পরিতোষ বদলাবে কেন? গাঁটি দেশপ্রেমিকের, বিশেষত একজন আত্মত্যাগী মুক্তিযোদ্ধার বদলাবার প্রশ্ন ওঠেনা। দুর্ভাবনায় পড়ে আদীল, খুলে বলতো—ব্যাপারটা কি।

—আমি তোকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। কাকার মৃত্যুসংবাদ পেলাম কলকাতা থেকে। ওকে আমি খুব ভালবাসতাম। কাকাই আমাকে হাত ধরে মুক্তিযুদ্ধে নিয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ওর আর এখানে থাকা হয়নি। কাকা আমার পুরনো ইমোশন। শেষ পর্যন্ত ওর লাশটাকেও একবার দেখতে পেলাম না। ভেবেছিলাম স্বাধীনতার যুদ্ধে সবাই মিলে রক্ত দিয়ে আমরা যে দেশটা বানাবো—তা হবে বাঙালির দেশ। কিন্তু আমার সে আশা পূরণ হলো না।

—বুঝলাম হলো না, তার সাথে তোর না যাবার সম্পর্কটা কোথায়?

—সম্পর্কটা তোরা বুঝবিনে। বুঝবিনে। দিন কয়েক ধরেই ব্যাপারটা নিয়ে বেশ ভাবছি আমি। সবকিছু মিলিয়ে বড্ড ইমোশনাল হয়ে গেছি। তুই আমাকে ক্ষমা কর। তুই একাই যা। আমি না হয় পরে যাবো।

পরিতোষ সহযোদ্ধা আদীলের। যুদ্ধের ময়দানে এক সময় আদীল আর পরিতোষ জীবন-মৃত্যুর আর বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে এক সাথে। সেই সখ্যতা শুধু ব্যক্তি জীবনের নয়, ব্যক্তি বিশ্বাসেরও। এখন সে মাঝারি এক ব্যবসা করে। অনেকের চেয়ে খারাপও নেই। আদীলও এক আধা-সরকারী অফিসের মাঝারি কর্মকর্তা। জীবনে অনেক কিছুই তাদের পাওয়া হয়নি। স্বাধীনতা যুদ্ধের অনেক স্বপ্নই তাদের অপূর্ণ। সেই যন্ত্রণা সেই ব্যর্থতা তাদের প্রতিনিয়ত কষ্ট দেয়। বৃহত্তর জনগোষ্ঠির বিবেচনায় তবু ওরা যথেষ্ট ভাল। মধ্যবিত্তের সচ্ছলতা। কিন্তু এই পঁচিশ বছরে ওদের মধ্যে একটা ফাঁক তৈরি হয়ে গেছে—যা ওরা কেউ চায়নি। আদীল চিন্তা করতে চেষ্টা করে, বন্ধুর এই সংকট দূর করা যায় কি করে। এই সমাজে মেজরিটি আর মাইনরিটির সংকট সাধারণ মানুষদের তৈরি নয়। ধর্মকে পুঁজি করে রাজনীতি করে যারা সিংহাসন পেতে চায়—এ তাদেরই অসৎ কীর্তি। কিন্তু উপেক্ষা করে নয়, বরং বাঙালি সমাজের লোভী তস্করগুলিকে দমাতে হলে সমাজ থেকে পালিয়ে নয়—বরং তাতে অবস্থান করেই যৌথ যুদ্ধে এগুতে হবে। এই তার বিশ্বাস।

—শোন পরিতোষ, এভাবে পালিয়ে লাভ নেই। তুই চল। এই সমাজে তুই মাইনরিটি বলে তোর যে সংকট তার চেয়ে আমি মেজরিটি বলে আমার সংকট কি কম? আমরা দু'জনেই ওইসব বজ্জাতদের কমন এনিমি। শুধু শুধু কাপুরুষের

মতো পালাবি কেন। মাতৃভূমি থেকে পালিয়ে যাবিই বা কোথায়। তারচে যুদ্ধ করে ওদের পরাজিত করতে পারলেই এই দুর্ভাগা বাঙালি সমাজের লাভ।

শেষ পর্যন্ত পরিতোষ আসেনি। ও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। মাথার যন্ত্রণা তীব্র হয়ে উঠেছিল। আখাউড়া পর্যন্ত পৌঁছতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগলো আদীলের। বাস থেকে নেমে বোকার মতো পরিচিত মুখ খুঁজতে চেষ্টা করলো সে প্রথমে। ওর ধারণা, কেউ না কেউ বেরোবে। কাউকে না কাউকে সে খুঁজে পাবে। পঁচিশ বছর এমন কি বেশি ব্যাপার।

কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা আদীলুজ্জামানের দুর্ভাগ্য সে তার নিজের শরীরটিকে পর্যন্ত এতোদিন তাকিয়ে দেখেনি। পঁচিশ বছর আগের যুবক আজ কি তারও সেই পুরনো দেহখাঁচায় আছে? এখন তাকেও কি চেনা যায়? সেই চিকচিকে কালো সিঁথিকাটা চুল নেই। দুমড়ানো সবল পেশির হাত নেই। পা আর হাতের পেশিগুলি অসুস্থ রোগীর মতো ক্রমশই যেন অকেজো হয়ে পড়েছে। পঞ্চাশের শরীরে বিশের শরীর খোঁজা নির্বোধের কর্ম বৈকি। অতএব কেউ তাকে চিনলো না। কোনো বন্ধু, পরিচিত মুখ বা তার প্রিয় কোনো সহযোদ্ধা।

যে গ্রামে সে যেতে চায় তার নাম জানে না আদীলুজ্জামান। পঁচিশ বছর আগে জানতো। হয়তো তার মুখস্থও ছিল নামটা তখন। কিন্তু আজ মনে পড়লো না একদম। ত্রিপুরা আর কুমিল্লার সীমান্তটা এখানে বড় অদ্ভুতভাবে ভাগ করা! এক সময় এগুলো নাকি সব এক ছিল। বৃটিশ আর ক্ষমতালোভী রাজনীতি-বিদদের হাতে ভাগ হয়ে গেছে ভূখণ্ড। আদীলের মনে হঠাৎ একটি প্রশ্ন এলো। একমাত্র বাংলা আর পাঞ্জাবকেই ভাগ করা হয়েছে কেন গোটা উপমহাদেশে? এই বাংলা আর পাঞ্জাব থেকেই ইংরেজ-বিরোধী বিদ্রোহ হয়েছিল, এই বঙ্গ-ভূমিতে ইংরেজ যতোটা মার খেয়েছে উপমহাদেশের আর কোথাও ততোটা নয়। তাহলে কি এটা ওদের প্রতিশোধ?

কী হাস্যকর এই সীমান্ত! ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে পরদেশি সীমানায় পা ঢুকে যায় বোঝাই যায় না। বঙ্গ সীমান্তের এই জায়গাটায় বাতাসেরা ভাগ হয় না, পাখিরা ভাগ হয় না, ভাগ হয় না কখনো সূর্য, দিন, রাত বা আকাশ। ভাগ শুধু মানুষের—যে মানুষ এক ভাষায় কথা বলে। এ এক বিচিত্র বিভাজন।

অবশ্য পঁচিশ বছর আগের অনুভূতিটা ভিন্ন ছিলো আদীলের। আজ যেমন গ্রামটিকে খুঁজতে হচ্ছে সেদিন হতো না। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ একাকার হয়ে গিয়েছিলো সেদিন। উদয়পুরের শালবনটার মাঝে ছিলো গেরিলাদের সারি সারি ক্যাম্প। শালগাছগুলির ফাঁক দিয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকাগুলিকে উড়তে দেখা যেত বাতাসে। অমরপুর, সোনামুরা, কসবা,

কৈলাসহর, সিলেট আর সাব্রুম-রামগড় সব এক হয়ে গিয়েছিল তখন।

মাইল কয়েক হাঁটলেই বা বাস-ট্রাকে চাপলেই আগরতলার উপকণ্ঠে অরুণ্যজ্যোতি নগর। মনে পড়ে, ওখানে পাপড়ি নামের এক কিশোরী একদিন তাকে অবাক করে দিয়েছিল তার ব্যবহারে।

আগের দিন আখাউরার দিক থেকে পাকিস্তানিদের একটি মর্টারের টুকরো ছুটে এসে হঠাৎ আদীলের উরুতে আঁচড় কেটে দিয়েছিল। রাতে তেমন ব্যথা হয়নি তবে রক্তক্ষরণ হয়েছিল। পরদিন ঘুম থেকে উঠতেই সে দেখলো প্যান্টের সাথে শুকনো রক্ত জমে চটচটে হয়ে গেছে। কিছুতেই ছাড়ানো যাচ্ছে না। দাঁড়ানোও যাচ্ছে না। সেই কষ্টের কথা এখনো মনে পড়ে।

পাপড়িদের স্কুল-ঘর বোঝাই করা তখন পূর্ববঙ্গের শরণার্থী। মাঝেমধ্যে গেরিলারাও আসে কাঁধে রাইফেল নিয়ে। ওদের কেউ কেউ গলা চড়িয়ে ওর মাকে ডেকে বলে, মাসীমা, মেলা দিন মাগুর মাছের ঝোল খাই না। আজ খাওয়াবেন নাকি? দুই ঘণ্টা মাত্র সময়।

পাপড়ির বাবা-মা সীমান্ত পেরিয়েছে পঞ্চান্নর দিকে। দীর্ঘকাল ত্রিপুরায় বসবাস করেও মাতৃভূমির গল্প শুনতে বসে দুজনের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। জল গড়িয়ে চোখের পাতা ভিজে যায়।

কাছে বসিয়ে পাতে মাগুর মাছের ঝোল দিতে দিতে মা বলেন: বাবা, ঢাকা থেকে মুন্সিগঞ্জ যেতে এখন কত সময় লাগে রে? আমাদের সময় কিন্তু লঞ্চ ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না। তুই কখনো রামসাগরে গেছিস? মুন্সিগঞ্জের ঠিক পাশেই। কী বড় বড় কলা হতো, আর কী স্বাদ!

আদীলের আজো মনে পড়ে, শুকনো রক্তের প্যান্টটাকে সে যখন টেনে ছিঁড়ছিল ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে চোখ দুটি ছলছল করে তাকিয়ে ছিল পাপড়ি।

—দাদা, ওভাবে আর টেনোনা, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তোমার। আমি জল দিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছি।

—আমার জন্য তোর কষ্ট হচ্ছে?

আদীলের কষ্টের কারণ বোঝা যায়। কিন্তু পাপড়ির কষ্ট যে কেন তা সে হয়তো নিজেও ভাল করে জানে না। আদীলের প্রশ্নে তাই সে মুখ তুলে একবার তাকায়। তারপর ছুটে গিয়ে এক বদনা জল এনে পায়ে ঢালতে থাকে।

—তুই যে আমাকে সেবা করলি, কেন করলি বলতো?

পাপড়ি এই প্রশ্নের উত্তর জানেনা। কিম্বা সে গুছিয়ে বলতে পারেনি। এক মনে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ ধরে জল ঢেলে ঢেলে আদীলের রক্তমাখা প্যান্টটাকে সে পরিষ্কার করে দিয়েছে।

—দাদা, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে আমাকে একবার তুমি নিয়ে যাবে?

মুন্সিগঞ্জ আমি কখনো দেখিনি। আমার কাছে ওটা স্বপ্নের মতো। আচ্ছা, ওখানে নাকি অনেক বড় বড় নদী? বাবা-মা প্রায়ই গল্প করেন, যেতে চান। আমার আর একটা স্বপ্ন আছে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে ফুল দিতে চাই আমি। অন্তত একবার।

আজ পঁচিশ বছর পর আদীলুজ্জামানের মনে পড়লো আবার সেই মেয়েটিকে। কেমন আছে কোথায় আছে সে এখন? তখন সে ক্লাস নাইনে পড়তো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংকটে প্রায় গোটা ত্রিপুরার স্কুল-কলেজ বন্ধ। অন্য দেশের নাগরিক হয়েও গলা ফাটিয়ে একই গান গাইতো ওখানকার ছেলে-মেয়েরা: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। শ্লোগান তুলতো: জয় বাংলা। সামান্য ওধারেই কসবা রেল স্টেশন। কিছু দূরেই পাহাড় বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে পাহাড়ি গোমতি। পাড় ধরে মাইল কয়েক হাঁটলেই সেই বৃক্ষ। মুক্তিযোদ্ধা আদীলুজ্জামানের ভালোবাসার বৃক্ষ।

এমন অদ্ভুত, গভীর ভালোবাসার বৃক্ষ আর একটিও নেই এ পৃথিবীতে। কতো বছর আগে ওর জন্ম? কোন ফলের কিম্বা কোন ফুলের বীজ থেকে, কোন বিহঙ্গের ঠোঁট থেকে খ'সে পড়ে ওর এই সুবিশাল উত্থান? এসবের কিছুই সে জানে না সে। জানতেও চায়না।

আদীলুজ্জামানের স্পষ্ট মনে পড়ে, সীমান্তরেখার ঠিক মাঝখানটায় ছিল গাছটির চওড়া গোড়ালি। ডালপালা বেড়ে একদিকে নাগরিক সে বাংলাদেশের অন্যদিকে ত্রিপুরা রাজ্যের। অবশ্য এসবের চাইতে বেশি করে মনে পড়ে ওর অবয়বকে। কাজী নজরুলের মতো কী অসাধারণ বাবরি দোলানো ঝাঁকড়া চুল। রবীন্দ্রনাথের মতো ঝুলে পড়া মাটি ছোঁয়া ডাল শেকড়। সুকান্তের চাপা ক্ষোভের বিদ্রোহ চোখেমুখে।

এসব মনে পড়ার কথা আদীলুজ্জামানের মতো আরো অনেকেরই। পড়েও হয়তো। যেমন পরিতোষেরও মনে পড়ে। কিন্তু পঁচিশ বছর আগে যতোটা মনে পড়তো, আজ ততোটা নয়। সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। দেশের ভেতরে শত্রুবাহিনীকে আক্রমণ করতে যাবার আগে উদয়পুর ক্যাম্পের মুক্তি—যোদ্ধারা এই বৃক্ষটির নিচে এসে এক দণ্ড হলেও দাঁড়াতো। হঠাৎ এক দুটো পাতা খসে পড়তেই পেয়ে যেতো ওরা মায়ের আশীর্বাদ। আদীলুজ্জামানের কাছে কখনো সে প্রেমিকা কখনো মা। মাঝে মধ্যে, দুপুরে, ক্ষররোদে, কিম্বা বিকেলে-সেই বৃক্ষছায়ায় আকাশমুখি হয়ে শুয়ে ওপরের সূর্য দেখতো সে। পিঠটা থাকতো মাটিতে। পা দুটো ছড়ানো। কোমরে গোঁজা গামছায় বাধা কার্তুজ। বুকে হেলান দেয়া রাইফেল। ঘন পাতা আর ডালের ফাঁক দিয়ে ঠিকরে পড়তো সূর্যের আলো। সেই আলোর সাতরঙা বিচ্ছুরণে গেরিলা যোদ্ধা আদীল বাংলা

ভাষাভাষীদের স্বাধীনতার মুখ দেখতো। কখনো সে দেখতো মাস্টারদা সূর্য সেনকে কখনো নেতাজী সুভাষ বসুকে—রবীন্দ্রনাথ আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। পঁচিশ বছরের যুবক আদীলুজ্জামান সেই স্বপ্নীল আলোয় নিজেকে রাঙিয়ে নিতো।

সামনে হাঁটতেই সে রাইফেল উঁচানো কয়েকজন বিডিআর সদস্যকে দেখতে পেল। সামান্য দূরে। ওরা বাংলাদেশের সীমান্ত প্রহরি। চোরাচালানিদের জন্যে এখানে পাসপোর্টের প্রয়োজন নেই। ওরা এক অর্থে আন্তর্জাতিক নাগরিক। কিন্তু আইনানুগ বলেই তার জন্যে ছাড়পত্র প্রয়োজন। ভারতীয় সীমান্ত প্রহরিদের কয়েকজন এস এল আর কাঁধে সীমান্তের অপর পাশে টহল দিচ্ছে। আচ্ছা, হঠাৎ এখন যদি এক দৌড়ে আমি সীমান্তরেখাটা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ি তাহলে কে আমাকে চিনতে পারবে? আমার ভাষা, আমার শরীর, আমার কান্না, আমার হাসি—কোথায় আমার বিভেদের চিহ্ন?

এসব ভাবতে ভাবতে একমনে গোমতির পার ধরে সে হাঁটতে থাকলো। নদীতে ছোট ছোট নৌকো। দুধারে ধান আর পাট ক্ষেত। মাথার ওপরে উড়ন্ত চিল, পাখি, পতঙ্গ। সব দেখে দেখে সে হাঁটতে থাকলো। এক সময় একেবারে সীমান্তরেখার কাছে এসে দাঁড়ালো। জায়গাটাকে চিনতে চেষ্টা করলো। পঁচিশ বছর আগের প্রিয় বৃক্ষটিকে আবিষ্কার করতে চোখের মণিকে গাঙচিলের মতো ঘুরাতে লাগলো। একবার সে পেল। হ্যাঁ, এই তো সেই জায়গা। এই তো সেই স্থান। এই তো সেই বৃক্ষ।

অগণিত নবীন বৃক্ষরাজি গজিয়ে এলাকার পুরনো চেহারাটা পাল্টে দিয়েছে। বুনো গাছ, তাল, বেল, বাবলা, আম আর খেজুর গাছের অরণ্য হয়েছে জায়গাটা। আর গজিয়েছে ঘন কাঁটার বন বাদাড়। হঠাৎ তাকাতেই ভয়ানক অচেনা মনে হয়। কই, এমনতো ছিলো না সেদিন? পঁচিশ বছর আগের তার সেই প্রিয় বৃক্ষ এখন কই? কই সেই দুর্বাঘাসের মসৃণ চাদর? কোথায় অসংখ্য বাহু প্রসারিত করা মুক্তিযোদ্ধা আদীলুজ্জামানকে আশ্রয় দেয়া সেই গাছ? কই সেই বৃক্ষ?

ঘাতকের হাতে কাটা পড়ে ইতিমধ্যেই বিনাশ হয়েছে ওর অজস্র বাহু। পঁচিশ বছরে একটুকুও সে বাড়েনি। সংকুচিত হয়েছে বরং। ঊর্ধ্বমুখি তিন-চারটে বড় ডালের আগায় মড়ক ধরেছে। অর্ধেকের বেশি শুকনো কাঠ হয়েছে তার প্রিয় বৃক্ষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। পত্রপল্লবে আগের মতো ঘন সবুজ সজীব দোলা নেই। হাত তুলে তাকে কাছে বসাবার যোগ্যতা নেই। মহারানীর সুনিপুণ কারুকাজ করা সেই প্রাসাদ আজ এক জীর্ণ কুটির। এ এক অভাবিত বেদনার অভিজ্ঞতা আদীলুজ্জামানের। তার হাতে এমন কোনো জীয়নকাঠি কি আছে—

যা দিয়ে তার প্রিয় বৃক্ষটিকে সে পঁচিশ বছর আগেকার যৌবনে ফিরিয়ে দিতে পারে ?

আদীলুজ্জামানের মনে পড়লো, এই তো, এই সেই বৃক্ষ যার তলায় একাত্তরের নয় মাসে অসংখ্য স্বাধীনতা যোদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। পাকিস্তানিদের বোমা আর গুলিতে থেঁতলে যাওয়া রক্তাক্ত শরীর ঢলে পড়েছে এরই প্রশান্তিময় এক ঘন ছায়ায়। এর যে সবুজ পাতাগুলো দিয়ে একদিন স্বাধীনতার সূর্য-সন্তানদের শরীর থেকে চাপ চাপ রক্ত মুছে দেয়া হতো, সেই পাতাগুলোর স্মৃতি ক'জনের মনে পড়ে আজ ?

দুর্বার আগ্রাসী এক হতাশা গ্রাস করে ওকে। দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে যায় সে তার প্রিয় বৃক্ষটির কাছে। অকৃত্রিম ভালোবাসায় হাত বুলিয়ে দেয় ওর শরীরে। প্রিয় বৃক্ষ, আমি তো তোমাকে মনে রেখেছি। আমি অন্তত মনে রাখবো।

ভালোবাসার হাতের ছোঁয়ায় হঠাৎ যেন হারানো ইতিহাস খুঁজে পায় বৃক্ষ। পঁচিশ বছর আগের মতো গভীর মমতায় বেঁধে নেয় সে তাঁর প্রিয় বালককে। ওপর থেকে এক-দুটো পাতা খসে পড়ে ঠিক তখনই। মৃদু বাতাসে হঠাৎ জেগে ওঠে পুরনো মন। আদীলুজ্জামান যেন সব বুঝতে পারে। কালবিলম্ব না করে দু'হাতে বৃক্ষটিকে আলিঙ্গন করে চোখ বুজে থাকে সে। শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে, মা-কে ধরার মতো, বাবাকে ছোঁয়ার মতো, প্রিয়াকে গ্রহণ করার মতো সেই আলিঙ্গন।

হ্যাঁ, এইবার তার প্রশান্তি। আহাঃ কতদিন পর। এই শান্তির কোনো বিশ্লেষণ জানে না সে। এই সুখের কোনো বর্ণনা দেয়ার ক্ষমতা নেই তার। মা'র বুকে, বাবার বুকে, প্রেয়সীর বুকে মাথা রেখে হারিয়ে যাবার যে সুখ তার কি বর্ণনা হয় ! আদীলুজ্জামান কবি হতে পারেনি। যদি হতো তাহলে কি হতো সে জানেনা।

হঠাৎ দমকা বাতাস ওঠে। পাক ধরা চুলগুলো বাতাসে উড়ে ওর চোখ দুটিকে আড়াল করে দেয় তখন। আদীলুজ্জামান যেন তার হারানো জীবন ফিরে পায়। চুমোয় চুমোয় ভরে দেয় সে তার প্রিয় বৃক্ষের শরীর। দীর্ঘক্ষণ সে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর দু পা পিছিয়ে বিদায় নেয়ার আগে বৃক্ষটির দিকে তাকিয়ে বলে—

—আবার দেখা হবে। আবার আমি আসবো। তুমি বেঁচে থাক।

—আবার যখন আসবে তখন নাও-তো পেতে পার আমাকে। কিন্তু আমার সন্তানেরা রইলো। এস, ওদের সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিই।

আদীলুজ্জামান চেয়ে দেখলো—অসংখ্য ছোট এবং মাঝারি গাছ। ঠিক

একই রকম দেখতে। সেই পাতা। সেই ডাল। সেই অবয়ব। তারই প্রিয় বৃক্ষটিকে ঘিরে সবার অগোচরে গজিয়েছে এই পঁচিশ বছরে। ওরা একদিন ওদের জননীর মতো বৃক্ষ হবে। হয়তো তারই মতো আশ্রয়দাতা হবে। ভালোবাসার হবে। নিশ্চয়ই হবে।

চোখের পাতাগুলো তার ভিজে উঠলো আনন্দে। 'জয় বাংলা' বলে গলাফাটা চিৎকার দিয়ে বৃক্ষটিকে সে আবার জড়িয়ে ধরলো। একবার নয়, অসংখ্য বার। সেই হৃদয় ফাটা উচ্চারণে সে নিজেকে আগুনে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে নিতে চাইলো। আদীলুজ্জামানের মনে হলো, তার সেই কণ্ঠস্বর নবীন গাছগুলিকে আন্দোলিত করছে। ওরা দুলছে। ওরা কাঁপছে। না, সে কিম্বা পরিতোষ হেরে যায়নি। এই মাটিতে এই তরুগুলো আবার একদিন তাদের ভালোবাসার বৃক্ষ হবে।

কুশপুত্তলি

কল্যাণ মজুমদার

অ্যালার্ম বাজার আগেই ঘুমটা ভাঙে। আজকাল—প্রায় তিরিশ বছরের শ্বাস-লুকানো অভ্যাসের পর—অন্তর্গত অনুভবের ঘড়িটাই ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তবু ঘড়িতে অ্যালার্ম দেওয়া থাকে—সাবধানী ব্যবস্থা হিসেবে। যদি কোন কারণে ঘুম না-ভাঙে! না-ভাঙলেও বিপুল কোন ব্যাঘাত ঘটবে, তার উপায় নেই। কেননা আধঘণ্টার মধ্যেই ঘরের দরজায় গাড়ির হর্ন বাজবে মুয়াজ্জিনের আজানের মতন।

বিছানা ছাড়ার আগে অতি সন্তর্পণে, শেষ নিশীথের নৈঃশব্দে বিন্দুমাত্রও শব্দ না-তুলে আবীর হাতের পেন্সিলটর্চের আলোয় জিনিয়ার মুখ দেখে—যেমন গত চব্বিশ বছর দেখে আসছে। জিনিয়ার দু'চোখে নিরুদ্বেগ ঘুম। সিঁথি-ছোঁয়া খুচরো চুলে একটা-দুটো সাদা রেখার গায়ে সিঁদুরের গুঁড়ো অলসভাবে জড়িয়ে রয়েছে। মুখের আদলে আদুরে ভাঁজ। অন্যদিন অন্যসময় হলে আবীর সশব্দে ওখানে চুমু খেত। দু'চোখের নিচের কালো রেখাগুলো আবীরের চোখ টানে। ও আরেকটু ঝুঁকে দেখে ঐ দাগগুলো আছে কিনা। ওর চোখে যাতে আলো না-লাগে তেমন সমীচীন দূরত্বে টর্চ রেখে আবীর অনুসন্ধানী চোখে জিনিয়ার মুখের ওপর ঝুঁকে দৃষ্টি সংহত করে। আর তখনই ওর বুকের মধ্যে আদিগন্ত জোড়া এক শব্দহীন আর্তনাদ হরকরার মতন ছুটে যায়। পাড় ভাঙার শব্দ শোনে ও। অজস্র, অনন্ত। নিজের অস্তিত্ব-ছেঁড়া ভঙ্গুর আত্মবিশ্বাসের এক গলিত লাভাতুল্য স্রোত ওর গলার দিকে ছুটে যায়—যা ও প্রাণপণ চেষ্টায় নিঃশব্দে গিলে ফেলে।

জিনিয়ার চোখের কোন ভাণ্ডারে থাকে এত জল, আবীর জানে না। কখন ঐ জল চোখের কোণ ভাসিয়ে গ্রীষ্মের অজন্মের মতন শুকিয়ে থাকে তাও জানে না। কিন্তু দেখে—না, আসলে আবিষ্কার করে। দেখেছিল প্রথমবার—চব্বিশ বছর আগে। তারপর প্রতিবারই আবিষ্কার।

টর্চ বালিশের পাশে রেখে আবীর বিছানা থেকে নেমে বাথরুমের দিকে এগিয়ে যায়। বাথরুমের আলো জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গে জিনিয়া উঠে পড়ে, ঘরের আলো জ্বালে। তখনই অ্যালার্ম বেজে ওঠে। জিনিয়া অ্যালার্ম বন্ধ করে রান্নাঘরে ঢুকে ইলেকট্রিক কেটলির সুইচ টেপে।

আবীর দ্রুত হাতে দাড়ি কামায়। শোবার আগেই গিজারে জল গরম করে রেখেছিল। উষ্ণ প্রপাত শরীরের স্নায়ুবলয়ে দীপ্তি জাগায়। তার সুখস্বাদ অনুভব করতে করতে আবীর ছবির মতন দেখে, জিনিয়া চা রাখে বিছানা-ধরা টেবিলে। ওর য়ুনিফর্ম বের করে। টাইয়ের ইস্ত্রি ঠিক আছে কিনা দেখে। রুমাল, পার্স

রাখে। পাইলট ব্যাগের ওপর টুপিটা সাজায়। আবীর অনেক বলেছে, তোমার ওঠার দরকার নেই, জিনি। এয়ারপোর্টে পৌঁছুলেই চা, ককপিটে মুহুর্মুহু চা। আর-সব তো শোবার আগেই গোছান থাকে।

জিনিয়া শোনে না। আবীর ভাবে, এ যেন নতুন রকমের পুতুল খেলা জিনিয়ার। জিনিয়ার কাছে তা জীবন-পূজা। এটা এমনই পূজা যা আবীর সারা জীবনের সকল সদিচ্ছা দিয়েও কোনদিন সম্যক অনুভব করতে পারবে না।

সার্ট-প্যান্ট পরে টাইয়ে গিঁট বাঁধার আগেই গাড়ির হর্ন বাজল। দোতলার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আবীর বলল—আসছি।

টাই পরে মাথায় ক্যাপ লাগিয়ে আয়নার সামনে নিজেকে দেখে আপাদ-মস্তক। ঠোঁটের ভাঁজে স্ব-অনুমোদনের খুশি টোল খায়। পাইলট ব্যাগ হাতে নিয়ে দরজার হ্যাণ্ডেলে হাত রাখে আবীর।

জিনিয়া এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রাখে। সদ্য ধোয়া মুখটা যেন নম্র কিশলয়। চোখ ঘন করে বলল, তাড়াতাড়ি আসবে।

জিনিয়ার চুলে বিলি কেটে আবীর বলে, একটার মধ্যেই চলে আসব। দিল্লি যাওয়া আর আসা কেবল। —ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়ে বেরিয়ে আসে আবীর।

—গুড মর্নিং, স্যার—ড্রাইভার বলে।

—মর্নিং। কেমন আছ?

গাড়ির দরজা বন্ধ করে আবীর চোখ তোলে ওপরে। জানালার ফ্রেমে জিনিয়ার মুখ। আবীর দেখে জোড়া চোখ। চোখের কোণে চব্বিশ বছর পুরানো জলের দাগ। জিনিয়া বিদায়-শুভেচ্ছায় হাত নাড়ে। আবীর ডান হাত তোলে। বুদ্ধের হাত যেন।

বেকবাগান থেকে ইস্টার্ন বাইপাস আর কতদূর! কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধূ ধূ রাস্তায় গাড়ি উর্দ্ধশ্বাস ছোটে। উষার বাতাস কোমল। আবহমণ্ডলে লাজুক খুশির আভাস। মার্চ এসে গেলেও গরম এখনো হাজির হয়নি। এমন আবহাওয়ায় প্লেন চালিয়ে দারুণ আনন্দ। মৌসুমী অবিশ্বস্ততার জন্য বাধ্য কোন উদ্বেগ থাকে না। দিগন্ত-জুড়ে ছড়িয়ে থাকা নানা রঙের খুশি ওর মাথার মধ্যেও নাচে। বত্রিশ তেত্রিশ হাজার ফিট উঁচু থেকে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত অসংখ্যবার দেখেছে, তবু ওর বিস্ময় ও চেতনা উজাড়-করা ভালো-লাগা ফুরোয় না। প্রতিবারই নতুন লাগে। নতুন আবিষ্কার। জিনিয়াকে আদর করার মতনই। এই যে আজ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দিল্লির পথে আকাশে উড়বে, প্রকৃতি খুব বিরূপ না-হলে, হিমালয়ের হিরণ্ময় রূপ-বৈভব দু'চোখে স্বপ্নের মতন ভরে নেবে। ফেরার পথে ঐ একই হিমালয়কে আবার নতুন রূপে দেখবে খর রৌদ্রের দ্যুতিতে। পর্বত-শৃঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় আইসক্রিমের টুপি—এত তার রং বাহার পৃথিবীর কোন

আইসক্রিম কোম্পানি যা আজো বানাতে পারেনি। এটা বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলতে পারে আবীর। কেননা এক দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়া আর সব মহাদেশেই ও গেছে অনেকবার। কখনো জাহাজ আনতে, কখনো ট্রেনিংয়ে এবং অবশ্যই —ছুটি ছুটি বেড়াতে। ব্রাজিল না-যাওয়ার দুঃখটা রয়ে গেছে অবশ্য। একবার 'পেলে'র দেশে যাবে না! ব্রাজিলের কথা ভাবলেই ওর বলিভিয়ার কথা অব্যর্থভাবে মনে আসে—যেমন কিউ আর ইউ। সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। চে জুয়েভারার মরদেহ শায়িত আছে বলিভিয়াতে কোথাও। কেমন দেশ বলিভিয়া যা চে-কে মৃত্যুচুম্বকে আকর্ষণ করেছিল? আবীরের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক তাঁতীর সঙ্গে হাপরের সম্পর্কের মতনই। কিন্তু ও তো একজন সামাজিক মানুষই। কামুর বর্ণনার মানুষ নয়, একজন সচেতন শিক্ষিত মানুষ যে খবরের কাগজ ছাড়াও বই পড়ে, ককপিটে বসে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনে। এবং এখনো "গাঁয়ের বধূ" শুনলে মনে হয়, এর চেয়ে ভালো গান পৃথিবীতে আর কখনো লেখা হয়নি, গাওয়াও হয়নি।

টারমিনাল বিল্ডিংয়ের পাশে গাড়ি দাঁড়ায়। আবীর নেমেই দেখে ওর ব্যাগ নেবার জন্য একজন লোডার দাঁড়িয়ে আছে।

—একটাই ব্যাগ। দিল্লি। —বলে আবীর দোতলার সিঁড়ি ভাঙে। ঐ লোডার ব্যাগটি সিকিউরিটির অনুশাসন মেনে প্লেনে তুলে দেবে।

দোতলায় উঠে প্রথমেই প্রথা-মাফিক প্রি-ফ্লাইট মেডিকেল চেক-আপের জন্য ডাক্তার মুন্সির কাছে হাজিরা। গতরাতের মদ্যপানের (যদি করে থাকে) রেশ কতটা রয়েছে তা দেখবে ডাক্তার। এমন সকালে ফ্লাইট থাকলে আবীর আগের সন্ধ্যায় মদ স্পর্শও করে না। ওর স্বেচ্ছাবৃত শৃঙ্খলাবোধের কথা সকলের মতন ডাক্তার মুন্সিরও জানা।

ফ্লাইট ডেসপ্যাচে এসে গুডমর্নিং বলতে পারার আগেই ওখানকার অফিসার বলল, ক্যাপ্টেন, আপনার ফ্লাইট লেট হবে—ঘণ্টাখানেক।

—কেন?

—আপনার কো সিক রিপোর্ট করেছেন একটু আগে। আমরা চেষ্টা করছি ক্যাপ্টেন দস্তিদারের জন্য।

আজ ওর কো—মানে কো-পাইলট যাবার কথা ছিল সুরেশ ভাটিয়ার। বেশ ঝলমলে মানুষ। হঠাৎ কি হলো ওঁর?

—সুরেশকে ফোনে ধরতো—

একজন সহকারী টেলিফোন আঙুল ঘোরায়। অন্যান্য ফ্লাইটের ক্রু-রা একে একে আসছে। গুডমর্নিং—গুডমর্নিং—যেন কোরাস। কিছু মামুলি কথা। কোন ফ্লাইট? ওয়েদার রিপোর্ট। ফুয়েল ফিগার। হোস্টেসদের শাড়ির শব্দ। নানা

গন্ধের সমাহারে ঘরের বাতাস থৈ থৈ।

—স্যার, ক্যাপ্টেন ভাটিয়া—

টেলিফোন ধরে আবীর বলে, কি হলো তোমার—কাল বেশি হয়ে গেছে, নাকি নতুন প্রজাপতি—

—না, স্যার, না। ভোর থেকেই ঘর আর বাথরুম করছি। হাতের জল শুকোচ্ছে না। নইলে আপনার সঙ্গে—তাও দিল্লি—আমি কখনোই ছাড়তাম না।

—ডাক্তারকে ফোন করেছ—ওষুধপত্র—

—হ্যাঁ। খেয়েছি। ঠিক হয়ে যাবে।

—ও কে। টেক কেয়ার।

—সরি স্যার, ফ্লাইটটা লেট হয়ে গেল—

—কি করবে! দস্তিদার এসে যাবে।

টেলিফোন রেখে আবীর ফ্লাইট-প্ল্যানে চোখ বোলায়। ওয়েদার রিপোর্ট দেখে। সবই রুটিন মাফিক। স্বাভাবিক।

—দস্তিদার এলে খবর দিও। —বলে আবীর বিশ্রামকক্ষের দিকে এগিয়ে যায়। পাইলটদের জন্য এই বিশেষ কক্ষ—যাকে বিশ্রামের না বলে প্রতীক্ষার বলাই সঙ্গত—সুন্দর সাজান। আরামদায়ক সোফা। দেওয়াল-জোড়া কার্পেট। তাপনিয়ন্ত্রিত। ঢুকে দেখে ক্যাপ্টেন হাসান বসে আছে। ও মুম্বাইয়ের লোক।

করমর্দন করে বলল—তুমি কবে এসেছ?

—কাল রাতের ফ্লাইটে। আমার আসার কথা ছিল না। যা হয়—অন্য কমাণ্ডার না পেয়ে আমাকেই ধরল। বাধ্য হয়ে—

—ভালোই হয়েছে। অনেকদিন পর দেখা হল তোমার সঙ্গে। ফ্যামিলির খবর কি? তোমার ছেলে কি করছে—

—এভরিথিং ফাইন। আল্লার মেহেরবানি। ছেলেকে স্টেটসে পাঠিয়ে দিয়েছি। ফ্লাইং শিখছে। আপনারও তো একটাই ছেলে—

—হ্যাঁ। ব্যাঙ্গালোরে আছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাসান বলল, সময় হয়ে গেছে। চলি দাদা।

—হ্যাপি ল্যাণ্ডিং।

—থ্যাঙ্কু।

এখন ঘরে আবীর একা। যদিও করিডোরে পায়ের শব্দ, নানা কণ্ঠের উচ্চারণ বন্ধ দরজায় ক্রমাগত ঢেউ ভাঙে। পা ছড়িয়ে সোফায় বসে সিগারেট ধরায়। জিনিয়ার চোখের কোলের কালি চিন্তায় উঁকি দিয়েই চলে যায় ছেলে সৃজনের কাছে। ছেলের ব্যাঙ্গালোরের ঘরবাড়ি দেখেনি এখনো। মাস ছয়েক হয়ে গেছে যদিও। ফ্লাইট নিয়ে আবীরের এখন ব্যাঙ্গালোর যাওয়া হয় না। গেলেও কি

যেত সৃজনের কাছে? যে ছিল জীবনের অপার আনন্দ, নয়নের জ্যোতি সে এখন জিনিয়ার নিঃশব্দ অশ্রু।

—স্যার, আপনার ফোন এসেছে—

ফোন পাশের ফ্লাইট ডেসপ্যাচের ঘরে। এখন কে ফোন করবে—কমার্শিয়াল না ইঞ্জিনিয়ারিং? ম্যানেজার বা ডিরেক্টর কেউ? নাকি জিনিয়া? ওর বাতিক আছে ঘনঘন ফোন করে ফ্লাইটের খোঁজ নেওয়ার। ফ্লাইট গেছে কিনা, গন্তব্যে পৌঁছেছে কিনা, ওখান থেকে ছেড়েছে কিনা, কখন ফিরে আসছে, নেমেছে কিনা—ইত্যাদি সব খবরের জন্য ও বারবার ফোন করে। এজন্য ডেসপ্যাচের লোকজন হাসাহাসিও করে। আবীর ওকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারেনি। জিনিয়ার উদ্বেগ ওর চেয়ে বেশি আর কে জানে!

—হ্যালো—

—আমি সংযুক্তা বলছি—

চমকে ওঠে আবীর। এতকাল বাদে, এই সময়ে সংযুক্তার ফোন সুদূর কল্পনাতেও ভাবা যায় না। আবীর একবার ঘরের চারদিকে দেখে। সবাই নিবিষ্টভাবে ব্যস্ত।

—বলো, কি খবর—

—আজ তুমি একবার আসতে পারবে—আমার ভীষণ দরকার—

—আমি তো এখন ফ্লাইটে যাচ্ছি। লেট আছে বলে পেয়ে গেলে—

—সেসব আমি জানি। তুমি সন্ধেবেলায় এসো।

ওর গলার স্বরে আর্তি। আগের রূঢ় বিদ্রূপের বদলে মিনতিময় স্বর।

—কি হয়েছে—তোমাকে খুব আপসেট মনে হচ্ছে—

—সন্ধেবেলা এসো প্লিজ—ডোণ্ট ডিচ মি দিস টাইম—টেলিফোন রাখার আগে গলায় চাপা কান্নার নিক্কণ নির্ভুল শুনতে পায় আবীর।

—মর্নিং স্যার—

ক্যাপ্টেন দস্তিদার।

—চলো যাওয়া যাক। ফ্লাইট অ্যানাউন্স করতে বলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে দেখা ক্যাপ্টেন ভিজের সঙ্গে।

—তুমি এখন—তোমার তো বিকেলে—

—ক্যাপ্টেন ব্যানার্জির সঙ্গে আমার ফ্লাইট বদলে নিয়েছি। শিলচর যাবো এখন। আসলে সন্ধেবেলা একটু কাজ আছে।

—ওকে। গুডলাক।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আবীরের মস্তিষ্ক জুড়ে মুভির ক্যারাভ্যান ছোটে। চেনা শব্দাবলী, ছাব্বিশটা বছর, হারানো মুখ। ও কি ভিজকে বলে

আসবে—যেও না, যেও না ভিজ—তুমি তোমার ফ্লাইটই করো—

ধ্যুৎ, কোন মানে হয়! এখনো এত স্মৃতিমেদুরতা?

ককপিটে বসে আবীর বলে, চেক—

২

একটু পরেই বারাণসীর ওপর পৌঁছে যাবে। যাত্রীরা ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে শুনেছে সেই ঘোষণা। তার সঙ্গে কত উচ্চতায় উড়ছে, বাইরের তাপমাত্রা কত, কখন দিল্লি পৌঁছুবে ইত্যাকার তথ্যাবলী। সবই অভ্যাসমতন করে গেছে নিখুঁতভাবে। অনুভবে যাই ঘটুক না কেন ককপিটে বসে সামান্যতম অন্যমনস্কতার কোনও সুযোগ নেই। প্রতিটি ফ্লাইটই যেন একদিনের ক্রিকেট খেলা—যার দ্বিতীয় ইনিংস নেই। ট্রেনিংয়ের সময় বারবার শেখানো হয়েছে, সামান্য ভুলেই যে কোন ফ্লাইট জীবনের শেষ ফ্লাইট হতে পারে। শুধু নিজের নয়, ককপিটের পেছনে বসে-থাকা যাত্রীদেরও। যাত্রীদের প্রতি দায়বদ্ধতা আরো বেশি করে স্থিতচিত্ত হতে বাধ্য করে।

অভিজ্ঞতায় আবীর জেনেছে দায়বদ্ধতা শব্দটির ব্যাপকতা কী বিপুল! একজন মানুষ শুধু তো একজন মানুষই নয়—নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতন। প্রতিটি মানুষকে ঘিরে থাকে আরো নানা মানুষের বলয়। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গীকার—উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত। নিজের ভিতরে যতই যন্ত্রণা থাকুক, যতই রক্তাক্ত হোক অনুভব, তবু দায়বোধ উপেক্ষা করা সভ্যতা-সচেতন মানুষের পরিচয় নয়।

আচমকা মাথায় ঝিলিক দেয়, এত দিন পর হঠাৎ সংযুক্তা ফোন করেছিল কেন! কেন ওকে আজই যেতে বলেছে? ওর জীবনে যা ঘটে গেছে তা খুবই মর্মান্তিক—যার হয়ত কোন সান্ত্বনাই হয় না। তবু আবীর কি করতে পারে?

—আজ আপনি ঠিক মুডে নেই মনে হচ্ছে।—কো-পাইলট দস্তিদার বলল।

—কিসে বুঝলে?

—রোজকার মতন কথা বলছেন না, গান শুনছেন না—

—হ্যাঁ, ওসব ঠিক ভালো লাগছে না। তবে মুড ঠিকই আছে। এখানে বসে মুড ঠিক নেই ভাবাও অনুচিত।

—তা ঠিক। তবু—বাড়িতে সব—

—সব ঠিক আছে। চিন্তা করার কিছু নেই। এক একদিন হয় না—ঘুম থেকে উঠেই দেখলে, আকাশ মেঘলা, সূর্য উঠেছে তবু যেন আলো নেই। তবু দিন তো নিজের মতনই কেটে যায়। দিনটা বদলে রাত হয় না। ধরো সেরকমই কিছু।

—উরে বাবা! আমি কিছুই বুঝলাম না।

—বোঝার দরকার নেই। এবার ডিসেন্ট শুরু করতে হবে। গেট ইয়োর চেকশীট রেডি।

পালামের উপরে এসে নিখুঁত ভাবে রানওয়ে ছুঁলো, কিন্তু পার্কিং-বেতে যাওয়ার সময় হঠাৎ চাকা ফেটে গেল। সম্পূর্ণ নিরাপদে পার্কিং-বেতে জাহাজ দাঁড় করায়। সিঁড়ি লাগে। যাত্রীরা সব নেমে যায়।

কর্তব্যরত ইঞ্জিনিয়ারকে আবীর জিজ্ঞেস করে, কটা গেছে? আর কোন জাহাজ আছে?

ইঞ্জিনিয়ার জানায় আর কোন জাহাজ নেই। সুতরাং এটারই চাকা বদলে কলকাতায় যেতে হবে।

—কতক্ষণ লাগবে?

—দেখছি। দেড়-দু' ঘণ্টা তো লাগবেই।

ফ্লাইট ডেসপ্যাচ জানায় ছাড়ার সময় ঠিক করা হয়েছে বেলা ১১টা। এতক্ষণ জাহাজে বসে থাকা যায় না। সব ক্রুকে নিয়ে নেমে আসে আবীর। রেস্টরুমে অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু ব্যাপারটা খুবই বিরক্তিকর।

এসবই অবশ্য পাইলট-জীবনে অবিচ্ছেদ্য। কতবার খারাপ আবহাওয়ার জন্য গন্তব্যের বদলে অন্য শহরে যেতে হয়েছে, কখনো কখনো রাত্রিবাসও করতে হয়েছে। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা যে ঘটেছে জীবনে। কত অদ্ভুত জায়গায় থাকতে হয়েছে, এখন ভাবলে নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য লাগে।

আবীরের মনে পড়ে এমনই এক অঘটনের ফলেই পরিচয় হয়েছিল সংযুক্তার সঙ্গে। ও তখন কো-পাইলট। কমাণ্ডার ছিলেন দেশপাণ্ডে। দিল্লি থেকে লক্ষ্ণৌ হয়ে পাটনায় নামার সময় পেছনের চাকা ফেটে যায়। পাটনা ছোট এয়ারপোর্ট। সেখানে তখনি চাকা বদলাবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, মানুষজন থাকে না—এয়ারলাইনের পরিভাষায় বলে মেন অ্যাণ্ড মেটিরিয়াল। সেসব থাকে বড় শহরে—কলকাতা বা মুম্বাই বা দিল্লিতে। শুধু মেন অ্যাণ্ড মেটিরিয়ালের জন্য একটা অতিরিক্ত ফ্লাইটের ব্যবস্থাও সম্ভব হয় না। কেননা তারজন্যও চাই বিমান, পাইলট—যা কোন এয়ারলাইনই অতিরিক্ত রাখার বিলাসিতা করতে পারে না। তার উপর আছে জালানির খরচ। একটা খালি ফ্লাইট চালানো মানেই কয়েক লক্ষ টাকার নির্মম ক্ষতি।

সেদিন কলকাতা থেকে নাগপুর যে ফ্লাইট যাবার কথা ছিল, স্থির হয় সেটাই পাটনাতে মেন-মেটিরিয়াল নামিয়ে ফিরে যাবে। সে-প্লেন আসবে বিকেলে। ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ সারতে সন্ধে গড়িয়ে যাবে। সুতরাং রাত্রিবাস ছাড়া উপায় নেই। পরদিন সকাল সাতটায় যাত্রার ঘোষণা করা হয়।

আবীর অন্য ক্রুদের সঙ্গে হোটেলে চলে আসে। একই হোটেলে কিছু

যাত্রীদেরও থাকার ব্যবস্থা হয়। সব যাত্রীকে এক হোটেলে স্থানাভাববশত রাখা সম্ভব হয় না। বিভিন্ন হোটেলে পাঠানো হয়।

হোটেলে চেক-ইন করার সময় আবীর লক্ষ্য না করলেও সংযুক্তার চোখে পড়ে সুদর্শন যৌবনদীপ্ত বাঙালি পাইলট। তখন আবীরের বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। লম্বা ছিপছিপে অ্যাথলিট শরীরে যৌবন ঠিকরে পড়ত। মুখের হাসিতে ফুটে উঠত প্রাণের আভা।

ক্ষুব্ধাচিত্ত সত্ত্বেও সংযুক্তার চোখ বারেবারেই ঝাঁপাচ্ছিল আবীরের ওপর। ও লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতা ফিরছিল। সন্ধেবেলায় জরুরি কাজ ছিল—রিসার্চ গাইডের সঙ্গে বসে ওর পেপার নিয়ে আলোচনা। প্রফেসর মৈত্র পরশুদিনই বিদেশে চলে যাবেন দু' মাসের জন্য। তার আগে ওঁর মতামত ও নির্দেশ নিয়ে না রাখতে পারলে ওর থিসিস শেষ করা মুশকিল। রিসার্চস্কলারের কার্যকালও ফুরিয়ে আসছে। তাছাড়া মা-বাবা চিন্তা করবেন, ব্যাকুল হবেন সেই উদ্বেগও মাথায় রয়েছে। এই সময় পরিষ্কার শুনলো—

—ওয়েলকাম ক্যাপ্টেন দাশগুপ্ত। অনেকদিন পরে এলেন। —হোটেলের রিসেপশনিস্ট বলে।

—আমরা এলে আপনাদের লাভ হয় ঠিক, কিন্তু এয়ারলাইনসের লোকসান, আর যাত্রীরা নাজেহাল। সেজন্য আমাদের কম আসাই ঠিক।

দুজনেই শব্দ করে হেসে ওঠে। সংযুক্তার মনে হয় ক্যাপ্টেন দাশগুপ্তর হাসির মধ্যে হৃদয়ের স্পন্দন মিশে থাকে। তবু কী যে হয় মাথার মধ্যে, ও হঠাৎই বলে ফেলে—থ্যাঙ্কস্, জেনে ভালো লাগল—আপনারা যাত্রীদের কথাও ভাবেন।

কেউ জবাব দিতে পারার আগেই সংযুক্তা ব্যাগেজবাহকের পিছু পিছু ঘরের চাবি হাতে এগিয়ে যায়।

আবীর বলে—এ যে একেবারে খাঁটি ধানি-লঙ্কা!

ক্যাপ্টেন দেশপাণ্ডে বলেন—কায়া বোলা—

—ও আপনি বুঝবেন না।

বিকেলে হোটেলের লাউঞ্জে একেবারে মুখোমুখি। আবীর বইয়ের স্টল থেকে দুটো বই আর কয়েকটা পত্রিকা কিনে ঘুরতেই দেখে সংযুক্তাও বোধহয় কফিশপের দিকে যাচ্ছিল।

মহিলাটিকে প্রথমেই কি খুব সুন্দরী মনে হয়েছিল? বোধহয় না। তবে প্রখরা মনে হয়েছিল নিশ্চয়। এমন মনে হবার কারণ ছিল সংযুক্তার ঋজু অবয়বে। আত্মবিশ্বাস যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটায় তারই বিচ্ছুরণ ছিল সংযুক্তার মধ্যে।

—কিছু মনে করবেন না, আপনি তো ক্যাপ্টেন দাশগুপ্ত—

আবীর সম্মতি জানায়। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করে দুপুরের তীব্রতা এখন

কণ্ঠস্বরে নেই।

—প্লেন কাল সকাল সাতটায় যাবে তো?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। এমন বলছেন কেন?

—কারণ আমার অভিজ্ঞতা। আপনারা কক্ষনো যাত্রীদের ঠিক কথা বলেন না।

—আপনার যদি এমন অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে সেটা খুবই দুঃখের। তবে কাল আমরা সাতটাতেই যাবো।

—দেখা যাক—বলেই সংযুক্তা এগুবার উদ্যোগ করে।

আবীর বলে, আমার নাম আবীর দাশগুপ্ত। আপনি—

—সংযুক্তা হালদার। লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতা ফিরছিলাম।

—যদি আপত্তি না-থাকে চলুন কফি খাওয়া থাক।

মৃদু হাসে সংযুক্তা—কফিশপেই যাচ্ছিলাম আমি। চলুন।

সংযুক্তার সেই হাসি আজো ভুলতে পারেনি আবীর। অনেক সময় মনে হয়েছে ঠিক ঐভাবে আর কখনো হাসেইনি সংযুক্তা। কি ছিল সেই হাসিতে? কিছুটা নারীসুলভ ব্রীড়া, অনেকখানি আত্মপ্রত্যয়, আর খানিক আবিষ্কারের অভিলাষ।

কফির চুমুকে চুমুকেই জানা হয়ে গেল দুজনের তখনকার মতন যা-কিছু জানার। আবীর সম্পর্কে জানার বিশেষ কিছু ছিল না। শুধু বাড়ি কোথায় আর টেলিফোন নম্বর ছাড়া। কিন্তু সংযুক্তার চোখ আটকে ছিল ওর কেনা বই-ম্যাগাজিনের ওপর—ভ্যান্স প্যাকার্ডের 'দ্য হিডেন পারমুয়েডারর্স', 'কনফেশনস অব রুশো' উইল ড্যুরান্টের 'দ্য স্টোরি অব ফিলজফি'। 'সাইকোলজি' পত্রিকার নতুন সংখ্যা এবং 'ইলাসট্রেটেড উইকলি'।

—আপনি দেখছি বিচিত্রসব বই কিনেছেন—আপনার কি বিষয়ে আগ্রহ বেশি? ফ্লাইং ছাড়া অবশ্য।

—খুব কঠিন প্রশ্ন। —চোখে হাসির ঝিলিক তুলে আবীর বলে। —আসলে এক-একটা সময়ে কোন একটা বিষয় নিয়ে মেতে উঠি। এই বইগুলো অনেকদিন ধরেই কিনব ভাবছিলাম। কলকাতায় বইয়ের দোকানে যাওয়া হয়ে ওঠে না। আজ এখানে হঠাৎই চোখে পড়ল। নিয়ে ফেললাম। প্যাকার্ডের 'দ্য সেকেণ্ড সোসাইটি' আমার ভালো লেগেছিল। আপনি পড়েছেন?

—না। আমি থিসিস নিয়ে এমন হিমশিম খাচ্ছি আর কিছু পড়ার সময়ই নেই। আজকাল ইকনমিকস এমন জটিল হয়ে পড়েছে—

—তা আর বলতে, মাসের শেষে পকেটে হাত দিলেই টের পাই। —বলেই হা-হা হেসে ওঠে আবীর।

সংযুক্তাও হাসে। পরমুহূর্তেই ম্লানমুখে বলে, আপনি হাসছেন, আর আমার যা দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কাল স্যার যদি সময় না-দিতে পারেন তাহলে যে কি করব—

—আপনি অকারণে ভাবছেন। আজকের কারণটা বুঝিয়ে বললে ঠিক বুঝবেন। শুধু শুধু চিন্তা করবেন না। আমার অবশ্য খারাপ লাগছে আজ যেতে পারলেন না বলে। কিন্তু কিছু করার ছিল না।

—বুঝেছি।

ওর চোখে দুষ্টুমির হাসি নির্ভুল পড়ে আবীর। চোখের হাসি মুখেও ছড়িয়ে পড়তে হাত চাপা দেয় সংযুক্তা।

বোকা চোখে আবীর বলে, কি ব্যাপার?

নিজের মনে আরো কিছুক্ষণ হাসে। নারীদের এই হাসির মর্মার্থ উদ্ধার করবে এমন পুরুষ সৃষ্টি হয়নি। হাসির দমকে ওর শরীর যত কেঁপে উঠছিল ততই মুগ্ধতার আবেশ জমছিল আবীরের অনুভবে।

হাসি থামলে সংযুক্তা বললো, এর আগে কখনো কোন পাইলটের সঙ্গে পরিচয় হয়নি আমার। আমার ধারণা ছিল পাইলটরা হয় খুব গুরুগম্ভীর, দাম্ভিক—বড়লোকের বখাটে ছেলে। আপনি পাইলট—প্যাকারড, ড্যুরাণ্ট পড়েন ভাবতেই পারছি না।

—কেন পাইলটরা কি মানুষ নয়?

—নিশ্চয়, অতিমানব। যখন ককপিটে থাকেন আমাদের তো মনে হয় ঈশ্বরের প্রতিভূ। অতগুলো মানুষের জীবন আপনার করতলে—নিজেকে বিরাট কিছু মনে হয় না?

—ধ্যুৎ, কি যে বলেন। ইটস অ্যা প্রফেশন। দায়িত্ববোধ নিশ্চয় থাকে, সে তো ধরুন একজন হার্ট-সার্জন যখন অপারেশন থিয়েটারে থাকেন তখন তাঁকেও ঈশ্বরতুল্য মনে হয়। আমার মতে এমন ডাক্তাররাই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের প্রতিনিধি।

—যাই বলুন, আমার তো এতকাল পাইলট মানেই মাথার পিছনে জ্যোতিবলয় নিয়ে ঘোরা মানুষের কথা মনে হত।

—ইস্, আপনি তাহলে খুবই হতাশ হলেন!

মৃদু হাসির যুগলবন্দী কফিশপের বাতাসে মর্মর তোলে। আবীরের মুখের উপর নিবদ্ধ দৃষ্টি সরিয়ে সংযুক্তা বলে, চলুন যাওয়া যাক।

লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে আবীর বলে, আপনার ডক্টরেটের সুখবর জানাবেন। তার আগে অবশ্য আপনার স্যার আগামীকাল কি বলেন জানার আগ্রহ থাকবে খুব।

—জানাব না। —সংযুক্তা মাথা নাড়ে।

—কেন?

—কি করে জানাব! আপনি কোথায় থাকবেন ঠিক আছে কিছু—ডিব্রুগড় না নাগপুর—

শব্দ করে হাসে আবীর—কথাটা আংশিক ঠিক। তবু ইচ্ছে করলে ঠিকই জানাতে পারবেন। যত দূরেই যাই ঘরে তো ঠিকই ফিরি।

—স্যার, এয়ারক্রাফট রেডি। —ক্যাপ্টেন দস্তিদার জানায়।

খুব ধীরে যেন চেতনা ফেরে আবীরের। ও কোথায়···কতদূরে হারিয়ে গিয়েছিল? চোখ ঘুরিয়ে তাকাতেই মনে পড়ে ও বসে দিল্লির ক্রু-রেস্টরুমে, পাটনার হোটেলে নয়। ও কি স্বপ্ন দেখছিল? নাকি স্মৃতির টানে হারিয়ে গিয়েছিল বর্তমান থেকে?

—ফ্লাইট অ্যানাউন্স হয়েছে?

—হ্যাঁ। প্যাসেঞ্জারস আর বোর্ডিং।

—চলো তবে। যাওয়া যাক।

৩

যেন জলপ্রপাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। শরীর বেয়ে অবিরল ঝরে যাচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ জলের ধারা। জলের প্রপাতধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। শহর, আকাশ, গাড়ির শব্দ, অগণন মানুষ—এসব কোন কিছুরই যেন অস্তিত্ব নেই। পৃথিবীতে শুধু এই শাওয়ার আর ও। মাঝে মাঝে হাতের কোষে জল নিয়ে মুখে, বুকে, শরীরের নানা অংশে ছিটোয়। এক-একবার শাওয়ার-ক্যাপটা ঠিক আছে কিনা দেখে নেয়। বহমান জলধারা শরীরে ঢেউ তোলে। অমেয় সুখের স্বাদ। ওর চোখ বুজে আসে। যখন মনে হয় ত্বকের প্রতি অণুতে জলবিন্দু থৈ থৈ করছে, জিনিয়া শাওয়ার বন্ধ করে। গা মুছে তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে আসে। পোশাক আগেই গুছিয়ে রেখেছিল ড্রেসিং টেবিলের সামনে। তোয়ালে ছেড়ে একে একে পরে শায়া, ব্রা, ব্লাউজ, শাড়ি। তোয়ালে জড়িয়ে চুল থেকে জলকণা শুষে নেবার প্রয়াস চালাতে চালাতে এগিয়ে যায় লাগোয়া বারান্দার দিকে। বারান্দায় নরম হরিৎ রৌদ্রের মেলা। রেলিংয়ের উপর তোয়ালে ছড়িয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজস্ব প্রসাধন সারে। বডিলোশন, ক্লাইমেটাইজার, সামান্য পাউডারের চকিত বিস্তার সেরে নিছক অভ্যাসবশত সিঁদুরের কৌটো খোলে। সিঁথিতে একটুখানি ছুঁইয়ে রাখবে। ছোঁয়াতে গিয়ে কী যে হয়। হঠাৎই হাতটা কেঁপে যায়। সিঁথির বদলে দুই ভুরুর বিভক্তি নিখুঁত রেখে নাকের উপর আছড়ে পড়ে। আর মাথার মধ্যে যেন আকাশ-চেরা জেটরেখার মতন এক তীব্র চিৎকার

ছুটে যায়। বুকের মধ্যে মরুভূমির বাতাসের মূর্ছনা। একটুক্ষণ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে প্রতিবিম্বর মুখোমুখি। দু'জোড়া চোখই ভাষাহীন।

না, এটা নতুন নয়। মাঝে মাঝেই এমন হয়। কেন হয় জিনিয়া জানে না। মনে আছে বিয়ের পর মা বলেছিলেন, স্বামীর মুখ মনে করে সিঁথিতে সিঁদুর দিবি। ঐ সিঁদুর তার পরমায়ু।

কথাটা যে কী অর্থহীন তা ওর চাইতে বেশি কেউ জানে না। ও যে এমন সংস্কারে বিশ্বাস করে তাও নয়। কিন্তু এটাও তো ঠিক সিঁদুর পরার সময় ও স্বামীর মুখ মনে করার চেষ্টা করেনি। আজ তো করেইনি, নিছক প্রথাগত অভ্যাসের আচরণ করছিল শুধু। কোনদিনই কি করে? করেছে, বহুবারই করেছে। তবে নিজের কাছে তো গোপন করা যাবে না যে, কখনো কখনো স্বামীর মুখ মনে করতে গিয়েও মনে করতে পারেনি। আলো-আঁধারির আবছায়ায় কিছুতেই স্পষ্ট ধরতে পারেনি সে-মুখ। এমন তো হবার কথা নয়। তবু হয়, কেন? কেন? জিনিয়া বহুবার নিজেকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করেছে। উত্তর পায়নি। প্রথম প্রথম এমন ঘটলে খুবই বিচলিত হত। এখন আর হয় না। তবু অনুভবে মুহূর্তের ঝঞ্ঝা ওঠেই।

আত্মস্থ হয়ে মুখ মুছে ঘড়ির দিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে সমুদ্রের হাহাকার আছড়ে পড়ে। দেড়টা বেজে গেছে। আবীর এখনো এলো না! ও উদ্‌ভ্রান্ত ত্রস্ততায় টেলিফোনের বোতাম টেপে। ওপারের হ্যালো শব্দটির উপরই ও বলে, আমি মিসেস দাশগুপ্ত বলছি—দিল্লি ফ্লাইট—

—স্যরি ম্যাডাম, আপনাকে জানাতে পারিনি, ফ্লাইটটা লেট আছে—আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই নামবে।

—লেট কেন? কি হয়েছিল? দিল্লি থেকে ছেড়েছে?

—অনেকক্ষণ ছেড়েছে। বললাম যে পনেরো মিনিটের মধ্যেই নামছে। দিল্লিতে ইঞ্জিনিয়ারিং একটু বেশি সময় নিয়েছে তাই—

—আপনারা জানাননি কেন আমাকে? —চিৎকার করে ওঠে জিনিয়া।

—স্যরি—এক্সট্রিমলি স্যরি, ম্যাডাম। আমরা পারিনি। আমাদের ক্ষমা করে দিন।

ফ্লাইট ম্যানেজার শুভেন্দু কর খুবই নম্র ভাষায় কথা বলে। ও জানে জিনিয়ার মানসিকতা। ক্যাপ্টেন দাশগুপ্ত সব সময় বলেন; ওর কথায় তোমরা কিছু মনে করো না, ভাই। আমি জানি তোমরা কত ব্যস্ত থাকো। সামান্য দেরির কথা জানাবারও কিছু নেই। তবু পারলে ওকে একটু জানিয়ে দিও। তাতে আমার অস্বস্তি একটু কমবে।

শুভেন্দু ঈষৎ একরোখা তেজি চরিত্রের মানুষ। পাইলটদের খেয়ালখুশি

সহজে মেনে নেয় না। কিন্তু ক্যাপ্টেন আবীর দাশগুপ্তকে ও ভিন্ন চোখে দেখে। তাঁকে শুধু সমীহ করে না, শ্রদ্ধাও করে। অবশ্য পেশাগত একটা সুবিধার ব্যাপারও আছে। আবীর দাশগুপ্ত কখনো ফ্লাইট নিতে অরাজি হন না। অসময়ে বললেও রাজি হন। কেননা, তাঁর মতে যাত্রীরাই আমাদের মালিক—প্যাসেঞ্জারস আর আওয়ার মাস্টারস। ওদের অসুবিধেয় ফেলা যেতে পারে না কোন কারণেই। অবশ্য ওঁরও একটা গোঁ আছে। সেই গোঁ থেকে ওঁকে কিছুতেই টলানো যায় না।

পনেরো মিনিট পর জিনিয়া আবার ফোন করে—ফ্লাইট নেমেছে?

শুভেন্দুই জবাব দেয়—হ্যাঁ নেমে গেছে।

—উনি কি বাড়ি আসছেন?

এ প্রশ্নের জবাব কি শুভেন্দু দিতে পারে? আবীর কোথায় যাবে সে তো আবীরই স্থির করবে। তবু বললো—নিশ্চয় যাবেন। আজ ওঁর আর কোন ফ্লাইট নেই।

রিসিভার রাখার পরপরই ফোন বাজে।

—হ্যালো—

—বীর ফিরেছে? —আবীরের মা। জিনিয়ার মুখের রেখা আপনা থেকেই শক্ত হয়।

—ল্যাণ্ড করেছে। এখনো বাড়ি আসেননি।

—আচ্ছা। ওকে একবার ফোন করতে বলো।

—বলব।

ওদের বিয়েটা আবীরের মা মেনে নিতে পারেননি। প্রথম দিকে কথাই বলতেন না। এখন কখনো কখনো দু'-চারটে বৈষয়িক কথা বলেন। এ-বাড়িতে আসেন না। আবীর পৈত্রিক বাড়িতে যাতায়াত করে। জিনিয়া বছরে দু'-একবার যায়—আবীরের বিশেষ অনুরোধে। জিনিয়ার অবাক লাগে আবীরের বাবা—শ্বশুরমশাইকে দেখে। রাশভারী নামী অ্যাডভোকেট। অথচ কথাবার্তায় স্নেহশীল, উচ্ছ্বাসপ্রবণ। বাংলা সিনেমার পাহাড়ী সান্যালের মতন। দু'জন সম্পূর্ণ বিপরীত মানসিকতার মানুষ যে কীভাবে এক জীবন অবিচ্ছিন্ন দাম্পত্যজীবন কাটিয়ে গেলেন—সেটা এক বিস্ময়। জিনিয়ার এখনো দুঃখ হয় ওঁর শেষ সময়ে ও পাশে থাকতে পারেনি, শেষ চোখের দেখাও হয়নি। বছর পাঁচেক আগে ওঁর মৃত্যুর সময় ওরা ছিল আমেরিকায়।

তারপর থেকেই শ্বাশুড়ি নীহারিকা দাশগুপ্ত একটু একটু বদলাতে থাকেন বলেই মনে হয় জিনিয়ার। আবীর ফ্লাইটে গেলে ফেরার খবরের জন্য নিয়মিত ফোন করেন। না-ফিরলে বা ফিরতে বিষম দেরি হলে খুবই সঙ্গত উদ্বেগে অস্থির হয়ে ওঠেন। তখন আবার জিনিয়াকে আশ্বস্ত করারও চেষ্টা করেন। জিনিয়ার

ধারণা ও যদি উদ্যোগ নেয় তাহলে সম্পর্কটা সহজ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ওর ইচ্ছে করে না। কোনই আগ্রহ জাগে না নিজের মধ্যে। শ্বশুরমশাই বেঁচে থাকলে করা যেত। এখন কোন মানে হয় না। তাছাড়া আলিপুরের ও-বাড়িতে যেতে ওর ভালো লাগে না। মিহি কথার চতুরতা আর চোখের তারায় ভাসমান সন্ধিগ্ধতা কখনোই প্রিয় হতে পারে না।

গাড়ির শব্দ পেয়ে ছুটে জানালায় পৌঁছায় জিনিয়া। দরজা খুলে আবীর নামে। চোখ তুলে ওকে দেখে হাসে। হাতে ফ্লাইট ব্যাগ। জিনিয়ার মনে হয় পায়ের তলার মেঝে কী সমর্থ মসৃণ! ও ঘুরে গিয়ে দরজা খুলে কপাট ধরে দাঁড়ায়।

আবীর বাঁহাতে ওকে জড়িয়ে ঘরে ঢুকে বলে—কি, আবার অস্থির হয়ে পড়েছিলে?

—দেরি হলে অস্থির হব না? তোমার অফিসের লোকেরা খবর দেয় না কেন?

—এ তো সামান্য দেরি। তুমি কি ভাবো ওদের আর কোন কাজ নেই?

ব্যাগ রেখে টুপিটা নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে টাই খোলে। জিনিয়া হাত বাড়িয়ে টাই নিয়ে পাজামা ও টি-শার্ট এগিয়ে দেয়।

শার্ট খুলতে খুলতে আবীর বলে—জিনিয়া, স্তোত্র পড়ার দায়িত্ব আমি নিয়েছি। আমার অফিস নেয়নি, বুঝলেন মহাশয়া। বেচারীদের ওপর শুধু শুধু রাগ করো না।

অসংখ্যবার শুনেছে একথা, তবু খারাপ লাগে না। বরং স্বীকার করতে বাধ্য জিনিয়া, এই লঘু স্তব ও বেশ উপভোগ করে। তবু তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বললো, তুমি কি চান করবে এখন? সকালে তো—

—একবার করেছি, মনে আছে। এখন আরেকবার করব। জানোই তো বাইরে থেকে এলেই আবার চান করতে ইচ্ছে হয়।

—জানি। বাথরুমে সব গুছিয়ে রেখেছি। তাড়াতাড়ি সেরে এসো। আমি খাবার দিচ্ছি।

খাবার ঘরে এসে দেখে রাধা টেবিল সাজিয়ে গ্লাসে জল ঢালছে। ওকে দেখে বলল, ভাত কি দেব বৌদি?

—এক্ষুনি না। মিনিট পাঁচেক পর। সব গরম করেছ?

—হ্যাঁ।

রাধা এখানে কাজ করছে অন্তত দশ বছর। এখন ওকে আর কিছু তেমন নির্দেশ দিতে হয় না। জানে কখন কি করতে হবে। ওর রান্নার হাতও ভালো। জিনিয়া শুধু বলে দেয় কি কি পদ কিভাবে রান্না হবে। অবশ্য রোজ নাহলেও প্রায়ই একটা-দুটো রান্না নিজে করে জিনিয়া। রাধার বাধা অগ্রাহ্য করেই করতে

হয়। না-করলেও চলবে জেনেও করে নিজের অন্তর্গত আনন্দে। অনেকটা সময় যেমন কাটে, তেমনি প্রিয়তম মানুষটির জন্য কিছু করার অনির্বচনীয় তৃপ্তিও অনুভব করে। এতদিনের সম্পর্কের ফলে রাধা এখন প্রায় সখীর মতন। তবু এসব গূঢ় কথা ওকে বলা যায় না।

দরকার ছিল না, তথাপি নিজের হাতে প্লেট মুছলো। স্যালাডের বাটিটি আবীরের হাতের নাগালে ঠেলে দিয়ে বলল, এবার ডাল তরকারি নিয়ে এসো।

—আজকের মেনু কি? —পর্দা সরিয়ে খাবার টেবিলের দিকে এগুতে-এগুতে আবীর বলে।

সাদা পাজামার ওপর হলুদ টি-শার্ট—টাটকা যুবকের মতন আবীর। চুলের শ্বেতভ্রান্তি ভুলে গেলে মনেই হবে না পঞ্চাশটি ঋতুচক্র পার হয়ে এসেছে ও। জিনিয়ার পছন্দ হত না পাজামার সঙ্গে টি-শার্ট। ও চাইত পাঞ্জাবি পরুক। নাছোড় আবীরকে মানাবে কে! এখন অভ্যস্ত চোখে ওকে এই পোশাকেই ভালো লাগে। ঘরোয়া অথচ স্মার্ট। ইয়ং জেনারেশন একেই কি বলে মেক্সি?

ঠোঁট টিপে জিনিয়া বলল, আজকের মেনু খুব ছোট্ট—ডাল আর বেগুন ভর্তা।

চেয়ার টেনে বসে আবীর বলল, মুসুর ডাল?

—হ্যাঁ।

—বাঃ চমৎকার! আর কি লাগে!

বেগুন ভর্তার পর লাউচিংড়ি। তারপর চিতলের পেটি। মাংস। দই।

—করেছ কি—এ যে একেবারে রাজসূয় ব্যাপার—

জিনিয়া হাসে—সব রাধার কীর্তি।

—কীর্তি খুবই ভালো। কিন্তু এমন রোজ খেলে চাকরিটা থাকবে না।

—কেন? চাকরির আবার কি হলো!

—তোমার কিচ্ছু মনে থাকে না আজকাল। ভুলে গেলে—আমাদের চাকরি ছ'মাস অন্তর রিনিউ করতে হয়।

—ওঃ বুঝেছি। এতে কিচ্ছু হবে না। —ঝকঝকে চোখে বলে জিনিয়া।

প্রতি ছ'মাস অন্তর মেডিক্যাল চেকআপে যেতে হয় সব পাইলটকে। এবং এই পরীক্ষা বেশ কঠিন। পরীক্ষার আগে অনেক পাইলটই ভয়ে ভয়ে থাকে। ওজন বেড়ে গেলে বা রক্তচাপ অস্বাভাবিক হলে কিংবা হার্টে কোন সমস্যা থাকলে, বিধিবদ্ধ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আর ফ্লাই করতে দেওয়া হয় না। ফ্লাইং ছাড়া পাইলট তুলিহারা শিল্পীর মতনই। চাকরি যায় না বটে, তবে রোজগার কমে যায় ভীষণ। নিজেকে তখন জগন্নাথ মনে হবে।

এমন সহকর্মী আছে আবীরের। জিনিয়া চেনেও তাদের। যারা আর সুস্থ হয় না, অর্থাৎ পাকাপাকিভাবে ফ্লাইং ছেড়ে দিতে হয় যাদের, তাদের অবস্থা

হয় খুবই করুণ। ক্যাপ্টেন সুবোধ গুপ্তকে নিত্য দেখেছে জিনিয়া। না, আবীরের তেমন সঙ্কট হবে না। ও খুবই স্বাস্থ্য-সচেতন। আগে মনে হত যেন বাড়াবাড়ি করছে। এখন বুঝে গেছে ঐ সচেতনতা বাড়াবাড়ি নয়, প্রয়োজন।

—তোমার মাকে একবার ফোন করো।

—ফোন করেছিলেন বুঝি! কিছু বলেছেন?

—না। আমাকে তো কখনোই কিছু বলেন না।

কথা বাড়ায় না আবীর। স্পর্শকাতর বিষয় এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, মার ফোনটা আজ আশীর্বাদের মতন। সংযুক্তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার জন্য কোন অজুহাত খুঁজতে হবে না।

খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে ড্রইংরুমে আসে। সিগারেট ধরিয়ে মাকে ফোন করে। তেমন কোন কারণ নেই, তবু মা বললেন ও যেন একবার দেখা করে। আবীর ভেবেই রেখেছিল যাবে। আলিপুরে মাকে দেখে টালিগঞ্জ যেতে কতক্ষণ লাগবে?

শোবার ঘরে ঢুকে ভাবল এয়ারকণ্ডিশনার চালাবে কিনা। তেমন গরম লাগছে না। পাখা চালিয়ে শরীর ছড়িয়ে দেয় বিছানায়। জিনিয়া এসে দেখে আবীর পরম আরামে ঘুমের আদরে ভাসছে। সুকুমার ঘুমন্ত মুখ দেখে ছুঁতে ইচ্ছে হয়, ইচ্ছে হয় ওঁর কপালে হাত রাখতে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে জিনিয়া। ছুঁলেই ঘুম ভেঙে যাবে। কোন ভোরে উঠেছে। এখন ঘুম ওর ভীষণ জরুরি। শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে জিনিয়া ড্রইংরুমে সোফায় বসে টিভি চালায়। কোন চ্যানেলেই পছন্দমত কোন প্রোগ্রাম না-পেয়ে বন্ধ করে টিভি। হাত বাড়িয়ে খবরের কাগজ তুলে নেয়।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠে আবীর। চা খেতে খেতে বলল, আমি একবার আলিপুর যাব। তুমি যাবে?

—কেন, কিছু হয়েছে? —জিনিয়া জানতে চায়।

—জানি না। মা বললেন যেন একবার যাই।

—কাল ফ্লাইট কখন?

—বিকেলে। সেই দিল্লি যাওয়া-আসা।

—তার মানে মধ্যরাতে ফিরবে।

—সে আর কি করা? তুমি যাবে এখন?

—তোমাদের মা-ছেলের কথার মধ্যে আমি গিয়ে কি করব! তুমি ঘুরে এসো।

—ক্লাব হয়ে ফিরব। দেরি হলে যেন চিন্তা করতে বসে যেও না।

৪

মারুতি ওয়ান থাউজেণ্ডটা নতুন কিনেছে আবীর। স্টিল গ্রে রং ওর খুব পছন্দ। গাড়িতে বসে এসি চালিয়ে দিল। এ-গাড়ি চালিয়ে খুব আরাম। গাড়ির জানলায় রঙিন কাচ। অপরিচ্ছন্ন ভীড়াকুল এবড়ো-খেবড়ো শহরকেও অন্যরকম লাগে। দিল্লি মুম্বাইয়ের কথা ভাবলে বুক নিংড়ে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। কেন কলকাতাকে পরিচ্ছন্ন রাখা যায় না? কেন রাস্তাগুলো সুস্থ মসৃণ হবে না? হারানো ফুটপাথ খুঁজে পাওয়ার জন্য বোধহয় বিরল গবেষণা করতে হবে কোনদিন।

গবেষণা শব্দটা মাথায় উজিয়ে উঠতেই মনে এলো সংযুক্তার কথা। ডক্টরেট পাওয়ার পর ও ঠিক ফোন করেছিল। এবং ওর আশঙ্কা সত্যি করে আবীর বাড়ি ছিল না। হায়দ্রাবাদে কমাণ্ড ট্রেনিংয়ে গিয়েছিল। অবশ্য তার আগেও টেলিফোনে কথা বলেছে। দেখাও হয়েছে দু'-একবার। সেসব সাক্ষাতে শৌখিন সখ্যতা থাকলেও হৃদয়তার গুপ্ত উষ্ণ প্রস্রবণ উন্মোচন করেনি। উন্মোচন ঘটে সেবার হায়দ্রাবাদ থেকে কমাণ্ড নিয়ে ফেরার পর।

অভিনন্দন জানিয়ে আবীর বলল, এমন সুখবর—লেটস সেলিব্রেট—

—বাসি খবর। বিলম্বিত অভিনন্দন। এখন সেলিব্রেট করার কোন মানেই হয় না। একদম পানসে লাগবে।

—কি করব বলুন, আমার ট্রেনিংয়ে না গিয়ে উপায় ছিল না। কমাণ্ড ট্রেনিং—

—তার মানে?

—মানে, এখন থেকে ককপিটে আমি ডানদিকে না-বসে বাঁদিকে বসব। কমাণ্ড পেয়ে গেছি আমি।

—কনগ্রাচুলেশনস্! ছাট কলস ফর সেলিব্রেশন।

—ডবল সেলিব্রেশনই হোক—

গ্রাণ্ডের সেই সন্ধ্যা অনুপুঙ্খ মনে আছে কি? সম্ভবত আছে। অসম্ভব সুন্দরী লাগছিল সংযুক্তাকে সেদিন। রূপের চেয়েও প্রখর ছিল ব্যক্তিত্বের দ্যুতি। তবু চোখাচোখি হলেই কালো চোখে ব্রীড়া-রহস্যের ঢেউ খেলে যাচ্ছিল।

আবীর জানল ও কলকাতারই এক নামী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেছে।

—কেমন লাগছে এই পরিবর্তন—ছাত্রী থেকে অধ্যাপিকা?

—এখন তো ভালোই লাগছে। পরে হয়ত বোরিং লাগবে—সে তো সব কাজই একঘেয়ে—আপনাদের লাগে না?

—লাগে আবার লাগেও না।

—কেন?

—এতদিনের চেনা আকাশ, তবু রোজই কি একই রকম লাগে? একঘেয়ে মনে হয়? আমাদের কোন ফ্লাইটই অন্য আরেকটা ফ্লাইটের মতন নয়। আমার

ধারণা আপনাদের সব ক্লাস একরকম নয় সিলেবাস যতই একঘেয়ে হোক না।

—তা ঠিক। সেই 'বর্ষে বর্ষে দলে দলে'—

সাগ্রহে আবীর বলে, মনে আছে আপনার? পুরোটা বলতে পারবেন?

—না। আপনি পারবেন?

—পুরোটা পারব না। কিছুটা পারব বোধহয়।

—থাক, এখন পারতে হবে না। —বলে চোখের ইঙ্গিত করে।

বেয়ারা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে! হাতে মেনু। নিজের জন্য পছন্দের হুইস্কি বলে আবীর জিজ্ঞেস করে—আপনি কি নেবেন? আজ সফট ড্রিঙ্ক চলবে না।

—আপনি বলুন তবে।

—হুইস্কি?

—না।—সজোরে মাথা নাড়ে সংযুক্তা।

—ব্লাডি মেরী—জিন-টনিক—

—জিন-টনিক।

বেয়ারা অর্ডার নিয়ে গেলে আবীর বলে, কিছু মনে করবেন না—আপনার এসবে অভ্যাস আছে?

—অভ্যাস নেই। শুচিবাইও নেই। মাঝেমধ্যে খেয়েছি, খাই। আমাদের বাড়িতে কোন রাগঢাক নেই এসব নিয়ে। বাবা দাদা বাড়িতেই খায়। তবে ঐ একটাই। নো মোর।

—কেন, নেশা হবার ভয়?

—ভয় না। মহিলাদের নিজস্ব কারণেই সতর্ক থাকা প্রয়োজন। মাতাল শব্দটি পুরুষদের জন্যই বরাদ্দ।

দুজনেই হেসে ওঠে। বেয়ারা গ্লাস নিয়ে আসে। জল বরফ মিশিয়ে আবীর বলে চিয়ার্স—

—চিয়ার্স টু য়ু।

খাওয়া সেরে হাত ধরাধরি করে বেরিয়েছিল হোটেল থেকে। গাড়িতে উঠেও আবীরের বাঁ হাতে ধরে থাকে সংযুক্তার ডান হাত। রবীন্দ্রসদন ছাড়িয়ে এসে আবীর গলা পরিষ্কার করে বলে, একটা কথা বলব—

সংযুক্তা ওর কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে বলে, আজ নয়—কোন কথা নয়—জাস্ট হোল্ড মি।

সেদিন দুজনের কেউই জানত না, আবীর স্বতোৎসারিত যা বলতে চেয়েছিল, তা আর কখনোই বলা হবে না।

বাড়ির গেটে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বেল টেপে। পুরানো চাকর হরিপদ দরজা খোলে।

—ছোড়দাবাবু।

—কেমন আছ? মা কোথায়?

—দোতলায় আছেন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আবীর ডাকে, মা—মা—

—কে বীরু, এদিকে আয়—

দোতলার বারান্দায় নীহারিকা। নাতনি পিউর চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলেন। বেণী বাঁধতে বাঁধতে বললেন, এখানে বোস।

পিউ বলল, ছোটকা, তুমি কদ্দিন আসনি! কেন আসনি?

—কদ্দিন কিরে, দু'হপ্তা আগেও তো এসেছি। এত উড়ছি না মা, মাটিতে পা থাকে না, কি করে আসি বল। তারপর, স্কুলে যাচ্ছিস রোজ?

—হ্যাঁ।

—নতুন কি দুষ্টুমি শিখলি?

—ধ্যাৎ, তুমি না—স্কুলে কি দুষ্টুমি শেখায়?

—শেখায় না বুঝি! আমি কি করে জানব বল। তোর ঠাম্মা বলে তুই খুব দুষ্টু হয়েছিস। আমি অবশ্য বলি মিষ্টি দুষ্টু—এই নাও তোমার র‍্যাশন—

বলে একমুঠো চকলেট এগিয়ে দেয়।

দু'হাতের মুঠো ভরে পিউ চকলেট নিয়ে বলল, থ্যাঙ্কু।

নীহারিকা বললেন, যাও এবার হোম ওয়ার্ক নিয়ে বসো গে—

আবীর মার সামনে বসেছিল। বলল, বলো মা, জরুরি তলব কেন?

—জরুরি কিছু না। তোকে অনেকদিন না দেখলে মনটা অস্থির অস্থির করে। যতই উড়িস মাটিতে না নামা পর্যন্ত স্বস্তি হয় না। বৌমাকে আনলি না—

—আমি আরেকটা জায়গায় যাব, তাই—দাদা ফেরেনি? বৌদিকেও দেখছি না—

—বড়খোকা এখনো ফেরেনি। আজকাল প্রায়ই বেশি রাত করে ফেরে। বড়বৌ ওর বোনের বাড়ি গেছে বেহালায়। এসে যাবে। চা খাবি?

—না, মা। কিছু খাব না। তুমি কি বলবে ভেবেছ তাই বলো—

—তোর দাদার কথা বলছিলাম। ও খুব বাড়াবাড়ি করছে আজকাল।

—মানে বেশি ড্রিঙ্ক করছে?

—হ্যাঁ। আর খালি আমাকে দিয়ে বাড়িটা ওর নামে লিখিয়ে নিতে চায়। ও নাকি এখানে মাল্টিস্টোরিড বানাবে।

আবীর জানে, দাদা বাবার চেম্বারে বসলেও তেমন ভাল পশার জমাতে পারেনি। যে-কোন অর্থমনস্ক মানুষের মতন দাদা সুবীরের মধ্যেও গৃধ্নতা লক্ষণীয়। সেই সঙ্গে ওর ধারণা আবীরের প্রচুর টাকা। পাইলটদের নিয়ে কাগজে অত

লেখালেখি তো এমনি হয় না। অত সুন্দর ফ্ল্যাট কিনেছে, নতুন গাড়ি, একটিমাত্র সফল ছেলে। সুবীরের মধ্যে হীনমন্যতা তো আঁচড় কাটবেই। চারটে ছেলে-মেয়ের কেউই এখনো পড়াশোনা শেষ করেনি। ছোট মেয়ে পিউ তো মাত্র আট বছরের।

আবীর বলল—মা, আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি, আমার কোন অংশ চাই না। তবে দাদাকে এখনি লিখে দেবে কিনা ভেবে দেখো। আর মেজদির কথাটা মাথায় রেখো। ও খুব ভালো নেই। নিজে থেকে কিছু বলতে চায় না। তবু আমি জানি। যে ব্যবসা দেখে বিয়ে দিয়েছিলে সেটা এখন আর তেমন চলছে না। আর রণেনদা তেমন উদ্যোগীও নন। গয়ংগচ্ছ করে চালিয়ে যাচ্ছেন।

—জানি। বিনু এসেছিল কদিন আগে। ওর বড় মেয়ের বিয়ের কথা চলছে। বেশ ভালো সম্বন্ধ এসেছে। তবে খাঁই খুব। তোর দাদা কথাটা কানেই তুললো না।

—মিলির বিয়ে—আমি জানি না তো। ঠিক আছে আগামী সপ্তাহেই আমি যাব একবার।

—কিন্তু বাড়িটার কি হবে—

—মা, আইন-কানুন আমি কিচ্ছু বুঝি না। তুমি বরং একবার বড়মামার সঙ্গে কথা বলো। দেখ উনি কি বলেন।

বড়মামা, অমলেন্দু, মার ছোটভাই—বিখ্যাত আইনজীবি।

একটু ভেবে নীহারিকা বললেন, ঠিক আছে, অমুকে একদিন আসতে বলব—

—না। আসতে বলবে না। তুমি যাবে।

—তুই নিয়ে যাবি?

—আগে থেকে বলে ব্যবস্থা করো, নিশ্চয় নিয়ে যাব।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আবীর বলল, এখন চলি মা। বড়মামার সঙ্গে কথা বলে আমাকে ফোন করো।

গাড়িতে বসে সিগারেট ধরায় আবীর। লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে স্টার্ট দেয়। সকাল থেকেই বিজবিজ করা প্রশ্নটা মাথার মধ্যে আবারও খোঁচা দেয়। অমনভাবে সংযুক্তা ডাকল কেন? শেষ যে কবে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে মনে পড়ে না। বছর দুয়েকের মধ্যে নিশ্চয় দেখা হয়নি। ফোন করেছিল কি? আশিসকে বিয়ে করার পরও মাঝে-মাঝে ফোন করত, দেখা করতে চাইত। সম্ভব হলে ওর জেদ মেটানোর জন্য দেখা করেছে আবীর। প্রতিবারই খুব অস্বস্তি-বোধ করেছে সংযুক্তার প্রায় পাগলামির জন্য। ও এমন অবুঝ বায়না করত যা মেনে নেওয়া সম্ভব হত না।

আবীর বলত, কতবার কতভাবে বোঝাব তোমাকে, যে আবীর দাশগুপ্তকে

চিনতে আমি সে নই। আমি ললিত মিত্রর জীবনযাপন করছি। ললিতের সঙ্গে সংযুক্তার কোন সম্পর্ক নেই।

সংযুক্তা বলত, আবীরের সঙ্গেও কি ছিল?

—সেটা তুমি বলো।

—তুমি কি বলো?

—অনুভবের একটা সম্পর্ক নিশ্চয় ছিল। সম্ভবত বিশ্বাসেরও। তারপর সেই গানের লাইনের মতন—'হঠাৎ বুকে বিঁধল যে তীর স্বপ্ন দেখা হল ফাঁকি'।

—তীর মোটেই বেঁধেনি, তুমি যদি ইচ্ছে করে বেঁধাও—স্রেফ আমাকে এড়াবার জন্য—

—একদম ভুল বলছ। আমি কখনো তোমাকে এড়াইনি—তার দরকারই হয়নি কেননা পারস্পরিক অনুরক্তির কোন কথাই আমরা কখনো বলিনি। তুমি যখন বলতে চাইলে তখন আবীর দাশগুপ্ত শেষ হয়ে গেছে।

—না, আমি মানি না তোমার কথা।

—সে তোমার ইচ্ছে।

আবীরের বিয়ের পরও সংযুক্তা বছর পাঁচেক অন্তত বিয়ে করেনি। বিয়ে করবেই না এমনই ইচ্ছা ছিল।

—জানি, আমি বিয়ে করলেই তুমি মুক্ত হয়ে যাও। তা হতে দেব না। নিজের অপরাধবোধে যাতে তুমি সারাজীবন কষ্ট পাও, দগ্ধ হও, আমি তাই দেখব।

আবীর বোঝাত—তুমি অহেতুক অবুঝপনা করছ। আমার অপরাধবোধের কোন কারণই নেই।

—তুমি বলতে চাও আমার জন্য তোমার মনে—

—আবারও বলছি, কোন অপরাধবোধ নেই।

—তবে কি আছে? কিছুই কি আছে?

—যা আছে তা আমারই থাক। যদি মনে করো কিছু নেই তাহলেও আপত্তি করব না। শুধু বলব, বিয়ে না-করাটা তোমার ভুল হচ্ছে।

—কেন, বিয়ে না-করে থাকা যায় না?

—যায়। অনেকেই আছে। কিন্তু সে-জীবন তোমার নয়। য়ু এনজয় লিভিং—দ্য গ্রেটনেস অব লাইফ। সেজন্যই তোমার বিয়ে করা জরুরি।

মানেনি সংযুক্তা। বস্তুত নিজের সঙ্গেই তখন লুকোচুরি খেলছিল ও। আশিস চন্দ্রের সঙ্গে ধীরে ধীরে একটা মানস-সম্পর্ক গড়ে উঠছিল যে গতিতে তার দ্বিগুণ অনুপাতে ও আবীরকে উদ্ব্যস্ত করে তুলত। সেটা ছিল নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার সময়। আবীর যাই বলুক—যত মহৎই হোক না কেন ওর ঐ সিদ্ধান্ত, সংযুক্তা

কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি আবীরের ত্বরিত বিবাহ। কিভাবে কেন যে ওর মনে আবীর-নির্ভরতা সঞ্চারিত হয়েছিল, সচেতনভাবে নিজেও বলতে পারবে না। সেই আত্মিক নির্ভরতা থেকেই ও ভাবতে বাধ্য হত যে, নিজে বিয়ে করলে সম্পূর্ণভাবেই আবীরকে হারাবে। আবীর আশ্বাস দিত, আমি তোমার এক জীবনের বন্ধু। আমাকে ডাকলেই পাবে।

—ঠিক বলছ?

—ডেকে দেখো।

তবুও সংশয় কাটছিল না সংযুক্তার।

আবীর যখন ওদের মাল্‌টিস্টোরিড বাড়ির উঠোনে গাড়ি দাঁড় করালো তখন সন্ধের রং বেশ গাঢ়। লিফটে সাত তলায় উঠে বেল টেপে। এই ফ্ল্যাটে আরো কয়েকবার এসেছে ও। দরজায় অযত্নের ছাপ চোখে লাগে। অল্পবয়সী যে-মেয়েটি দরজা খুলে দাঁড়ায় তাকে ও চেনে না। মেয়েটির চোখের জিজ্ঞাসা পড়ে বলল—আমি ক্যাপ্টেন দাশগুপ্ত—সংযুক্তা—

মেয়েটি বলল, আসুন—বসুন আপনি।

সোফায় বসে ঘরের চারদিকে চোখ চালায় আবীর। অযত্নের ছাপ সর্বত্র। দেয়ালে রং করা হয়নি বহুকাল। শেষ যেমন দেখেছিল (কতদিন আগে মনে পড়ছে না) তার থেকে কোন বদল চোখে পড়ছে না। মেয়েটি পাখা চালিয়ে দিয়েছিল। অনিচ্ছুক পাখাটার প্রতিবাদ—যান্ত্রিক কর্কশ শব্দ—কানে উৎপাত ঘটায়। বন্ধ করে দিলে গরম লাগবে সুতরাং এই উপদ্রব সহ্য করতেই হবে।

সংযুক্তার গলা শুনে উঠে দাঁড়ায় আবীর। ওকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। একি চেহারা হয়েছে! বেশ বোঝা যায় দ্রুতহাতে কিছু প্রসাধন করে এসেছে। কিন্তু তাতে মুখের রেখার ভাঙচুর ঢাকা পড়েনি। প্রসাধনে শরীরের শীর্ণতা ঢাকা যায় না। চোখের ভারি চশমা কতটা সত্য গোপন করছে তা বোঝার উপায় নেই।

আবীরের সামনের সোফায় নিজেকে জমা করে সংযুক্তা। আবীর বসে বলল—আমি তো বলেছিলাম আসব। কিন্তু একি অবস্থা করেছ!

—কেন খারাপটা কি—তুমি কি তাজমহল দেখতে এসেছ, না মহেঞ্জোদরো-হরপ্পা—

—কি আবোল তাবোল বলছ?

—সারাজীবন তাই বলে গেছি—তোমার তো এমনই ধারণা। আমার সব-কিছুই তোমার কাছে পাগলামি।

—আমি তা বলিনি। তোমার কি শরীর খারাপ? ব্লাডপ্রেশার বা অন্য কিছু—

—চেক করাইনি, ওসব বলতে পারব না। মনে হয় শরীর ঠিকই আছে। খাচ্ছি, ঘুমুচ্ছি, কলেজে পড়াচ্ছি। মোটামুটি অ্যাফ্লুয়েন্ট লাইফ। এর বেশি আর কি চাওয়ার থাকতে পারে।

ওর গলার স্বরের নিহিত শ্লেষ আবীর নির্ভুল বুঝতে পারে। ওর বুকের মধ্যে গভীর মমত্ববোধ জেগে ওঠে—বাৎসল্যের মতন।

—চা খাবে, না কফি? —সংযুক্তা বলে।

—কোনটাই না। আলিপুর হয়ে আসছি—

অন্যসময় হলে সংযুক্তা বলত, তুমি মায়ের তেমন আদুরে ছেলে নও। মার তোয়াক্কা না-করেই জীবনের অতবড় সিদ্ধান্ত নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছ। আজ এসব বলতে ইচ্ছে করল না।

—ড্রিঙ্কস নেবে?

—এখন না। আগে কেন ডেকেছ বলো।

—যদি বলি শুধু তোমাকে দেখার জন্য।

—তাহলে আমি উঠি—দেখা তো হয়ে গেছে।

আবীরের কণ্ঠের কৌতুক সংযুক্তার ঠোঁটে বিদ্যুৎ রেখার মতন একটুকরো হাসি ফুটিয়ে তোলে। আঁচলে মুখ মুছে ও ব্যাকুলভাবে আবীরের দিকে তাকায়। আবীরের বুকের মধ্যে শিরশির করে। এই নারী ওর প্রিয় ছিল, কাম্য ছিল। যদিও কখনো উচ্চারণ করেনি। কিন্তু বাগ্ময় অনুভবের দাবী অস্বীকার করা চলে না। নিজের মধ্যে ঘুলিয়ে-ওঠা অস্বস্তি এড়াবার জন্য আবীর বলল, আশিস কোথায়?

—মুম্বাই গেছে। গতকাল।

—ফিরবে কবে?

—জানি না। নাও ফিরতে পারে।

—কি যা-তা বলছ!

—বিশ্বাস হচ্ছে না? তোমার তো আমার কোন কথাই বিশ্বাস হয় না কোনদিন। তবে ও আমায় তাই বলে গেছে।

আবীর জানে আশিস এক বিখ্যাত মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে উচ্চপদে আসীন। সারা পৃথিবীর মতন ভারতেরও সব বড় শহরে ওদের অফিস আছে। তাই ওকে প্রায়ই ট্যুরে যেতে হয়। মুম্বাই-দিল্লি যাওয়া খুবই রুটিন ব্যাপার। বস্তুত বিয়ের আগে থেকেই এটা জানা ছিল।

আশিসের সঙ্গে সংযুক্তার বিয়ে হয় প্রথামাফিক সম্বন্ধ করে। বাবার জেদ ও জোরের কাছে শেষপর্যন্ত নতিস্বীকার করে সংযুক্তা। খবর দিয়ে বলেছিল, ওর নাকি খুব ট্যুর থাকবে—সেটা একটা রিলিফ।

—কেন, রিলিফ কেন ?

—মাঝে মধ্যে নিজের সঙ্গে থাকতে পারব—নিজের মতন করে। আমার কাছে এটা খুব জরুরি। পড়াশোনার জন্যও তো সময় দরকার।

—আচ্ছা, জোজোর মৃত্যুর জন্য কি আমি দায়ী ?

আচমকা এমন প্রশ্নে আমূল চমকে ওঠে আবীর। জোজো মারা গেছে বছর তিনেক হবে। ওদের একমাত্র ছেলে। মেয়েটি এখন শান্তিনিকেতনে। ষোল বছরের জোজো মারা যায় প্রায় ভাগ্যহীনভাবে। সেকেণ্ডারি পাশ করার পর সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি হয়েছিল। যাতায়াতের সুবিধের জন্য এবং অবশ্যই জোজোর বায়নাবশত ওকে কিনে দেওয়া হয়েছিল স্কুটার। একদিন কলেজ কম্পাউণ্ডেই স্কুটার স্টার্ট দিতে গিয়ে হঠাৎ ও পড়ে যায় মাটিতে। স্কুটারও ওর গা ঘেঁষে শুয়ে পড়ে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জোজো উঠে দাঁড়ায়। স্কুটারটাও দাঁড় করায়। তারপরই ও আবার ভূমিগত হয়। আর ওঠে না। বন্ধুরা লোকজন জুটিয়ে গাড়িতে করে পিজিতে নিয়ে যায় বটে, তবে তার আগেই পৃথিবীতে তার বরাদ্দ বায়ু শেষ।

এই শোক কী মর্মান্তিক অনুমানই কেবল করা যায়। এমনই দুর্ভাগ্য আবীরের ও তখন দেশের বাইরে। নতুন প্লেন আনতে গেছে ফ্রান্সে। ফিরে এসে খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিল আবীর। ততদিনে অনেকটা সামলে নিয়েছিল সংযুক্তা। আশিসের চোখেমুখে তখনো ছিল উদভ্রান্তির অমেয় যন্ত্রণা। আবীর কোন কথা বলতে পারেনি। এই শোকের কোন সান্ত্বনা নেই, হয় না। এই শোক শুধু সয়ে যেতে হয়। শুধু অপেক্ষা করতে হয় সময়ের সস্নেহ প্রলেপের।

কেবল বলেছিল—আশিস, জানি কাজটা কঠিন, তবু তোমাদের নিজেদের ভেতর থেকেই শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। জীবনের মুখোমুখি তোমাদের দাঁড়াতেই হবে।

বলতে পারেনি আবীর যে, দ্যাখো আমাকে। কীভাবে কুশপুত্তলির জীবন যাপন করছি। উড়ছি, হাসছি, সংসার করছি। এ যে কী কঠিন কাজ সে-শুধু আমিই জানি। মানুষের অন্তরাত্মার আর্তনাদ কেউ শুনতে পায় না। তাকে গোপনে একা—একেবারে একা কাঁদতে হয়—সকলকে লুকিয়ে।

আবীর বলল, হঠাৎ একথা কেন! তুমি কেন দায়ী হতে যাবে ?

—আশিস আমাকে তাই বলে। আমারই জন্য জোজো—স্কুটারটা আমিই কিনে দিয়েছিলাম—

চোখ ভেঙে জল আসে সংযুক্তার। গলা কেঁপে ঝাঁজিয়ে ওঠে। মুখে আঁচল চাপা দেয়।

—দুঃখ থেকে বলে। মিন করে না। লক্ষ লক্ষ লোক স্কুটার চড়ছে রোজ।

ওটা একটা দুর্ঘটনা—

—দুঃখ শুধু ওর! আমার কোন দুঃখ নেই ? দুর্ঘটনা—শুধু আমারই জীবনে কেন দুর্ঘটনা ঘটে বারবার!

বলে আবীরের চোখে চোখ রাখে সংযুক্তা। আবীর চোখ সরিয়ে নেয়। ও জানে কি বলতে চাইছে সংযুক্তা। এখন নিজের বিক্ষত হৃৎপিণ্ড দেখাতে চায় না আবীর। ও প্রসঙ্গান্তরে যাবার সুযোগ খোঁজে।

সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দেয় আবীর। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শব্দ খোঁজে। ফ্ল্যাট নিয়ে কিছু বলবে, যেমন ফেস-লিফটিং দরকার। বা মেয়েকে নিয়ে কিছু। ও কি গান শিখছে না ছবি আঁকা? সংযুক্তার মেজাজ যা দেখছে এসব কথাকে লঘু ভেবে তাচ্ছিল্য করতে পারে।

অগত্যা বলল, তুমি কিন্তু আসল কথাটা এখনো আমাকে বলোনি।

—কি আসল কথা ?

—সে তো তুমি আমাকে বলবে, কি জন্য ডেকেছ আমাকে।

ম্লান হাসে সংযুক্তা—বালুচরে সমুদ্রের রেখার মতন। যেখানে বিলীয়মান ঢেউ দেখা যায়, ঢেউয়ের সঙ্গীত শোনা যায় না। দু'হাতের করতলে মুখ ঢাকে খানিকক্ষণ। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, কি বলব, কি ভাবে বলব, বলে কি হবে কিছুই জানি না। তবু তোমাকে বলব বলেই ডেকেছি। বাবা নেই, দাদাকে বলে কিছু হবে না—তুমি বন্ধু মানুষ, তোমাকেই বলা যায়। তবে আগেই বলি—তোমাকে কোনভাবে বিরক্ত, বা বিব্রত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। যদি কোন পরামর্শ দিতে পার ভালো, না পারলেও অভিযোগ করব না। আমি তো ভাগ্যের হাতে বন্দী।

একটু থেমে আবার বলে, আশিস ডিভোর্স চায়।

শেষ বাক্যটি সংযুক্তা উচ্চারণ করে টিভি-র ঘোষিকার স্বরে। স্তম্ভিত বা বিহ্বল কোন শব্দই আবীরের মানসিকতার উপর বহু ঝঞ্ঝার রূপ প্রকাশ করতে অসমর্থ। মুহূর্তের জন্য যেন চোখের দৃষ্টিই মুছে যায়, ফুসফুস শ্বাস নিতে বিরুদ্ধতা করে। হাতের সিগারেট নিঃশব্দে জলতে জলতে ত্বক স্পর্শ করলে মুহূর্তের মৃত্যু থেকে পুনরায় জেগে ওঠে আবীর।

অ্যাশট্রেতে সিগারেট বুজিয়ে নরম গলায় বলল, কারণ কিছু বলেছে ?

মাথা নাড়ে সংযুক্তা—বলেছে। আমার সঙ্গে থেকে ও আর কোন আনন্দ পাচ্ছে না। আমি নাকি ভেজা ব্লটিং পেপারের মতন হয়ে গেছি। দো নট ফিজিক্যালি।

সংযুক্তার শরীর-সুষমা এখনো যা আছে তাকে ভেজা ব্লটিংয়ের সঙ্গে তুলনা করবে আশিসকে এমন বেরসিক মনে করে না আবীর। এ-বয়সে শরীরের চাহিদার তীব্রতা আর কতটুকু ? এখন বেশি দরকার মানস-উষ্ণতার। প্রেমের চেয়ে বেশি

প্রয়োজন স্নেহ ও মমতার আত্মিক অনুষঙ্গের। সেখানে কি ব্যর্থ হচ্ছে সংযুক্তা?

—জোজোর মৃত্যু আমাকে এমন ভাবে ভেঙে দিয়েছে যে আমি আর আগের মতন হেসে উঠতে পারি না—আমার ভেতরে কিছুই ভালো লাগে না। আমি সারাক্ষণ কাঁদি, শুধু কাঁদি—বাইরে নয়, ভেতরে। আমার ভেতরে কান্না ছাড়া আর কিছু নেই। আমি আশিসকে দোষ দিই না। কেননা আমার নিজেরই নিজেকে এক বৃষ্টিঝরা রাত বলে মনে হয়—এমন রাত যার জন্য কোন ভোর অপেক্ষায় নেই। কিন্তু আমি কি করব, বলো, কি করব আমি?

আবীর কিছু বলে না। চুপ করে ওকে দেখে। ভাবতে থাকে নিজের কথা, ললিতের কথা; সংযুক্তার কথাও। মাথার ভেতরে অনেক সমীকরণের কাটাকুটি খেলা চলতে থাকে।

—ডিভোর্স আমি দেব না, দৃঢ়স্বরে সংযুক্তা ঘোষণা করে, কিছুতেই দেব না। আমি একবার তোমাকে হারিয়েছি, ওকে হারাতে পারব না। আই কাণ্ট লুজ এনি মোর!

অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ে সংযুক্তা।

৫

সকালের মুখ দেখেই বোঝা যায় দিনটা কেমন যাবে—কোন অর্বাচীন বলেছিল এটা জানার উপায় নেই। তবে এর চেয়ে বাস্তববিরুদ্ধ কথা আর দ্বিতীয় নেই এ বিষয়ে আবীর নিশ্চিত। এমনই একটি নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর দিনের স্মৃতিচারণা করে সংযুক্তার মধ্যে কিছুটা জীবনপ্রত্যয় জাগাবার ঈষৎ সফল প্রয়াস করে লেক-ক্লাবে এসেছে। ক্লাবের ছায়া-অন্ধকারে লেকের জল ঘেঁষে একা টেবিলে বসে হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে স্মৃতিচারণারই পর্যালোচনা করছিল। কতটুকুই বা জানে সংযুক্তা। ও কেবল মুখোসটাই দেখেছে, মানুষটাকে কখনো দেখেনি। পুরো মুখোস ও কি ঠিক দেখেছে? সংযুক্তা কেন, কেউই কি দেখেছে?

সংযুক্তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আবীর বলেছিল, তুমি দুর্ঘটনার কথা বলছিলে একটু আগে—আমার দুর্ঘটনার কথা মনে আছে?

—মনে নেই আবার!—সংযুক্তা হিসহিস করে বলে, সেদিনই তো আমার জীবন বিবর্ণ বেদখল হয়ে গেল। উঃ যা দিন গেছে—এখনো ভাবলে আঁতকে উঠি। খবরটা পেয়ে কতবার ফোন করেছি তোমাদের অফিসে কেননা আগের দিন তুমি বলেছিলে সকালে আগরতলা ফ্লাইট নিয়ে যাবে—কেউ সঠিক খবর দিতে চায় না। একবার তো কনফার্মই করল, ক্যাপ্টেন দাশগুপ্ত ছিলেন ফ্লাইটে, পরমুহূর্তেই আরেকজন বলল, না উনি ছিলেন না—ট্যোটাল কনফিউসন ফর সামটাইম। তারপর অবশ্য সঠিক জানাল—

—না সংযুক্তা, প্রথম খবরটাই ঠিক ছিল—সেদিনই আবীর দাশগুপ্ত মারা গেছে। এখন তুমি যাকে দেখছ সে ললিত মিত্র—আপাদমস্তক ললিত মিত্র। শুধু আবীর দাশগুপ্তর মুখোসটা রয়ে গেছে।

সাধারণত ক্রুদের রোস্টার এক সপ্তাহ আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়। অনিবার্য কারণে কোন বদল ঘটাতে হলে ফ্লাইটের আগের দিন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলোচনা করে সেই পরিবর্তন করা হয়। ঐ অভিশপ্ত দিনে আবীরের সকালের আগরতলা ফ্লাইট নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। সেই দিন—২৮শে জুন—মাথার ভেতরে ক্রুশের মতই গেঁথে আছে। ভোরবেলা প্রতিদিনের মতন বেরুবার জন্য তৈরি হচ্ছিল আবীর। হঠাৎ ফোন বাজল। ফোন ধরেছিলেন বাবা। ওঁর স্বভাব ছিল, বাড়িতে থাকলে ফ্লাইটের জন্য যাবার সময় আবীরের সঙ্গে হেঁটে গেট পর্যন্ত এসে ওকে গাড়িতে তুলে দিতেন। সকালে ফ্লাইট থাকলে ছেলের আগে নিজেই ঘুম থেকে উঠে হাঁক-ডাক শুরু করতেন—গরম জল হলো কিনা, চা কেন আসছে না, গ্যারেজ গাড়ি পাঠিয়েছে কিনা।

আবীর বলত, তুমি কেন যে শুধু শুধু এত ভোরে ওঠো, বাবা—

—কেন উঠি? এখন বুঝবি না। বুঝবি যেদিন নিজে বাবা হবি।

সব বাবাই এমন বলে থাকেন। একথার উপর কোন কিছুই আর বলা যায় না।

বাবা সেদিন ডেকেছিলেন, বীরু, ললিতের ফোন—

ললিতের সঙ্গে পরিচয় ফ্লাইং ক্লাবে। একই সঙ্গে ভর্তি হয়েছিল দুজনে। একই সঙ্গে সি. পি. এল. পাওয়া, একই সঙ্গে এই কোম্পানিতে ট্রেনি-পাইলট হয়ে ঢোকা। কম্যাণ্ডও পেয়েছে একসঙ্গে। প্রথম দিনেই পরস্পরকে পছন্দ হয়েছিল তাই সহজেই বন্ধু হয়ে উঠেছিল। দিনে দিনে বন্ধুত্ব হয়েছিল খুবই গাঢ়। দু'বাড়িতেই দুজনের অবাধ যাওয়া-আসা।

ফোন ধরে আবীর বলল, বল—তাড়াতাড়ি আমাকে এক্ষুনি বেরুতে হবে—

—ড্যামনামি করিস না! আমিও বেরুব। শোন তুই ৩৪১/৩৪২ করছিস তো, আমাকে দিয়েছে ৩৭৬-বম্বে নাইট স্টপ। আজ আমি নাইট স্টপে যেতে পারব না। তুই আমার ফ্লাইটটা করে দে, আমি ৩৪১ / ৩৪২ করে দেব।

আগে বলিসনি কেন? ডেসপ্যাচে জানিয়েছিস?

—আরে কাল রাতে রোস্টার থেকে বলল। তুই বাড়ি ছিলি না তাই আমাকে ধরেছিল। আমি কনফার্ম করে ভেবেছি সকালে তোর সঙ্গে বদলে নেব। তুই রাজী হলে ডেসপ্যাচকে বলব।

—আজকের ব্যাপারটা কি? বৌ ছাড়ছে না—নাকি, না এক বছর তো হয়নি এখনো। তবে?

—তেমন কিছু না—ওকে নিয়ে একটু বেরুবার আছে। বিয়ে করলে বুঝবি

মেয়েরা কি জিনিস—তুই করে দিবি ?

—তুই বলছিস, করতে তো হবেই—আমার কোন অসুবিধে নেই। ডেসপ্যাচকে বলে দে। ফোন করে ভাল করলি, বাড়িতে বলে যেতে পারব। রাখি এখন। এয়ারপোর্টে দেখা হবে।

ফ্লাইট বদল করা বা নিজের পছন্দ মত ফ্লাইট চাওয়া খুবই রুটিন ব্যাপার। ক'দিন আগেই আবীরের দিল্লিতে দরকার ছিল, ললিত ওর ফ্লাইট ছেড়ে দিয়ে আবীরের নির্দিষ্ট ডিব্রুগড় ফ্লাইট করে দিয়েছে। সুতরাং ললিতের অনুরোধ না-রাখার কথাই ওঠে না। বেচারা বিয়ে করেছে মাত্রই কয়েকমাস, এখন বাইরে রাত্রিবাস করাটা নিতান্ত অরুচিকর। ললিতের মধ্যে একটা উচ্ছল প্রাণময়তা দাপিয়ে বেড়ায়। হৈ হৈ কথা বলে, উচ্ছ্বাসবশত অনেক সময় শব্দের শালীনতা হারিয়ে ফেলে। ও ভ্রূক্ষেপহীন বকে যায়। মাত্র তিন মাসের উন্মাদ প্রেমের পরই জিনিয়াকে বিয়ে করে। বিয়ের আগে হঠাৎ একদিন বিকেলে বাড়ি এসে বলে, কিরে—ঘুমুচ্ছিস নাকি ?

সকালের ফ্লাইট সেরে দুপুর গড়িয়ে বাড়ি ফিরেছে আবীর। খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়েছিল ঠিকই। তবে তখন শুয়ে শুয়ে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল।

—চল চল—তাড়াতাড়ি রেডি হ। বেরুবো।

—কোথায় বেরুবো ? —আবীর জানতে চায়।

—তুই কি ফ্লাইট-প্ল্যান ছাড়া ঘর থেকে নড়িস না ?

হেসে ওঠে আবীর—না, না, তা নয়। কোথায় যাব বলবি তো—সেভাবে পোশাক পরব—

—যা খুশি পরো, তোমাকে কেউ দেখতে আসছে না। পোশাক বদলে বেরিয়ে এসে দেখে গেটের সামনে আনকোরা নতুন ফিয়া গাড়ি। মেরুন রংটা ঝকঝক করছে। গাড়ির দরজা খুলে ললিত বলল, উঠে আয়—

হতচকিত আবীর গাড়িতে বসে বলল, কবে কিনলি ? বলিস নি তো !

—কিনলে বলতাম।

—তবে ?

—ট্রায়ালে নিয়েছি। পছন্দ হলে কিনব।

—ধ্যাৎ, তাই আবার হয় নাকি ! কাকে টুপি পরাচ্ছিস ?

—অয়-অয়—জান্তি পার না।

—ঠিক করে বল। নইলে নেমে যাব—

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ললিত বলে, তুই সব সময় এত সিরিয়াস হয়ে যাস কেন ? আমার এক বন্ধুর গাড়ি, ধার নিয়েছি। পছন্দ হলে সত্যি কিনে ফেলব। অবশ্য এক্ষুনি নয়। একসঙ্গে অত ইনভেস্টমেন্ট করতে পারব না।

ওর কণ্ঠস্বরের চাপা বেদনা বুঝতে পারে আবীর। ললিতের বাবা রিটায়ার করেছেন। সঞ্চিত অর্থে ছোট বাড়ি করেছেন ঢাকুরিয়ায়। বাকি অর্থ খরচ করেছেন ছেলের ভবিষ্যতের জন্য। এখন মা-বাবা ভাইবোন-সহ সংসারের দায়িত্ব ললিতের উপরই। এজন্য যত পারে ফ্লাইট করে। নাইট স্টপের ফ্লাইট কখনো ছাড়ে না, কেননা এই ফ্লাইটে গেলে অ্যালাউন্স বেশি পাওয়া যায়। প্রতি ফ্লাইটের জন্য অ্যালাউন্স তো আছেই। ও নিজেই বলে, উড়লেই টাকা / বসে থাকলে ফাঁকা।

একাডেমি অব ফাইন আর্টসের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ললিত বলল, তুই বোস একটু। আমি আসছি।

ঠিক চার মিনিটের মধ্যে ললিত ফিরে এলো একাডেমির ভেতর থেকে। সঙ্গে একটি মেয়ে। আবীর দরজা খুলে নেমে দাঁড়ায়।

ললিত মেয়েটিকে বলে, এই হচ্ছে ক্যাপ্টেন আবীর দাশগুপ্ত—মাই বেস্ট অ্যাণ্ড ওয়ার্স্ট ফ্রেণ্ড। আর বীরু, ইয়ে মেরা কাতিল জিনিয়া বক্সি।

—কাতিল ?—আবীরের মুখ থেকে শব্দটি অসতর্ক বিহ্বলতায় ঝরে পড়ে।

—ইয়েস কাতিল—কিলার ! মাইরি, একেবারে খুন করে ফেলেছে আমাকে।

এবার শব্দ করে হেসে ওঠে আবীর—ফাঁদে পড়েছিস তাহলে ! কনগ্র্যাচুলেশনস ! —বলে ললিতের পিঠ চাপড়ায়।

জিনিয়া মুখ টিপে হাসছিল। কোনমতে নমস্কার জানিয়ে বলল, আপনার কথা এত শুনেছি ওর কাছে—

আবীর জরিপ করার চোখে জিনিয়ার দিকে তাকায়। বছর কুড়ি বয়েস হবে বোধ হয়। গায়ের রং ম্লান জ্যোৎস্নার মতন। খুব লম্বা নয়—বাঙালি হিসেবে বেঁটেও বলা যাবে না। হলুদ-সবুজ শাড়িতে ভালো মানিয়েছে। গলার স্বর নরম। ললিতের পছন্দ ভালোই।

সেদিন গঙ্গার ধারের রেস্টুরেন্টে বসে কফি খেতে খেতে আবীর বুঝেছিল, জিনিয়া সর্বস্ব-নিবেদিতা হয়ে আছে ললিতের জন্য। নারী প্রজাতির সঙ্গে ওর কোন পরিচয় নেই।

ললিত বলল, শোন, আগামী মাসে বিয়ে করছি।

—বাঃ দারুণ !

—তুই তো দারুণ বলে খালাস। এদিকে আমার যে কি যাচ্ছে—বাঙালি বিয়ের এত ঝামেলা—

—তাহলে না করলেই পারিস। আবীর হাসে।

—না করলেই পারিস। —ভ্যাংচিয়ে ললিত বলে, শালা—দেব একখানা—ইয়াকির ছলে কিল মারার ভঙ্গি করে ললিত।

এরপর জিনিয়ার সঙ্গে বিয়ের আসরেই দেখা হয় আবীরের। বিয়ের পর বেশ কয়েকবারই আড্ডা দিয়েছে ওদের সঙ্গে। ললিতের ফিরতে দেরি হলে, ফ্লাইট কোথাও আটকে গেলে জিনিয়া প্রথমেই ফোন করত আবীরকে। কিভাবে যে মানুষের উপর বিশ্বাস ও নির্ভরতাবোধের উদ্ভব হয় তার কোন আগাম নির্দেশ থাকে না, ফর্মুলাও নেই।

সেই ২৮ শে জুন এয়ারপোর্টে পৌঁছুলে ফ্লাইট ম্যানেজার শুভেন্দু কর বলে, আপনি ৩৭৬ নিয়ে যাবেন?

—হ্যাঁ।

—এই শেষ মুহূর্তে আবার সব ক্লিয়ারেন্স নিতে হবে। এনিওয়ে—৩৪১ লেট হবে।

—কেন?

—ওয়েদার। ঢাকা সহ পুরো নর্থ ইস্টেই আবহাওয়া খুব খারাপ।

—আমার ফ্লাইট রেডি?

—হ্যাঁ। অ্যানাউন্স করতে বলছি।

আবীর রেস্টরুমের দিকে এগিয়ে যায়। ললিত বেরিয়ে আসে। দুজনে করমর্দন করে। আবীর বলে, ওয়েদার নিয়েছিস?

—মনে হয় কিছুক্ষণ পর ঠিক হয়ে যাবে। বলেছি পরের ওয়েদার নিতে।

আধ-ঘণ্টা পর পর ওয়েদার রিপোর্ট নেওয়া হয়। আপাতত ললিতকে অপেক্ষা করতেই হবে।

—ভাবলাম তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। শালার ওয়েদার কিচাইন করে ছেড়ে দিলে। —ললিত বলে।

আবীর বলল, সাবধানে যাস। আমি চলি। টেক কেয়ার।

—ওকে বয়! —আবীরের পিঠ চাপড়ে ললিত বলে, ডোণ্ট ওয়্যারি। হ্যাপি ল্যাণ্ডিং। থ্যাঙ্কস—

—থ্যাঙ্কস কি জন্য?

—আমার ফ্লাইটটা করছিস বলে।

—ওঃ, কাম অন ললিত—

সিঁড়ি বেয়ে নেমে প্লেনের দিকে যেতে যেতে আবীর ভাবে ললিত এখনো ছেলেমানুষ রয়ে গেছে। কিন্তু চমৎকার মানুষ। সুন্দর বন্ধু। তখন অতি দূর কল্পনাতেও ভাবা সম্ভব ছিল না যে প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে শেষ বাক্যবিনিময় করে আক্ষরিক ভাবেই এক জীবনের দূরত্বে চলে যাচ্ছে।

বম্বেতে নিরুপদ্রবে নেমেছিল আবীর। একই প্লেন নিয়ে ওকে গোয়া গিয়ে ফিরতে হবে। ও ককপিটেই বসে থাকে। কো-পাইলট ঘোড়পাড়ে ক্লিয়ারেন্স

আনতে গেছে। ফ্লাইট-প্ল্যানও নিয়ে আসবে। কেবিন পরিষ্কার করে সাফাই-ওয়ালারা চলে গেছে। ক্যাটারিং খাবার-দাবার যা দিয়েছে মিলিয়ে নিচ্ছে এয়ারহোস্টেস। জানালা দিয়ে আবীর দেখে যাত্রীরা উঠছে।

একটু পরে ঘোড়পাড়ে এসে বলল, একটা খুব খারাপ খবর আছে—৩৪২-এর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

আঁতকে ওঠে আবীর—কি বলছ তুমি!

—ডেসপ্যাচ থেকে তাই বললো।

—তুমি ঠিক শুনেছ ৩৪২?

—হ্যাঁ।

—ট্রাই ক্যালকাটা ডেসপ্যাচ।

কোম্পানি চ্যানেলে কলকাতা ডেসপ্যাচ ধরার চেষ্টা করে ঘোড়পাড়ে। কিছুতেই কলকাতার সাড়া পায় না। আবীর বম্বে ডেসপ্যাচকে জিজ্ঞেস করে—

—৩৪২-এর কি খবর?

ডেসপ্যাচ জানায় আগরতলা থেকে ছেড়ে ৩৪২ দুর্যোগের জন্য গৌহাটি ডাইভারট করে। তারপর আর খবর পাওয়া যাচ্ছে না। সারা অঞ্চল জুড়ে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি চলছে।

—দ্যাখ তো গৌহাটি টাওয়ার ধরতে পার কিনা।

ট্রিমশীট নিয়ে আসা ছেলেটি বলল, অল অন বোর্ড স্যার।

—গুড।—ট্রিমশীট সই করে প্রয়োজনীয় তথ্য নোট করে আবীর। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাগজ আগেই সই করা হয়ে গেছে।

ঘোড়পাড়ে বলল—গৌহাটি পাওয়া যাচ্ছে না।

—ছেড়ে দাও। স্টার্ট চেক—

বম্বে থেকে গোয়া গিয়ে ফিরেও এলো আবীর। সব কিছু করে গেল রোবটের মতন। বারবার চেষ্টা করেছে কলকাতা বা গৌহাটির সঙ্গে যোগাযোগের। পারেনি। যত সময় গেছে ততই উদ্বেগ অস্থিরতা মাথার মধ্যে ঝড়ের সমুদ্রের মতই দাপাচ্ছিল। বারবার ভাবছিল, ভাইভার্ট যখন করেছে চিন্তায় কিছু নেই। কিন্তু খবর নেই কেন? রেডিও ফেল করেছে! মুম্বাই ডেসপ্যাচও কোন খবর দিচ্ছে না।

শেষ যাত্রীর পিছু পিছু দ্রুত নেমে আবীর সোজা চলে আসে ডেসপ্যাচে। ফ্লাইট ম্যানেজার যোশী ওকে দেখেই এগিয়ে আসে। ওর হাতে টেলেক্স মেসেজ। বলল, এই মাত্র এটা এলো—৩৪২ ক্র্যাশ করেছে—গারো হিলসে। অনুমান করা হচ্ছে ক্রু বা যাত্রী কেউই বেঁচে নেই। রেসকিউ টিম রওনা হয়ে গেছে।

দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে আবীর। ওকে ঘিরে থাকে ডেসপ্যাচের কর্মী,

অন্যান্য পাইলট। কারো মুখে কোন শব্দ জোগায় না।

কতক্ষণ জানা নেই—তবে বেশ অনেকক্ষণ পর স্মৃতির ওপার থেকে যেন আবীর শুনতে পায়—ক্যাপ্টেন দাশগুপ্ত—ক্যাপ্টেন দাশগুপ্ত—

মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে চোখ খোলে আবীর। ভাষাহারা দুই চোখে রক্তজবার রং। ঘরের কারুকেই যেন চিনতে পারে না।

—ক্যাপ্টেন দাশগুপ্ত! যোশী আবার ডাকে।

ঘোর-লাগা চোখে যোশীর দিকে তাকিয়ে আচমকা চিৎকার করে ওঠে আবীর—হি ইজ ডেড—ডু য়ু আণ্ডারস্ট্যাণ্ড হি ইজ ডেড—ক্যাপ্টেন দাশগুপ্ত ইজ ডেড। ইট ওয়াজ মাই ফ্লাইট—মাই ফ্লাইট—অ্যাণ্ড ইট হ্যাজ ক্র্যাশড। নো—ললিত—নো—য়ু কণ্টি ডু দিস টু মি—নো—য়ু কাণ্ট—

সবাই জোর করে ধরে আবীরকে রেস্টরুমে নিয়ে যায়। সোফায় বসিয়ে জল দেয়। ও স্পর্শও করে না।

—চা খাবেন?

মাথা নাড়ে আবীর।

—কলকাতার ফ্লাইট কটায়?

—পাঁচটায়।

—আমার জন্য সীটের ব্যবস্থা করুন।

—স্যার, কাল আপনার ৩৭৫ নিয়ে যাবার কথা—

—টু হেল উইথ ইয়োর ৩৭৫! আই মাস্ট গো ব্যাক টু-ডে।

যোশী বলল, ঠিক আছে। এখন আপনি হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম করুন, তারপর—

—না। হোটেলে যাব না আমি।

হঠাৎ উঠে ডেসপ্যাচে চলে আসে আবীর।

—গেট মি ক্যালকাটা প্লিজ—অন ফোন—

তখন এখনকার মতন সহজলভ্য এস. টি. ডি ছিল না। ট্রাঙ্ক বা ডিমাণ্ড কল করতে হত।

—আমরা চেষ্টা করছি স্যার।

—আপনাদের ও. এম. কোথায়?

—হিয়ার আই অ্যাম—বলতে বলতে ঘরে ঢোকেন অপারেশনস ম্যানেজার ক্যাপ্টেন দেশপাণ্ডে।

আবীর এগিয়ে গিয়ে দেশপাণ্ডের দু'হাত ধরে বলল, স্যার—৩৪২ ওয়াজ মাই ফ্লাইট—মাই ফ্লাইট—ইট হ্যাজ ক্র্যাশড—আই মাস্ট গো—

প্রবীণ দেশপাণ্ডে জীবনে অনেক ক্র্যাশড দেখেছেন। আবীরের মানসিক

অবস্থা বুঝতে পারলেন সহজেই। বললেন, যাবে বইকি, নিশ্চয় যাবে। এখন এসো আমার সঙ্গে।

সস্নেহে ওকে জড়িয়ে ধরে চেম্বারের দিকে যেতে যেতে বললেন, আমি ব্যাঙ্গালোর থেকে এলাম। ওখানেই খবরটা পেয়েছি। স্যাড—ভেরি স্যাড—ললিত এমন ভুল করল—ইট ওয়াজ শিয়ার ম্যাডনেস। ঐ ওয়েদারে ওর টেক অফ করাই উচিত হয়নি।

চেম্বারে বসিয়ে চা খাওয়ান। নিজের নানা অভিজ্ঞতার কথা বলেন দেশপাণ্ডে। বিভিন্ন দুর্ঘটনার কথাও। সব দুর্ঘটনাই ঘটে মানুষের হঠকারী গোঁয়াতুর্মির জন্য। এরোপ্লেন খেলনা নয়। একজন পাইলটকে সব সময় মনে রাখতে হয় সকল যাত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব তার। শুধু যাত্রী কেন তার সহযোগী ক্রু-মেম্বারদের কথাও মনে রাখতে হবে।

—কলকাতায় কথা বলবে?

—ক্যালকাটা ডেসপ্যাচ পেলে—

ক্যাপ্টেন দেশপাণ্ডে টেলিফোন তুলে নির্দেশ দিলেন। মিনিট দশেকের মধ্যেই লাইন পাওয়া গেল।

শুভেন্দু আছে—আমি ক্যাপ্তেন দাশগুপ্ত বলছি বম্বে থেকে।

—ধরুন, দিচ্ছি।

পরমুহূর্তেই শুভেন্দুর গলা শোনা গেল—

—হ্যালো, শুভেন্দু কর বলছি—

—শুভেন্দু, ক্যাপ্তেন দাশগুপ্ত বলছি। ৩৪২—

—খুবই দুঃখের কথা। ৩৪২ গারো হিলসে ক্র্যাশ করেছে। মেডিক্যাল ইউনিট ও অন্যান্য লোকজন নিয়ে উইন টপ অফিসিয়ালস একটা স্পেশাল ফ্লাইট যাচ্ছে গৌহাটিতে। এদিকে যা-যা করার ব্যবস্থা হচ্ছে, সকলকে খবর দেওয়া হয়েছে। আপনার বাড়ি থেকে ফোন করেছিল। বলে দিয়েছি আপনি বম্বেতে আছেন।

—শোন, ললিতের বাড়িতে—

—লোকজন গেছে। অন্য ক্রুদের বাড়িতেও পাঠিয়েছি। চিন্তা করবেন না—শোনার আগেই লাইনটা কেটে গেল।

—হ্যালো—হ্যালো—কয়েকবার চেঁচিয়ে রিসিভার রেখে দেয় আবীর।

—ভালো লাগছে একটু?—দেশপাণ্ডে বলেন।

স্বীকার করতে বাধ্য আবীর যে শুভেন্দুর সঙ্গে কথা বলে নিজেকে হাল্কা লাগছে। বাড়িতে খবর দিয়েছে কাজেই মা-বাবা অহেতুক চিন্তিত হবেন না। হঠাৎ মনে হলো, সংযুক্তা কি করছে! ও তো জানত আবীর ৩৪২ নিয়ে আগরতলা

যাবে। ও কি খবর পাবে বা খোঁজ করবে? আজ ওর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল না। তবু যদি খবর পেয়ে খোঁজ করে—বাড়িতে ফোন করলে সঠিক খবরটা পাবে। কিন্তু করবে কি?

দেশপাণ্ডে বললেন, তুমি চলে যেতে চাইছিলে, গিয়ে কি করবে? রাতে পৌঁছে কিছুই করতে পারবে না। যা ঘটে গেছে তা মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। দিস ইজ পার্ট অব লাইফ। জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, রাত-দিন সব হাত ধরাধরি করে চলে। অ্যাকসিডেন্ট আছে বলেই সেফটি শব্দটির এত কদর। এসব কিছুই এড়ানো যায় না। তুমি চলে গেলে হয়ত কালকের ৩৭৫ কেনসেল করতে হবে। আমার কাছে অতিরিক্ত কমাণ্ডার নেই। শ'খানেক মানুষের দুর্ভোগ হবে। তুমি তাই চাও? তুমি গেলে আমি বাধা দেব না। কিন্তু আমি তোমাকে অনুরোধ করব হোটেলে যাও, বিশ্রাম কর। ভাবো। যেতে চাইলে চলে এসো। আমি আছি অফিসে।

হোটেলে এসে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে আবীর। মাথার মধ্যে কেবল বাজতে থাকে ললিতের শেষ কথা—থ্যাঙ্কু—থ্যাঙ্কু ফর হোয়াট? লেটিং হিম ডাই? বারবার মনে হয় যদি ফ্লাইট না-বদলাতো তবে এই দুর্ঘটনা ঘটত না। আবীর ৩৪২ নিয়ে গেলে কখনোই অমন বিরুদ্ধ-আবহাওয়ায় টেকঅফ করত না। এটা অবশ্য এখনকার ভাবনার কথা। ককপিটে বসে কি করত সেটা অনুমানসাপেক্ষ। আর যদি এমনই ঘটত তবে এখানে তো আবীরের বদলে ললিতের থাকার কথা। ললিত কি নিজের জীবনটা আবীরকে দিয়ে গেল? সবাই আঙুল তুলে বলবে, এই লোকটা ললিতের বদলে বেঁচে আছে। কি ভাগ্য ফ্লাইট বদলের কথা ললিত বলেছিল, আবীর বলেনি। যদি আবীর বলত তাহলে নিশ্চয় এমন গুঞ্জন শোনা যেত যে ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতনই সুকৌশলে আবীর ফ্লাইট বদলে নিয়েছিল। এখনই কি বলবে না? বলতে পারে। কজন আর জানে বা জানবে ললিত বদলটা চেয়েছিল। সবাই বরং জানবে শেষ সময়ে ফ্লাইট বদলে আবীর দাশগুপ্ত চলে গেছে বম্বে।

ললিতের বাড়ির লোকেরা কি বলবে? ওর বাবা-মা? জিনিয়া—জিনিয়া কি ভাববে?

আর ভাবতে পারে না আবীর। ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় আছড়ে ফেলে টানটান শুয়ে থাকে। আর কী আশ্চর্য, কখন যে ঘুম এসে পরিত্রাণ করে টেরও পায় না।

ছয়

লেককাবের নম্র মায়াবী আলোয় বসে পুরানো কথাগুলো রোমন্থন করতে গিয়ে মনে হচ্ছিল যেন জন্মান্তরের কথা ভাবছে। অন্য কারুর জীবনের কথা—আবীর দাশগুপ্ত সে নয়। অথচ রক্ত-মাংস-মজ্জায় সে আবীর দাশগুপ্তই। জৈবিক অবয়বটাই কি মানুষের পরিচয়? তার মনন, অনুভব, জীবনযাপন, দর্শন-আকুতি, বিশ্বাস বা বিশ্বাসহীনতার কি কোন গুরুত্ব নেই। নিজের সঙ্গে একা হলেই এইসব বিষয় মাথার মধ্যে ঝনঝন করে ক্রমাগত।

সেদিন হোটেলে ঘুম ভেঙেছিল টেলিফোনের শব্দে। অপারেটর বলে, কল ফ্রম ক্যালকাটা!

—হ্যালো—ক্যাপ্টেন দাশগুপ্ত হিয়ার—

—ওঃ! আবীর! আমি সংযুক্তা বলছি—ওর গলায় স্বস্তি ও আর্তনাদ একই সঙ্গে ধ্বনিত হয়।

—সংযুক্তা—কি হয়েছে—অমন করছ কেন!

—আবীর সারাদিন আমার যে কেমন কেটেছে—দুপুরে রেডিওতে খবরটা শোনার পর থেকে—তুমি তো আমাকে আগরতলা যাবার কথা বলেছিলে—উঃ, পরে অনেক চেষ্টায় জানা গেল তুমি বম্বে গেছ—আমি পারছিলাম না—আই ওয়াজ ডেসপারেট টু হিয়ার ইয়োর ভয়েস—

—ওকে! এখন শান্ত হও। আমি ঠিক আছি। কাল সকালে ফিরছি।

—আমি এয়ারপোর্টে আসব।

—না, এসো না। এয়ারপোর্টে কি অবস্থা হবে বলতে পারছি না। এখন আমাদের অনেক কিছু করতে হবে।

—তুমি তাহলে দেখা করবে—

—দেখা তো নিশ্চয় করব—

—না কালই—

—শোন, অবুঝ হয়ো না। কালই পারব কিনা বলতে পারছি না। যদি না-পারি ফোন করব। প্রথম সুযোগেই দেখা করব তোমার সঙ্গে। প্লিজ বোঝার চেষ্টা কর—এ্যাণ্ড জাস্ট থিঙ্ক ললিত যদি ফ্লাইট না বদলাতো—

—না। ওকথা বলো না। আমি শুনতে চাই না।

—ওকে, ওকে। চিন্তা করো না। আয়্যাম অলরাইট।

টেলিফোন রেখে ঘড়ির দিকে তাকায়। সাতটা বাজে। অন্তত ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়েছে। স্নান করার সময়ই স্থির করেছিল, ক্যাপ্টেন দেশপাণ্ডের পরামর্শ ই মেনে নেবে। সত্যিই তো আজ গিয়ে ওর কিছু করার নেই। শুধু শুধু কালকের ৩৭৫-এর জন্য সংকট তৈরি করে লাভ কি! সকাল ৯টার মধ্যেই কলকাতা পৌঁছে যাবে।

বিছানা ছেড়ে বাথরুমে যায় আবীর। পেচ্ছাপ সেরে বেসিনে ঝুঁকে চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চমকে ওঠে। দর্পণে এ কার মুখ? এ তো তার চেনামুখ নয়। কপালে গালে ও রেখাগুলো তো ছিল না। হনু দুটো অত উঁচু হলো কি করে? চোখের দৃষ্টিও অচেনা। বারবার গাল ঘষে আবীর নিজেকে দেখে। ওর তো এখন গারো পাহাড়ের কোথাও পড়ে থাকার কথা। এখানে এই হোটেলের বাথরুমে এ কোন আবীর? মাথার মধ্যে আবার কুয়াশা জমতে থাকে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়ায়। দশ তলার উপর থেকে আলোময় বম্বাই শহরের অভ্যস্ত স্বভাব-চঞ্চলতা অবিকল। কোথাও ঝড়ের শব্দ নেই। কালো মেঘের ডানা ঝাপটানি নেই। গারো পাহাড় এখান থেকে কতদূর?

আচমকা আবীরের বুক ভেঙে দলা-পাকানো কান্না বেরিয়ে আসে। বিছানায় বসে বালিশে মুখ গুঁজে হুহু কাঁদতে থাকে। অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা কান্নার ঢেউয়ে ওর শরীর কাঁপে। শরীর—নাকি ওর অস্তিত্ব?

কিছুক্ষণ পর টেলিফোন বাজে।

—হ্যালো—

—স্যার ঘোড়পাড়ে বলছি।

—বলো—

—ক্যাপ্টেন কাপুর, ক্যাপ্টেন হাবিব আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমরা কি আসব?

আবীর ভাবল বারণ করে। কিন্তু দিল্লির ক্যাপ্টেন কাপুর আর মাদ্রাজের ক্যাপ্টেন হাবিব খুবই সিনিয়র—ওদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কও খুব ভালো। সুতরাং ওঁদের ক্ষুণ্ণ করাটা যুক্তিযুক্ত হবে না।

—আমাকে দু' মিনিট সময় দাও।

টেলিফোন রেখে আবার বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে জল দেয়। ঘরে ফিরে পোশাক বদলায়। তখনই দরজায় শব্দ হয়। দরজা খুলে সম্ভ্রম রেখে দাঁড়ায় আবীর।

ক্যাপ্টেন কাপুর ওকে জড়িয়ে ধরে ভেতরে এগিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে ক্যাপ্টেন হাবিব। ঘোড়পাড়ে দরজা বন্ধ করে একধারে দাঁড়িয়ে থাকে।

—আমরা সবাই গভীরভাবে দুঃখিত, আবীর। বুঝি হোয়াট য়ু আর ফিলিং। ললিত ওয়াজ আ গুড ফ্লায়ার। কিভাবে যে—কাপুর বলেন।

হাবিব বলেন, সব খোদাতাল্লার ইচ্ছা। আমাদের পাইলটদের জীবনই এরকম। একটা একটা ফ্লাইট করে বাঁচি। কেউ জানে না পরের ফ্লাইটে কি হবে। তবে আল্লা মেহেরবান। ভেঙে পড়ো না আবীর। চিয়ার আপ।

আরো দু'চারটে খুচরো কথার পর কাপুর বললেন, চলো—আমার ঘরে চলো সবাই।

* * *

বেরুবার আগেই অর্ডার দিয়ে গিয়েছিলেন কাপুর। সবাই এসে দেখে ঘরে পানভোজনের সুবন্দোবস্ত। সবার হাতে গ্লাস তুলে দিয়ে কাপুর বললেন—চিয়ার্স টু আওয়ার টুমরো।

মদের একটা গুণ—মাথার মধ্যে জমা কুয়াশা বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। বদলে হাল্কা হাওয়ার সঞ্চার ঘটে।

দুটো হুইস্কি আর সামান্য খাবার খেয়ে চলে আসার সময় আবীর বলে—আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করব না ক্যাপ্টেন কাপুর। শুধু বলব আমি খুব কৃতজ্ঞ।

—ডোণ্ট বি সিলি, আবীর। যাও ভালো করে ঘুমাও। তোমার তো ভোরেই ফ্লাইট। উইশ য়ু অল দ্য বেস্ট।

প্রাত্যহিকের রুটিন মেনে যথাসময়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছায় আবীর। ঝকঝকে সকালের শরীরে কোথাও কোন ম্লানিমা নেই। গারো পাহাড়ের শোকাগ্নি রয়েছে শুধু খবরের কাগজের পাতায়। গাড়িতে বসে খবরের কাগজের রিপোর্টগুলো পড়তে পড়তে হাসিও পাচ্ছিল আবীরের। বিভিন্ন যাত্রীদের পরিবার পরিজন নিয়ে করুণ মানবিক 'স্টোরি' লেখা হয়েছে। কিন্তু পাইলট যেন ভিলেন, যেন তাদের কোন পরিবার পরিজন নেই। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে নিজস্ব অজ্ঞানতা আড়াল করার জন্য অর্বাচীন অবাস্তব বিবরণ লিখেছে।

ডেসপ্যাচে এসে আবীর জানতে চায় উদ্ধারকার্যের খবর। জানা গেল দুর্যোগের জন্য দুর্গম স্পটে এখনো পৌঁছানো যায়নি। তবে দলবল নিয়ে এয়ার-লাইনস কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসন রওনা হয়ে গেছে। একটু বেলা বাড়লে হয়ত খবর পাওয়া যাবে।

নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই কলকাতা পৌঁছে যায় আবীর। পার্কিং বেতে প্লেন দাঁড় করিয়ে দেখে বেশ কিছু পাইলট, কেবিন ক্রু, শুভেন্দুসহ আরো দুজন ডেসপ্যাচার দাঁড়িয়ে রয়েছে। যাত্রীরা না-নামা পর্যন্ত ক্যাপ্টেন নামতে পারে না। শেষ যাত্রীটির পর আবীর নেমে আসতেই ওকে ঘিরে ধরে সবাই। বুকের মধ্যে আবেগের বিস্ফোরণোন্মুখ উচ্ছ্বাস দমন করে ও ধীরে ধীরে হেঁটে যায়। হোস্টেসদের কারো কারো চোখে জল।

ভারী আবহকে হাল্কা করার জন্য আবীর বলল, কি ব্যাপার—তোমরা এমন করছ কেন—

—আমরা সবাই আপনার জন্য চিন্তা করছিলাম। —চিফ হোস্টেস রেবেকা বললেন।

—হ্যাঁ ক্যাপ্টেন, সবাই ভীষণ ওয়ারিড ছিল আপনার জন্য। —শুভেন্দু জানায়।

—বাট হোয়াই ? আমার তো কিছু হয়নি।

—আমরা সবাই জানি ক্যাপ্টেন ললিত আপনার কত কাছের ছিলেন—তার পর—

—জানি কি বলবে—দ্যাট জোকার হ্যাড দ্য লাস্ট লাফ !

শুভেন্দু জানায় রেসকিউ টিম সকালবেলা স্পটে পৌঁছেছে। ভাঙা পোড়া প্লেনের ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে লাশ খোঁজা হচ্ছে। বিকেল নাগাদ কিছু উদ্ধার হলেও হতে পারে। ওখানে এখনো বৃষ্টি হচ্ছে প্রবল।

রেস্টরুমে বসে আবীর বলল, শুভেন্দু, টেল মি, কিভাবে ঘটল ব্যাপারটা। কাগজের রিপোর্ট পড়েছি আমি। ও গারো হিলসের উপর কেন যাবে !

শুভেন্দু বলল, ওঁর তো এখান থেকেই যাওয়া উচিত ছিল না। আমি বারবার বলেছি, এই ওয়েদারে যাবেন না। আমাকে বললেন, তা হয় না। আমি নিজে বদলে ফ্লাইট নিয়েছি। না গেলে আবীর তো রাগবেই, কর্তৃপক্ষও ভালো চোখে দেখবে না। বলতেই পারে না-যাবার জন্যই ফ্লাইট বদলেছি।

—রাবিশ !

—তারপর ওয়েদার একটু ভালো হতেই চলে গেলেন। আগরতলা নামার পর ওয়েদার আবার খারাপ হয়। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ফ্লাইট প্ল্যান বদলাতে বলেন। কোম্পানি চ্যানেলে বলেন গৌহাটির উপর দিয়ে রুট করে দিতে। আমি বলি ঐ রুটেও আবহাওয়া খারাপ—যাবেন না। বরং আপনি আগরতলাতেই থেকে যান। বললেন, তাহলে আর ফ্লাইট বদলালাম কেন ! আমি গৌহাটি রুট ধরে আসছি। তবু আমি বললাম, চেষ্টা করবেন না। শুনলেন না। টুক অফ ফ্রম আগরতলা। প্রথমে ঢাকার উপর দিয়ে আসার চেষ্টা করেন, না-পেরে মেসেজ দিলেন ডাইভারটিং টু গৌহাটি। গৌহাটি টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগও করেছিলেন। তারপরই হি গট লস্ট। গৌহাটি জানায় ৩৪১-র কোন খবর নেই। আগরতলা, শিলচর, তেজপুর, যোড়হাট কেউই কোন খবর দিতে পারে না। তখন বেলা প্রায় ১১টা, সাড়ে বারোটা নাগাদ থ্রু আমি খবর পাওয়া যায় গারো হিলসে একটা প্লেন ভেঙে পড়েছে। ওখানকার আর্মি ক্যাম্প থেকে খবরটা আসে। একজন জওয়ান আমাদের লোগোটা চিনতে পেরেছিল।

শুভেন্দু যোগ করে—নিছক সুইসাইডাল ব্যাপার।

—হ্যাঁ। কিন্তু কোন কারণ ছাড়াই। কাল কলকাতায় ওর কি আকর্ষণ ছিল আমি জানি না। বুঝতেও পারছি না।

—ক্যাপ্টেন দাশগুপ্ত, খুব সন্তর্পণে শুভেন্দু বলে, আপনার এখন প্ল্যান কি ?

—তার আগে বলো বডি আনার কি ব্যবস্থা হয়েছে ?

'বডি' শব্দটি মুখ থেকে ঝরার সঙ্গে সঙ্গে মগজে ঝাঁকুনি লাগে আবীরের। কাল

যে বন্ধু ছিল আজ সে 'বডি' মাত্র। অর্থাৎ নোবডি। একজন জীবন্ত মানুষ কিভাবে শুধু বডি হয়ে যায় ? এই রূপান্তরের সময়সীমা কতটুকু ? এসব নির্ধারণের কলাকার কে ?

শুভেন্দু বলল, ক্রু সহ গোটা কুড়ি বডি কলকাতা আসবে। আর সবাই যাবে আগরতলা। একটা জাহাজ গৌহাটিতে আজ রাখা হবে। যাতে কালই সব আগরতলা পাঠানো যায়। কলকাতার গুলো রেগুলার ফ্লাইটে আসবে। আজ আসার কোন আশা নেই।

মন দিয়ে শুভেন্দুর কথা শুনছিল। একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, আপাতত আমাকে রোস্টারের বাইরে রাখতে বলো। কি করব পরে জানাব তোমাকে। এখন একটা গাড়ি দিতে বলো—ঢাকুরিয়া হয়ে আলিপুর।

—আপনি এখনি ঢাকুরিয়া যাবেন ?

শুভেন্দুর গলার স্বর আবীরকে সন্ধিগ্ধ করে। ও বলে—কি হয়েছে বলতো।

ইতস্তত করে শুভেন্দু জানায়—আমাদের লোকজনের চরিত্র তো জানেনই। জল ঘেঁটে কাদা করতে পছন্দ করে। কাল অনেকেই গেছিল ঢাকুরিয়ায়। কেউ কেউ আলগা কথাবার্তা বলে বেশি বেশি দরদ দেখাচ্ছিল।

—কি বলছিল, আমি জেনেশুনে ইচ্ছে করে ফ্লাইট বদলেছি ?

—একেবারে সরাসরি ওরকম না-বললেও মানেটা অমনই দাঁড়িয়ে যায়। কাজেই ক্যাপ্টেন মিত্রর বাড়ির লোকেরা আপনার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবেন—আমি আপনাকে একটু জানিয়ে রাখলাম।

—থ্যাঙ্কু, শুভেন্দু। এসব আমাকে শুনতে হতে পারে তা আমি ভেবেছি। সত্যটা তুমি জানো। আমি বা ললিত কেউই গণৎকার নই। আর হ্যাঁ, আজ থেকে আমি কোনদিন কারুর সঙ্গে কোন ফ্লাইট বদলাব না। কেউ যেন আমাকে এবিষয়ে অনুরোধ না-করে। সবাইকে বলে দিও।

রেস্টরুম ছেড়ে আবীর সোজা চলে আসে পরিবহন বিভাগে। সেখানে ড্রাইভার ওর ফ্লাইটব্যাগ ও সুটকেস নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ড্রাইভারকে বলল, কণ্ট্রোলে বলুন আপনার দেরি হবে। আমি আগে ঢাকুরিয়া যাব।

বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ আবীর ঢাকুরিয়ায় ললিতের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। এ-বাড়িতে বহুবার এসেছে। ললিতের বাবা সুখময় মিত্র একটু ভারিক্কি চালের মানুষ। রিটায়ারমেন্টের এক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন ডেপুটি সেক্রেটারি হয়েছিলেন। সৎ অফিসারের খ্যাতি রাখার জন্য টাকা-পয়সা বানাতে পারেননি। সততার ও কর্মনিষ্ঠার অভিমানটুকু দ্বিতীয় ত্বকের মতন শরীরে এঁটে নিয়েছেন। তেষট্টি বছরেও ঋজু পদক্ষেপে চলাফেরা করেন। অন্যদিন দূর থেকেও ওঁর গলা শোনা যেত। আজ করুণ নিস্তব্ধতা বাড়িটাকে

ঘিরে রয়েছে।

আবীর ধীর পায়ে দরজায় এসে দাঁড়ায়। রাস্তার ওপরেই বাড়ি। দরজা খুললেই একটা ঘর—যাকে বসার ঘর বলে। সে-ঘরের দু'দিকে দুটো দরজা। বাঁদিকে গেলে ললিতের ঘর। ডানদিকে বারান্দা ও আরো দুটি ঘর। অন্যদিন বাইরের দরজা বন্ধ থাকে। আজ খোলা। য়ুনিফর্ম পরা ও দীর্ঘশরীর দেখেই ছুটে আসে ললিতের ভাই প্রমিত। সোফায় ললিতের মাকে ঘিরে দু'জন মহিলা আর ললিতের বোন। আরেকটা সোফায় সুখময় তিনজন বয়স্ক মানুষের সঙ্গে নীচু গলায় কথা বলছেন।

প্রমিতকে বুকে জড়িয়ে ঘরে ঢোকে আবীর। ওকে দেখেই চিৎকার করে ওঠেন ললিতের মা—ও বাবা আবীর, তোমার বন্ধুকে কোথায় রেখে এলে—

পমিও মার সঙ্গে যোগ দেয়। প্রমিত আবীরের বুকের মধ্যে ফোঁপায়।

সুখময় বলেন, বসো আবীর। বুড়ো চোখে আর জল নেই। ওদের আছে, কাঁদুক। সারাজীবনই তো এখন কাঁদতে হবে। তা আবীর, ললিতের কোন খোঁজ পেলে?

—না। এখনো পাওয়া যায়নি। সম্ভবত বিকেলের মধ্যে কোন একটা খবর পাওয়া যাবে।

—তাহলে তুমি এখন—

—আমি একটু আগে বম্বে থেকে ফিরেছি। সোজা এয়ারপোর্ট থেকে আসছি।

—ওঃ তুমি বম্বে গিয়েছিলে—ললিতেরই যাবার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে কি যে হলো—

একজন মহিলা চাপা গলায় বলেন যাতে আবীর শুনতে পায়—এঁরই জায়গায় ললিত গেছিল?

আবীর প্রমিতকে জিজ্ঞেস করে—তোমার বৌদি কোথায়—

—ওঘরে। কাল থেকে একবারও ওঠেনি, খায়নি।

—স্বামী খেয়েও পেট ভরেনি—আরো খেতে হবে? যাও দেখে এসো—পমি নিয়ে যা—

পমির পিছু পিছু প্রমিতসহ এগিয়ে যায় আবীর। ঘরজোড়া ডবল বেড, একধারে ড্রেসিং টেবিল, আলমারি। অন্যধারে একটা ছোট টেবিল। দুটো চেয়ার। এঘরেও বার কয়েক আড্ডা দিয়েছে।

ডবলবেডে একা শুয়ে আছে জিনিয়া। কাছে গিয়ে মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। চোখের কোণে আধ-শুকনো জলের দাগ। চোখের কোলে কালো রেখা। গালের ভাঁজে, ঠোঁটের আধারে তীব্র যন্ত্রণার আভাস। হাতে এখনো শাঁখা,

সিঁথিতে সিঁদুরের স্মৃতি। আবীরের বেপথ অনুভবে আলোড়ন ওঠে। ওর বিষণ্ণ করুণ মুখটা মগজের অনেক গভীরে আঁকা হয়ে যায়।

—ওঁর বাড়ির কেউ আসেনি?

—কে আসবে! বৌদির মা নেই। বাবা প্রায় অথর্ব—বড় মেয়ের কাছে থাকেন, তো তারা নাকি বাইরে কোথায় গেছেন। বৌদির কোন ভাই বা দাদাও নেই।—পমি বিশদ তথ্য জোগায়।

এইসব তথ্য আবীরকে আরো বিচলিত করে। মনে মনে ললিতকে বলে, ইডিয়ট, এই সহায়সম্বলহীন মেয়েটাকে কোথায় রেখে গেলি। স্বার্থগৃধ্নু পৃথিবী ওকে ছিঁড়ে খাবে। এ পৃথিবী যে কী নিষ্ঠুর!

—বৌদিকে ডাকব?—প্রমিত বলে।

—না। জাগলে বলো আমি এসেছিলাম। পরে আবার আসব।

হঠাৎ প্রমিত বলল, আবীরদা গতকাল খবরের কাগজের অনেক লোক এসেছিল। অনেক ছবি তুলেছে বৌদির, মার—আমারও।

মাথা নাড়ে আবীর।—কাগজে দেখেছি।

—ছাপেনা শুধু বৌদি আর মার ছবি ছেপেছে। আমার ছবি ছাপেই নি।

ওর পিঠে হাত রেখে আবীর বলল, সেকেণ্ডারিতে ভালো রেজাল্ট করো, তখন দেখবে সব কাগজই বড় করে ছবি ছাপবে তোমার।

ও ঘর থেকে বেরিয়ে বসার ঘরে আসতেই ললিতের মা বললেন—কথা হলো?

—না। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন বোধহয়—

—তা আর ঘুমাবে না—আমাদের সর্বনাশ তো করা হয়ে গেছে—বলেই আরেক দফা কান্না শুরু করেন।

আবীর সুখময়কে বলে, এখন আমি আসি। পরে আসব। কখন কি হয় জানাব। আর, একটা অনুরোধ করছি, কিছু মনে করবেন না—খুব বিনীতস্বরে জানায়—আমি কিছু করতে পারলে অসংকোচে বলবেন—যে-কোন দরকারে যখন খুশি আমাকে ডাকবেন।

সুখময় বলেন, তুমি বললে খুব ভালো লাগল। তবে না-বললেও ডাকতাম। তুমি ছাড়া আর কারুকে চিনি না। এখন তো তুমিই ভরসা।

বাড়ি ফিরে বাবাকে দেখে অবাক হয় আবীর—তুমি কোর্টে যাওনি।

জবাব দেন মা—কাল খবর পেয়েই কোর্ট থেকে চলে আসেন। আর খালি ঘর-বার করছেন। তোর এত দেরি হলো? ফ্লাইট তো অনেকক্ষণ এসেছে।

—ঢাকুরিয়া গিয়েছিলাম—ললিতের বাড়িতে।

বাবা বললেন, ভালো করেছ। চেনা-জানা থাকলে আমিও যেতাম। কাল

ললিতের ফোনটা আমিই ধরেছিলাম। পরে সবই শুনেছি। কপালের লিখন—ভাগ্যের মার—কে খণ্ডাবে! তুমি নিয়মিত ওঁদের খোঁজখবর করো। কিছু দরকার-টরকার হলে বলো।

রাত দশটা নাগাদ খবর এলো কিছু বডি সনাক্ত করে গেছে। তার মধ্যে ক্যাপ্টেন ললিত মিত্র, ক্যাপ্টেন কৃষ্ণাণ আর দুজন এয়ারহোস্টেস আছে। বাকি দু'জন এয়ারহোস্টেসের বডি তখনো পাওয়া যায়নি। যেগুলো পাওয়া গেছে তার মধ্যে থেকে কলকাতার বডিগুলো সকালের ফ্লাইটে পাঠানো হবে।

আবীর ডেসপ্যাচে ফোন করে—সকালের গৌহাটি—৩০১ কে করছে?

—ওটা তো আপনারই ছিল—কিন্তু আপনি তো বলে গেছেন অফ দ্য রোস্টার—

—ঠিক আছে ওটা আমিই অপারেট করব।

ললিতের জন্য এটুকু করতে ও দায়বদ্ধ। ওর শেষ উড়ানের নাবিক হবে আবীর।

তখনি ঢাকুরিয়ায় ফোন করে। পাঁচ-ছটা ঘণ্টার পর ফোন ধরেন সুখময়। হ্যালো—

—আমি আবীর বলছি। এতরাতে ফোন করছি কারণ ওকে পাওয়া গেছে—মানে আইডেন্টিফায়েড হয়েছে। কাল সকালের ফ্লাইটে গৌহাটি থেকে আনা হবে। ও-ফ্লাইট আমিই আনব। আপনারা কি কেউ গৌহাটি যাবেন?

—ধরো একটু।

সম্ভবত উপস্থিত লোকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন, আইডেন্টিফায়েড যখন হয়েই গেছে, তোমরা যখন নিয়ে আসছ, তখন আর গিয়ে কি হবে!

—তাহলে আপনারা এয়ারপোর্টে আসুন। আমি আপনাদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করছি।

—ঠিক আছে। তাই করো।

—ফ্লাইট নামবে ৮-৪৫এ। গাড়ি আপনাদের কাছে সাড়ে সাতটায় পৌঁছে যাবে।

ঠিক সময়েই গৌহাটিতে নামে। পার্ক করে ককপিট থেকেই দেখে ট্রলির ওপর সারি সারি কফিন। শুদ্ধ শাদা কাপড়ে ঢাকা।

আবীর নামতেই সামনে আসে অপারেশনস অফিসার বরুণ নন্দী আর এয়ার-পোর্ট ম্যানেজার কিশোর পাল। নন্দী ওকে নিয়ে যায় ললিতের কফিনের কাছে। সব কফিনের ওপরেই নাম লেখা।

কিশোর বলল, খুলিয়ে দেব, দেখবেন?

আবীর বলল—কণ্ডিশন কি?

—না দেখাই ভালো। —নন্দী বলল, আমি দেখেছি, চেনা যায়না প্রায়। মুখটা পুড়ে গেছে। কৃষ্ণাণের তো মাথা একেবারে থেঁতলে গেছে।

—চিনলে কি করে?

—ক্যাপ্টেন মিত্রর হাতের আংটি আর পকেটের পার্স। ইউনিফর্মের অ্যাফুলেট। মাথা ছাড়া কৃষ্ণাণের আর সবই ইনট্যাক্ট প্রায়। কেবল একটা হাত পুড়ে গেছে। মেয়ে দুটোও আধপোড়া। শাড়ীর টুকরো দেখে চেনা গেছে হোস্টেস, তবে কোনটা কার বডি বলা মুশকিল। তিনদিনের বাসি বডি বুঝতেই পারছেন—

—কাগজপত্র সব ঠিক আছে তো?

কিশোর বলল, হ্যাঁ, স্যার। আমি একজন স্টাফ পাঠাচ্ছি—সে সব কাগজপত্র, ডেথ সার্টিফিকেট, পুলিশ রিপোর্ট, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আর ছোটখাট ব্যক্তিগত জিনিস যা উদ্ধার করা গেছে, নিয়ে যাচ্ছে।

—ঠিক আছে। লোড করে দাও। অ্যানাউন্স ডিপারচার ইফ য়ু আর রেডি।

ককপিটে উঠে আসে আবীর। ওদের সামনে সাবলীল কথা বললেও ওর মধ্যে এক অনুচ্চারিত কান্না ওর যমজ অনুভব আঁচড়ে যাচ্ছে। ললিতের কফিনের সামনে দাঁড়িয়ে ইচ্ছে করছিল জড়িয়ে ধরে ঝাঁকুনি দেয়—যদি ও জেগে ওঠে। আবেগকে নিগড়ে দমিত রাখাই সভ্য মানুষের কৃষ্টির পরিচয়। স্তব্ধতাই শান্তি খোঁজার শক্তি জোগাবে।

কলকাতা এয়ারপোর্টে আলাদা জায়গা করা হয়েছে কফিন হস্তান্তরের জন্য। বাইরে গাড়ির ব্যবস্থা আছে। কয়েকটা কফিন দিল্লি, বম্বে, মাদ্রাজ যাবে। সেগুলো একধারে রেখে বাকি কফিন যাঁরা নিতে এসেছেন তাঁদের কাগজপত্রসহ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে এয়ারলাইনসের লোকও যাচ্ছে প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য।

ললিতের পরিবারকে ঘিরে ছিল কয়েকজন পাইলট, এয়ারহোস্টেস, পার্সার এবং অন্য কর্মচারী। আবীর গিয়ে দাঁড়াতেই সুখময় এগিয়ে আসেন। তাঁর পাশেই শুভেন্দু।

হাত তুলে শুভেন্দুকে ডাকে আবীর। শুভেন্দু বলে, সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। কিন্তু ওঁরা বলছেন কফিন ঢাকুরিয়া নিয়ে যাবেন। ক্যাপ্টেন মিত্রর মা নাছোড়—কিছুতেই বুঝছেন না। বলছেন শেষ দেখার জন্য সবাই ঢাকুরিয়াতে অপেক্ষা করছে।

এমনই অনুমান করছিল আবীর। এতে আর কিছু নাহলেও জিনিয়ার ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করা যাবে। নিষ্ঠুরতম বাক্যবাণে জর্জরিত হবে ও।

—চলো। আগে এঁদের কফিনের কাছে নিয়ে আসুক।

শুভেন্দু নির্দেশ দিয়ে আবীরের সঙ্গে কফিনের দিকে এগোয়। আবীর সুখময়ের হাত ধরে যেতে যেতে বলে, আপনারা কফিন ঢাকুরিয়া নিতে চান?

—হ্যাঁ—সবাই—আত্মীয়স্বজন অপেক্ষা করছে।

—আপনি প্রবীণ মানুষ, নিশ্চয় বুঝবেন। বার্নট বডি, তিনদিনের বাসি—আমার মতে সোজা শ্মশানে নেওয়াই ঠিক হবে। যাঁরা দেখতে চান বরং গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি—প্রমিত বা অন্য কেউ ওঁদের শ্মশানে নিয়ে আসুক।

ইতিমধ্যে কফিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে জিনিয়া ও ললিতের মা। মার পাশে পমি। কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে আবীর লক্ষ্য করে জিনিয়া অনেক সংযত, সংহত।

শুভেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে আবীর জিনিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। —শুভেন্দু, আমাদের ফ্লাইট ম্যানেজার তোমাকে কিছু বলবে।

একই কথা যা আবীরকে বলেছিল এবং আবীর সুখময়কে বলেছিল, জিনিয়াকে বলে। —আপনি বলুন মিসেস মিত্র, কি করব আমরা। আমাদের ঢাকুরিয়া নিয়ে যেতে কোন অসুবিধে নেই, তবে তার ফলাফল কি হবে—

জিনিয়া আবীরের দিকে চোখ তুলে ম্লান গলায় বলে—আপনি কি বলেন?

—আমার মতে সোজা কেওড়াতলা যাওয়াই ঠিক। তোমার শ্বশুরমশাইকে বলেওছি আমি।

—তাহলে তাই করুন।

ললিতের মা-বাবা এই কথোপকথন শুনছিলেন। জিনিয়ার কথা শুনে ললিতের মা প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে গেলেন। আবীর স্পষ্ট দেখে সুখময় ওঁর পিঠে খোঁচা দিচ্ছেন।

সুখময় বললেন, সেটাই ঠিক হবে। আবীর, বাবা—ঢাকুরিয়ায় একটা দুটো গাড়ি যদি পাঠাবার ব্যবস্থা করো—

শুভেন্দু বলল, একজন কেউ সঙ্গে আসুন। আমি ব্যবস্থা করছি।

সাত

পরদিন নটা নাগাদ সুখময়ের ফোন এলো।

—তুমি কি বিকেলের দিকে একবার আসবে? তোমার কি ফ্লাইট আজ?

—আমি কয়েকদিন ফ্লাইট করব না বলেছি। সারাদিনই বাড়িতে আছি। বিকেলে চলে আসব।

গতকাল বাড়ি ফিরেছে সন্ধ্যা পেরিয়ে। সারাদিন যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাকে ভয়ঙ্কর বললেও কিছুই বলা হয় না। মানুষের বিবেকবর্জিত নিষ্ঠুরতা ও হানাদারী অর্থ-লোলুপতা শ্মশানের মতন এমন অব্যর্থভাবে আর কোথাও প্রকাশ

হয় না বোধহয়। ঘাটবাবু থেকে পুরোহিত থেকে ডোম—সকলেই যেন নখর শ্বাপদ। এয়ারলাইনসের শব যেন কুলি ফলার—মহোৎসবের বস্তু। রেট সব ডবল। মৃত্যু নিয়েও যে-দেশে কালো-কারবারি চলে, সে-দেশে দুর্নীতিদমন উটের কুঁজ ছাঁটাইয়ের মতন। বিরক্তি ও বিবামিষায় একধারে সরে আসে আবীর।

একটু পরে প্রমিত এসে ডাকে—আসুন—

ভেবেছিল দেখবে না, দগ্ধ গলিত দেহ দেখে বন্ধুর প্রিয় মুখস্মৃতি দংশাবে না। পরে মনে হলো, শেষ স্যালুট তো ওর প্রাপ্য।

কফিন থেকে বের করে বাঁশের মাচার উপর শুইয়ে রেখেছে ললিত মিত্রর ভগ্নাবশেষ। সামনে দাঁড়িয়ে এক পলক দেখেই চোখ বন্ধ করে আবীর। কাকে দেখছে ও? ঐ শব তো আবীরেরই। পোড়ামুখে ললিতের প্রাণময় হাসির কোন চিহ্ন নেই। ও মুখ ললিতের হতে পারে না। ঐ দগ্ধাবশেষ আবীরকেই মানা তো। এভাবে আবীর আর নিজেকে দেখতে পারে না।

অজস্র সুগন্ধী ঢেলেও বাসি লাশের দুর্গন্ধ সহনশীল করা যাচ্ছিল না। সবাই কাপড়ে, রুমালে মুখ ঢেকে দেখছিল, করণীয় কাজ করছিল। শুধু জিনিয়া যেন নিঃসঙ্গ, ভ্রূক্ষেপহীন, ললিতকে সাজিয়ে দিচ্ছিল অনন্তপথের পথিক হবার উপযুক্ত। কপালে চন্দনের ফোঁটার সঙ্গে মিশছিল ওর অশ্রুবিন্দু। যেন বা শান্তিবারি।

একজন পাঁশুটে বয়স্ক মানুষ আবীরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলেন—দুটো কথা বলব?

আবীর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালে বলেন, আমি ললিতের পিসেমশাই। রেলে ছিলাম। দু'বছর হলো রিটায়ার করেছি। যাদবপুরে থাকি। আমি নৃপেন পাল।

—আচ্ছা। নমস্কার। বলুন কি বলবেন।

—না—মানে, যে গেছে সে তো আর ফিরবে না। একমাত্র রোজগেরে ছেলে—কত আশা করে, সর্বস্ব খরচ করে পাইলট বানিয়েছিল—তা ভগবানের যেমন ইচ্ছে—কিন্তু সংসার তো থেমে থাকবে না। ডিউটিতে মারা গেল, এয়ারলাইনস নিশ্চয় ক্ষতিপূরণ দেবে—কি রকম পাবে মনে হয়?

আবীরের প্রথম প্রতিক্রিয়া হয়, ধাঁ করে একটা চড় মারে। পরমুহূর্তেই মনে হলো, উনি তো একা নন। ক'জনকে মারবে!

—বউমার কি একটা চাকরি-টাকরি হতে পারে? প্রমিত তো এখনো স্কুলে। পমির তো পড়াশোনা হলোই না।

উৎকট সঙ্গ এড়াবার জন্য আবীর বলল, ঠিক জানি না। খোঁজ নিয়ে বলব।

ঠারেঠোরে আরো অনেকেই একই প্রসঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে। আবীর মুখগুলো দেখে আর ভাবে ললিতের দেহাবশেষ এখনো ভস্ম হয়নি। তার আগেই ক্ষতিপূরণের অঙ্ক নিয়ে গবেষণা। একজনের মন্তব্য এখনো কানে বাজে

—অ্যাকসিডেন্টে মরতে হলে প্লেন ক্র্যাশে মরাই ভালো। অনেক টাকা পাওয়া যায়—শুনেছি দু'-তিন লাখ।

মৃত্যুরও যে ভালো মন্দ আছে জানা ছিল না। যেমন জানা ছিল না, এমন মৃত্যুও কারো কাছে আশীর্বাদ হতে পারে!

ললিতের আত্মীয়স্বজন কেউ কেউ অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল আবীরের দিকে। সকলেই জেনে গেছে ফ্লাইট বদলের কথা। কাজেই আবীর জেনেশুনে ফ্লাইট বদলেছিল এটা মনে করা যেতেই পারে। করেছিল বলেই দিব্যি ইউনিফর্ম পরে কর্তব্যবোধের প্যারেড করছে। আসলে তো ললিতের জায়গায় আবীরেরই শুয়ে থাকার কথা। যায় তো গরীবেরই। বড়লোকের কিছু হয় না।

আবীর নিজেই আপন অন্তঃপুরে দগ্ধ হচ্ছে, কিন্তু অন্যদের মুখে এসব শুনে মাথার মধ্যে যেন আগুন জলে। যেহেতু একটিও বেভুল কথার প্রতিক্রিয়া ভয়ানক হতে পারে, ও নিজেকে শক্ত রাখে। আক্রমণের লক্ষ্য থেকে যথাসম্ভব দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে।

সুখময় কেন ডেকেছেন অনুমান করতে পারে। তাঁর সব জিজ্ঞাসার সম্ভাব্য জবাবের প্রস্তুতি নিয়ে আবীর সন্ধে ছটা নাগাদ হাজির হয় ঢাকুরিয়ায়। বাড়িতে স্বাভাবিক শোকের আবহ। বসার ঘরে সুখময়কে ঘিরে ওঁরই বয়েসী চারজন মানুষ। তাঁদের মধ্যে ললিতের পিসেমশাইকে চিনতে পারল।

সুখময় অন্যদের উদ্দেশে বললেন, এ ললিতের ব্যাচমেট আবীর। ওই সব করেছে। বসো আবীর।

তিনজন মানুষ এমন চোখে ওর দিকে তাকায় যার ভাষা বলে, ও কেন বেঁচে আছে!

একজন বলেন, ভগবানের মার সুখময়—নইলে অমন টগবগে ছেলেটা—উঃ!

পিসেমশাই নৃপেন পাল বললেন—ওসব কথা থাক। কপালের লিখন কে খণ্ডাবে! কিন্তু যারা আছে তাদের কি হবে, কি করে চলবে—ভরসা ছিল তো ঐ ছেলে—

আরেকজন বলেন—এয়ারলাইনস শুনেছি ভালোই ক্ষতিপূরণ দেবে।

নৃপেন পাল ত্বরিত বলে ওঠেন—শোনা তো কতই যায়। কি দেয় আবার দেখ। এখনো মেয়ের বিয়ে বাকি, ছেলের লেখাপড়া। এতগুলো মানুষের চলা কি কম কথা! সুখময়ের তো বাড়িটা ছাড়া আর কিছুই নেই।

আবীর এই অরুচিকর আলোচনা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বলল, আমি কি একবার জিনিয়ার সঙ্গে দেখা করতে পারি?

সুখময় বললেন—নিশ্চয়—নিশ্চয় যাবে। ওর অবস্থা তো বুঝতেই পারছ—তবু তোমাদের দেখলে যদি একটু—পমি—পমি—

ডাক শুনে পমি এলে বললেন, বৌমাকে বল আবীর এসেছে। তুমি যাও ওর সঙ্গে।

পমির পিছু পিছু ঘরে ঢুকে দেখে খাটের ওপর হাঁটুতে মাথা রেখে পাথর-প্রতিমা হয়ে বসে আছে জিনিয়া। পরনে কালো পাড়ের শাদা থান। হাতে একটা করে চুড়ি। আবীরের মনে আছে আগের দিনও ওর হাতে আরো চুড়ি, বালা, নোয়া দেখেছে।

—আপনি! —আবীরকে দেখে জিনিয়া উচ্চারণ করে। ওর ম্লান চোখে ঈষৎ দীপ্তি খেলে যায়। —বসুন।

চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসে আবীর। পমি বসে জিনিয়ার পাশে। ঘরের মধ্যে বুকচাপা নীরবতা।

—আমি কি করব বলুন তো—আমার যে কেউ নেই—হঠাৎই কান্নাভাঙা গলায় বলে ওঠে জিনিয়া।

—কে বলে কেউ নেই!—পমিকে দেখিয়ে আবীর বলে, এরা সবাই আছে, আমি আছি। শোন জিনিয়া—তোমার ভেতরে কি হচ্ছে আমি বুঝি। নিজেকে শক্ত কর। তোমার এখন অনেক দায়িত্ব। এঁরা সবাই তোমার ভরসায় আছে।

জিনিয়া বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আয়্যাম ট্যোটালি লস্ট।

—না, জিনিয়া, না। এভাবে ভেবো না। তোমার সারাজীবন রয়েছে। আমার নিজেকে এত অপরাধী মনে হয়। সেদিন—

—আপনার তো কোন দোষ নেই। ও নিজেই আমার সামনে আপনাকে ফোন করে। আমি বারণও করেছিলাম।

—পমি, এক গ্লাস জল খাওয়াবে?—

পমি উঠে যেতেই নীচুগলায় আবীর বলে, তোমার পরীক্ষার এই শুরু। নানা চাপ আসবে। না-দেখে, না-জেনে কিছু সই করো না। দরকার বুঝলেই আমাকে ফোন করবে। আমি আছি জিনিয়া—আয়্যাম উইথ যু—এই বিশ্বাসটা রেখো।

পায়ের শব্দ পেয়ে আবীর বলে, প্রমিতের পড়াশোনা, পমির বিয়ে—এসবই এখন তোমাকে দেখতে হবে। ভার থাকলে তো ভেঙে পড়া চলবে না। শোক-দুঃখ জীবনে থাকবেই, তবু জীবনকে এগিয়ে যেতে হবেই।

পমির হাত থেকে জলের গ্লাস নিয়ে এক ঢোঁকে শেষ করে আবীর। —আমি আজ চলি। পরে আবার আসব। যে-কোন দরকারে ফোন করো। আমি না-থাকলে মেসেজ রেখো।

বসার ঘরে এসে দেখে অন্যরা চলে গেছে। বসে আছেন সুখময় আর নৃপেন পাল।

—বসো, আবীর, বসো। —সুখময় বলেন, বউমা কিছু বলল ?

সোফায় বসে আবীর বলে, না। কি আর বলবে! আমি ঐ একটু চিয়ার-আপ করার চেষ্টা করলাম।

—ভালো করেছ। তুমি মাঝে মাঝে এসো। ওরও ভালো লাগবে। আমাদেরও একটু ভরসা হয়।

নৃপেন পাল বললেন, তা বাবা—টাকাপয়সার ব্যাপারগুলো—খোঁজ নিয়েছিলে নাকি—

—হ্যাঁ। দেখুন আমাদের তো চাকরি বেশিদিন হয়নি। গ্রাচুইটি পাওয়া যাবে না। পি. এফ-এর সামান্য কিছু টাকা—হাজার কয়েক হবে। আর ইনসিওরেন্সের দু'লাখ। তবে একটা ব্যাপার আছে—

—কি ? কি ? —সুখময়-নৃপেন দুজনেই ব্যগ্র।

—সব কিছুরই নমিনি ললিতের স্ত্রী।

—এ্যাঁ! —সুখময়।

—সে কি! —নৃপেন।

এই সময় ললিতের মা ট্রেতে তিনকাপ চা নিয়ে ঘরে ঢোকেন। কাপ নামিয়ে ঘরের আবহাওয়া দেখে বললেন—কি হয়েছে ?

—হবার আর আছে কি! ললিত সবই বউমার নামে লিখে দিয়ে গেছে। —নৃপেন।

—ওমা! বুড়ো মা-বাপ কিচ্ছু পাবে না!

—ঠিকই করেছে ললিত। —সুখময় বলেন—বুড়ো মা-বাবা আর কদ্দিন! বউমার সারাজীবন পড়ে আছে।

—সে তো ঠিকই। বউমা তো আর আমাদের পর নয়। ও তো ঘরেরই মেয়ে।—ললিতের মা রেণুবালা।

নৃপেন বলেন, যার নামেই হোক টাকা তো টাকাই। ঘরে বসে খেলে আর কদিন। বউমার কি একটা চাকরি—

আবীর বলে, হতে পারে। কিন্তু যে-সাজে ওকে রেখেছেন সেভাবে তো চাকরি করা যাবে না। থান না-পরালেই পারতেন। আজকাল এসব চলে না। আশা করি ওকে নিরামিষ খেতে বাধ্য করবেন না। ঘরের মেয়েকে মেয়ের মতনই রাখুন।

রেণুবালা বলে ওঠেন—আমরা কিছু বলিনি। ও নিজেই—শত হোক হিন্দু-ঘরের বউ। তবে আমি বারণ করে দেব। ঠিকই তো—চাকরি করতে গেলে ওসব কি মানা যায়!

ঢাকুরিয়া থেকে ফিরে স্নান করে বেরুবার পর মনে এলো, বম্বে থেকে এসে

পর্যন্ত সংযুক্তার সঙ্গে কোন যোগাযোগ করা হয়নি। ও নিশ্চয় ক্ষেপে আছে। আসলে গত কদিন ওর কথা লহমার জন্যও মাথায় আসেনি। এবং আশ্চর্য, তার জন্য নিজের মধ্যে কোন দুঃখবোধ বা অনুশোচনার লেশও টের পেল না আবীর।

বারান্দায় এসে ডায়াল করে। সংযুক্তাই ফোন ধরে। আবীরের গলা পেয়ে বলে—হঠাৎ মনে পড়ল যে!

—গত কয়েকদিন যা গেল, একদম ফুরসৎ পাইনি।

—ফ্লাই করছ ?

—কয়েকদিন অফ দিচ্ছি। এদিকে প্রচুর ছোটাছুটি করতে হচ্ছে।

—তার মানে আমার জন্য তোমার সময় নেই!

—তা কেন! লেটস মিট টুমরো।

—টুমরো—না, আমি পারব না।

—ডে আফটার ?

—সকালে ফোন করো। এখনই বলতে পারছি না। তুমি আছ কেমন ?

—অ্যাবসলুটলি ফাইন!

—আমার এক্ষুনি তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। ইস্ এত রাত করে ফোন করলে কেন! ক-ত-দি-ন তোমাকে দেখিনি! কাল ছাই এমন সব কাজ রয়েছে—পরশু ফোন করো।

ফোনটা করা হয় না। পরদিন অফিস থেকে জানায় আবীরের মেডিকেল চেকআপ ও লাইসেন্স নবীকরণের সময় হয়েছে। সেদিন বিকেলের ফ্লাইটে দিল্লি যেতে হলো। ঐসব মিটিয়ে ফিরল চারদিন পর। ফিরে ফোন করে জানল সংযুক্তা কি একটা সেমিনারে যোগ দেবার জন্য মাদ্রাজ গেছে। চার-পাঁচ দিন পর ফিরবে। ততদিনে আবীর আবার উড়তে শুরু করবে।

অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি একদিন জিনিয়া ফোন করে, আপনি একবার আসতে পারবেন! আমার খুব দরকার—

এর মধ্যেও কয়েকবার গেছে আবীর। প্রাপ্য টাকা মোটামুটি পেয়ে গেছে। টাকা এবং তার বিনিয়োগ নিয়ে মতবিরোধও হয়েছে। আবীর পরামর্শ দিয়েছে, সুখময়ের সঙ্গে কথা বলেই যেন বিনিয়োগ করে। আর প্রতিমাসে ললিত যত টাকা দিত, তার আনুপাতিক টাকা যেন জিনিয়া ওঁদের দেয়। সুখময় চেয়েছিলেন টাকাগুলো নিজের হাতে রাখতে, বিনিয়োগও নিজের নামে করতে চেয়েছিলেন। জিনিয়া রাজি হয়নি। আবীরও সম্মতি দেয়নি। সব টাকা পেয়ে গেলে জিনিয়ার অবস্থা কি হবে সে-বিষয়ে নিশ্চিত ছিল না কোন। এখন টাকাই একমাত্র শক্তি জিনিয়ার। নিরাপত্তার উৎসও।

আবীরের জীবন ফিরে গেছে দিনানুদৈনিকতায়। ফ্লাই করে। মাঝেমাঝে

দেখা হয় সংযুক্তার সঙ্গে। ও বিদেশে যাবার কথা ভাবছে। আবীর একদিন ওকে যা বলবে ভেবেছিল, বলা হয় না। মধ্যরাতে হঠাৎ হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় ওর—ললিতের শেষ উচ্চারণ—থ্যাঙ্কু শব্দটা মাথার মধ্যে ঝনঝন বাজে। ওর দগ্ধ মুখ ভেসে ওঠে, আবীর চিৎকার করে—আমি—আমি—ও তো আমারই মুখ! গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় না। ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে স্তব্ধ বসে রাতের ঘন হওয়া দেখে! কালো থেকে ফর্সা হওয়া দেখে।

সেদিন জিনিয়াকে দেখে ভীষণ অবাক হয় আবীর। মাত্র সপ্তাহ দুয়েক আসেনি। এর মধ্যে এমন চেহারা হয় কি করে! এলোমেলো চুল, চোখের কোলে গাঢ় কালি। মলিন শাড়ি-জামা। ও ঘরে ঢুকতেই জিনিয়া আবীরকে নিজের ঘরে নিয়ে আসে। ও কিছু বলার সুযোগই পায় না।

—আপনি আমাকে বাঁচান। এঁরা আমাকে মেরে ফেলবে। সব টাকা কেড়ে নিতে চাইছে। দু'দিন ধরে খেতে দিচ্ছে না। এই দেখুন কি রকম মেরেছে—বলে সম্ভ্রম বজায় রেখে যতটুকু সম্ভব শাড়ির আঁচল সরিয়ে দেখায়। বাহুতে, ঘাড়ের নিচে, কোমরে কালসিটে পড়ে আছে।

—কারুকে দেখছি না। সব কোথায়?

—প্রমিত আছে। ওই যা একটু আমাকে সাহায্য করে। —বলে গলা তুলে প্রমিতকে ডাকে জিনিয়া।

প্রমিত এসে আবীরকে দেখে কেঁদে ফেলে—তুমি বৌদিকে বাঁচাও আবীরদা—এখানে থাকলে বৌদি বাঁচবে না—মা খালি মারে—খেতে দেয় না—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি ভেবো না। আমি তো আছি প্রমিত। তুমি আছ। কিচ্ছু হবে না বৌদির। তোমার মা-বাবা কোথায়?

—সব মাসীর বাড়ি গেছে।

—তুমি যাও এখন। তোমার বৌদির সঙ্গে একটু কথা বলি।

প্রমিত চলে গেলে জিনিয়া বলল, আমি একা হলে ভাবতাম না—কিন্তু আপনার বন্ধুর স্মৃতি—

—মানে—কি বলছ—

—ঠিকই বুঝেছেন। সেদিন ২৮শে জুন—আমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে বলেছিল—যাতে কনকার্মড হতে পারে—সেজন্যই সকালে আপনাকে—

আঃ! আর পারে না আবীর। এতটা নেওয়া ওরও সাধ্যের বাইরে। থ্যাঙ্কু শব্দটা মাথার মধ্যে জেট ইঞ্জিনের শব্দে গর্জন করে। শ্মশানের ঐ মুখ কিছুতেই ললিতের নয়—ওটা আবীর দাশগুপ্তর। ললিতকে বাঁচতে হবে—বাঁচতেই হবে। নইলে ওর সন্তানকে কে দেখবে! ললিতের সন্তান—সে তো বাঁচবেই। বাঁচতেই হবে।

—আবীরবাবু।—জিনিয়ার স্বরে আর্তি।

যেন কোন গভীর সুপ্তি থেকে জেগে ওঠে আবীর। গাঢ় চোখে জিনিয়াকে দেখে। ওই শরীরের মধ্যেই কোথাও রয়েছে একটুকরো ললিত। ললিত পিতৃত্বের নিশ্চিতি চেয়েছিল।

—আমার ওপর তোমার বিশ্বাস আছে জিনিয়া?

—কি বলছেন! আপনিই তো আমার একমাত্র ভরসা।

—আমি যা বলবো করতে পারবে?

—পারব।

—তাহলে তুমি যা-কিছু টাকা পেয়েছে, যেখানে যা বিনিয়োগ করেছ তার পুরো হিসেব কাল তৈরি রাখবে। আমি কাল বিকেলে আসব। আমার সঙ্গে যাবার জন্য তৈরি থাকবে।

—এখান থেকে চলে যাব!

—যেতেই হবে। কয়েকটা দিন কি তোমার দিদির কাছে থাকতে পারবে?

—পারব বোধহয়।

একবার মনস্থির করলে সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য বেশি সময় নেওয়া আবীরের স্বভাব নয়। এখন তো ওর হাতে সময় খুবই কম।

ঢাকুরিয়া থেকে বাড়ি ফিরেই সংযুক্তাকে ফোন করে—এখন সন্ধে সাতটা—সাতটা পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হিন্দুস্থান হোটেলে চলে এসো! জরুরি দরকার।

আটটা নাগাদ সংযুক্তা পৌঁছুবার আগেই তিনটে হুইস্কি শেষ করে আবীর। সংযুক্তা এলে ওর জন্য ব্লাডি মেরী বলে আরেকটা হুইস্কি চায়।

সংযুক্তা বলল—এত কি জরুরি ব্যাপার?

পানীয় দিয়ে গেলে আবীর বলল—চিয়ার্স টু আওয়ার লাস্ট ড্রিঙ্ক টুগেদার।

—এর মানে কি? হোয়াই?

—তোমাকে আগেই বলেছি পাটনায় যে আবীর দাশগুপ্তকে দেখেছিলে ২৮শে জুন গারো পাহাড়ে সে শেষ হয়ে গেছে। আমি তার মেকি অস্তিত্ব আর বয়ে বেড়াতে পারছি না। আই মাস্ট কুইট।

—কি হয়েছে বলবে তো!

সংক্ষেপে জিনিয়ার কথা জানিয়ে আবীর বলে, ললিতের ঋণ আমাকে শোধ করতেই হবে। জিনিয়াকে বিয়ে করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। ললিতের সন্তানকে বাঁচাতেই হবে।

সংযুক্তার কোন আবেদন বা যুক্তি শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না আবীর। ও দৃঢ়সংকল্প। শুধু বলল—আসলে তো আমরা বন্ধুই ছিলাম। এখনো বন্ধুই থাকব। বন্ধু হিসেবে ভাবলে দেখা পাবে।

অশ্রুমতী সংযুক্তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আবীর সোজা চলে যায় বাবার ঘরে। বাবা বসে বসে নথি দেখছিলেন। ওকে দেখে কিঞ্চিৎ অবাক হয়েই বললেন—কিরে কাল ফ্লাইট নেই? এত রাত পর্যন্ত—

—কাল অফ আমার। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—বোস। বল।

বাবাকে জিনিয়ার সমস্যার কথা জানিয়ে বলে, ওর কেউ নেই। ও কোথায় যাবে?

—কি করতে চাস?

—ওকে বিয়ে করা ছাড়া আমি তো আর কোন রাস্তা দেখছি না। তুমি যদি অনুমতি দাও—

—জিনিয়াকে বলেছ? মাত্র ক'দিন আগে অমন একটা ঘটনা ঘটল। ও কি রাজি হবে এখন?

—রাজি না হয়ে উপায় কি বাবা? আমি তো কোন অসমীচীন কথা বলছি না। ওরই ভালোর জন্য।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে বাবা বলেন, আমি মত দিলাম। তবে তোমার মাকে কথাটা তুমিই বলবে।

মাকে বললে কি প্রতিক্রিয়া হবে জানে আবীর। কিছুতেই মানবেন না। সুতরাং মাকে এখনি বলবে না। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর বলবে।

পরদিন কয়েকজন দালালের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা ফ্ল্যাটের জন্য চেষ্টা শুরু করে। দালালরা আশ্বাস দেয় দিন কয়েকের মধ্যেই ব্যবস্থা করে দেবে।

দুপুরে লালবাজারে পুরানো বন্ধু ডি. সি. (সদর)-এর সঙ্গে দেখা করে ওর সাহায্য চায়। বিকেলে বাবার এক জুনিয়র আইনজীবীকে নিয়ে চলে আসে ঢাকুরিয়া। সেখানে স্থানীয় ওসি ওরই অপেক্ষা করছিলেন।

দরজা খুলে ওদের দেখে অবাক হন সুখময়। ভয়ও পান নিশ্চয়। বলেন—কি ব্যাপার, আবীর! এঁরা।

—ভয়ের কিছু নেই। ওঁদের সামনে আপনাকে কিছু কথা বলব। একবার জিনিয়াকে ডাকুন।

জিনিয়া ভীরু পায়ে ঘরে এলে আবীর বলে, চিন্তা করার কিছু নেই। তুমি কাগজ রেডি করেছ?

—একটা খাতা এগিয়ে দেয় জিনিয়া। পাতা উল্টে আবীর দেখে, সমস্ত টাকার হিসেব নিখুঁত ভাবে লেখা।

—চেক বুক, পাস বুক—

—খামের মধ্যে আছে।

—জিনিয়া, এবার ওসি সাহেব আর ল-ইয়ারকে তোমার পিঠটা একটু দেখাও—একটা দুটো শিল্পচিত্র দেখালেই হবে।

জিনিয়া কোমর ও ঘাড়ের দাগগুলো দেখায়।

আবীর সুখময়কে উদ্দেশ করে বলে—ঘরের অসহায় বউটির ওপর আপনারা যা করেছেন তার জন্য সহজেই আপনাদের জেলে পাঠানো যায়। সেজন্য আমি আসিনি। আপনি ছেলের মৃত্যুর বিনিময়ে টাকা চেয়েছিলেন। পুরো টাকার হিসেব এখানে আছে দেখে নিন। দেখে বলুন হিসেব ঠিক আছে কিনা।

সুখময় বলেন—এসব কি বলছ আবীর—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না—

—ওসি সাহেব, আপনি কি বুঝিয়ে বলবেন?

ওসি বললেন, সুখময়বাবু—আমি কিন্তু আপনাকে এখনি গ্রেপ্তার করতে পারি। তার চেয়ে আবীরবাবু যা বলছেন শুনুন।

রেণুবালা ভেতরে ছিলেন। খবর পেয়ে দৌড়ে এসে বললেন—আবীর—এসব কি বাবা—

—জিনিয়ার গয়নাগুলো ফেরৎ দিয়ে দিন।

—গয়না! গয়না আমার কাছে কোথায়!

—শ্মশান থেকে ফিরে এসেই সব খুলে নিয়েছিলেন—এরই মধ্যে ভুলে গেলেন?

—না না। ভুলিনি, ভুলব কেন। শোকের বাড়ি—তাই—আমি নিয়ে আসছি—বলে ভেতরে যান রেণুবালা।

প্রাথমিক নাটকীয়তার চমক কেটে যাবার পর আবীর শান্তভাবে সুখময়কে বলে, আপনারা এত নীচ নিষ্ঠুর হবেন ভাবিনি। যাইহোক, জিনিয়া যা টাকা পেয়েছিল তার পাই-পয়সা হিসেব আপনাকে বুঝিয়ে দিলাম। আপনি উকিলবাবুর হাতে সই করে সেই কাগজ দিয়েছেন। জিনিয়ার কাছে ললিতের বা আপনাদের প্রাপ্য এক পয়সাও নেই। ঠিক?

—হ্যাঁ। সবই আমাকে দিয়েছ।

—বিনিয়োগের কাগজপত্রও আপনি পেয়েছেন। জিনিয়া আপনার নামে সব লিখে দিয়েছে?

—হ্যাঁ।

—জিনিয়ার কাছে যে গয়না আছে তা সবই ওর বিয়ের। আপনাদের দেওয়া সবকিছু ও ফেরৎ দিয়েছে?

—হ্যাঁ।

রেণুবালাকে বলে আবীর—আপনি বলুন—ওর কাছে আপনাদের কোন

গয়না বা জিনিস আছে ?

—না, বাবা। আমি আশীর্বাদ করে যা দিয়েছিলাম তাও তো ফেরৎ দিয়েছে।

আবীর ডাকে—জিনিয়া বেরিয়ে এসো। অল্প আগে ওকে ভেতরে গিয়ে তৈরি হতে বলেছিল।

স্যুটকেস হাতে জিনিয়া বেরিয়ে আসে।

—স্যুটকেসটা খুলে ওঁদের দেখাও।

রেণুবালাকে বলে, আপনি দেখুন ওর জামা-কাপড় ছাড়া আর কিছু আছে কিনা।

—দেখার দরকার নেই—

—তবু দেখুন। সুখময়বাবু আপনিও দেখুন।

ওসি বললেন—হ্যাঁ, দেখুন। পরে বলবেন না যেন হেন-তেন নিয়ে গেছে।

—না না। কি যে বলেন! আমরা কি তা বলতে পারি!

—জিনিয়া চলো—

সুখময় বলেন, ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

—আপাতত ওর বাবা—দিদির কাছে।

—ও এখানে থাকবে না!—রেণুবালা।

—থাকতে চেয়েছিল। আপনারা দিলেন না। রোজ মার খেয়ে অনাহারে কি কেউ থাকতে পারে! অসুবিধে ঘটাবার জন্য দুঃখিত। কিন্তু এছাড়া উপায় ছিল না।

ঠিক বারো দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রি করে সোজা নতুন ফ্ল্যাটে জিনিয়াকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করে আবীর।

আট

লেক ক্লাব থেকে দশটা নাগাদ ওঠে আবীর। বাড়ি পৌঁছুলে জিনিয়া বলে, এত রাত করলে! আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল।

—চিন্তা কেন। আমি তো ফ্লাইটে যাইনি।

পোশাক বদলে বাথরুমে যাওয়ার উদ্যোগ করে আবীর।

—তোমার মা কেমন আছেন ?

—ভালোই তো দেখলাম।

—ডেকেছিলেন যখন নিশ্চয় কিছু—

—বাজে ব্যাপার। দাদা প্রপার্টি সব কোন প্রমোটারকে দিতে চায়—বা ঐরকম কিছু একটা। আমি বলে দিয়েছি, আমার কোন ইন্টারেস্ট নেই। আমার কিছু চাই না। অ্যাম আই রাইট ?

—যাও স্নান করে এসো। কতটা খেয়েছ আজ ?

—বেশি খাইনি। স্নান করে আসছি। তুমি আমাকে আরেকটা হুইস্কি দাও।

স্নান করতে করতে মনে পড়ে আজ সংযুক্তাকে নিজের সব কথা উজাড় করে বলেছে। ছেলে সৃজনের জীবনে যাতে কোনরকম আঁচ বা আঁচড় না-লাগে, সেজন্য দ্বিতীয় সন্তান চায়নি আবীর। ভুলক্রমেও যদি কোথাও ব্যত্যয় ঘটে—কোন চান্স নিতে চায়নি। আবীর স্বীকার করতে বাধ্য, জিনিয়া দু'চার বার বলেছিল। জোর দিয়েই বলেছিল। কেননা, ও আবীরকে অভিযোগ করার সুযোগ দিতে চায়নি। না, আবীরের কোন অভিজ্ঞতা নেই। সৃজনকে নিজের ঔরসজাত সন্তান হিসেবেই দেখেছে, মানুষ করেছে। বিয়ের সাত মাসের মধ্যে ওর জন্ম নিয়েও কি কম কথা শুনতে হয়েছিল!

সৃজন পড়াশোনায় ভালো ছিল। আই-আই-টি থেকে ভালোভাবেই পাশ করল। আবীরের ইচ্ছে ছিল বিদেশে যাক। আমেরিকা বা ইংল্যাণ্ড। বদলে চাকরি নিয়ে চলে গেল ব্যাঙ্গালোর। কারণ? ওখানকার এক মুসলিম মেয়ের সঙ্গে প্রেম। লতিকাকে ও বিয়ে করবেই।

খবরটা ওকে দেয় জিনিয়া। জিনিয়া শুনে একেবারে ভেঙে পড়ে। একমাত্র ছেলে এমন করবে ও ভাবতেও পারেনি। সারাজীবন তো এই ছেলের স্বপ্ন নিয়েই কাটিয়েছে। এই ছেলের জন্যই আবীরের স্বামীত্ব স্বীকার করেছে।

ছেলেকে বোঝাবার জন্য আবীর বলেছিল—শোন, তুমি বড় হয়েছ। তোমার যা ভালো লাগে করতেই পারো। আমি কোনদিনই তোমার কোন কাজে বাধা দিইনি। তুমি যা পড়তে চেয়েছ, যেখানে যেতে চেয়েছ—বাবা হিসেবে তোমাকে দেবার চেষ্টা করেছি। আমি শুধু বলছি, এতবড় সিদ্ধান্ত নেবার আগে আরেকটু ভাবো। আর কিছু সময় যেতে দাও। মাত্র চব্বিশ তোমার বয়েস। এখনই ব্যস্ত হচ্ছ কেন।

গোঁয়ার্তুমি কি জিনের মধ্যে থাকে! কনজেনিটাল? প্রতিবাদ, মত-বিরোধিতা সহ্য করতে পারত না ললিত। অনেক সময়েই সৃজনের গলায় ললিতের স্বর শুনেছে আবীর। কারুকে কিছু বলেনি। জিনিয়া আপত্তি করলে বলেছে, ছেলেমানুষ—অল্প বয়েসে ছেলেরা এমনই হয়। তোমার তো ভাই ছিল না, তাই দেখনি।

সংযুক্তা বলেছিল—আবীর—আমি তোমাকে কী ভীষণ ভুল বুঝেছিলাম। এখন তোমার জন্য আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

আবীর বলেছিল, আমার কথা থাক। তোমার কি মনে হয় নিজের জীবনটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সম্ভব? সম্ভব আশিসকে ক্ষমা করা?

—আমি কি করব তুমি বলে দাও।

—গো টু মুম্বাই। মুম্বাই যাও। আশিসকে অবাক করে দাও। আরব সাগর থেকে শুরু কর নবীন যাত্রা।

—যদি না পারি—ফেল করি যদি—

—কলকাতা তো রইলই।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে অভ্যস্ত পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বসার ঘরে আসে আবীর। সেন্টার টেবিলে জিনিয়া হুইস্কির বোতল, গ্লাস, জল সাজিয়ে রেখেছে। ওর শব্দ পেয়ে রান্নাঘর থেকে বলল—বরফ আনছি।

সোফায় বসে গ্লাসে হুইস্কি ঢালে আবীর। জিনিয়া বরফের পাত্র রেখে শোবার ঘরে যায়। বরফ, জল মিশিয়ে চুমুক দিয়ে বলে—তুমি কিছু নেবে?

ওর কিছু মানে কোন কোল্ড ড্রিঙ্ক।

—না। —জিনিয়া জবাব দেয়।

টেলিফোন বেজে ওঠে। আবীর হাত বাড়িয়ে রিসিভার তোলার আগেই ভেতরে কর্ডলেস ফোন তোলে জিনিয়া—হ্যালো—

—ও সিজু! কেমন আছিস তুই! চিঠি লিখিসনি কেন? জামাকাপড় সব পেয়েছিস?

আবীর শুনতে শুনতে হাসে। এখন আধ ঘণ্টা নিশ্চিন্ত। কথা শুনলে মনে হবে জিনিয়া যেন কোন বাচ্চা ছেলের সঙ্গে কথা বলছে।

—কি বললি? দিন ঠিক করে ফেলেছিস? আমি জানি না তুই বাবার সঙ্গে কথা বল—

—শুনছ, সিজুর ফোন—কথা বল—জিনিয়া গলা চড়িয়ে বলে।

রিসিভার তুলে আবীর বলে, বলো বেটা কেমন আছ?

—ড্যাডি, আমাদের বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে—

—একটু অপেক্ষা করতে পারছ না—তোমাকে বলেছিলাম—শুধু একটু ভাবতে—

তখনই সেই অব্যর্থ শক্তিশেল ছোঁড়ে সৃজন—সিজু—একমাত্র সন্তান—তুমি কতটা ভেবেছিলে নিজের বিয়ের সময়? আই নো হাউ ফাস্ট য়ু ডিড ইট। কেন করেছিলে তাও জানি। তোমাদের আসতে হয় এসো, আমার জানানো কর্তব্য জানিয়ে দিলাম—

জিনিয়ার—সিজু! চিৎকার শুনে বুঝতে পারে আবীর—ও কর্ডলেসে সবই শুনছিল। —তুই কাকে কি বলছিস—সিজু শুনেছে কিনা জানা নেই কেননা আবীর তখন বাহ্যজ্ঞানহীন। যেন ইন্দ্রিয় লুপ্তি ঘটেছে। ওর হাত থেকে রিসিভারটা পড়ে শব্দ হয়। জিনিয়া ছুটে আসে। আবীরের দু' চোখ বোজা। চোয়াল শক্ত। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ। জিনিয়া ঝুঁকে ওর মাথা বুকে চেপে ধরে—এই—তুমি রাগ

করো না—রাগ করো না গো—কি বলতে কি বলে ফেলেছে—ওর দু'চোখে অঝোর বর্ষা নামে। এ-বর্ষার সাধ্য নেই পূর্ব মুহূর্তের বিস্ফোরণে উৎক্ষিপ্ত আগ্নেয় বলয় নিভিয়ে দেবার।

—এই—এই—তুমি কথা বলছ না কেন—কথা বল—কথা বল—প্লিজ আমার ভয় করছে। —জিনিয়া আরো জোরে আবীরের মাথা বুকে চেপে ধরে।

ধীরে ধীরে চোখ খোলে আবীর। মাথা আলগা করে হাত বাড়িয়ে হুইস্কির গ্লাসটা তুলে নেয়। এক ঢোঁকে গ্লাস খালি করে বলে, আমি ঠিক আছি জিনি, আমি ঠিক আছি। ভয়ের কিছু নেই।

—তুমি সিজুর কথায় কিছু মনে করো না গো, দোহাই—

—কেন এসব বলছ জিনি। ও তো আমারই ছেলে—কি মনে করতে পারি আমি! তুমি ভেবো না কিছু।

আবার হইস্কি ঢালে আবীর।

—আবারো নিচ্ছ তুমি?

—এই লাস্ট। তুমি খাবার লাগাও।

কারুর মুখেই খাবার উঠছিল না। আবীর দু'এক গ্রাস খেয়ে উঠে পড়ল। জিনিয়া নাড়াচাড়া করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। আবীর চলে গেলে ও সব গুছিয়ে রেখে আলো নিভিয়ে শোবার ঘরে চলে এলো।

আবীর ড্রইংরুমের সোফায় বসে সিগারেট ধরিয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়। দু-একবার পায়চারি করে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। চেনা দৃশ্য চোখে ধরা পড়ে না। আচমকা ব্রেক কষার একটা কর্কশ শব্দ কানে আছড়ে পড়ে। মাথার মধ্যে ঝনঝন বাজে থ্যাঙ্কু! থ্যাঙ্কু! চোখের পর্দায় একটা দগ্ধ মুখ—বা মুখের ছবি। কার মুখ? এত অস্পষ্ট কেন! কার মুখ? মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের হাতেই নিজের চুল টানে।

—তোমার কি দেরি হবে?—শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জিনিয়া বলে।

—না, আসছি।

বিছানায় শুয়ে জিনিয়া আবীরের বুকের কাছে ঘন হয়ে আসে। ওর বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে—আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে—সিজু তোমাকে এমন কথা বলল—

জিনিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে আবীর বলে, ভুলে যাও সেসব। ঘুমোও—

—কী করে ভুলবো—বলো—কি করে ভুলবো—

—অপ্রিয় কথা মনে রাখতে নেই। আর ও তো আমাদেরই ছেলে। ছেলেমানুষ এখনো। ওর কথা ধরতে নেই। বিয়ের তারিখটা যেন কবে বলল?

—১৮ই মে।

—ওঃ তবে তো অনেক সময় আছে। তুমি তৈরি হও। ছেলের বউকে যা দিতে চাও—

—কিছু দেব না—যাবও না—

—তা হয় নাকি! যেতে তো হবেই।

—তুমিই প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটা খেয়েছ—কোনদিন একটা জোরে কথা বললে না—

—ঠিক আছে, আমিই দোষী। খুশি তো!

সত্যি, কোনদিন জোর করে ছেলেকে কিছুই বলতে পারেনি আবীর। ওর অনেক অন্যায় অযৌক্তিক আবদারও মেনে নিয়েছে। কেবলি মনে হয়েছে, জোর করলে, বাধা দিলে যদি দুঃখ পায়। যদি জিনি মুহূর্তের জন্যও ললিতের অভাব অনুভব করে!

শুধু ছেলের ওপর কেন, জিনিয়ার ওপরই কি কখনো জোর খাটিয়েছে? ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনদিন মার কাছে আলিপুরে নিয়ে যায়নি। দৈহিক বলপ্রয়োগের তো কথাই ওঠে না। আসলে জোর করার জন্য নিজের মধ্যে যে জোর থাকা প্রয়োজন, সে-জোর আছে কিনা সে বিষয়ে আবীর নিঃসন্দেহ ছিল না।

—আমার নিজেকে একেক সময় খুব স্বার্থপর মনে হয়—জিনিয়া বলে, তোমাকে কিছুই দিতে পারিনি আমি, অথচ দু'হাতে ভরে খালি নিয়েছি—

ওর দুই স্তনে হাত রেখে আবীর বলে—ভুল—এই দ্যাখো, আমার দু'হাত কত ভরা—

—ধ্যাৎ, সত্যি—আই মিন ইট—নিজের জন্য কখনো কিছু করলে না—

—কেন তুমিই তো আছ আমার নিজের।

—কি জানি! আমাকেও নিজের ভাবো কিনা—কিংবা হয়ত ছেলের মতনই নিজের ভাবো।

—কি বললে জিনি! তুমি বলতে পারলে!

জবাব না-দিয়ে ওর বুকে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে জিনিয়া—আমি বলতে চাইনি—বিশ্বাস কর বলতে চাইনি—

কুশপুত্তলিকার অশ্রু থাকে না। আবীর ওর চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলে ঘুমোও—ঘুমোও তুমি—

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় আবীরের। ও সন্তর্পণে উঠে টর্চ জেলে জিনিয়ার মুখের ওপর ঝোঁকে। দু'চোখের ঢাল বেয়ে অশ্রু চিহ্ন নদীখাতের মতন লুটিয়ে রয়েছে। চোখের নিচে কালির পোঁচ গাঢ়। ঠোঁট ফুলিয়ে ঘুমের মধ্যেই ফুঁপিয়ে ওঠে। আবীরের বুকের মধ্যে এক তীব্র আর্তনাদ সাইরেনের মতন বাজে। গলার

কাছে দলা পাকায় বাষ্প। অস্তিত্ব নিংড়ে উঠে আসে চব্বিশ বছর দীর্ঘ বিফলতার ইতিহাস। জিনিয়ার চোখের জলের রেখা মুছে দিতেও পারেনি। পারেনি বদলে দিতে চোখের তলার রং। আজই জানলো, পারেনি বদলে দিতে জিনিয়ার আত্মার বিশ্বাস।

নিরুপায় আবীর বলে—আমি চেষ্টা করেছিলাম জিনি। আমি আন্তরিক-ভাবেই চেষ্টা করেছিলাম—

কুশপুত্তলি তো দহনের জন্যই!

ন্যায়মূর্তি

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

চরিত্রলিপি

পুরুষ

	বয়স	
নীতিশ রায়	৪০-৪৫	
ড্রাইভার, চ্যাটার্জি	৩০-৪০	
গগন মুহুরি	৩৫-৪০	২ জন সঙ্গী
আর্দালি ১		
আর্দালি ২		
গুরুপদ	৫৫-৬০	
পাড়ার ছেলে ১	২৫-৩০	
ঐ ২	ঐ	
ঐ ৩	ঐ	
কালিকা ভট্টাচার্য	৫৫	
ঋষি	৩০-৪০	
সুমন্ত্র	৩৫-৪০	
কনস্টেবল ১	Sc-3	
ঐ ২		
ASI শ্যামসুন্দর	৩৫	
নাসিমুল	৫০	
নেতা	৫০	দুজন সঙ্গী
SI	৪০	
Mr. Mitra ভাড়াটে	৪৫	
শিউপ্রসাদ মোহাঙ্কা	৪০-৬০	
Dr. আব্দুর মান্নান	৩৫	
S.P.	৪০-৪৫	
নওসাদ খান CI	৫৫	চারজন কনস্টেবল
আতাউর মান্নান	৬০-৬৫	জনতা
আবুল মান্নান	৩০	
ভিখারি কিশোর	১৬-১৭	
কুঞ্জ	বিভিন্ন বয়সের যুবক	
আলি	”	
মদন	”	
হেলা	”	
চন্দন মিত্র	২৬-২৭	

ASI	৩৫	কনস্টেবল দুজন
রমাপদ সিংহরায়	৫০-৫৫	
তাঁতি		
সতু		ভৃত্য দুজন
ফণীস্যাকরা		
জজ		আর্দালি
ডিফেন্স লইয়ার		পাহারাদার
পাবলিক প্রসিকিউটর		পুলিশ দুজন
পেশকার		দর্শক ১০ জন
কোর্ট ক্লার্ক		
সাক্ষী প্রভাস প্রামানিক		
ঐ অখিল বিশ্বাস		
পুরোহিত	৫৫-৬০	২য় পুরোহিত
		গগনের দলের ৬-৮ জন, প্রহরীগুণ্ডা ৬-৭ জন
		বর-বরপক্ষ, বিয়েবাড়ির জনতা
এজামুদ্দিন	৪৫	সশস্ত্র পুলিশ ৮-১০ জন
ক্লাবের ব্যক্তি ১		
ঐ ২		
ঐ ৩		
ঐ ৪	৩০	
সাংবাদিক	৩০-৩৫	জনতা (বক্তৃতার)

নারী

অর্চ্চনা রায়	৩৫	
সাবিনা	১৮-২০	
কালিকার স্ত্রী	৫০	
বেলা	৩০	
আতাউরের স্ত্রী	৫৫-৬০	
ঐ পুত্রবধূ	৩২-৩৩	
ঐ মেয়ে	২৮	পরিচারিকা
উষা	২০	
রমাপদর স্ত্রী	৪৫	

রচনাকাল ১৩-২-৯৬ থেকে ২৯-৪-৯৬

প্রথম দৃশ্য

[গ্রামের বাইরে একটা জঙ্গুলে জায়গা। মঞ্চে আলো ফুটলে একজন পুলিশ অফিসার, নীতিশ মুখার্জি, তার সঙ্গে একজন কন্‌স্টেব্‌ল ড্রাইভার, বাম দিক থেকে মঞ্চে ঢুকে আসে।]

নীতিশ। কি হে, ঠিক জায়গায় এসেছি তো?

ড্রাইভার। হ্যাঁ স্যার, এই জায়গাই।

নীতিশ। মানে, তুমি চেনো তো?

ড্রাইভার। অনেক বছর পোস্টিং হয়ে গেল স্যার, অনেকবার এদিকে আসতে হয়েছে। এ গ্রামগুলো বাজে স্যার। সব ফ্যামিলিতে একটা করে ডাকাত পাবেন।

নীতিশ। দ্যাখোতো, ওই গাছটা মনে হচ্ছে না?

ড্রাইভার। আপনি এখানে দাঁড়ান, আমি দেখে আসছি।

[নীতিশ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে। দূরে কোথায় কুকুর ডাকছে। ড্রাইভারের গলা শোনা যায়]

ড্রাইভার। [নেপথ্যে] স্যার—একবার হেডলাইট-টা জ্বালাবেন? অন্ধকারে ভালো ঠাহর হচ্ছে না।

[নীতিশ উল্টোদিকে বেরিয়ে যায়। একটু পরেই হেডলাইটের আলো মঞ্চের ওপর এসে পড়ে।]

ড্রাইভার। [নেপথ্যে] পেয়েছি স্যার, আছে।

নীতিশ। [নেপথ্যে] হেডলাইট বন্ধ করব?

ড্রাইভার। [নেপথ্যে] হ্যাঁ স্যার, নইলে ফেরার পথে আর জ্বলবেনা। ব্যাটারির যা অবস্থা।

[হেডলাইট নিভে যায়। দুজনে দুদিক থেকে ছুটে আসে]

ড্রাইভার। অনেকটা উঁচুতে স্যার। শালা গলায় দড়ি দেবার সময় একবার ভাবলোনা লাশটা নামবে কি করে?

নীতিশ। গলায় দড়ি দেবার সময় যার অত হুঁশ থাকবে সে তো গলায় দড়ি দিতেই যাবে না। যাকগে—দেখে কি সুইসাইড্ বলে মনে হল?

ড্রাইভার। তা না হলে আর অত উঁচুতে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলবে কেন?

নীতিশ। ফাউল্ প্লে-ও তো হ'তে পারে। মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

ড্রাইভার। মেরে ঝোলালে অত উঁচুতে ঝোলাতে যাবে না স্যার। অযথা খাটনি বেশি হয়ে যাবে। তাছাড়া রিপোর্ট যা এসেছিল তাতে তো সুইসাইড্ই জানিয়েছিল।

নীতিশ। বলেছিল গো-ভাগাড়ের পাশের খিলজমিতে একটা বড়ি গাছে ঝুলছে। যাক couse of death তো পোস্ট্‌মর্টেমেই পাওয়া যাবে, কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা। এখন তো লাশটা নামাতে হবে।

ড্রাইভার। হ্যাঁ স্যার, তা না হ'লে তো পোস্টমর্টেমও হবে না।

নীতিশ। তুমি নামাতে পারবে না?

ড্রাইভার। আমি ড্রাইভার স্যার। প্লেন রাস্তায় মায় চষা ক্ষেতে খানাখন্দেও জিপ চালাতে পারি। গাছে চড়তে পারি না স্যার।

নীতিশ। আমি পারি—

ড্রাইভার। আপনি স্যার!

নীতিশ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রেনিং-এর সময় তো অনেক কিছুই করতে হয়। আমি কোন-রকম ক'রে উঠে যাব—তুমি নিচে থেকে ধরতে পারবেনা?

ড্রাইভার। আমি ব্রাহ্মণ স্যার। কি না কি জাতের মড়া। এই ভর সন্ধ্যেবেলায় ছোঁয়াটা কি উচিৎ হবে। আমার এখনও মা বেঁচে আছেন স্যার। শুনলে আমার হাতে জল খাবেন না।

নীতিশ। তাহলে? কি ক'রে নামবে লাশটা?

ড্রাইভার। তাই তো ভাবছি স্যার! মানে due course-এ যে নিজের থেকেই নেমে পড়বে তাতো নয়। মড়া তো!

নীতিশ। তুমি অসম্ভব বেশি কথা বলছ চ্যাটার্জি।

ড্রাইভার। আসলে এই ভর সন্ধেবেলায় ওইরকম মগডালে মড়া দেখা এস্তক কিরকম যেন নার্ভাস হয়ে গেছি স্যার।

নীতিশ। দাঁড়াও আমি একবার দেখিতো কি position-এ রয়েছে।

[বলতে বলতে বেরিয়ে যায়]

ড্রাইভার। খুব হাই পোজিশন্ স্যার।...থানাতে আপনাকে বললাম ফোর্স নিয়ে চলুন।

নীতিশ। [ফিরে আসে] Force কোথায় যে নিয়ে আসব? দুজন Sick, MLA'র বাড়ি পাহারা দিচ্ছে দুজন—ASI দত্ত গেছে সার চুরির enquary করতে—আর force এসেই বা কি করত? ডাকাত তো ধরতে হবে না, মড়া ধরতে হবে। কোন কোন জাতের লোক মড়া ধরবে না তা তো জানিনা। যাক তবু Jeepটা সারিয়ে তুমি না ফিরলে তো আসতেও পারতাম না।

ড্রাইভার। ভালো ক'রে সারানো হয়নি স্যার। কারবোরেটরে এখনও ময়লা আসছে, সেলফ্ আটকে যাচ্ছে, টিউনিং ঠিক নেই, ক্লাচ্ করলেই এসটার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফেরার পথে ট্রাব্‌ল্ না দিলে বাঁচি। এরকম লজ্‌ঝড়ে গাড়ি দিয়ে কাজ হয়না স্যার—নতুন গাড়ির জন্যে লিখুন।

নীতিশ। তুমি এত কথা বললে নতুন ড্রাইভারের জন্যেও আমাকে লিখতে হবে।

উফ্, এ কি ফৈজতে যে পড়লাম।

ড্রাইভার। আমাকে নিয়ে স্যার?

নীতিশ। না, এই চাকরি নিয়ে। রিক্রুটমেণ্ট্-এর সময় কি জানতাম যে এইরকম বিজন পাড়াগাঁয়ে কেউ গলায় দড়ি দিয়ে গাছের মগডালে ঝুলে পড়লে অন্ধকারে গাছে উঠে তাঁর লাশ নামানোর duty হল থানার O.C'র।

ড্রাইভার। আপনার এ লাইনে আসাটা বোধহয় উচিৎ হয়নি।

নীতিশ। কিন্তু চ্যাটার্জি, অনেকে যেমন আর পাঁচটা লাইনেও যেতে পারত, না গিয়ে এখানে শুধু চাকরির জন্য চাকরি করতে ঢুকেছে, আমি কিন্তু ঠিক অতটা না ভেবে চিন্তে পুলিশে ঢুকিনি। আমার বাবা মা দুজনেই ইংরেজ আমলে জেল খেটেছেন স্বাধীনতার জন্যে। সেই জন্যে ছোটবেলা থেকেই আমার দেশের জন্যে একটা কিছু করার ইচ্ছে হ'ত। মুশকিল হচ্ছে দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে দেশের জন্যে কিছু করাটা বেশ কঠিন হয়ে যায়, তখন তো স্বদেশী ক'রে জেল খেটে দেশসেবা করা যায় না। তাছাড়া চাকরি বাকরি তো একটা করতেই হবে, নইলে খাবো কি? এই সব ভাবতে ভাবতে মনে হ'ল এই পুলিশের চাকরির কথা। এ মিলিটারির মত দেশের জন্যে যুদ্ধ করছে না বটে, কিন্তু দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন তো করছে। সমাজটা তো রক্ষা পাচ্ছে—সেও তো দেশের মানুষের সেবাই। কলেজে গল্প শুনতাম ইংলণ্ডের পুলিশ নাকি বয়স্ক লোককে রাস্তা পার ক'রে দেয়—লোকের কত রকমের সেবা করে। তারপর ইংরিজি ছবিতে পুলিশের নানান রকম কীর্তিকলাপ দেখে মনে হ'ত পুলিশ হ'লে দারুণ হয়—চোর ধরব ডাকাত ধরব, দেশের মানুষ শান্তিতে থাকবে—ধন্য ধন্য করবে। কিন্তু actually কাজ করতে এসে যে এরকম পদে পদে ঠেকতে হবে ভাবিনি। আজকের কাজটাই ধরোনা। থানায় এমন স্টাফ্ নেই যে পাঠাব—O.C-কে আসতে হবে গাছের থেকে মড়া নামাতে। কোন আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই, দরকারের তুলনায় transport নেই—কত থানায় তো একটা typewriter-ই নেই।

ড্রাইভার। স্যার—যদি অপরাধ না নেন তাহলে একটা কথা বলব?

নীতিশ। হ্যাঁ বলো।

ড্রাইভার। ওসবের থেকেও বড় অসুবিধে আছে স্যার। লোকের সাধুতা নেই। যে অসাধু লোককে ধরবে সেই যদি সাধু না হয় তাহলে ডিপার্টমেণ্টে কি রইল বলুন তো?

নীতিশ। তুমি দুর্নীতির কথা বলছ তো? দ্যাখো দুর্নীতি সব জায়গাতেই আছে, তাই বলে সবাই তো দুর্নীতি করছে না—

ড্রাইভার। যে করছে না তার পেছনে সবাই মিলে কাঠি করছে স্যার। এর আগে আমি বর্ডারের একটা থানায় ছিলাম। সেখানে তো দেদার স্মাগলিং। কি

বলব—ওপর থেকে নিচে অবধি সবাই টাকা খেত। মাঝে মাঝে লোক দেখানো রেড্ হত—ওরা আগেভাগেই জেনে যেত। বড়বাবু ফোর্স নিয়ে যখন রেড্ করত তখন কোথায় মাল কোথায় মালদার? সব সুনসান। আমি টাকা খেতাম না বটে, তবে স্যার মুখও খুলতাম না। কিন্তু একদিন মুখ খুলে ফেললাম। থানার গাড়ি স্মাগ্লারকে বর্ডার পার করে দেবে এ কি সহ্য হয় স্যার? বড়বাবুকে বললাম স্মাগলারকে আমি গাড়িতে তুলবনা। এখনও আমার মা বেঁচে রয়েছেন, শুনলে আমার হাতে জল খাবেন না। ব্যস্ ট্রান্সফার অর্ডার এসে গেল এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে!

নীতিশ। তোমার মা বেঁচে আছেন শুনে মনে পড়ল—মড়াটা তো নামাতে হবে।

ড্রাইভার। হ্যাঁ স্যার। কিন্তু কি করে নামবে বলুন তো?

নীতিশ। একটা কাজ করো, ওই যে আলোগুলো দেখা যাচ্ছে—ওই গ্রামটায় চলে যাও। Jeep নিয়েই যাও। দেখো লোকজন পাও কিনা -মানে সন্ধ্যের পর মড়া ছুঁলে জাত যাবেনা এমন কিছু লোক পাও কি না। গিয়ে বলো বড়বাবু ডাকছেন।

ড্রাইভার। কিন্তু আপনি এখানে একা থাকবেন? ভয় লাগবে না?

নীতিশ। গাছে মড়া আছে ব'লে?

ড্রাইভার। না মানে গাছে বলে নয়, মড়া ব'লে—

নীতিশ। চ্যাটার্জি, মড়া তো মরেই রয়েছে, তার থেকে তো ভয় নেই। ভয় জ্যান্ত মানুষকেই। তবে জ্যান্ত মানুষ ধারে কাছে আছে বলে তো মনে হচ্ছে না, নইলে আর তোমাকে খুঁজতে পাঠাচ্ছি কেন? যাও যাও চলে যাও, চটপট লোক জোগাড় ক'রে নিয়ে এস।

ড্রাইভার। ঠিক আছে যাচ্ছি স্যার। ভয়টয় পেলে ওই মরা মরা—না রাম রাম করবেন তাতে ওনারা কাছে ঘেঁসবেন না।

[ড্রাইভার চলে যায়। নিস্তব্ধতা ঝিঁঝিঁর ডাকে যেন শ্রবণগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। নীতিশ সময় ও অস্বস্তি কাটানোর জন্যে সিগারেট ধরাতে চায়। মুখে সিগারেট নিয়ে দেশলাই খুঁজে পায় না। অস্ফুটে বলে]

নীতিশ। আহ্, দেশলাইটা কোথায় গেল?

[ফশ্ করে একটা অত্যাধুনিক লাইটার জলে উঠল, তাতে বাজনা বাজছে। কণ্ঠস্বর ভেসে এল]

কণ্ঠস্বর। আসুন স্যার।

নীতিশ। কে আপনি?

কণ্ঠস্বর। আগে সিগারেটটা ধরিয়ে নিন। আলাপ পরিচয় তো হবেই।

[নীতিশ সিগারেট ধরিয়ে নেয়—কণ্ঠস্বরের মালিক নিজেও পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরায়। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে] অনেকক্ষণ ধরে

আপনাকে দেখছিলাম বড়বাবু।

নীতিশ। দেখছিলাম মানে?

গগন। আপনাদের কথাবার্তাও শুনছিলাম।

নীতিশ। আপনি কি কাছাকাছি কোন গাঁয়ে থাকেন?

গগন। না বড়বাবু, আমার বাড়ি তিনপাহাড়ে। ভাসতে ভাসতে এদিক পানে চলে এসেছি।

নীতিশ। আপনি কি করেন?

গগন। বিজনেস্।

নীতিশ। কিসের?

গগন। সেটা কিছু ফিক্স্ট্ নেই।

নীতিশ। এখন এই সন্ধ্যেবেলায় এখানে কি করছিলেন?

গগন। আপনিও যা করছিলেন তাই। ওই মড়াটার তত্ত্ব-তালাশ করছিলাম। খবর পেলাম ভিখু কৈবর্ত গলায় দড়ি দিয়েছে। কাছেই একটা গাঁয়ে এসেছিলাম, ভাবলাম গিয়ে একবার দেখি ব্যাপারটা কি?

নীতিশ। আপনি লোকটিকে চিনতেন?

গগন। বুড়োটার বড় ছেলেটা বছর দু'এক আগে বি এস এফের গুলিতে খরচা হয়ে গেল।

নীতিশ। তার মানে smugling করত?

গগন। সে আপনি যা বলেন স্যার। পেট তো চালাতে হবে। সুদু ওর নয়তো, বুড়ো বাপ মা আছে, অপোগণ্ড ভাই বোন রয়েছে। ভিখু একটা বিড়ির কারখানায় কাজ করত। ছেলেটাও মরল, সে কারখানাও মালিক বন্ধ ক'রে দিল।

নীতিশ। কেন—labour trouble?

গগন। না স্যার। ওই বিড়ি চালানের টেরাকে দ্রোব্‌বো চালান হ'ত। কাসটম ধরে ফেলল। তা সেই থেকে এক বছর ভিখু বেকার। কত আর জ্বালা সহ্য হয়—রাখি বন্‌ধন্ করে ফেলল।

নীতিশ। আপনি দেখছি অনেক খবর রাখেন?

গগন। রাখতেই হয় স্যার। আপনি কেন এই থানায় বদলি হলেন সে খবরও আমি রাখি।

নীতিশ। কি খবর?

গগন। সাটা কিং রহমৎ মিয়াকে কেউ ধরতে পারছিল না। ধরতে গেলে তো গদির থেকে খাতাপত্তর বলকি কাকাদের সুদু ধরতে হয়। কিন্তু চাপ হবার আগেই না বিলা হয়ে যেত। খাতাপত্তর সরে গেলে কাকারা না থাকলে তো সাবুদ থাকে না, সাজাও হয় না। ভিতরে পুরবেন কি করে?

শেষে উলটবাজ মিন্টু ছেলেটা কখন বামাল-সাথ পাবেন সব-উগরে দিল। আপনি গিয়ে ধরলেন। রেড্ করার ঠিক আগে আপনি ওপরওয়ালাকে জানিয়েছিলেন না যে আপনি রহমৎ মিয়ার ফনডায় রেড করতে যাচ্ছেন?

নীতিশ। By Jove, আপনি তাও জানেন?

গগন। জানি স্যার। সেই জন্যেই তো আপনি বদলি হয়ে গেলেন, রহমৎও পরে বেরিয়ে এল। কি স্যার ঠিক বলিনি?

নীতিশ। কিন্তু···আপনি কি করে···আপনার নামটা কি বলুন তো? আপনি কিসের business করেন?

গগন। এই বিজনেসে সবাইকে সবাইকার খবর রাখতে হয়। আমার নাম গগন মুহুরি। আপনাদের খাতায় আমার আর একটা নাম আছে—গনা ওস্তাদ।

নীতিশ। আপনিই গনা?

গগন। আমাকে আর আপনি বলবেন না বড়বাবু। আপনার থানায় সবাই আমাকে তুই-তোকারি করে।

নীতিশ। থানায় আপনার নামে তো অনেকগুলো Case-ও আছে। খুন, ডাকাতি, স্মাগলিং···

গগন। কাঁকন কয়েকবার পরতে হয়েছে স্যার, কিন্তু আপনার মা বাবার আশীর্বাদে কুলিতে ঢুকতে হয়নি। হরবখত বেরিয়ে এসেছি।

নীতিশ। বুঝলাম। তা আপনি যে এভাবে আমার সঙ্গে—

গগন। একটু কথা বলার দরকার ছিল বড়বাবু।

নীতিশ। কি কথা

গগন। সাফ কথায় বলি? অনেক তো দেখলেন। এবারে একটা সমঝাওতায় আসুন স্যার। এখান থেকে বর্ডার অবধি পুরো এলাকাটাই বলতে পারেন আমারই এলাকা। আমি আপনাকে ওয়াদা করছি আপনার ভিত্‌তর অন্য কেউ কিচাইন করলে আমি ধরে দেব। তার বদলিতে আপনি আপনার সারি একটু সরিয়ে রাখবেন—আমার বিজনেস যাতে বন্ধ না হয়।

নীতিশ। আপনার বিজনেস! মানে ডাকাতি খুন লুটপাট স্মাগলিং!

গগন। কি করব স্যার? এই তো পেশা। খেয়েপরে বাঁচতে তো হবে? আপনাকেও হবে। আপনার দিকটা আমি দেখব স্যার, আমাকে যাতে দিনরাত তাড়া খাওয়া কুত্তার মত ছুটে না বেড়াতে হয় সেইটা আপনি একটু দেখুন।

নীতিশ। [একটু চুপ করে থাকার পরে] গগনবাবু, আপনি এত খবর রেখেছেন অথচ একটা খবর রাখেননি কেন বুঝতে পারছিনা। রহমৎকে arrest করার আগে রহমৎ আমাকে এক লাখ টাকা offer করেছিল, ওকে শান্তিতে ওই

'বিজনেস' করতে দেওয়ার জন্যে। আমি টাকাটা নিইনি। আপনি আসুন গগনবাবু।

গগন। তার আগে লাশটা গাছ থেকে নামানোর ব্যবস্থাটা করে দিই স্যার।

[একটা সিটি দেয়। দুটো অনুচর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায়]

ভিখুর লাশটা নামিয়ে আন। এটা নিয়ে যা, দড়ি কাটবি কি দিয়ে?

বস্ত্রাবরণ থেকে একটা ধারালো ছুরি বার করে দেয়। লোকদুটো তা নিয়ে চলে যায়] আপনি কঠিন লোক বড়বাবু। তবে আমাকেও পোকামাকড় জ্ঞান করবেন না স্যার। আমারও কিছু সহায় সম্বল আছে।

নীতিশ। সহায় সম্বল আমার বেশি কিছু না থাকলেও আমার ন্যায়নীতি আছে গগনবাবু। Duty আছে। তা থেকে আমি নড়তে পারবো না।

[একটু শব্দ হয় : একটু পরে গগনের অনুচর দুটি একটা শীর্ণ বুড়ো লোকের দেহ এনে মঞ্চের পেছন দিকে শুইয়ে দেয়। জীপ আসার আওয়াজ পাওয়া যায়। লোকজনের কণ্ঠস্বর শোনা যায়]

গগন! চলি বড়বাবু!

নীতিশ! আসুন! যা মনে হচ্ছে—দেখা আমাদের হবেই!

দ্বিতীয় দৃশ্য

[নীতিশ রায় এখন Deputy Superintendent of Police। তার কোয়ার্টারের বাইরের ঘর। টেলিফোন বাজে। নীতিশের স্ত্রী অর্চ্চনা প্রবেশ করে ফোন ধরে]

অর্চ্চনা। হ্যালো। হ্যাঁ ডি এস্ পি-র Quarter। না উনি এখন নেই। কে বলছেন!···কতক্ষণে আসবেন তা তো বলতে পারছি না। [উদ্বিগ্ন]··· ওঃ!···আপনি পরে ফোন করবেন [অর্চ্চনা উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে। একজন Orderly নীতিশের briefcase নিয়ে ঢুকে আসে]

অর্চ্চনা। সাহেব ফিরেছেন?

আর্দালি। হ্যাঁ মেমসাহেব! বাইরে অনেক লোক অপেক্ষা করছিল তো, ওদের সঙ্গে কথা বলছেন!

অর্চ্চনা। অবরোধে নাকি লাঠি চার্জ হয়েছে শুনলাম? ইট ছোঁড়াছুঁড়ি? ওঁর লাগেনি তো?

আর্দালি। [কতটা বলবে ভেবে নিয়ে] তা সামান্য একটু বলতে পারেন!

অর্চ্চনা। সামান্য মানে? কোথায় লেগেছে?

আর্দালি। সামান্য ইট ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছে আর কি।

অর্চ্চনা। আশ্চর্য! সাহেবের চোট লেগেছে কি না তাই বল না?

আর্দালি। চোট লাগলে কি হেঁটে চলে বেড়াতেন। ওই তো আসছেন।

[নীতিশ ঢুকে আসে। তার হাতে ব্যাণ্ডেজ আছে। জামায় রক্ত লেগে রয়েছে]

অর্চ্চনা। ওমা, কি সর্বনাশ! কি হয়েছে?

নীতিশ। কিচ্ছু না, সামান্য একটু বলতে পারো···

অর্চ্চনা। আবার সেই সামান্য একটু বলতে পারো! শার্ট রক্তে ভেসে যাচ্ছে, হাতে ব্যাণ্ডেজ—এটা সামান্য?

নীতিশ। রক্তে ভেসে যাচ্ছেটা দেখলে কোথায়? হাতের এইখানটায় একটু কেটে গিয়েছিল, তাই থেকে রক্ত বেরিয়ে জামায় সামান্য একটু লেগেছে।

অর্চ্চনা। হাত কাটল কি করে?

নীতিশ। ইট লেগেছিল। সামান্য একটু stitch করতে হয়েছে।

অর্চ্চনা। [জোর দিয়ে পুনরাবৃত্তি করে] সামান্য একটু stitch করতে হয়েছে। এই করতে করতে কোনদিন একটা সর্বনাশ হয়ে যাবে।

নীতিশ। আজকের হাঙ্গামাটা শুরু হয়েছিল মেয়েদের একটা মিছিল নিয়ে। আমরা যেখানে ব্যারিকেড করেছি সেইখানে এসেই মেয়েগুলো রাস্তায় শুয়ে পড়ল। Arrest করে van-এ তুলতে যেতেই চারপাশের জমা ভীড় থেকে ইষ্টকবৃষ্টি সুরু হয়ে গেল। মেয়েগুলোও ইট ছুঁড়তে আরম্ভ করে দিল। ভেবেছিলাম বাড়িতে এসে অন্তত weaker section-এর হাতে আর নিগৃহীত হতে হবে না, কিন্তু এখন দেখছি মানুষ ভাবে এক—হয় আর এক।

অর্চ্চনা। [হেসে ফেলেছে। আর্দালিকে বলে] মাখন, সাহেবকে চা দিতে বলো, আর আলুর পরোটাগুলো ভেজে দিতে বলো।

[আর্দালি চলে যায়। অর্চ্চনা নীতিশের কাছে এসে ক্ষতস্থানটা আলতো করে স্পর্শ করে]

খুব ব্যথা?

নীতিশ। কমে যাচ্ছে এখন। [স্ত্রীর কাঁধের ওপর হাত রাখে]

অর্চ্চনা। [খুব নম্র করে হাতটা নামিয়ে দিয়ে আবার শিশুপালনের ভূমিকায় ফিরে যায়] Tedvac নিয়েছ? নইলে ডাক্তার সান্যালকে telephone করি—

নীতিশ। নিয়েছি রে বাবা নিয়েছি। এমন একটা করছ না! জানো, পাঁচ-ছ জন constable seriously injured?

অর্চ্চনা। ওমা সেকি? তা পুলিশের চাকরিতে তো এসব hazard থাকবেই?

নীতিশ। ভাগ্যিস পুলিশের চাকরি নিইনি।

অর্চ্চনা। কি?

নীতিশ। না—মানে—বলছিলাম পুলিশের চাকরিতে এসব hazard থাকবেই?

[এই সময় একজন আর্দালি প্রবেশ করে]

আর্দালি। দেখা করতে চাইছেন স্যার।

অর্চ্চনা। কে?

আর্দালি। ওই আগে কাউনসিলর ছিল না—গতবারে হেরে গেছে—

অর্চ্চনা। বলো সাহেব খুব ক্লান্ত, এখন—

নীতিশ। না না, পরে এসে কাজের সময় ঝামেলা বাড়াবে— [আর্দালিকে] নিয়ে এস।

[আর্দালি বেরিয়ে যায়]

অর্চ্চনা। একটু rest-ও নিতে দেবে না। এর থেকে তো থানার কাজ ভালো ছিল। DSP হয়ে তো বাড়ির জন্যে আর সময়ই হয়না তোমার। আর দারোগাকে সবাই মানে, এখানে সদরে DSP-র তো শুধুই ঝামেলা পোয়ানো। আমার চা-টা দেখি।

[অর্চ্চনা বেরিয়ে যায়। গুরুপদকে নিয়ে আর্দালি ভেতরে পৌঁছে দেয়।]

নীতিশ। আসুন গুরুপদবাবু? কোন Problem আছে নাকি?

গুরুপদ। কি ব্যাপার Mr Ray? সাংঘাতিক ভাবে ইনজিওর্‌ড্ শুনলাম?

নীতিশ। না না, সাংঘাতিক কিছু নয়।

গুরুপদ। না মিস্টার রায়, রাস্তায় রাস্তায় লোকে বলাবলি করছে আপনার জামা রক্তে ভিজে গেছে!

নীতিশ। হাতে একটা ইট লেগে তাই থেকে রক্ত বেরিয়ে জামায় লেগেছিল—

গুরুপদ। তবে মিস্টার রায়—বামপন্থীদের ব্যাপারে আপনারা বড্ড লিনিয়েন্ট। ওই যে কথায় আছে না—আগুন কোথাও আদা, পুলিশ কোথাও দাদা। আরও স্ট্রং মেজার নেওয়া উচিৎ ছিল।

নীতিশ। মেয়েরা রাস্তায় শুয়ে পড়লে আর কত strong meassure নেব বলুন তো?

গুরুপদ। আপনি এদের মেয়েছেলে বলছেন? ফেস্টুনের বাঁশ খুলে মারামারি করে, ইট ছুঁড়ে মাথা ফাটিয়ে দেয়, এরা মেয়েছেলে? "এমন দেখিনি বাপের কালে, মেয়ে হয়ে বলদে চাপে।" গণতন্ত্রের নাম করে এসব কি চলছে বলুন তো? স্ট্রং মেজারস্ নেওয়া উচিৎ। "অক্ষরে পণ্ডিত তুষ্ট ফুলে তুষ্ট ভোমরা, ক্ষুধা ভোজনে তুষ্ট কীলে তুষ্ট বর্বরা।"

[আবার আর্দালি প্রবেশ করে]

আর্দালি। স্যার—পাড়ার ছেলেরা এসেছে, দেখা করতে চাইছে।

নীতিশ। ডাকো। [আর্দালি চলে যায়]

গুরুপদ। আপনি দেখবেন মিস্টার রায়, এই ইস্যুতে তো আমরাও অ্যাজিটেশন করব, দেখবেন টোটালি নন-ভায়োলেন্ট পিস্‌ফুল্ হবে।

নীতিশ। হ্যাঁ গুরুটাতো non-violent-ই হয় সব, তারপর যে কি হয়…[এই সময় পাড়ার ছেলেরা ঢুকে আসে] কি ব্যাপার আপনাদের আবার কি হ'ল?

পাড়ার ছেলে ১। আমাদের কিছু না স্যার, আপনি শুনলাম ভীষণ আহত হয়েছেন?

পাড়ার ছেলে ২। শুনলাম হসপিটালে নিয়ে গেছে আপনাকে?

নীতিশ। না না, সেরকম কিছু হয়নি। তবে আপনারা আমার জন্যে এতটা…

পাড়ার ছেলে ৩। আপনার জন্যে চিন্তা করবনা স্যার? আপনার মত অফিসার আমরা পাইনি। কারও সাইড নেন না—

নীতিশ। তবে আপনারাও ওরকম রাস্তা অবরোধ করলে আমাকে কিন্তু সাইড নিতেই হবে – law and orderএ-র সাইড।

গুরুপদ। এই—এইটে বলুন তো মিস্টার রায়। এরা তো দেশে প্রশাসন বলে কিছু থাকতে দেবেনা দেখছি। নিজেদেরই সরকার নিজেরাই আন্দোলন করছি। এ আবার কি কথা?

হোমে পুড়িয়ে সাতমন ঘি
পুজোর ভোগে খিচুড়ি
দেবতার নৈবিদ্যি করে
পুরুত শালা চুরি।

পাড়ার ছেলে ১। গুরুপদদা, ছড়া কাটার অভ্যেসটা আপনার গেল না।

গুরুপদ। এটা ছড়া কাটা নয়, এ হ'ল প্রবাদ প্রবচন। জনগণের জীবন থেকে এই সব প্রবাদ প্রবচন উঠে এসেছে—এগুলোতেই দেশের ঐতিহ্য ধরা থাকে। এগুলো তো তোমরা জানোই না। জনগণ জনগণ ক'রে গলাবাজি করলেই কি জনগণের পাশে থাকা যায়?

পাড়ার ছেলে ১। ছড়া কেটেও থাকা যায়না গুরুপদদা। আর ছড়া আমরাও জানি।

খেলাম পাঁঠা ধেনু-বৎস
এখন ভেঙে দন্ত
গেরুয়া ধরে তিলক কেটে
হয়েছি মোহন্ত।

[গুরুপদ উঠে পড়ে]

গুরুপদ। আমি চলি মিস্টার রায়। পরে একদিন আসব।

[গুরুপদ প্রস্থান করে]

নীতিশ। কেন শুধু শুধু বয়স্ক ভদ্রলোককে চটিয়ে দিলেন বলুন তো?

পাড়ার ছেলে ৩। আপনি জানেন না কিরকম ভেক ধরে থাকে লোকটা। আমাদের criticise করার সময় মনে থাকে না ওদের regim-এ খাদ্য আন্দোলনে কতগুলো লোক পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিল।

নীতিশ। এসব political কথা থাক ভাই। আমরা সরকারি চাকরি করি। নেতাদের political সিদ্ধান্তে তো আমাদের কোন হাত নেই।

[এই সময় একজন লোক এসে ঘরে ঢোকে। লম্বা চওড়া কাঠামো—কিন্তু এখন শীর্ণ হয়ে গেছে—বোঝাই যায় খুব অসুস্থ]

একি! কালিকাবাবু—একাই এলেন নাকি?

কালিকা। হ্যাঁ, এখনও তো একটু হাঁটা চলা করতে পারছি। আর আমার কোয়ার্টার থেকে এই তো ক'পা মাত্তর।

নীতিশ। তাহলেও একা একা না এলেই পারতেন। বৌদিকে নিয়ে এলেন না কেন?

কালিকা। ও ছোট মেয়েটাকে পড়াতে বসেছে, তার সামনে পরীক্ষা। আপনার injury হয়েছে শুনে ভাবলাম একবার যাই দেখেই আসি। এতখানি উপকার তো কোনদিন কেউ করেনি। তাছাড়া একটু কথাও ছিল—কদিন থেকেই ভাবছিলাম—[বসে]

পাড়ার ছেলে ৩। আমরা তাহলে যাই স্যার।

নীতিশ। আসুন ভাই। অনেক ধন্যবাদ আপনারা দেখতে এসেছিলেন। আপনাদের deputation-টা যেন কবে?

পাড়ার ছেলে ২। সামনের সোমবার।

নীতিশ। আপনাদের মহিলা কমরেডদের একটু সামলাবেন ভাই, নইলে আর একখানা হাতও আমার যাবে।

[ছেলেরা হাসাহাসি করতে করতে বেরিয়ে যায়]

চা খাবেন কালিকাবাবু?

কালিকা। না না, চা এখন খাবো না।

নীতিশ। chemotherapyর পর এখন খানিকটা better বোধ করছেন তো?

কালিকা। নাহ্। বরং কয়েকটা নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে। সর্বক্ষণ একটা নশিয়া হচ্ছে—এবং যন্ত্রণাও মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে যায়। মনে হচ্ছে এইবার বোধহয় time হয়ে এল।

নীতিশ। না না—এসব ভাবছেন কেন?

কালিকা। আপনাকে যখন operation-এর সময় আমার সঙ্গে কোলকাতায় যেতে request করেছিলাম, তখন কিন্তু ভেবেছিলাম operation করে ফেললে কিছুটা time পাওয়া যাবে। তারপর radiotherapy করার সময়ও

তো আপনি সঙ্গে গিয়েছিলেন। Mrs মেয়েমানুষ, মেয়েদুটোকে কার কাছে রেখে যাবে···সে সময় আপনি যা ক'রেছেন—

নীতিশ। আরে এ তো যে কেউ করবে—আপনি তো কলিগ—

কালিকা। না মিস্টার রায়, সবাই করে না, আরও দু-একজনকে বলেছিলাম তো—করা হয়ত সম্ভবও নয়। যাই হোক radiotherapy-র পরেও ভাবতে পারিনি যে কনডিশনটা এত তাড়াতাড়ি ডিটরিয়েট করবে। ভাবতে পারিনি বলেই হয়ত ইতিমধ্যে দু-একটা ভুল কাজ ক'রে ফেলেছি। জিনিশটা দু-একজন হয়ত জানতেও পারে, তবু এটা খুবই কনফিডেনশিয়াল। আপনার মত উপকারী বন্ধুকে শুধু বলতে পারি।·· আমার একটা বাড়ি আছে। বেনামিতে, স্ত্রীর নামে। নতুন বাজারের কাছেই। অসুখ ধরা পড়ার আগেই কিনেছিলাম। ভেবেছিলাম রিটায়ারমেন্টের পরে এইখানেই settle করব।

নীতিশ। বাড়ি কিনে ভুল করেছেন বলছেন কেন?

কালিকা। কিনে নয়, বাড়িটা ভাড়া দিয়ে ফেলে ভুল ক'রে ফেলেছি। ওই, ভাবতে পারিনি তো এত তাড়াতাড়ি কনডিশানটা এতটা খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন যা দেখছি আমার তো যে-কোনদিন একটা কিছু হয়ে যেতে পারে—এবং সে অবস্থায় আমার family-র তো একটা মাথা গোঁজার মত আস্তানা চাই। এই Police Qr.-এ কদিন থাকতে পারবে? আপনি অনেক ক'রেছেন আমার জন্যে, আর একটা request আপনাকে করছি। আমার অবর্তমানে ওই বাড়িটা খালি ক'রে দেবার একটা ব্যবস্থা আপনি যদি করে দেন!

নীতিশ। আপনি বড্ড anxiety করছেন। এখনই অত কিছু ভাবার মত সময় আসেনি।

কালিকা। না মিস্টার রায়, আমি নিজে তো বুঝছি। এখন না ভাবলে কোনদিনই আর সময় হবে না। আরও একটা ব্যাপার আছে—

[অর্চ্চনা প্রবেশ করে, হাতে ট্রে—তাতে খাবার plate ও দু'কাপ চা]

নমস্কার মিসেস রায়।

অর্চ্চনা। [নমস্কার করে] আসুন একটু চা খান।

কালিকা। Thank you, আমার এখন ওসব চলবেনা। নানা রকমের restriction তো আছেই, শরীরটাও ঠিক···

অর্চ্চনা। না না—তাহলে জোর করবনা।

কালিকা। [নীতিশকে] আপনি তো শিউপ্রসাদ সোহাঙ্কাকে চেনেন?

নীতিশ। চিনিনা, তবে নাম জানি। নতুন বাজারে গদি তো?

কালিকা। হ্যাঁ, ওর মহাজনি কারবারও আছে। ওর কাছে আমার কিছু টাকা আছে। ওর through-তে টাকাটা খাটে।

নীতিশ। কত টাকা।

কালিকা। তা interest accumulate ক'রে দু'লাখ চল্লিশ হাজারের মত এখন দাঁড়িয়েছে। সেইটে যদি উদ্ধার করে আমার স্ত্রীকে পাইয়ে দেন—

[একটু নীরবতার পর উঠে দাঁড়ায়]

চলি মিসেস রায়।

অর্চ্চনা। মীরা বৌদি একটা রান্নার লোকের কথা বলেছিলেন; ওঁকে বলবেন একটা মেয়ে পেয়েছি, রবিবার আসবে বলেছে, এলেই নিয়ে যাব আমি।

কালিকা। বলব। [নীতিশকে] আবার একটা ভার আপনার ওপর চাপাচ্ছি বলে খুবই খারাপ লাগছে, তবে আর কাকেই বা বিশ্বাস করে বলতে পারি। এটা মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুর অনুরোধ মনে ক'রে আমায় মার্জনা করবেন।

[বেরিয়ে যায়]

অর্চ্চনা। ভদ্রলোকের অত টাকা আছে তুমি জানতে?

নীতিশ। না। একটা বাড়িও আছে বেনামিতে, স্ত্রীর নামে কিনেছেন।

অর্চ্চনা। ও বাবা, এত টাকা কোত্থেকে পেলেন?

নীতিশ। উপরি।

অর্চ্চনা। মানে ঘুস?

নীতিশ। হুঁ।

অর্চ্চনা। তুমি জানতে?

নীতিশ। দু-একবার কানাঘুসো কানে এসেছে। কিন্তু একসঙ্গে তো সেরকম কাজ করিনি, উনি তো অন্য সব জায়গায় ছিলেন। enforcement-এ আছেন। আগে সেরকম ঘনিষ্ঠতাও ছিলনা, cancer হবার পর থেকেই ঘনিষ্ঠতাও বেড়েছে।

[আর্দালি এসে বলে]

আর্দালি। ঋষি এসেছে স্যার। বলছে জরুরি দরকার আছে।

নীতিশ। ও, পাঠিয়ে দাও। [আর্দালি চলে যায়]

অর্চ্চনা। ঋষি কে?

নীতিশ। আমাদের informer। আগে criminal gang-এ ছিল, এখন শুধরে গেছে। জুতোর দোকান করেছে।

অর্চ্চনা। জুতোর দোকান—মানে—বুঝতে পেরেছি। একে দোকান করতে তুমিই তো টাকা দিয়েছিলে। ওকি আবার টাকা চায় না কি?

নীতিশ। না না—ওই একবারই দিয়েছিলাম।

অর্চ্চনা। সংসার চালাতে আমার কালঘাম ছুটে যাচ্ছে—মেয়ের হোস্টেলের খরচ আছে, তোমার তো সেসব চিন্তা নেই, একে তাকে দিয়ে নয় ছয় করে যাচ্ছো। যাকগে, কালিকাবাবুর ব্যাপারে কি করবে?

নীতিশ। দেখি।

[ঋষি নামের যুবকটি ঢুকে আসে। নীতিশ অর্চ্চনার দিকে তাকায়। অর্চ্চনা ভেতরে চলে যায়] বলো।

ঋষি। সায়েব, নাসিমুল আজ বাড়ি গেছে।

নীতিশ। কে?

ঋষি। ওই যে এস ডি ও-র বাড়িতে চুরির ব্যাপারে যে লোকটাকে খুঁজছেন—নাসিমুল হক্। চাকরটাকে স্ট্যাব করেছিল—অনেকগুলো কেস্ আছে ওর নামে।

নীতিশ। বাড়ি কোথায় ওর?

ঋষি। শাহেপুর। ২৫ কিলোমিটার মত হবে।

নীতিশ। তুমি ঠিক জানোতো বাড়ি গেছে?

ঋষি। হ্যাঁ সাহেব। ওর একটা মাত্র মেয়ে—আর কেউ নেই। মেয়েটাকে ভীষণ ভালোবাসে। এলাকা টং দেখে দু-সপ্তাহ গাঁয়ের দিকে যায়নি। কিন্তু মেয়েটার ওপর মাছি বসছে কিনা, ভূখা পেটে আছে কিনা—এই সব ভেবে বোধহয় আর থাকতে পারেনি—দিনমানে গাঁয়ের বাইরে পানের বুরুজের মধ্যে ঘাপটি মেরে ছিল—আনধেরা হতে বাড়ি ঢুকেছে। আমাদের লোক দেখেছে।

নীতিশ। [একটা চিরকুট লিখতে লিখতে ডাকে] এই, রতন। [আর্দালি আসে] এটা নিয়ে গিয়ে মেজবাবুকে দাও। [ঋষিকে] তুমি যাও ওর সঙ্গে। মেজবাবু সব ব্যবস্থা করবেন, আমি ততক্ষণ একটু চান করে আসছি।

[ঋষি ও আর্দালি চলে যায়। নীতিশ খাবার প্লেট থেকে একটা কিছু নিয়ে খেয়ে ভেতরে যেতে উদ্যোগ করতে গিয়ে বাইরে কাকে যেন দেখতে পায়]

কে ওখানে?

[একটি ৩৫ থেকে ৪০ বছরের যুবক ঢুকে আসে। তার একটা হাত নেই]

সুমন্ত্র। আমি রায়বাবু। সুমন্ত্র!

নীতিশ। কি ব্যাপার, তুমি হঠাৎ?

সুমন্ত্র। শুনলাম আপনি নাকি খুব চোট পেয়েছেন?

নীতিশ। সেরকম কিছু নয়। এরা ইটের কারবারি। তোমাদের মত বোমা নিয়ে এরা মিছিল করে না।

সুমন্ত্র। [একবার কাটা হাতের দিকে তাকিয়ে] আমার বোমায় তো রায়বাবু আমি নিজেই ঘায়েল হলাম।

নীতিশ। কিন্তু একটা কথা ভেবে খুব অবাক লাগছে; তোমরা এক সময় পুলিশ মারতে না? বলতে না শ্রেণীশত্রুর রক্তে হাত না রাঙালে সাচ্চা বিপ্লবী হওয়া যায় না? আজ একজন পুলিশ অফিসার চোট পেয়েছে ব'লে—

সুমন্ত্র। দু' যুগ আগের অবস্থা কি আর আছে রায়বাবু—তখন এই পুলিশ লাইনে আমাকে পেলে আপনারা কি করতেন ভেবে দেখুন না। তবে ভুল তো আমাদের হয়েই ছিল। সমাজ বদলে দেবার স্বপ্ন দেখেছিলাম আমরা, কিন্তু যাদের নিয়ে এই সমাজ—জনগণ—তাদেরই আমরা ওই লড়াইয়ে সামিল করতে পারিনি। তাদের জীবনের মধ্যে আমরাই সামিল হতে পারিনি।

নীতিশ। দ্যাখো সুমন্ত্র—তোমাদের একটা section-এর যে সত্যি সত্যিই Idealism ছিল, sacrifice ছিল তা আমি মানছি, কিন্তু ওভাবে system পাল্টানো যায় না। এই system-এর ভেতরেই চেষ্টা করতে হবে কিভাবে মানুষের অবস্থাটা পাল্টানো যায়। খানিকটা অন্তত ভালো করা যায়—

সুমন্ত্র। একটা কথা বলব—কিছু মনে করবেন না তো? আপনি আমার বিরাট উপকার করেছেন; জেল থেকে বেরনোর পর এই বইয়ের ব্যবসাটা আপনি help না করলে তো দাঁড় করাতেই পারতাম না। তাই ব্যক্তি হিসেবে আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এই system-টা বাঁচিয়ে রেখে মানুষের অবস্থা পাল্টানো এটা আপনাদের সোনার পাথরবাটির concept। এই সমাজটাকে রেখে দেবেন অথচ এই সমাজের exploitation-গুলো উপড়ে ফেলবেন এটা কি সম্ভব। এই system-টা এত লতায়পাতায় শেকড়ে বাকড়ে জড়িয়ে রয়েছে যে এখানে ওখানে একটু ছেঁটে কেটে একে পরিষ্কার করতে পারবেন না। আপনার কথাই ভাবুন না, আপনার পেশার কথা ভাবুন। দেখবেন সেখানেও এই system আপনার হাত পা বেঁধে রেখেছে। ব্যক্তি হিসেবে আপনি তো সৎ। আপনার তো কতগুলো সদিচ্ছাও আছে। কিন্তু আপনি দেখবেন এই system-কে মেনে নিয়ে, এই দেশের আইনকানুন শাসনব্যবস্থা বিচারব্যবস্থা মেনে নিয়ে আপনি ভালো কাজ করতে পারছেন না। এই system-এর ভেতরে থেকে এর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আপনি হেরে যাবেনই। Ultimately হয় একা হয়ে যাবেন নইলে surrender করে দলে ভিড়ে যাবেন।

নীতিশ। আমার তো এ ছাড়া রাস্তা নেই ভাই। দেখি surrender না করে কতদূর লড়া যায়।...উঠি ভাই, আমাকে এখন আবার বেরতে হবে।

[সুমন্ত্র চলে যাচ্ছে, দরজার কাছে পৌঁছতে নীতিশ ডাকে]

সুমন্ত্র!

[সুমন্ত্র থামে। নীতিশ তার কাছে এগিয়ে গিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দেয়। সুমন্ত্র তার অবশিষ্ট হাতটা দিয়ে করমর্দন করে]

দৃশ্য শেষ হয়]

তৃতীয় দৃশ্য

[মঞ্চ দুটি ভাগে ভাগ করা। একদিকে একটা হতদরিদ্র কুঁড়ে দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকের অংশে কয়েকজন পুলিশ কনস্টেবল, একজন ASI এবং শেষে নীতিশ প্রবেশ করে।]

কনস্টেবল ১ম। এহ্…

কনস্টেবল ২য়। কি হল?

কনস্ ১ম। গোবরে পা পড়ল।

ASI। গোবর তো, আর কিছু তো নয়। ঝেড়ে ফেল।

কনস্ ১ম। পচা গোবর পা চুলকোবে।

নীতিশ। তোমরা আস্তে কথা বল। এত সাবধান হয়ে এতদূরে গাড়ি রেখে এসে শেষকালটায় লোকটা না হুঁশিয়ার হয়ে যায়।

কনস্ ১ম। এতদূরে গাড়ি রাখার কি কোন দরকার ছিল স্যার? গাড়ি তো এইখান অবধিই চলে আসত। শুধুমুদু মাইলটাক হাঁটতে হল আপনাকে।

নীতিশ। এত রাতে গাড়ির আওয়াজ অনেকদূর থেকে শোনা যেত, আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলত পুলিশের Jeep ছাড়া এত রাতে কোন গাড়ি এরকম interior গ্রামে আসতেই পারে না। পাখি উড়ে যেত।

কনস্ ২য়। তবে স্যার লোকটাকে পাওয়া গেলেও মাল কিছু পাওয়া যাবে না। এ ক'দিনে ওসব গয়নাফয়না জ্যাঠার কাছে গালিয়ে ফেলেছে।

নীতিশ। চলো দেখাই যাক। SDO সাহেবের বাড়িতে চুরি—এ তো ফেলে রাখা যায় না।

[পুলিশরা কুঁড়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। নীতিশ খাপ থেকে রিভলবার বার করে, Armed Police-রাও রাইফেল উঁচিয়ে ধরে। তারা নীতিশের ইশারায় দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলে। মঞ্চ থেকে কুঁড়ের বাইরের দেওয়ালও সঙ্গে সরে যায়। ঘরের ভেতরটা দ্যাখা যায়।

একটি ১৮/১৯ বছরের মেয়ে ভীষণ ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ায়। শতছিন্ন পরিধেয় ও জরাজীর্ণ কুঁড়ের দারিদ্র্যলক্ষণ তাহার দেহের বসন্তাগমকে আড়াল করতে পারেনি। ঘরে একটা কুপি জ্বলছে। দুটো পিঁড়ে পাতা। দুটো অ্যালুমিনিয়মের কানা ওঠা কানসিতে খানিকটা নুন ভাত]

নীতিশ। এটা নাসিমুল হকের বাড়ি?

মেয়েটি। হ্যাঁ।

নীতিশ। নাসিমুল তোমার কে হয়?

মেয়েটি। আব্বাজান।

নীতিশ। তোমার নাম কি?

মেয়েটি। সাবিনা।

নীতিশ। তোমার আব্বা কোথায়?

মেয়েটি। জানিনা হুজুর।

কনসটেবল ১ম। [ধমকে] এই—মিছে কথা বলবিনা।

[নীতিশ তাকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দেয়]

নীতিশ। ও তো আজ বাড়িতে এসেছে।

মেয়েটি। না হুজুর। দু'হপ্তা বাড়ি আসেনি।

[একটু চুপ করে থাকার পরে নীতিশ থালা দুটো দেখিয়ে বলে]

নীতিশ। এ দুটো থালা কার জন্যে?

[মেয়েটি ঘাবড়ে যায়

মেয়েটি। একটা আমার আর একটা ওই দাদিমা আসবে তার জন্যে।

নীতিশ। কে দাদিমা?

মেয়েটি। রাতে একা থাকি, তাই পাশের বাড়ির দাদিমা এসে আমার কাছে রোজ শোয়।

ASI। দাদিমার বুঝি বাড়িতে খাওয়া জোটেনা তাই তোর এই মাড়ভাত খায় এসে? এ চালু মেয়ে স্যার। একেই নিয়ে চলুন, তাহলে ওর বাপটা দেখবেন বাপ-বাপ বলে হাজির হবে।

[বলতে বলতে লোকটা মেয়েটির দিকে দুপা এগোয়। মেয়েটি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চট্ করে একদিকে তাকায়, নীতিশ সেটা লক্ষ্য করে]

নীতিশ। ওদিকে কে আছে?

মেয়েটি। কেউ নেই হুজুর—ওদিকে গোয়াল।

ASI। গরু আছে?

মেয়েটি। আগে থাকত। অনেক দিন আগেই বেচে দিয়েছে আব্বা।

নীতিশ। তোমাদের চলে কি করে?

মেয়েটি। আগে ঘরামির কাজ করত আব্বা—এখন টাউনে রিক্সা চালায়।

কনস্ ১। টাউনে গিয়েই তো উন্নতিটা হয়েছে।

মেয়েটি। অনেকদিন সে কাজও নেই।

[নীতিশ গোয়ালের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর মেয়েটির কাছে ফিরে আসে।]

নীতিশ। তোমার আব্বাজানের খোঁজে আমরা পরে আসব সাবিনা। [পুলিশদের] চলো।

[পুলিশরা চলে যায়। সাবিনা গোয়ালের দিকে তাকায়। সাবিনার পিতা মলিন ধূলিধূসর নাসিমুল সেইখান থেকে বেরিয়ে আসে। সাবিনা তার

বুকের ওপর পড়ে কাঁদতে থাকে। মঞ্চের এই দিক অন্ধকার হয়ে যায়। অন্য দিকে আলো জ্বলে ওঠে]

কনস্ ১ম। একবার গোয়ালটা দেখলেন না স্যার ?

কনস্ ২য়। ও চরুয়া সালা জরুর ওইখানে ছিল।

ASI। Criminal-দের দয়া দ্যাখাবেন না স্যার। আজ লোকটাকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলেন, পরে তো ধরার চেষ্টা করতেই হবে। তখন যদি ধরতে না পারি তখন তো না পাবলিক না SP—কেউ রেয়াত করবে না।

নীতিশ। আমি পরের কথা ভাবছিলাম না শ্যামসুন্দর। আমি আগের কথা ভাবছি। এই যে রাতবিরেতে raid করা হয়, গাড়ির খরচ আছে, petrol এর দাম আছে, আমরা তো মাইনে পাই, তার একটা ভাগ ধরো এই কয়েক ঘণ্টার জন্যে—এত কাগজপত্তর লেখালেখি সবেতেই তো পয়সা লাগে —সব মিলিয়ে এইরকম একটা আসামীকে ধরতে সরকারের যে টাকা খরচ হয় তার খানিকটা যদি ওই নাসিমুলকে দিয়ে দেওয়া যেত তাহলে হয়ত ওর চুরিটা করার দরকারই পড়ত না।

ASI। কিন্তু একটা criminal-কে দয়া দ্যাখাতে গিয়ে আমরা নিজেরাই একটা বেআইনি কাজ করে ফেললাম না তো স্যার ?

নীতিশ। জানিনা। হতেও পারে। কাজটা হয়ত আইনমাফিক হল না। কিন্তু অন্যায় কিছু করলাম কি ? কমা ফুল্‌স্টপ পর্যন্ত আইন মেনে এদেশে কটা কাজ হয়। আইনজ্ঞ যাতে আইনের ফাঁক খুঁজে বার করতে পারে সেই জন্যে তো আইন প্রনয়ণকারীরা সেইরকম করেই আইন তৈরী করেন। আমরা যারা আইনের রক্ষক আমরাও তো অনেক সময় সেই রাস্তাতেই চলি। যাই হোক, নাসিমুলকে পরে ঠিকই ধরা যাবে। আজ ওই মেয়েটার চোখে কৃতজ্ঞতার যে দৃষ্টিটা দেখেছি তাইতেই মনে হচ্ছে মানুষ হিসেবে খুব একটা অন্যায় কাজ বোধহয় করিনি !

দৃশ্য শেষ হয়]

চতুর্থ দৃশ্য

[নীতিশের কোয়ার্টারের বাইরের ঘর। কালিকা ভট্টাচার্যের স্ত্রী বিধবার বেশে বসে আছেন। অর্চ্চনাও আছে।]

নীতিশ। কি বলছেন বৌদি ?

কালিকার স্ত্রী। হ্যাঁ। নিয়মভঙ্গ গেল ১৯ তারিখে। ২০ তারিখে নোটিস পেলাম, আজ ২৩ তারিখ ঘর থেকে পাখাগুলো খুলে নিয়ে চলে গেল।

নীতিশ। দাঁড়ান। [টেলিফোন করে] সেনবাবু, আমি নীতিশ রায় বলছি। কালিকা ভট্টাচার্যের স্ত্রী এসেছেন আমার কাছে। ওঁকে quarter ছেড়ে দেবার notice দেওয়া হয়েছে ?…হ্যাঁ accomodation-এর shortage আছে আমি জানি, তাই ব'লে এতদিন চাকরি করার পর লোকটির মৃত্যু হ'লে শ্রাদ্ধশান্তি মিটতে না মিটতেই তার family-কে বাড়ি ছেড়ে দেবার notice দিতে হবে ? কদিন অপেক্ষা করা যেত না ? …নতুন অফিসার এসে গেছে তো কি হয়েছে ? সে কদিন গেস্ট্ হাউসে থাকতে পারে। যেখানে posting-এ quarter থাকে না সেখানে লোকে কি করে ? Private বাড়ি ভাড়া করেও তো থাকে ?…Procedure ? ও, তা notice দেবার তিন দিনের মধ্যে quarter থেকে পাখা খুলে নিয়ে যাওয়াটাও কি procedure-এর মধ্যে পড়ে ? একটা officer এত বছর service করার পর তার family-কে যদি তার মৃত্যুর পরে department এর কাছ থেকে এই ব্যবহার পেতে হয় তাহলে পুলিশের চাকরি করবে লোকে কিসের ভরসায় ?…এ্যাঁ ?…আপনার হাত পা বাঁধা ? কে বেঁধেছে ? তার নাম কি ? procedure ? [ফোন রেখে দেয়] শালা।

অর্চ্চনা। কি বলল ?

নীতিশ। বলছে ওপর থেকে order এলে আমি কি করতে পারি। Procedure দ্যাখাচ্ছে।

কালিকার স্ত্রী। এখুনি যদি কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হয় তাহলে যাবোই বা কোথায় ? মেয়েটার পরীক্ষা হয়ে গেলে না হয় একটা বাড়িটাড়ি দেখে—

নীতিশ। না না, অত তাড়াতাড়ি Quarter আপনাকে ছাড়তে হবে না। কি করে না ছাড়া যায় তারও তো procedure আছে। সেই ব্যবস্থাই না হয় করা যাবে। আর ছাড়বেন যখন একেবারে নিজের বাড়িতে গিয়ে উঠবেন।

অর্চ্চনা। কিন্তু ভাড়াটে বসে গেছে, তারা কি বাড়ি ছাড়বে ?

নীতিশ। Mrs Bhattacharya আসবেন শুনে আমি ভাড়াটেকে ডেকে পাঠিয়েছি। শুধু ভাড়াটে নয়, শিউপ্রসাদ মোহাঙ্কাকেও আমি ডেকেছি। ও ব্যাপারটারও একটা amicable ফয়সালা করা যায় কি না দেখি। [ঘন্টি বাজায়, আর্দালি আসে] সরকারকে গিয়ে বলো তো আমার কাছে যে দুজন লোক এসেছেন তাদের এখানে নিয়ে আসতে।

[এই সময় ধুতি পাঞ্জাবী পরা একজন রাজনৈতিক নেতা ঢুকে আসেন। তাঁর সঙ্গে দুজন কর্মী। নীতিশ উঠে দাঁড়ায়]

নীতিশ। আরে আসুন স্যার, বসুন।

অর্চ্চনা। আমি বৌদিকে নিয়ে ভেতরে গিয়ে বসছি। পরে দরকার হ'লে তুমি ডেকো। [কালিকার স্ত্রীকে নিয়ে অর্চ্চনা ভেতরে চলে যায়]

নীতিশ। বলুন স্যার, কোন গোলমাল আছে নাকি ?

নেতা। হ্যাঁ, একটা ছোটখাটো গোলমাল আপনারা ক'রে ফেলেছেন মনে হচ্ছে। আজ বিকেলে কাছারির মাঠ থেকে একটি ছেলেকে আপনারা arrest করেছেন ?

নীতিশ। কাছারির মাঠে আজ তুমুল বোমাবাজি হয়েছে স্যার।

নেতা। হ্যাঁ, যত সব antisocialদের কাণ্ড। ওরা তো চিরকালই এইরকম গুণ্ডা পুষছে। যাই হোক, যে ছেলেটিকে arrest ক'রেছেন, এরা বলছে ছেলেটি নাকি ভালো ছেলে। Antisocial তো নয়ই, political ছেলে। পার্টির কাজটাজ করে। সেই জন্যেই এরা বলল আপনি নিজে একবার চলুন···

নীতিশ। কি নাম বলুন তো ছেলেটার ?

নেতা। তিলক। [সঙ্গীদের] কি তাই-তো ?

সঙ্গী। তিলক পণ্ডিত।

নীতিশ। ও, পণ্ডিত তিলু ! আপনি ওকে personally চেনেন স্যার ?

নেতা। না – ঠিক personally চিনিনা বটে, তবে খবর রাখি। Party member নয়, তবে আমাদের সঙ্গেই আছে অনেকদিন।

নীতিশ। আপনারা গর্ভমেণ্টে আসার আগে ও আগেকার গর্ভমেণ্টের সঙ্গে ছিল। বেশির ভাগ antisocial-ই এই রকম চিজ্ স্যার। সাপের মুখেও চুমু খাচ্ছে ব্যাঙের মুখেও চুমু খাচ্ছে।

নেতা। আপনি ভুল করছেন মিস্টার রায়। ছেলেটি antisocial নয়। ভদ্রঘরের ছেলে, বিয়ে থা করেছে, সংসার আছে। এরা তো বলছে –

নীতিশ। না, বুঝতে পারছি আপনি নিশ্চয়ই ওকে personally চেনেন না। আপনাকে একটা খবর দিই স্যার। পণ্ডিত তিলুকে যখন arrest করা হয় তখন ওর কাঁধে একটা ব্যাগ ছিল, আর সেই ব্যাগটায় মাত্র ২৬টা বোমা ছিল। হাতে বাঁধা, crude cottage industry product।

নেতা। না, এ কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। Election meating-এ ছেলেটা গিয়েছিল—ওর সঙ্গে তো প্যামফ্লেট বা প্রচারপুস্তিকাটুস্তিকা ছাড়া আর কিছু থাকতেই পারেনা। এরা তো তাই বলছে। আপনি ওসিকে ওকে ছেড়ে দিতে বলুন। কাল court-এ produced হলে তো আর···

নীতিশ। Election যাতে peaceful হয়, law and order যাতে বজায় থাকে voterরা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে তার ঠিকঠিক ব্যবস্থা করার জন্যে আমাদের কাছে DGর circular এসেছে স্যার। কাগজে Honourable Minister-এর Statement তো দেখেছেন, পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে election যাতে free and fair হয় তা ensure করতে হবে, এবং anti-social-দের party affiliation যাই হোক না কেন তাদের antisocial

বলেই treat করতে হবে। আমি আপনাকে assure করছি স্যার আমার ক্ষমতায় যতটুকু আছে আমি করব। পণ্ডিত তিলুকে এবং সবকটা anti-socialকে nonbailable caseই দেওয়া হবে – দেখব যাতে বেশ কিছুদিন তারা বেরতে না পারে।

[এই সময় একজন ASI দুজন লোককে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করে]

নেতা। এটা কিন্তু আপনি বড্ড high handed ব্যাপার করছেন। এরকম হলে তো আমায় মন্ত্রীকে approach করতে হবে···

নীতিশ। সে আপনি নিশ্চয়ই করতে পারেন, আমি কিন্তু Governmentএর declared policy অনুযায়ী এবং law অনুযায়ীই চলছি।

নেতা। [উঠে দাঁড়ায় এবং যেতে গিয়ে থেমে বলেন] আমি আপনাকে unlawful কিছু করতে বলছিনা। কিন্তু humanitarian ground বলেও তো একটা জিনিশ আছে। ছেলেটি গরীব, বাড়িতে বউ আছে। সে বেচারীর কি হবে—ওর যদি by chance সাজা হয়ে যায় ?

নীতিশ। ২৬টা বোমা সমেত ধরা পড়েছে এই রকম একটা antisocialএর কথাটা humanitarian দৃষ্টিতে দেখছেন – কিন্তু আজ ওদের বোমাবাজিতে ওই মিটিং শুনতে যাওয়া একজন নিরীহ citizenএর একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, আমি তার কথা ভাবছি। তারও তো বাড়ির লোকজন আছে, তার রোজগারের ওপর dependent স্ত্রী পুত্র কন্যা আছে···। তিলুকে ছাড়া যাবে না স্যার।

[নেতা তার সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে যায়। নীতিশ শিউপ্রসাদ মোহাঙ্কা ও শ্রী মিত্রকে বলে]

বসুন আপনারা।

[লোকদুটি বসে। ASI ভদ্রলোক নীতিশকে কিছু কাগজপত্র এগিয়ে দেয় – সে সেগুলোয় সই করতে থাকে]

ASI। তাহলে তিলুর caseটা কি হবে ?

নীতিশ। কি হবে মানে ?

ASI। মানে লিখব –

নীতিশ। Of course ; লেখেন নি এখনও ?

ASI। না – মানে, খুব ভীড় ছিল তো—আর party থেকে যে pressure দেবে সেটাও বুঝতেই পারছিলাম, তাই···lock upএই আছে।

নীতিশ। এখুনি গিয়ে লিখে দিন। [কাগজপত্রগুলো দিয়ে দেয়] একটু অপেক্ষা করুন। [হাত দিয়ে চেয়ার দেখায়] Mr Mitra, বলুন কি ভাবলেন ?

মিস্টার মিত্র। এটা আপনারা একটা অন্যায় দাবী করছেন মিস্টার রায়। এখ্খুনি দুম্ করে বাড়ি ছেড়ে দিতে বললে কি ছাড়া যায় ?

নীতিশ। কিন্তু এর মধ্যে এই unfortunate ঘটনাটা তো ঘটে গেছে। মিস্টার ভট্টাচার্য মারা গেছেন। মিসেস ভট্টাচার্যের এখন থাকার জায়গা দরকার।

মিস্টার মিত্র। আমারও তো থাকার জায়গা দরকার। আমি দস্তুরমত lease agreement ক'রে advance দিয়ে বাড়ি ভাড়া নিয়েছি। দু' মাসও হয় নি।

নীতিশ। দেখুন agreement-এর কথা আমি তুলছিনা। তাছাড়া যে agreement-এর কথা বলছেন সেটা in the court of law lease agrrement ব'লে গণ্য হবে না। 21 years-এর কম হ'লে caseটা West Bengal Tenancy Act-এই হবে।

মিস্টার মিত্র। ঠিক আছে, West Bengal Tenancy Act-এই আপনারা eviction-এর case করুন। দ্যাখা যাক কতদিনে ফয়সালা হয়।

নীতিশ। Mr Mitra, case ক'রে কতদিন লাগবে তা আমারও ধারণা আছে। কিন্তু আপনি কাজকর্ম করবেন না ওইসব ঝামেলা সামলাবেন? তাছাড়া বাড়িটা তো after all একজন মৃত পুলিশ অফিসারের বিধবার। সেখানে আপনি যদি মানবিক কারণেও না ছাড়তে চান তাহলে আইনত এখ্খুনি আমরা কিছুই করতে পারি না। কিন্তু আমাদের মানবিক কর্তব্যবোধে আমরা কিন্তু পুলিশ হিসেবে অনেক কিছুই করতে পারি। আপনি নতুন এসেছেন এ শহরে। জলে বাস করে কি কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করাটা উচিৎ হবে? [একটু স্তব্ধতার পর] তবে সেসব বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে আমরা যেতে চাই না। একজন অসহায় বিধবার কথা ভেবে আপনি দয়া ক'রে বাড়িটা ছেড়ে দিন। আপনার জন্যে অন্য বাড়ি আমরাই ব্যবস্থা ক'রে দেব।

মিস্টার মিত্র। [একটু ভাবনার পরে] ঠিক আছে। একমাস সময় দেবেন তো?

নীতিশ। অবশ্যই। আপনাকে বাড়ি খুঁজে দিয়ে আপনার পছন্দ হ'লে তবে আপনি উঠে যাবেন।

মিস্টার মিত্র। O.K. I agree.

নীতিশ। Thank you very much। আপনার এ উপকার আমরা ভুলব না।

মিস্টার মিত্র। আমি উঠি মিস্টার রায়।

নীতিশ। আচ্ছা। [মিস্টার মিত্র চলে যায়। নীতিশ মোহাঙ্কাকে বলে] মিস্টার মোহাঙ্কা, আপনি তো জানেন কালিকা ভট্টাচার্য মারা গেছেন?

মোহাঙ্কা। হ্যাঁ, মিস্টার রায়। কালিকাবাবুর মৃত্যুতে বহুত্ দুখ হোল।

নীতিশ। ওর যে টাকাটা আপনার কাছে খাটত তার একটা হিসেব তো আপনার কাছে আছে। সেটা কত টাকা?

মোহাঙ্কা। কোন সে টাকার কোথা বলছেন?

নীতিশ। কালিকাবাবুর যে দু'নম্বর টাকাটা আপনার দু'নম্বরি money lending-এর ব্যবসায় খাটত সেইটের কথা বলছি। আমি যে হিসেবটা পেয়েছি— [ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বের করে দ্যাখে] সেটা হল দু'লাখ পঞ্চাশ হাজার, প্লাস এই পাঁচ সপ্তাহের interest।

মোহাঙ্কা। Mr Ray—you must be misinformed! আপনাকে কে কি বলিয়েছে জানিনা—মিস্টার কালিকা ভোট্টাচারিয়া স্রিফ আমার বন্ধু ছিলেন, বিজনেস পার্টনার ছিলেন না।

নীতিশ। আপনার through-তে ওর টাকা খাটত না?

মোহাঙ্কা। কোথোনা না। Never। উনার সাথে আমার লেনদেনের কৌন সম্বন্ধই ছিল না। He was a friend। কোথোনা কোথোনা দেখা সাকষাত্ হত—উনি আসতেন সমঝিয়ার পর drinks বাগারা হত—পর ই সব ওর cancer হোবার আগের বাত।

নীতিশ। কালিকা ভট্টাচার্যের টাকা আপনার কাছে আছে।

মোহাঙ্কা। একটা নয়া পয়সা ভি নেই। পরন্তু উনার treatment-এর সময় আমার কাছে দো একবার রূপেয়া উধার করিয়েছেন। পর সে ছোড়িয়ে দিন—friendএর অসুখে সে টাকা দিয়েছি ধরে নিন, as a friend দিয়েছি—I dont want that money.

নীতিশ। কালিকাবাবুর অসুখের সময় যে দশ হাজার টাকা আপনি দিয়েছিলেন এই হিসেবের মধ্যে সে টাকাটা ধরা আছে।

মোহাঙ্কা। Mr Ray, এ হিসাব আমি কুচ্ছু বুঝলাম না। মিস্টার ভোট্টাচারিয়ার সাথে আমার রূপিয়া পয়সার কৌন লেনদেন ছিল না—কৌনদিন।

নীতিশ। আপনি টাকাটা মিসেস ভট্টাচার্যকে ফেরত দেবেন না দেবেননা?

মোহাঙ্কা। আমার কাছে উনার টাকা থাকলে তব না ফেরত দিবার কোথা হচ্ছে…

নীতিশ। [ASI-কে] একে lock up-এ নিয়ে যান।

মোহাঙ্কা। Sir?

নীতিশ। Lock up-এ নিয়ে যান—এখুনি। Theft extortion আর cheating-এর যতগুলো section আছে 378, 383, 415 থেকে 20 অবধি সবকটা case দিয়ে দিন!

মোহাঙ্কা। This is highly illegal sir; you cannot do this—

নীতিশ। Legal illegal পরে court-এ decided হবে। আপাতত I can do this [ASI-কে] যান নিয়ে যান।

ASI। চলুন উঠুন।

মোহাঙ্কা। ইয়ে বহৎ বুরি বাত্ হ্যায়। মেরা পাস ভোট্টাচারিয়াকা কোই রূপেয়া

নাহি থা। আপলোগ জুলুম করকে হম্‌সে রুপেয়া লেনা চাহতে হে। ফির হমে ইত্‌না ডরপুক্ মত্‌ সমঝিয়ে।

নীতিশ। আর confession-এর জন্যে ভালোমত ব্যবস্থা করবেন।

ASI। ঠিক আছে স্যার।

[ASI মোহাঙ্কাকে নিয়ে চলে যায়। আর্দালি এসে একটা Visting card দেয়]

নীতিশ। ডক্টর আবদুর মান্নান? নিয়ে এস—

[আর্দালি একজন ভদ্রলোককে নিয়ে আসে]

কি ব্যাপার বলুন।

আবদুর। ব্যাপারটা খুব confidential।

নীতিশ। [আর্দালিকে] তুমি যাও। [আর্দালি চলে যায়]

আবদুর। আমি ইব্রাহিমপুরে practise করি। তার কাছেই ফুলতলা গ্রামে আমার বাড়ি। আমার বাবা আতাউর মান্নান ও অঞ্চলে খুব নামকরা লোক। আমাদের পরিবার বেশ অবস্থাপন্ন বলতে পারেন। এখন খানিকক্ষণ আগে আমি একটা খবর পেলাম যে গনা মুহুরি আজ সন্ধ্যেবেলায় আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে ডাকাতি করবে।

নীতিশ। কোত্থেকে খবর পেলেন?

আবদুর। আমার একটি পেশেন্ট-এর কাছ থেকে। লোকটির নাম এজামুদ্দিন। এর বাড়ি আমার কাছেই পশ্চিমপাড়ায়। এ নিজেও মোটামুটি গনা মুহুরির দলেরই লোক বলতে পারেন—criminalই। তবে আমি একবার ওকে ম্যালিগনান্ট ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করে সুস্থ করেছিলাম, তাই লোকটি আমাকে খুবই খাতির করে, শ্রদ্ধা করে। আজ সকালেই গনা ওকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছে যে আতাউর মান্নানের বাড়ি আজ সন্ধ্যেবেলায় কাজ হবে, ও যেন আসে। লোকটা তখন আমার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত বলে যে ওর শরীর খুব খারাপ যেতে পারবে না, তারপর আমাকে এসে সব ব'লে দেয়। আমি আব্বাজানকে বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিয়েই ছুটতে ছুটতে আপনার এখানে আসছি।

নীতিশ। আপনাদের বাড়িতে male member কজন?

আবদুর। সে ভাইবেরাদার ছেলেপিলে নিয়ে ৭/৮ জন তো বটেই।

নীতিশ। পুলিশ না গেলে তারা গগন মুহুরিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না?

আবদুর। কি বলছেন স্যার, তা কি সম্ভব? ওরা কতজন আসবে তার কি ঠিক আছে! তাদের প্রত্যেকের কাছে বন্দুক বা পিস্তল থাকবে—আর আমাদের বাড়িতে একটা মাত্র বন্দুক, কোনদিন চালানো হয় না বলে টোটাগুলোও বোধকরি নষ্ট হয়ে গ্যাছে।

নীতিশ। বন্দুকের license-টা কার নামে?

আবদুর। আব্বাজান—আতাউর মান্নানের নামে।

নীতিশ। হুঁ, বন্দুক থাকলে তো গগন মুহুরি সে বাড়িতে হানা দেবেই। ইব্রাহিমপুর থানায় জানিয়েছেন তো?

আবদুর। না স্যার। ওইটে করিনি। আপনাকেও একটাই request, যা করবার local থানাকে না জানিয়ে করুন।

নীতিশ। কেন? local থানার OC যদি গগনের মত একটা criminal-কে ধরার সুযোগ পেয়ে—

আবদুর। আপনাকে বললে আপনি হয়ত প্রত্যয় যাবেন না কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন—আমি দায়িত্ব নিয়েই বলছি—OC গনার থেকে—OC গনার বন্ধু স্যার। ওঁকে কিছু জানালে গনাও জেনে যাবে।

নীতিশ। এই রকম দু চারটে লোকের জন্যে লোকে ভাবে Criminalদের সঙ্গে পুলিশের যোগসাজস আছে। রাতের পর রাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে এত জীবন বিপন্ন করে কাজ করেও সাধারণ মানুষের যে পুলিশ সম্পর্কে এত অবিশ্বাস সে তো এইরকম কিছু লোকের জন্যেই। যাক্‌গে—ঠিক আছে, যা করার আমি Head Quarter থেকেই করব। আপনি ফুলতলায় চলে যান, আপনার বাবাকে বলুন গিয়ে আমরা বিকেলের মধ্যে পৌঁছে যাব। এবং আমরা যে যাচ্ছি সে খবর এখ্‌খুনি কাউকে যেন না বলেন।

আবদুর। থানায় আব্বাজান খবর দেবেন না। ওঁরাও জানেন—

নীতিশ। না না শুধু থানা নয়, গ্রামেও কোন লোককে কিছু বলার দরকার নেই। আপনি শুধু alert থাকবেন আমাদের receive করার জন্যে। আপনি তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে যান [আবদুর উঠে দাঁড়ায়] দাঁড়ান, আপনাদের গ্রামের direction-টা একটু বুঝিয়ে দিন তো [একটা road-map খুলে টেবিলে রাখে—আবদুর বুঝিয়ে দেয়]

আবদুর। এই জায়গাটার নাম পাগলাডাঙা। সোজা গেলে ইব্রাহিমপুর, সোজা যাবেন না; এইখান থেকে এই যে জেলাপরিষদের রাস্তাটা ডান দিকে গেল—এইটে দিয়ে মাইল চারেক গেলেই ফুলতলা। আমি যাচ্ছি স্যার। তাহলে আমি···

নীতিশ। হ্যাঁ আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি নিজে যাব।

আবদুর। Thank you Sir :

[আবদুর চলে যায়। ASI ভদ্রলোক প্রবেশ করে]

ASI। হয়ে গেছে স্যার। প্রথমে খুব ট্যাণ্ডাইম্যাণ্ডাই করছিল, তারপর আমি যখন রামস্বরূপ জমাদারকে ডাকলাম ওর চেহারা দেখেই লোকটা কেঁদে সব বলে দিল। সব টাকা দিয়ে দেবে বলেছে। সাতদিন সময় চেয়েছে।

নীতিশ। [ডাকে] অর্চ্চনা, এ-ঘরে এস তোমরা।

ASI। আমি ওকে দিয়ে মিসেস ভট্টাচার্যের নামে একটা promisory note লিখিয়ে নিয়েছি।

[নীতিশকে একটা কাগজ দেয়]

নীতিশ। Thank you, আপনি যান।

[ASI চলে যায়। অর্চ্চনা ও মিসেস ভট্টাচার্য প্রবেশ করে]

Good news। Mr Mitra বাড়ি ছেড়ে দেবে বলেছে, তবে ওকে আর একটা বাড়ি দেখে দিতে হবে। সেই সময়টুকু চেয়েছে। আর এই নিন, এটা মোহাঙ্কা লিখে দিয়েছে। ও টাকা ফেরৎ দেবে সাতদিনের মধ্যে।

কালিকার স্ত্রী। কি বলব আপনাকে··· ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, আর কি বলব···

নীতিশ। কিছু বলার দরকার নেই। টাকাটা পেলে এবারে আর বেশি interest-এর কথা না ভেবে Unit Trust-এ একটা Monthly Income Scheme-এ টাকাটা রেখে দেবেন বৌদি। একটা steady income থাকবে।

কালিকার স্ত্রী। যা করার আপনার পরামর্শ মতই করব। অর্চ্চনা, আমি আসি ভাই।

[কালিকার স্ত্রী চলে যায়]

অর্চ্চনা। কি করে এদের manage করলে?

নীতিশ। ঠিক যে আইন মেনে করলাম তা বলতে পারছি না। একটু চাপ দিতে হল।

অর্চ্চনা। ভয় দ্যাখালে?

নীতিশ। বলতে পারো। মোহাঙ্কাকে lock up-এও পুরতে হল। তার আগে তো বেমালুম অস্বীকার করছিল ওর কাছে টাকা আছে।

অর্চ্চনা। Lock up-এ পুরলে কি অভিযোগে? টাকা cheat করার জন্যে?

নীতিশ। টাকাটা তো জুনম্বরি – রিসিট-টিসিটও তো ছিলনা। তা নিয়ে তো case করা চলে না। অনেকগুলো ধারায় case করা হবে বলে ভয় দ্যাখালাম। সেগুলো পরে court-এ টিকুক বা না টিকুক, আপাতত হাজতবাস কি হ্যারাসমেন্টকে তো বেশির ভাগ লোকই ভয় পায়।

অর্চ্চনা। লোকটা যদি পরে তোমার নামে case করে?

নীতিশ। পরে দ্যাখা যাবে। তবে করবে না। কাঁচের ঘরে বাস করে ঢিল ছোঁড়া চলে না। ওর নিজের অনেক জুনম্বরি কারবার আছে।

অর্চ্চনা। তাহলেও তোমার দিক থেকে তো তুমি ঠিক আইনমাফিক কাজ করলে না?

নীতিশ। হ্যাঁ, তা বলতে পারো। সুমন্ত্র সেদিন বলছিল আইন-কানুন মেনে এই

system-এ ভালো কাজও করা যায় না। I think he has a point there–

অর্চ্চনা। তুমি কি তোমার principle-গুলো থেকে সরে যাচ্ছ?

নীতিশ। জানিনা। তবে অর্চ্চনা, এই সব principle-এর ব্যাপারে ইদানীং আমার অনেক সব খটকা লাগছে। কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায়—মাঝে মাঝে যেন বুঝতে পারি না। কালিকা ভট্টাচার্যের ব্যাপারটাই ধরো না। ওঁর কথা থেকে যখন বুঝতে পেরেছিলাম যে ভদ্রলোক ঘুষ খেতেন তখন ভেতরে ভেতরে একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম বৈকি। Infact—বুঝতে পারছিলাম না ওই জুনম্বরি টাকা বা ঘুষের টাকায় কেনা বাড়ি উদ্ধারের চেষ্টা করাটা উচিৎ বা অনুচিত। তবু, terminal illness-এ ভুগছে এরকম একজন সহকর্মীর অনুরোধ রাখতে খানিকটা ইচ্ছের বিরুদ্ধেও তো কাজটা করলাম। তবে এখন মনে হচ্ছে যে দেশে corruption-টা কোন ঘটনাই নয়, way of life—সেখানে লোকটা কি এমন মারাত্মক অপরাধ করেছে? ঘুষের টাকায় বাড়িটা করেছিলেন বলেই তা department-এর এই দুর্ব্যবহারের সময় ওঁর family-কে রাস্তায় দাঁড়াতে হল না। জুনম্বরি টাকাটা থাকছে বলে মেয়ের বিয়ের সময় তো ওঁর স্ত্রীকে আতান্তরে পড়তে হবে না। তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে honest থাকলেই বিপদ—dishonest হলে তবেই এই সমাজে টেঁকা যাবে!

[আর্দালির প্রবেশ]

আর্দালি। একটি মেয়ে দ্যাখা করতে চাইছে। বলছে পার্টি অফিস থেকে এসেছে।

নীতিশ। নিয়ে এসো। [আর্দালি চলে যায়] যেখানে আইন মেনে চললে অন্যায়ের প্রতিকার হয় না, সেখানে আইন রাখব না ন্যায় রাখব বুঝে উঠতে পারি না।

অর্চ্চনা। চারপাশে যা দেখছি তাতে এসব প্রশ্ন আমারও মনে আসে। কিন্তু আমি এসব নিয়ে বেশি ভাবতে চাইনা। ভাবলে তো কোন সমাধান দেখতে পাইনা। তাই নিজে ছোটবেলা থেকে যা শিখেছি সেই মতই নিজের principle-গুলো ধরে থাকার চেষ্টা করি। আমি চাই তুমিও সেই রকমই থাকবে। জেনেশুনে কখনও অন্যায় করবে না।

[একটি বছর ২৫/৩০-এর মেয়ে ঢুকে আসে]

নীতিশ। কি ব্যাপার বলুন তো?

মেয়েটি। আমাকে পার্টি অফিসে বলল আপনার কাছে আসতে। আপনার হাতেই সব—আপনি আমার স্বামীকে ছেড়ে দিন কাকু।

নীতিশ। তোমার স্বামী···?

মেয়েটি। তিলক পণ্ডিত। ওর জেল হ'লে আমি কোথায় যাব—আমার পেট চলবে কি করে?

নীতিশ। স্বামী যখন গুণ্ডামি করে, বোমাবাজি করে তখন তাকে ঠেকাতে পারো না?

মেয়েটি। অনেক বুঝিয়েছি কাকু। বলেওছে আর এসব করবে না। কিন্তু যেই ওরা ডাকতে আসে আবার চলে যায়। ওর রোজকারেই তো চলে, ওকে ছেড়ে দিন কাকু। নইলে আমাকে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

অর্চনা। তোমার বাবা মা নেই?

মেয়েটি। তারা আমার মুখ দ্যাখেনা; তাদের অমতে বিয়ে করেছিলাম তো। বলে—সমাজবিরোধীকে কিছুতেই জামাই বলে পরিচয় দিতে পারবেনা।

নীতিশ। তোমার নাম কি?

মেয়েটি। বেলা।

নীতিশ। দ্যাখো বেলা, তোমার স্বামীকে ছাড়া আমার হাতে নয়। আদালত যদি ছাড়ে তো ছাড়বে। আমরা ওকে ছাড়তে পারি না।

মেয়েটি। তাহলে আমায় এইখানে রেখে দিন। একা আমি ওইখানে থাকতে পারবোনা। আমি কাকীমার সব কাজকর্ম করে দেব—রান্নাবান্না, বাসনমাজা, কাপড়কাচা—

অর্চনা। না না, আমার সব কাজ করার লোক আছে, আমার বাড়িতে তুমি কি কাজ করবে? শোন, তুমি বাড়ি যাও। আমি ওঁকে বলে দিচ্ছি ওঁদের লোক তোমার খবর রাখবে, কোন অসুবিধে থাকলে আমাদের জানাবে…[নীতিশকে] তোমার ব্যাগটা দাও তো। [নীতিশ ব্যাগ দেয়, অর্চনা ১০০ টাকার নোট বের ক'রে বেলাকে দেয়] এই নাও, আপাতত এটা রাখো, পরের সপ্তাহে আবার এসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।

[মেয়েটি প্রণাম করে চোখের জল মুছতে মুছতে চলে যায়]

নীতিশ। শোন—বেরোচ্ছি। একবার SP-র কাছে যেতে হবে, তারপর একটা কাজে খানিকটা দূরেই যেতে হবে; রাত্রে ফিরতে দেরী হতে পারে, চিন্তা কোরোনা।

অর্চনা। [ব্যাগ ফেরত দিয়ে] এই নাও।

নীতিশ। সংসার চালাতে তোমার কালঘাম ছুটে যাচ্ছে, আর যত টাকা নাকি একে তাকে দিয়ে আমিই নয়ছয় করছি?

[নীতিশ হাসে। অর্চনাও স্মিত হাসি হাসে।]

দৃশ্য শেষ হয়]

পঞ্চম দৃশ্য

[S. P.-র অফিস। নীতিশ ও S. P. কথা বলছে]

S. P.। Information-টা reliable?

নীতিশ। হ্যাঁ স্যার। গগনের দলেরই একটি লোক খবরটা দিয়েছে। ডাক্তার সম্বন্ধে মানুষের একটা gratitude থাকে তো। এ খবর jenuine হতে বাধ্য।

S. P.। কিন্তু আপনি কেন যেতে চাইছেন না? Local P S তো এক্ষেত্রে অনেক effective action নিতে পারে। ওরা রাস্তাঘাট জানে; যেদিক থেকে গনার gang আসতে পারে তা ওরা জানবে। মান্নান সাহেবের বাড়ি attack করার আগেই তো ওরা তাদের encounter করতে পারে। আর possible escape route-ও ওরাই বুঝতে পারবে। সেগুলো seal করে রাখতে পারবে।

নীতিশ। কিন্তু স্যার। ডাক্তার মান্নান insist করছেন local PS-কে না জানাতে। উনি দায়িত্ব নিয়ে আমায় বলেছেন—they have a link with গগন।

S. P.। [একটু চুপ করে থাকার পর] আপনার plan of action-টা কি?

নীতিশ। আমি নিজে যাব। সঙ্গে Circle Inspector নওসাদ সাহেবকে নেব। উনি একটু elderly হলেও জনা চারেক শক্ত সমর্থ young constable সঙ্গে নেব। সকলেই plain clothes-এ যাব।

S. P.। Arms থাকবে তো?

নীতিশ। হ্যাঁ, তবে small arms। সকলের কাছেই revolver থাকবে। Jeep টা চারপাঁচ মাইল দূরে রেখে যাব। আমরা bank-এর staff, মান্নান সাহেবের কাছে loan repayment-এর ব্যাপারে এসেছি এই রকম একটা pose করব। আজকাল অনেক গ্রামেই এরকম bank-এর staff যাতায়াত করে।

S. P.। কিন্তু bank-এর staff pose করার কি দরকার?

নীতিশ। যদি বাড়ির direction জিগেশ করতে হয় কাউকে এবং তখন যদি আমরা কারা কোথা থেকে আসছি এসব প্রশ্ন করে তাহলে তো আমাদের একটা explanation লাগবে। মান্নান সাহেবের বাড়িতে পৌছে গেলে তখন তাঁকে আমাদের আসল পরিচয়টা দেব। এবং তিনি নিশ্চয়ই আমাদের লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। আমরা একদম সাড়াশব্দ না ক'রে গগনের gang-এর জন্য অপেক্ষা করব। এবং আমার বিশ্বাস এই ফাঁদে ওরা পা দেবেই—ওদের ধরা যাবেই। যদি গুলি-টুলি চালায় তার জন্যে তো আমরা তৈরীই থাকলাম। এবার ওকে ফিরতে হচ্ছে না।

S. P. । আপনি বলছেন বটে কিন্তু আমি ঠিক·· এই gang-টা ভীষণ dangerous। গত তিনমাসে আটটা বাড়িতে ডাকাতি করেছে। লুটপাট তো করেইছে, তিনটে খুন করেছে। বন্দুক ছিনতাই করেছে প্রত্যেকটি বাড়ি থেকে। না না না, আপনি যা plan করেছেন কোন কারণে যদি সেটা বানচাল হয়ে যায়, তখন তো আর আপনি কতখানি risk নিয়েছিলেন তা লোকে দেখবে না। আবার পুলিশকে গালাগাল করতে থাকবে। কাগজে কাগজে লেখা হবে···না, ওভাবে যাওয়া ঠিক নয়। At all যদি যান আপনি আরও কয়েকজন officer এবং আরও বেশি force নিয়ে যান।

নীতিশ। কিন্তু গগনের modus operandi analyse করলে আমার plan টাই আপনি approve করবেন স্যার। গগন যে বাড়ি attack করে সে বাড়িতে বন্দুক থাকে। এই বাড়িতে আছে। ও invariably সন্ধ্যেবেলায় attack করে কারণ সাধারণত ওই সময়টা বাড়ি সব থেকে unguarded। কেউ কিছু বোঝার আগেই ও দলবল নিয়ে একেবারে শোবার ঘরে ঢুকে গিয়ে বন্দুকটা হস্তগত করে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা তো prepared থাকব। ও আসবে এবং আমাদের ফাঁদে পা দেবে। বেশি লোক নিয়ে গেলে ও somehow জেনে যাবে। ওই গ্রামে নিশ্চয় এমন কেউ আছে যার কাছ থেকে ও মান্নানের বাড়ির খবরটা পেয়েছে। সেই লোকই ওকে আমাদের সম্বন্ধে alert করে দেবে। সেইজন্যেই কম লোক নিয়ে plain clothes-এ যাওয়ার কথা ভেবেছি। তাছাড়া আমরা তো থাকব বাড়ির ভেতরে, গগন থাকবে বাইরে—সে advantage-টা আছে। ডাক্তার মান্নানও থাকবেন।

S. P. । এই ডাক্তার ভদ্রলোক কোথায়?

নীতিশ। তাঁকে গ্রামে চলে যেতে বলেছি। আমরা যাওয়ার অনেক আগেই পৌঁছে যাবেন।

S. P. । ঠিক আছে, রাত নটার মধ্যে আপনার কাছ থেকে খবর না পেলে আমি কিন্তু বড় force পাঠিয়ে দেব।

নীতিশ। Thank you Sir। ও, আর একটা ব্যাপার। আমি এখানকার থানা থেকেও force নিচ্ছিনা। Police lines থেকে নেব।

S. P. । As you wish. Good luck.

দৃশ্য শেষ হয়]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[আতাউর মান্নানের বাড়ি। মঞ্চের সম্মুখ ভাগে আতাউর নমাজ পড়ছিলেন। মঞ্চের পিছনের দরজা দিয়ে নীতিশ ও তার দলবল ঢুকে আসে]

নওসাদ খান। সেলাম আলেকম।

আতাউর। আলেকম আসলাম।

[আতাউর নামাজ শেষ করে একটু ত্রস্ত ভাবে উঠে আসেন]

নওসাদ খান। আপনি নিশ্চয় জনাব আতাউর মান্নান?

আতাউর। হ্যাঁ, কিন্তু আপনাদের তো···?

নওসাদ। ডাক্তার আবদুর মান্নান আছেন তো?

আতাউর। না, সে তো বাড়ি নেই···

নীতিশ। সে কি? ডাক্তার মান্নান এখনও আসেন নি?

আতাউর। না, তবে এখনি এসে পড়বে নিশ্চয়। আপনাদের পরিচয় তো পেলাম না?

নওসাদ। ইনি DSP Head Quarter মিস্টার নীতিশ রায়। আমি সার্কেল ইন্‌স্‌পেকটর নওসাদ খান।

আতাউর। মানে আপনারা পুলিশ অফিসার? কিন্তু আপনাদের পোশাক দেখে তো···

নওসাদ। আমাদের আসার ব্যাপারে ডাক্তার সাহেব কিছু জানান নি?

আতাউর। নাঃ।

নীতিশ। ও, আমার তো ধারণা ছিল এতক্ষণে উনি গ্রামে ফিরে আমাদের কথা জানিয়ে রাখবেন।

আতাউর। সে তো সেই ভোরবেলা প্র্যাকটিসে বেরিয়েছে, এখনও তো ফেরেনি।

নওসাদ। আপনার বাড়িতে যে একটা ডাকাতি হবার সম্ভাবনা আছে এখবরটা উনি জানিয়েছেন তো?

আতাউর। অ্যাঁ, হ্যাঁ। খবর একটা পাঠিয়েছিল বটে, তবে যে লোকটি খবরটা নিয়ে এসেছিল ওর কম্‌পাউন্‌ডার—সে লোকটি নেশা ভাঙ করে, তার কথায় ঠিক—আর আবদুর যে এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছে তাও তো জানায়নি।

নীতিশ। শুনুন, ডাক্তার মান্নান আমার কাছে এসেছিলেন। ওঁর কাছে খবরটা শুনে আমি নিজে এসেছি আপনাদের safety-র ব্যবস্থা করতে এবং এই গগন মুহুরির দলটাকে ধরতে।

[এই সময় বাইরে থেকে একজন যুবক ঢোকে—সে আতাউরের আর-এক ছেলে, আবুল]

আবুল। আব্বাজান, একটা ব্যবস্থা করে এসেছি। ডিফেন্স পার্টি তৈরী। আমাদের বাড়ি থেকে বন্দুকের আওয়াজ করলেই একেবারে রইরই করে ছুটে আসবে।

আতাউর। রাখো তোমার ডিফেন্স পার্টি। সব জানা আছে কে কত বীর। সেবারে যখন মীরপাড়ায় ডাকাতি হ'ল তখন তো মিয়ারা সব বিবিদের আঁচলের তলায় গিয়ে শুয়েছিলেন।

আবুল। না না, এবারে দেখবেন সব অন্যরকম। লাঠি-বল্লম শড়কি নিয়ে সবাই তৈরী। ফয়েজ শেখের কে একজন পূর্বপুরুষ আলিবর্দির ফৌজে লড়াই করেছিল না, তাঁর একখানা তলোয়ার ওদের বাড়িতে আছে। বলেছে সেইটে নিয়ে আসবে।

আতাউর। ফয়েজ শেখ? ও তো ধমক দিলে কেঁদে ফেলে। গরু চরানোর ফাবড়া ছুঁড়তে পারে না ও চালাবে তলোয়ার? যাক্‌গে এঁরা এসেছেন, দেখি কোন ব্যবস্থা যদি সত্যিই করতে পারেন। তবে [নীতিশকে] আপনারা পুলিশের লোক, ডাকাত ধরতে এসেছেন। কিন্তু সঙ্গে বন্দুক নেই, কি করে মোকাবিলা করবেন?

আবুল। এঁরা পুলিশের লোক আব্বাজান?

আতাউর। হ্যাঁ তাইতো বলছেন। ইনি DSP মিস্টার রায়—ইনি সার্কেল ইনস্‌পেক্টর নওসাদ খান।

আবুল। তাজ্জব ব্যাপার। একটু আগে রথতলায় ওঁরা আমাদের বাড়ির direction জানতে চাইছিলেন—কোত্থেকে আসছেন জিজ্ঞাসা করায় বললেন ওঁরা ব্যাঙ্কের এস্টাফ। বাড়িতে ঢুকে পড়েই ব্যাঙ্কের এস্টাফ পুলিশ হয়ে গেল?

নীতিশ। শুনুন ভাই—গ্রামের লোক যাতে আমাদের পুলিশ বলে চিনতে না পারে সে জন্যেই ব্যাঙ্কের staff বলে পরিচয় দিতে হয়েছিল।

আবুল। কথার চোটে মানুষ চিনি দৌড়লে চিনি ঘোড়া
দূর থেকে সেপাই চিনি পরলে জামা জোড়া।

গ্রামের লোক চিনতে পারলে অসুবিধে হয় তো চোর ডাকাতের, পুলিশের হবে কেন? জিপ নেই উর্দি নেই—পুলিশ?

নওসাদ। শুনুন—আপনার সব কথার উত্তর পেয়ে যাবেন আপনার বড় ভাই এলে। এখন আর একদম সময় নেই, গগন মুহুরি এসে পড়ার আগে আমাদের কাজটা করতে দিন। আপাতত আমাদের বলুন তো এই দরজা ছাড়া আর কোন দরজা আছে এ বাড়িতে ঢোকার? খিড়কি তো নিশ্চয়ই একটা আছে?

আবুল। দেখুন—আপনাদের সঠিক পরিচয় না জানলে আমরা কিছুই বলতে

পারবো না।

নীতিশ। আপনারা কেন বুঝছেন না আপনাদের বিপদেই আমরা সাহায্য করতে এসেছি। গগন মুহুরির দল বাড়ি চড়াও করলে আপনারা কি তাদের রুখতে পারবেন? দয়া করে আমাদের সঙ্গে একটু সহযোগিতা করুন, তাতে আপনাদেরই উপকার হবে:

আবুল। হুঁঃ! মুখমে শেখ ফরিদ
বগলমে ইঁট!

আব্বাজান আমি গিয়ে দেখি ডিফেন্স পার্টি রেডি হল কিনা।

নওসাদ। না না, আপনি এখন বাইরে যাবেন না।

আবুল। যাবো না মানে? আপনারা কি জবরদস্তি আমাকে আটকাবেন না কি?

নওসাদ। আপনি এরকম ছেলেমানুষি করলে জবরদস্তিই আপনাকে আটকাতে হবে।

আবুল। পড়েছি দজ্জালের হাতে
খানা খেতে হবে সাথে।

আতাউর। থামো। আবদুর যখন এঁদের খবর দিয়েছে তখন এঁদের বিশ্বাস করতেই হবে। তবে আপনারা নিরস্ত্র অবস্থায় কতদূর কি করতে পারবেন তা তো বুঝছি না।

নওসাদ। আমরা নিরস্ত্র নই।

[রিভলবার বের করে দেখায়]

আবুল। ও বাবা, বাহিরেতে সাদা সাজ—ঢাকা আছে ঢাকাই কাজ! এতো আরও dangerous ব্যাপার।

নওসাদ। Dangerous ব্যাপারটা যে কোথায় আপনিই বুঝতে পারছেন না ভাইসাহেব। গাঁয়ের অশিক্ষিত লোক না বুঝতে পারে, আপনি শিক্ষিত লোক—পুলিশ সাদা পোশাকেও থাকে আপনি জানেন না? আমাদের অবিশ্বাস না করে বাড়িতে ঢোকার দরজাগুলো একটু দেখিয়ে দিন, আমরা সেগুলো বন্ধ করব।

আতাউর। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনারা যা করতে চান করুন। যাও আবুল—খিড়কি আর গোয়ালের দরজা দুটো দেখিয়ে দাও।

নওসাদ। [কনসটেবলদের দুজনকে] দুজন এস তোমরা। [নীতিশকে] দুটো entry point-এই gaurd থাক স্যার?

নীতিশ। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এই main door-টায় আমরা চারজন থাকব। [নওসাদ কনসটেবল দুজন ও আবুলকে নিয়ে বেরিয়ে যায়] মান্নান সাহেব, অন্দরে যারা আছেন তাদের বলুন দোতলায় শোবার ঘরে চলে যেতে।

সবাই দোতলার দরজা বন্ধ করে থাকে যেন। কোন কারণে যদি firing করতেই হয়—

আতাউর। এই যে আবদুরের মা, শুনছ? তোমরা সবাই ওপরে চলে যাও।

[মহিলারা অর্থাৎ আতাউরের প্রৌঢ়া স্ত্রী, পুত্রবধূ কোলে বাচ্চা, মেয়ে-পরিচারিকা সবাই বেরিয়ে আসে]

আতাউরের স্ত্রী। আবদুরের বাবাকে কি বাহাত্তুরে ধরল? জানা নেই শোনা নেই একেবারে ঘরের মধ্যে এনে তুললেন? আপনার কি মাথা খারাপ হল? টকের ভয়ে পালিয়ে কি কেউ তেঁতুলতলায় বাস করে?

আতাউর। এঁরা সদরের পুলিশ অফিসার। আবদুরের কথায় আমাদের জান-মান বাঁচাতে এসেছেন। যাও ওপরে যাও, গিয়ে ঘরে খিল এঁটে থাকো সবাই।

আতাউরের স্ত্রী। আবদুরের নাম করে এসেছেন, আবদুর আসা অবধি অপেক্ষা করুন না কেন?

আতাউর। ততক্ষণে যা সব্বোনাশ হবার হয়ে যাবে আবদুরের মা। যা বলছি তাই করো।

[সন্দিগ্ধ মহিলারা সাজগোজ করতে করতে ওপরে চলে যায়। ইতিমধ্যে আবুল ও নওসাদ ফিরে এসেছে। আবুলও ওপরে চলে যায়।]

নীতিশ। [আতাউরকে] আপনিও ওপরে গিয়েই থাকুন। বন্দুকটা টোটা ভরে ready রাখবেন। দরকার হয়ত লাগবেনা, তবু···

[আতাউর চলে যায়। পুলিশরা অপেক্ষা করতে থাকে। দূরে কুকুর ডাকছে]

১ম কনসটেবল। কুকুর ডাকছে।

২য় কনসটেবল। তো কি হয়েছে?

১ম কনসটেবল। মানে, কেন ডাকছে তাই ভাবছি।

২য় কনসটেবল। খিদে পেয়েছে তাই।

১ম কনসটেবল। না না, গনা ওস্তাদকে দেখে ডাকছে কিনা ভাবছি।

নওসাদ। কুকুরের ডাক নিয়ে তোমার ভাবার দরকার নেই। চুপ করে থাকো, নইলে আসল সময়ে কিছুই শোনা যাবে না।

[ক্ষণিক স্তব্ধতার পর একটা কি যেন আওয়াজ হয়]

১ম কন্। কিসের আওয়াজ হ'ল?

২য় কন্। আবার কি আওয়াজ পেলি তুই?

১ম কন্। গাছের ডাল ভাঙার মত যেন আওয়াজটা মনে হ'ল।

২য় কন্। বেলগাছ থেকে ব্রহ্মদত্যি নামল বোধহয়। তোকে এসে বেলের পানা খাওয়াবে।

নওসাদ। তোমরা এই ইয়ার্কি গুলো কোরোনা। এমনিই একটা tension হচ্ছে।

[খিড়কির কনসটেবল একজন প্রবেশ করে]

কন্-৩। স্যার, ওই ছোকরা পালাল।

নওসাদ। কে?

কন্-৩। বুড়োর ওই ছেলেটা। ন্যাড়া ছাদের পাশের গাছ দিয়ে নেবে গেল।

নীতিশ। তোমরা আটকাতে পারলে না?

কন্ ৩। খিড়কি দরজার দিকটায় তো নয়। দূর থেকে হঠাৎ দেখতে পেলাম গাছের ডাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে।

নীতিশ। যাকগে, কি আর করা যাবে। যাও তুমি তোমার জায়গায় যাও।

[৩নং কনস্টেবল চলে যায়। নওসাদকে নীতিশ বলে] ডাক্তার মান্নানের কি হ'ল বলুন তো? তার তো দুপুরের মধ্যে পৌঁছে যাবার কথা। সন্ধ্যে হয়ে গেল এখনও দেখা নেই!

নওসাদ। কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই! কিন্তু স্যার, একটা ব্যাপার খেয়াল করেছেন? গাঁয়ে কোন সাড়াশব্দ নেই? এত চুপচাপ হয়ে যাওয়ার মত রাত তো হয়নি!

নীতিশ। হুঁ?

নওসাদ। একটা বোধহয় ভুল হয়েছে আমাদের। S. P.-কে একটা back up force-এর কথা বোধহয় ব'লে এলে ভালো হত।

[এই সময় গোলমাল শুরু হয়ে যায়। দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা; বিরাট মারমুখি জনতার আওয়াজ। দরজাটা ভেঙে পড়ে। জনতা ঘরে ঢুকে আসে। তাদের পুরভাগে আবুল। জনতার কাছে লাঠি বল্লম শড়কি কোঁচ কুড়ুল টাঙি সবই আছে]

আবুল। এই, এই হচ্ছে গনার দল। শালারা ভদ্রবেশে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছে — বলে কিনা পুলিশ! খিড়কি আর গোয়ালের দরজায় পাহারা বসিয়েছে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে। মারো শালাদের···

[জনতা হৈ হৈ করে ওঠে। একটা ডাকাত আজ এখান থেকে ফিরবেনা — পুঁতে রেখে দেব সব কটাকে ইত্যাদি কথা বলছে জনতা। পুলিশরা রিভলবার বার করেছে]

নীতিশ। শুনুন, শুনুন আপনারা। আপনারা শান্ত হোন। আমাদের fire করতে বাধ্য করবেন না।

[জনতা তখনও মারমুখি। পুলিশদের গায়ে দুচার ঘা পড়তেও থাকে। এই সময় ছুটতে ছুটতে আবদুর মান্নান প্রবেশ করে]

আবদুর। থামো, থামো তোমরা। কর কি, কর কি তোমরা?

আবুল। এই তো বড় ভাই এসে গ্যাছেন। আপনার খবর পেয়ে ভাগ্যে আগে গাঁয়ে বলে রেখেছিলাম, তাইতেই এই শয়তানগুলোকে ধরা গেল। প্রথমে ব্যাঙ্কের staff বলে, পরে বলে কিনা পুলিশ।

আবদুর। হ্যাঁ হ্যাঁ ওরা পুলিশই! কি পাগলের মত করছ?

[ততক্ষণে আতাউরও নেমে এসেছেন]

আতাউর। আবুলের [সবতাতেই বাড়াবাড়ি। আমি যখন বলছি আবদুরের কাছে খবর পেয়ে এনারা এসেছেন, আমি যখন বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছি তখন তুমি কেন আমার কথা অমান্য করে গাছ বেয়ে নেমে গাঁয়ের লোক ডেকে আনতে গেলে? ছি-ছি-ছি—কি সব্বোনাশটাই না হচ্ছিল এখনি···

আবদুর। আমি না এলে তো এঁদের জান চলে যেত। [আবুলকে] স্বয়ং DSP সাহেব নিজে এসেছেন আমাদের বাড়ি পাহারা দিতে, এর থেকে বেশি protection কি আশা করতে পারো? আর তুমি কিনা গাঁ শুদ্ধু লোক এনে তাঁদের খুন করার ব্যবস্থা করছিলে? উফ্, খোদা বাঁচিয়েছেন। খুব নসীব যে ঠিক সময়ে এসে প'ড়েছিলাম!

নীতিশ। আপনি কিন্তু ঠিক সময়ে আসেন নি ডাক্তার মান্নান। আপনাকে যখন বাড়ি যেতে বলেছিলাম তখন যদি এসে এঁদের বলে রাখতেন তাহ'লে এই ঘটনা ঘটত না। আপনি তা না ক'রে এতক্ষণ কি করছিলেন বলুন তো?

আবদুর। রাগ করবেন না স্যার, আপনি যে শেষ পর্যন্ত নিজেই আসবেন এটা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। তাই ওখানে থানার কাছে অপেক্ষা করছিলাম আপনি কি step নেন, কিরকম force নিয়ে আসেন তাই দেখার জন্যে। দুপুর গড়িয়ে গেল থানার থেকে কোন force বেরল না, আপনিও এলেন না, তাই দেখে আমি DM-এর কাছে ছুটলাম। প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ওঁর সঙ্গে দেখা হল—তখন উনি SP-র সঙ্গে কথা বলে বললেন আপনি অনেকক্ষণ রওয়ানা হয়ে গেছেন। তখনই আমি ফুলতলা রওয়ানা দিয়েছি। বাড়ির সামনে এত ভীড় হট্টগোল দেখেই বুঝতে পেরেছি একটা কিছু অঘটন ঘটতে চলেছে। তবে খোদার কৃপায় যে শেষ পর্যন্ত সর্বনাশ হয়নি এই আমার বরাত। [জনতাকে] এইবার সব যান আপনারা। সাহেবদের একটু বিশ্রাম করতে দিন। যান, যান আপনারা—

[ঘর আস্তে আস্তে খালি হয়ে যায়]

কনস্টেবল ১। এতদিন চাকরি করছি, এত action-এ গেছি। Riot duty করেছি, আজকের মত কোনদিন মনে হয়নি মৃত্যু অবধারিত।

নওসাদ। তোমার থেকে আমার চাকরি আরও বেশি দিনের। আমারই মনে হচ্ছিল আজ মৃত্যু অবধারিত।

আতাউর। আবুল চা করতে বল, আর নাস্তার ব্যবস্থা কর।

নীতিশ। না না নাস্তাটাস্তা নয়, শুধু একটু চা খাব।

আবদুর। স্যার আপনি আমায় মাফ করুন। আমার ভুলেই আজ···

নীতিশ। প্রাণ যখন যায়নি তখন ও নিয়ে আর ভেবে কি হবে? এখন শুধু

ভাবছি গ্রামবাসীদের এই মহড়া দেখে গগন আজ নিশ্চয় গা ঢাকা দিল। ওকে ধরার একটা golden chanceও miss করলাম। যাক্, এক মাঘেতে শীত যায় না; দেখা আমাদের হবেই।

দৃশ্য শেষ হয়]

সপ্তম দৃশ্য

[নদীর ধার। চারজন স্মাগলার দিশি মদের বোতল নিয়ে মদ খেতে বসেছে। একটা গান শোনা যেতে থাকে। গান যে গাইছে সে মঞ্চে ঢুকে আসে। একটি কিশোর—ভিখারি ও আধ-পাগল]

কিশোর। [গান] পানের খিলি সাজিয়ে দিলাম
পাশে দিলাম রাইখা
তবু আমার সোনা বঁধু
খাইয়া গেল না।
আমে দুধে মাইখা দিলাম
পাতে দিলাম রাইখা
তবু আমার সোনা বঁধু
খাইয়া গেল না।

কুঞ্জ। এই শালা, গান গাইচিস কেন?

কিশোর। পয়সার জন্যে বাবু।

হেলা। গাও বাপধন, গান গাও।

কুঞ্জ। তুই কি বাহারকা না কি?

কিশোর। বাংলা দেশ থিকা আসছিলাম বাবু।

মদন। এলি কেন?

কিশোর। ঘরে কেউ নাই—ভাত জোটে না—মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকাররা সবাইকে কেটে ফেলেছে—তখন আমি ছোট। গানটা গাই বাবু?

কুঞ্জ। হ্যাঁ গাও, আর তোমার গলা শুনে ঝাঁউগুলো ডাকতে আরম্ভ ক'রে দিক। যা ভাগ শালা। এই নে, এটা নিয়ে একদম ফরসা হয়ে যা। [একটা টাকা দেয়, কিশোর চলে যায়] মাল চাপানো হয়ে গেছে, ভটভটি ছাড়লেই হয়—এই সময় এসে ঝামেলা করছে। ভাল্লাগে না। আর কত টাইম বসে থাকতে হবে বলতো?

আলি। বলব? যতটাইম ওস্তাদ না আসে।

কুঞ্জ। এটা একটা কথা হল? ওস্তাদের জন্যে বসে আচি নাতো কি তোর বে'র বরযাত্তর খাব বলে বসে আচি সালা? আমি বলচি ওস্তাদ এখনও আসচে না কেন?

মদন। আসচেনা তো আসচেনা। তুই নতুন চ্যাংলার মত ধড়ফড় করছিস কেন রে? সময় হলেই আসবে। ছত্রিশট তত্‌খন শেষ কর।

কুঞ্জ। না, আর খাবোনা। ভাল্লাগচে না।

মদন। তাহলে কি হলে তোর ভাল্লাগবে? মিছরি? সে এখন কোথায় পাব মানিক? কাজ শেষ হলে তীর্থে যা, সেখানে তোর সেই ডবলডেকার মেয়েটাকে পেয়ে যাবি।

কুঞ্জ! মদনা—এখন ইয়ারকি ভাল্লাগচে না।

মদন। খা, খা। বর্ডারের উসপারকা পানি, খেলে ছিটকে ফেলেও দেয়না, খাওয়ার সময়ও মনে হয়না কচুর আরক খাচ্ছি।

আলি। হেলাটা কিরকম হাঁকাল্লুকের মত খাচ্ছে ছাখ্। তিনটে ছত্রিশ শুকনো করে দিয়েছে

মদন। সামনের হপ্তাটা ওর মাল না খেলেও চলে যাবে।

কুঞ্জ। মদনা—ওকে মানা কর।

মদন। আমি মানা করবার কে? পেটটা তো আমার নয়—ওর।

আলি। ওকে দেখে মনে হচ্ছে ও তা জানে না। পরের পেট মনে করে খাচ্ছে।

কুঞ্জ। মাল ফেরানোর সময় ওরকম টুপভূজঙ্গ হয়ে বসে থাকতে দেখলে ওস্তাদ এসে এ্যায়সা ঝাড় দেবেনা! অ্যাই হেলা; আর টানিস না। এবার একেবারে সাথকনামা হয়ে একেবারে হেলে পড়বি।

হেলা। হেলাকে হেলাছেদ্দা কোরোনা গুরু। দাঁড়ালে দেখবে ধানকলের চিম্‌নির মত সোজা।

মদন। দাঁড়াতে পারবি?

হেলা। দেখবে? [টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়, কয়েক পা হাঁটে]

মদন। না, হাঁটতে পারে। পাপোস নয়, মানুষ।

হেলা। স্লা, পাপস কেন হব, আমি হেঁটে চলে বেড়াই না?

আলি। না তুই পাপোস নোস। তুই শিশু। টল্‌মল্ করে হাঁটিস তো।

হেলা। সে তো দুধের শিশু হাঁটে। আমি কি দুধের শিশুর মত বেকসুর?

আলি। নয়ত কি? তুই তো একটা পিঁপড়েও মারতে পারিস না।

হেলা। পিমড়ে মারা কি সোজা কাজ?

আলি। তাই তো বলচি তুই একটা শিশু।

হেলা। বেশি বারফাট্টাই করিস না আলি। পিমড়ে যদি বেকায়দায় প্যানজামায় ঢুকে যায় দেখবি কবজা খুলে যাবে।

আলি। পিঁপড়ে খেলে বলে সাঁতার শেখে। তুই ছেলেবেলায় খেয়ে ছিলিস, না?

হেলা। কেন?

আলি। লালপানিতে সাঁতার কাটিস তো, তাই বলচি।

হেলা। না, পিমড়ে আমি খাইনি। কুনদিন খাইনি। একবার বাঞ্জারাদের সঙ্গে ইঁদুর খেয়েছিলাম।

আলি। তাহলে তো দেকচি তুই একটা ঢ্যামনা।

হেলা। অ্যাই স্লা, মুখ সামলে কতা বল। আমি ঢ্যামনা কেন হব? আমি কি বলেচি আমি বেকসুর?

[এই সময় গগন মুহুরি প্রবেশ করে! হেলা তখনও বকেই চলেছে]

ঢ্যামনা কাকে বলে, অ্যাঁ? যে স্লা ধোঁকাবাজ, কলজের জোর নেই, বেকসুর সেজে থাকে, সে হল ঢ্যামনা···

গগন। হেলা! [হেলা গগনের পায়ের কাছে পড়ে পা চেপে ধরে]

ছাড়্। [পা ছাড়িয়ে নেয়] কত খেয়েছে যে ত্যাওরাতে শুরু করেছে?

মদন। অনেকক্ষণ বসে আচে তো ওস্তাদ, ও একটু বেশিই টেনে ফেলেচে।

গগন। মাল উঠে গ্যাচে?

কুঞ্জ। অনেকক্ষণ।

গগন। কি লৌকো দিয়েচে—দিশি না ভটভটি?

কুঞ্জ। ভটভটি।

গগন। তুই এগিয়ে গিয়ে ছ্যাক লাইন কিলিয়ার আচে কি না। তারপর ফোকাস্ জেলে সাড়া দিলে আমরা যাব। দাঁড়া। কলকে কই? [মদন রিভলবার বার করে ছ্যাখায়] হাতে রাখ। কোনো সম্‌ভুর চেনা খোমা দেখলে খাটিয়া করে দিবি। [মদন চলে যায়]

কুঞ্জ। এস্‌মাগলিঙে এত বসে থাকতে হয় বস্ তাতেই হাত পায়ে খিল ধরে যায়। টাইমেরও ঠিক নেই। যখন বড়চাকায় বাগনভাঙার কাজ করতাম তখন একটা টাইমের ঠিক থাকত। মাস্টারমশাই আগেভাগে খবর করে দেবে—তোড়ন নিয়ে রেডি থাকো। এসটেসানে বাকসো থামলেই বাকসোর ভেতরে ঢুকে বসে থাকো—বাকসো এসটেসান ছেড়ে ডিসটেন সিঙ্গেল পেরুল কি মাল বাইরে ফেলে দাও—তারপর সালা গাড়বাবু গাড়ি নরম করে দেবে লাপিয়ে পড়ে .কাটলাস। মুখ রক্ষে করার জন্যে কালো মামা তাড়া করলে গোটাকয়েক পাঁউরুটি ঝেড়ে চমকিয়ে দাও—ব্যাস টাইম মত কারবার ফিনিস্।

গগন। এ কারবারও তো টাইমেই চলছিল। বি এস এফের গাঢ়ুগুলো তো খেয়ে খেয়ে দমদম হয়ে ছিল। এই DSP রায়টা এসেই না এলাকা গরম করে দিয়েছে।

[এই সময় Jeep-এর আওয়াজ পাওয়া যায়] আড়িয়া নিচ্ছে বোধায়। গাড্ডা পার কর্। [গগন ও তার দল পালায়। হেলা খুবই টলতে টলতে যায়। Jeepটা থামার আওয়াজ হয়। নীতিশ একজন ASI ও দুজন কনসটেবলকে নিয়ে ঢুকে আসে। একটা ফেলে যাওয়া মদের বোতলে পা দিয়ে ঠোক্কর মারে]

নীতিশ। এইখানেই ছিল। মনে হচ্ছে ধরা যাবে। চলো।

[একটি সতেরো আঠারো বছরের মেয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে। বোঝা যায় সে কাউকে প্রত্যাশা করছে। এই সময় চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি যুবকও মঞ্চের পিছন দিক থেকে প্রবেশ করে]

চন্দন। উষা ! [মেয়েটি ঘুরে তাকায় ছেলেটির কাছে আসে]

উষা। এই জানো – এখুনি এখানে একটা কাণ্ড হয়ে গেছে।

চন্দন। জানি। ওই যে নৌকোটা সারাই হচ্ছে আমি ওর আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম।

উষা। ওমা তাই ?

চন্দন। তুমি কতক্ষণ এসেছ ?

উষা। আমি তো মালোপাড়ার পাশ দিয়ে শর্টকাট করে আসছিলাম, দূর থেকে দেখি জিপ্‌টা থামল। আমি একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

চন্দন। ছাখো, এমনিতেই এই রকম লুকিয়ে দেখা করাটা ভীষণ risky, তার ওপর নদীর ধারটা আজকাল অসম্ভব খারাপ হয়ে গ্যাছে। সন্ধ্যের পর পুরো এলাকাটা antisocial-দের হাতে চলে যায়। এইখানে দেখা করাটা একদম উচিৎ হয়নি।

উষা। কিছু হবে না। যা হবার ছিল হয়ে গেছে। এখন কেউ আর এদিকে আসবে না।

চন্দন। তাই বলে এই রকম একটা unsafe জায়গায় –

উষা। চন্দনদা – সেরকম বললে তো পুরো বর্ডার এরিয়াটাই unsafe হয়ে গেছে। সেই ভেবে কি মানুষ কাজকর্ম সব বন্ধ করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে।

চন্দন। অন্তত এইরকম জনমানবশূন্য নদীর ধারে সন্ধ্যের পর প্রেম করার কাজটা তো বন্ধ করা যায়।

উষা। না যায় না।

চন্দন। কারণ ?

উষা। কারণ এই গ্রামে এই একটা জায়গা ছাড়া কোন জায়গায় নির্জনতা নেই এবং আরও বড় কারণ তোমার সঙ্গে একলা কথা বলা এখন ভীষণ শক্ত হয়ে গেছে। আমার চলাফেরা গতিবিধির ওপর এখন পাহারা বসে গেছে। আজকে অনেক ছলছুতো ক'রে লক্ষ্মীদের বাড়িতে একখানা গানের খাতা

পড়ে আছে আনতেই হবে, এই বলে বেরিয়েছি। বেরবার সময় মা বলল 'পাকা দেখা হয়ে গেছে, এখনও ধিংগী মেয়ের মত ঘুরে বেড়ালে বদনাম রটবে। শ্বশুর বাড়িতে পর্যন্ত সে কথা পৌঁছে যাবে।' [খানিক স্তব্ধতা] কি কিছু বলছ না যে ?

চন্দন। আমাকে ভুলে যাও উষা।

উষা। কি সহজে বলে দিলে কথাটা। ভোলা এতই সহজ ?

চন্দন। কিন্তু আমাদের তো কোন ভবিষ্যৎ নেই।

উষা। ভবিষ্যৎ তো নিজেদের হাতে।

চন্দন। অবুঝের মত কেন কথা বলছ ? তোমার বাবা এই গ্রামের সব থেকে বড়লোক, তার ওপর orthodox মানুষ ; আমি একটা ইস্কুল মাস্টার, তোমার প্রাইভেট টিউটর ; আমার সঙ্গে তোমার বাবা বিয়ে দেবেন ?

উষা। না দেবেন না। কিন্তু আমরা নিজেরা তো কিছু করতে পারি ?

চন্দন। কি করতে পারি ?

উষা। তুমি আমায় নিয়ে চলে যেতে পারো না ?

চন্দন। কোথায় চলে যাব ? সেখানে গিয়ে তোমাকে খাওয়াব কি ? এখানে না হয় স্কুলের চাকরিটা আছে, অন্য কোথাও গিয়ে আজকের দিনে চাকরি জোটানো অত সোজা ? এখানে মাথা গোঁজার আস্তানা আছে, বাবা-মার সংসারে একসঙ্গে আছি বলে এই রোজগারে চলে যাচ্ছে।

উষা। আমিও কাজ করব। পড়াশুনো শেষ করব – সেই সঙ্গে একটা কোন কাজ করব। দুজনে মিলে ঠিক চলে যাবে।

চন্দন। একটু practical হও উষা। সংসার করা মানে স্বপ্ন দ্যাখা নয়। বাস্তব বড় কঠিন !

উষা। জীবনে তাহলে স্বপ্নের কি কোন জায়গা নেই চন্দনদা। তবে এমন করে ভালোবাসা এল কেন ? কেন এত স্বপ্ন দেখলাম ? মা বাবা সমাজ – এদের ইচ্ছে এদের জোরাজুরিই বড় হবে ? দুজন কমবয়েসী মানুষ যারা ভালোবেসে কোন অপরাধ করেনি তাদের নিজেদের ইচ্ছের কোন দাম নেই ! তাদের স্বপ্নের কোন মানে নেই ?

চন্দন। কি জানি, যাদের অবস্থা ভালো তাদের ক্ষেত্রে হয়ত আছে। আমার মত গরীব মধ্যবিত্তের পক্ষে স্বপ্ন বলো ভালোবাসা বলো কিছুরই বোধহয় কোন দাম নেই। [একটু স্তব্ধতার পর উষা চলে যেতে যায়] চলে যাচ্ছো ?

উষা। হ্যাঁ। বাড়িতে এতক্ষণ খোঁজাখুজি শুরু হয়ে গেছে হয়ত।

চন্দন। আমি জানি না তোমার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে গেলে আমি কি করে থাকব।

উষা। একটু practical হও চন্দনদা। কঠিন বাস্তবকে মেনে নিতে শেখো এখন থেকে।

[চলে যেতে গিয়ে থামে। নদীটা দেখতে দেখতে বলে]

ছোটবেলায় এইখানে আমি চড়ুইভাতি করতে এসে আমি থেলা ফেলে খালি নদীর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কত নৌকা যেত গুণ টেনে, পাল তুলে—কতরকমের সব পাল। আমি ভাবতাম একদিন আমিও ওমনি গয়নার নৌকোর মাঝিদের মত জলে ভেসে ভেসে অনেক দূর দেশে চলে যাব। বড় হতে বুঝলাম গ্রাম বাংলার মেয়ের ভাগ্যটা বড় খাটো। শেষ পর্যন্ত স্বামীর ঘর ছাড়া তার আর কোথাওই যাওয়া হয়না। বুঝেও কিন্তু স্বপ্নটাকে খাটো করতে পারি নি। স্বপ্ন দেখতাম এমন একটা স্বামীর ঘর আমার হবে যেখানে জীবন এই নদীর মত স্বাধীন, ভালোবাসা বর্ষার ভরা নদীর মত দুকূল ভরিয়ে রেখেছে··· এবার বুঝছি সেই স্বপ্নটাকেও খাটো করতে হয়, practical হতে হয়। অর্থাৎ বাঙালি মেয়ের খাটো ভাগ্যটাকেই শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়।

[এই সময় টর্চের আলো পড়ে ওদের মুখের ওপর। ওরা ভয় পেয়ে গ্রামের দিকে ঘুরতেই আদেশ ভেসে আসে।]

নীতিশ। [নেপথ্যে] এই দাঁড়াও—পালাবার চেষ্টা কোরো না।

[নীতিশ ও তার দলবল ঢুকে আসে। তাদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়া হেলা]

নীতিশ। কে তোমরা? এখানে কি করছ?

উষা। আমরা এই গ্রামেই থাকি। নদীর ধারে বেড়াতে এসেছিলাম।

[চলে যেতে যায়]

নীতিশ। দাঁড়াও, যাবে না। কি নাম তোমার?

উষা। উষা সিংহরায়। আমার বাবার নাম রমাপদ সিংহরায়।

ASI। তুমি রমাপদবাবুর মেয়ে?

নীতিশ। [ASI-কে] চেনেন?

ASI। হ্যাঁ স্যার, রমাপদবাবু এই গ্রামের সব থেকে বনেদী নামকরা লোক। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। [চন্দনকে দেখিয়ে বলে] এঁকে চিনি না।

উষা। উনি আমাকে পড়ান।

চন্দন। আমি এখানকার হাইস্কুলে শিক্ষকতা করি। আমার নাম চন্দন মিত্র।

নীতিশ। ও। [কনস্টেবলকে] যাও—এটাকে গাড়িতে তোলো।

হেলা। আমার তো ধরা পড়ার কথা নয় হুজুর। ওরা মাল খাচ্ছিল, আমায় বলল খা। চেনা নাই জানা নাই খেতে বসে গেলাম, তাতেই না এই হল! সঙ্গদোষে কি না হয়, ছুঁচো ছুঁলে গন্ধ হয়।

ASI। চল্ চল্, ছুঁচোর গোলাম চামচিকে। তোর গন্ধ আমরা ধোলাই করে ছাড়িয়ে দেব। তারপর ছুঁচোর বাসার ঠিকানাটা বলবি, তাকে এনে ধোলাই করব। চল্ শালা—

[হেলাকে নিয়ে পুলিশরা বেরিয়ে যায়]

নীতিশ। তোমার বাড়ির লোক জানে তুমি সন্ধ্যের সময় এইরকম জায়গায় বেড়াতে এসেছ?

[উষা ও চন্দন বিব্রত হয়ে দৃষ্টি নামিয়ে নেয়]

চলো তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিই।

উষা। নাহ, তার কোন দরকার নেই—আমরা নিজেরাই চলে যেতে পারব।

[নীতিশ একটু ওদের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে তারপর বলে]

নীতিশ। এরকম আর এসো না। কখন বিপদ-আপদ হয় বলা যায় না তো।

[নীতিশ বেরিয়ে যায়। উষা ও চন্দনও চলে যেতে যাবে, এমন সময় ভিখারি কিশোরটি আবার গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে]

কিশোর। [গান] পানের খিলি সাজিয়ে দিলাম
পাশে দিলাম রাইখা
তবু আমার সোনা বঁধু
খাইয়া গেলনা।
আমে দুধে মাইখা দিলাম
পাতে দিলাম রাইখা
তবু আমার সোনা বঁধু
খাইয়া গেলনা।
সোনার বাঙ্কালি নাও এ
বঁধু যায় দূর দেশে
পিঁড়াখানি শূন্য রইল
আমার কপাল দোষে

[এই গানের মধ্য দিয়ে দৃশ্য শেষ হয় ও বিরতির যবনিকা পড়ে]

অষ্টম দৃশ্য

[রমাপদ সিংহরায়ের বাড়ির বাইরের ঘর। রমাপদ ও তার স্ত্রী কন্যার বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত। একজন তাঁতিকে দেখা যায় শাড়ির গাঁটরি বাঁধছে। আরও বেশ কিছু শাড়ি ফরাসে পড়ে রয়েছে। তাঁতি ফর্দ নিয়ে পড়ে গাঁটরি বাঁধা হলে।]

রমাপদ। না কিছুতেই না। ওই মাইক সাউণ্ডে ছবির গান বাজানো চলবে না।

এই এক হয়েছে আজকাল। পুজোতে বিয়েতে পৈতেতে সবেতে আজকাল গাঁকগাঁক করে মাইক বাজছে—আর তাতে ওই জগঝম্প হিন্দি গান? দেশটার হল কি বলোতো? লক্ষ্মীপুজোয় মাইক বাজছে পটকা ফাটছে—যাতে চঞ্চলা লক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ বিদেয় হন।

রমাপদর স্ত্রী। সে মাইক না হয় না বাজালে, সানাই তো বাজবে—না কি?

রমাপদ। হ্যাঁ, আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে। সানাই নিশ্চয়ই দেবো। সতু, কালই লালবাগ চলে যাও, আমাদের ছেলেবেলায় নবাব বাড়িতে সানাই বাজাত ইলিয়াস মিয়া, পিলখানার কাছেই তার বাড়ি, তাকে গিয়ে খবর দাও।

রমাপদর স্ত্রী। তোমার যেমন কথা। তোমার ছেলেবেলায় যে লোক সানাই বাজাতো সে এখনও আছে? পিলখানার হাতির মত সেও কবে মরে হেজে গ্যাছে। সতু, কালই কোলকাতায় গিয়ে আলি হোসেনের পার্টি বায়না করে আয়। আমি রেডিওতে শুনেচি।

রমাপদ। খামাকা কেন খরচ বাড়াচ্ছ উষার মা? কোলকাতার সানাই পার্টি অনেক বেশী টাকা নেবে, আনা-নেওয়ার খরচা দশগুণ হয়ে যাবে। ইলিয়াস মিয়া না হোক, হাতের কাছে গেরস্ত লোক সানাইওয়ালা ঢের পাওয়া যাবে—

রমাপদর স্ত্রী। একটা বই দুটো মেয়ে নয়। বিয়েও তার একবার বই দুবার হবে না। আলি হোসেনই আনতে হবে। কেপ্পনের মরণ!

রমাপদ। আহ্, উষার মা! ঠিক আছে সতু, তোমার মাসীমা যেমন বলছেন সেইরকমই করো। [তাঁতিকে] কত হ'ল তোমার বল?

তাঁতি। দুবারের নিয়ে একুশ হাজার নশো ছিয়াত্তর টাকা।

রমাপদ। কমাও কমাও।

তাঁতি। যা কমাবার তাতো মাঠাকরুণ বাছার সময়ই কমিয়েছেন। সে তো হিসেবে ধরেইছি—

রমাপদ। না না, ওই পুরোপুরি সাড়ে একুশ ধরো।

তাঁতি। মরে যাবো বাবু। এক মুগা সুতোর দাম পড়ে আজকাল প্রায় ২৫ টাকা। একখানা কাপড়ে ৪ মুগা সুতো লাগে, বুনতে সময় যায় ৮ ঘণ্টা। কারিগরের রোজ ৪০ টাকা—২টো হেলপারের রোজ ২০-২০, ৪০ টাকা। সেই ফুলিয়া থেকে আসা-যাওয়ার খরচ আছে—কত টাকা মুনাফা থাকে বলুন? শুভকার্য করতে যাচ্ছেন আর দরাদরি করবেন না বাবু।

রমাপদর স্ত্রী। না বাপু, শুভকার্য করছি বলে তো ঘটিবাটি বন্ধক দিয়ে করতে পারবো না। [স্বামীকে] যাকগে, ওই ছিয়াত্তর টাকা বাদ দিয়ে দিয়ে দাও।

রমাপদ। এখন এই ভর সন্ধ্যেবেলায় আমি সিন্দুকের গায়ে হাত দোবো?

তাঁতি। এখন থাক বাবু। রাত্রের গাড়িতে তো অতগুলো টাকা নিয়ে আমি যেতে পারবো না—ও টাকা ডাকাতি হয়ে যাবে। সকালের প্যাসেঞ্জার ধরব—যাওয়ার আগে এসে টাকা নিয়ে যাব। এখন সিন্দুকের গায়ে হাত দিতে হবে না।

রমাপদর স্ত্রী। সতু, নাটমন্দিরে ওর শোয়ার ব্যবস্থা ক'রে দে। ঠাকুরকে বল ওকে খেতে দিতে। [তাঁতিকে] যাও—ওর সঙ্গে যাও।

[এই সময় উষা ঢোকে, হাতে একটা খাতা]

এত দেরী হ'ল তোর গানের খাতা আনতে? [উষা নিরুত্তর] যাকগে, খাতাটাতা রেখে একবার আয় তো।

উষা। কেন?

রমাপদর স্ত্রী। শাড়িগুলো একবার দেখবি। যেগুলো তোর পছন্দ সেগুলো রেখে নমস্কারিগুলো আলাদা ক'রে ফেলব।

[উষা অন্যমনস্কভাবে নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকে]

তাঁতি। আসি বাবু। মাঠাকরুন আসি।

রমাপদর স্ত্রী। বিয়ের দিন আসবে কিন্তু।

তাঁতি। সে বলতে হবেনা, নিশ্চয়ই আসব [সতুকে] এটা একটু ধরবেন দাদা?

[সতু ধরাধরি ক'রে গাঁটরি তুলে দেয়। তারপর সতু ও তাঁতি প্রস্থান করে]

রমাপদর স্ত্রী। [উষাকে] আয়—এসে ছাখ না?

উষা। ও আর আমি দেখে কি করব?

রমাপদর স্ত্রী। তোর পছন্দগুলো বেছে নিবি।

উষা। সবই তো তোমরা তোমাদের পছন্দমতই বেছে নিয়েছ। এখন আর আমাকে নিজের পছন্দ করতে বলছ কেন?

রমাপদ। [অন্য যে সব কর্মচারী উপস্থিত ছিল তাদের] ঠিক আছে তোমরা যাও! [তাদের প্রস্থান] নিজের পছন্দমত বলতে কি বলতে চাইছ তুমি? সয়ম্বরা হবে? লভ্ ম্যারেজ?

উষা। আমি আর কিছুদিন সময় চেয়েছিলাম। BA পাশ করার পর—

রমাপদ। ওরা পড়াবে বলেছে।

রমাপদর স্ত্রী। আর এত ভালো সম্বন্ধ হাতছাড়া করলে আর জুটত। বাপের অতবড় কারবার, ছেলে বি. কম্ পাশ। পণ যা নিচ্ছে সে ওদের মত ঘরে মেয়ে দিলে কিছু অন্যায্য নয়।

রমাপদ। ওইটি বোলোনা—গয়নাগাঁটি টিভি ফ্রিজ ফার্নিচারের ওপর লাখ টাকা।

উষা। এত খরচ করলে কেন?

রমাপদ। আশ্চর্য কথা! মেয়ের সুখের জন্যে বাপ হয়ে এটা করব না?

উষা। টাকা খরচ করলে যদি সুখের গ্যারান্টি দেওয়া যেত তাহলে বোধহয় সংসারে দুঃখ বলে কিছু থাকত না।

[গট্‌গট্‌ করে হেঁটে ভেতরে চলে যায়। রমাপদ ও তার স্ত্রী একটু স্তব্ধ হয়ে থাকে]

রমাপদ। শুনলে?

রমাপদর স্ত্রী। দোষ তো তোমারই। কবে থেকে বলছি মেয়েকে ধিঙ্গি না ক'রে বিয়ে দাও। না—পড়তে চাইছে পড়ুক। যা চাইবে তাই দিয়ে এসেছ, মাথা বিগড়োবে না?

[একজন ভৃত্য প্রবেশ ক'রে বলে]

ভৃত্য। ফণী স্যাকরা এয়েচে।

রমাপদ। কি চায়?

ভৃত্য। বলচে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, জরুরী দরকার আচে।

রমাপদ। নিয়ে আয়। [ভৃত্য চলে যায়]

রমাপদর স্ত্রী। ওকে হারের টাকাটা দেওয়া হয়নি?

রমাপদ। হয়েছে।

রমাপদর স্ত্রী। তাহলে আবার এল কেন?

রমাপদ। দেখি কথা বলে। লোকটাকে আমার সুবিধের লাগে না। ওর কাছ থেকে হারটা গড়ালে, আমার একেবারে ইচ্ছে ছিল না।

রমাপদর স্ত্রী। তা তখন কি ওই একখানা হারের জন্যে আবার কোলকাতা যেতাম?

রমাপদ। ননদপুঁটুলিতে গয়না দিতেই হবে এমন তো কোন মাথার দিব্যি নেই। তুমি জেদ ধরে বসলে—নইলে নাকি মান থাকে না। শুধু শুধু আর এক খরচের ধাক্কা।

[ফণী স্যাকরাকে পৌঁছে দিয়ে ভৃত্য চলে যায়। ফণীর চেহারা দেখলেই মনে বিরূপতা আসে]

এস ফণী। হঠাৎ কি মনে ক'রে?

ফণী। এই এলাম একবার। [রমাপদ ও তার স্ত্রীর পদধূলি নিতে নিতে] আপনাদের শ্রীচরণ স্পর্শ করলেও তো পুণ্য হয়! বলি তো সকলকে, এতবড় মানুষটা গাঁয়ে রয়েছেন, সকলেই নিঃভরসায় আছি। বটগাছের ছায়ায় রয়েছি সব।

রমাপদ। যাক্—বলো কি বলবে?

ফণী। বিয়ে তো এসে গেল?

রমাপদ। হ্যাঁ।

ফণী। হৈ চৈ পড়ে গেছে চারদিকে। বলচে তো সবাই, বাবু মেয়ের বিয়েতে যে জাঁক করবেন তেমনটি আর কেউ কোনদিন চোকে দ্যাকেনি।

রমাপদ। না—জাঁকের কিছু হচ্ছে না। সিংহরায় বাড়ির বিয়ে যেমন হলে উচিৎ হয় তেমনই হচ্ছে। যাক্, কি বলবে বলে—

ফণী। সে তো বটেই। সিংহরায়েদের সাতপুরুষের পয়সা। আর সব বড়লোকের তো শিঙে নেই ডুগডুগি আচে। তবে একটা দুঃখু থাকল বাবু। উষাদিদির বিয়ে, ভেবেছিলাম আমি চুড়ি বালা কানপাশা রতনচুড় সিঁথিমোর সব গড়ে দিয়ে সাজিয়ে দেবো। অমন তেলকাজলা মেয়ে তো এ গাঁয়ে আর একটা নেই। তা আপনারা কোলকাতার থেকে সব গয়না আনলেন। তবু শেষমেশ যে ছোট হারটা আমার ঠেঙে করালেন সেই কাজটাই আমার মনে থাকবে। আমি তো বলেচি লোককে—

রমাপদর স্ত্রী। মেয়ে আমার লেখাপড়া শিখেছে, আজকালকার মেয়ে। হাল-ফ্যাশনের গয়না নইলে যদি মন না ওঠে—তাই কোলকাতার থেকে—

রমাপদ। ও কথা নয়—ও কথা নয়। দ্যাখো ফণী, তোমায় তাহলে পরিষ্কারই বলি। গয়না যে তোমায় দিয়ে গড়াতে পারতাম না এমন নয়। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে নানা কথা কানে আসে। শুনতে পাই এ অঞ্চলে চুরিডাকাতির যত সোনারুপো সব তোমার কাছে আসে। তুমিই সেসব গালিয়ে দাও। বিক্রিবাটাও করো। আমার মেয়েকে বিয়েতে গয়না দিলাম, তার মধ্যে চোরাই সোনা থেকে গেল, কি সেই গয়না নিয়ে কোনদিন কি মামলা উঠল, এ আমি চাইনি।

ফণী। [একটু চুপ করে থাকার পর] আপনাকে তো পুরোনো গয়না বেচতাম না বাবু, যা দিতাম নতুনই গড়ে দিতাম। আর সোনা কি এঁটো হয় বাবু? হয় না। সোনা তুমি কার? না—যিনি রাখেন তাঁর। আপনার কাছে মিছে কতা বলব না, আসে। চোর বলুন ডাকাত বলুন—আমার কাছে কাজ কারবার করতে আসে। এই এঁদো জায়গায় সমবচ্ছরে কে কটা গয়না গড়ায় বলুন তো যে এই বাজারে দিন চলবে? তাই ওসব কাজও করি। তার ওপরে বাঘভালুকের রাজ্যে থাকি, তেনাদের তো তুষ্ট রাখতেই হয়। তারা আসে। এই তো সন্ধে দ্যাখাচ্ছি, দোকানে এল গগন মুহুরি। এসে বলল 'ফণী, একবার সিংহরায় বাবুর বাড়িতে যা। গিয়ে বাবুকে বল এতটাকা যখন মেয়ের বিয়েতে খরচা করছেন তখন শান্তিতে যাতে বিয়েটা হয়ে যায় তার জন্যে আমাকে যেন এক লাখ টাকা নগঁদি পাঠিয়ে দেন। নইলে তো আমাকেই ছাঁদনাতলায় যেতে হবে।

[রমাপদ স্তম্ভিত। তার স্ত্রী একটা অর্দ্ধস্ফুট আর্তনাদ ক'রে ওঠেন]

আমার ঘাড়ে—তাই বা বলি কেন—কার ঘাড়ে কটা মাথা আচে যে এই

বর্ডার এলাকায় বাস ক'রে গনা ওস্তাদের কথা অক্ষেয়ার করবে। তাই এলাম বাবু।

[রমাপদ ও তার স্ত্রী এখনও নির্বাক]

টাকাটা বলেচে একনম্বরি নোটে হওয়া চাই। এক হপ্তার মধ্যে আমার মারফতই পাঠিয়ে দিতে পারেন।

[আরও স্তব্ধতা]

আমি আসি বাবু। [পদধূলি গ্রহণ] আপনাদের শ্রীচরণ স্পর্শ করলেও পুণ্য হয়।

[বেরিয়ে যায়]

রমাপদর স্ত্রী। এ কি সব্বোনাশ হ'ল গো?

রমাপদ। সব্বোনাশ সব্বোনাশ কোরোনা তো—একটু ভাবতে দাও।

রমাপদর স্ত্রী। ভাবাভাবির কিচ্ছু নেই, তুমি টাকাটা দিয়ে দাও।

রমাপদ। আহ্লাদ না? টাকা গাছে ফলে?

রমাপদর স্ত্রী। মেয়ের সুখের থেকে তোমার টাকাটা বড় হল?

রমাপদ। টাকা বড় হওয়ার কথা নয়। ওই ফণী হারামজাদা যা বলে গেল তা মিথ্যে হুমকি কিনা তা কে বলতে পারে? ফণীটা মাঝখান থেকে কিছু কামিয়ে নিতে চাইছে হয়ত।

রমাপদর স্ত্রী। তুমিই তো বলছিলে ওর সঙ্গে চোর ডাকাতদের যোগসাজশ আছে।

রমাপদ। আছে বলেই কি গগন মুহুরি সত্যিই যদি টাকা চায় তাহলে ওর মত একটা ছ্যাঁচোড়কে দিয়ে হুমকি দেবে? আর তাছাড়া গগন মুহুরিরই বা এত বড় সাহস হবে কোত্থেকে যে রমাপদ সিংহরায়ের মেয়ের বিয়েতে টাকা চাইবে? তাও আবার দু'পাঁচ হাজার নয়, একেবারে লাখ টাকা?

রমাপদর স্ত্রী। যদি বোঝো সেই চেয়েছে, তুমি টাকাটা দেবে কি না?

রমাপদ। না দোবো না। এটা মগের মুল্লুক নয়। কি করবে ও? বাড়ি চড়াও হবে? হোক্। আমার লোকজন নেই? পুলিশ নেই?

[এই সময়ে ফণী আবার ফিরে আসে]

ফণী। একটা কথা বলতে বলেছিল গনা ওস্তাদ, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। থানা পুলিশ না করতে বলেছিল। আমিও বলি বাবু—ওসব না করাই ভালো। উগ্রচণ্ড স্বভাবের লোক তো গনা। খুঁচিয়ে ঘা না করাই ভালো। আসি বাবু। যেদিন আসতে হবে খবর পাঠালেই আমি হাজির হব।

রমাপদ। তোমাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না ফণী। গগন মুহুরি যদি সত্যিই তোমাকে পাঠিয়ে থাকে তাহলে তাকে বলে দিও টাকা আমি দোবো না।

ফণী। [একটু চুপ করে থেকে] এই তাহলে জানাবো তো?

রমাপদ। হ্যাঁ।

ফণী। এমন কতা তো আপনি বলতেই পারেন বাবু। শুনেচি আপনার পূর্ব-পুরুষও কালীপুজো করেই রক্তজবা কানে ধরে ডাকাতি করতে বের হতেন। সেই বংশের উপযুক্ত কতাই বলেচেন।

রমাপদ। ফণী—

ফণী। তবু এমন হুট করে সিদ্ধান্ত করবেন না বাবু। সিংহরায় বাড়ির মেয়ের বিয়ে নষ্ট হবে, এ তো শুধু আপনার নয়, তামাম গাঁয়ের লোকেরই অকল্যাণের কথা। আর একটু ভাবুন। মত হয়ত বদলাতেও পারে। কতায় বলেনা—

মানুষের মন মতির হার
দিনে বদলায় আঠারো বার।

[দৃশ্য শেষ হয়]

নবম দৃশ্য

[অতিরিক্ত জেলা জজের আদালত। লোহার খাঁচায় গগন ও তার দুজন সঙ্গী। আদালতে যে যে ব্যবস্থা থাকে ও যেসব কর্মচারী থাকে যেমন কোর্ট ক্লার্ক ইত্যাদিরা আছে। S.P. D.S.P-ও উপস্থিত আছে। দর্শকদের মধ্যে সুমন্ত্রকে দেখা যায়। জজ বসে আছেন তাঁর উচ্চাসনে। পাবলিক প্রসিকিউটর্ বসে আছেন নির্দিষ্ট চেয়ারে। ডিফেন্স লইয়ার তার বক্তব্য পেশ করছেন।]

ডিফেন্স লইয়ার। বাদীপক্ষ আমার মক্কেলদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ এনেছে তা খুবই মারাত্মক। বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র লেনদেন, মাদক দ্রব্য আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে পুলিশ under section 25 of Arms Act, Section 21 of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act-এ। এই অভিযোগ আনা হয়েছে কয়েকজন bonafide and lawabiding citizanকে অযথা হেনস্থা করার জন্যে। আসল দোষীদের ধরতে না পেরে অথবা ইচ্ছাপূর্বক না ধ'রে আমার মক্কেলদের মত কিছু নিরীহ নির্দোষ মানুষকে harass করাটা আজ পুলিশের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাবলিক প্রসিকিউটর। Objection Your Honour। Defense counsel যাদের নিরীহ-নির্দোষ bonafide lawabiding citizen ব'লে দেখাতে চাইছেন তারা সবাই আসলে দাগী আসামী। এদের সবার বিরুদ্ধে অতীতেও পুলিশ কেস্ ছিল।

ডিফেন্স লইয়ার। Your Honour—অতীতের সেই case-গুলির একটিও কিন্তু পুলিশ প্রমাণ করতে পারেনি।

পি. পি.। কিন্তু গগন মুহুরির gang-এরই একজন লোক, কালীচরণ সাঁপুই ওরফে হেলা পুলিশের কাছে যে confession দিয়েছে তা-ই গগন মুহুরির অপরাধ প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট!

ডি. এল.। Your Honour, আমার learned friend-এর মনে হয় ধৈর্যের অভাব হয়েছে। তাই উনি বোধকরি professional ethics-এর basic norms-গুলো ভুলে যাচ্ছেন। ওঁর জানা উচিৎ আমি যখন submission করছি তখন আমাকে disturb করাটা unethical। ওঁর turn এলে উনি নিশ্চয়ই বলবেন, কিন্তু তার আগে আমার মক্কেলরা কি তাদের বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা অভিযোগগুলি থেকে তাদের defense lawyer-এর মাধ্যমে নিজেদের defend করার সুযোগ পাবেনা?

জজ। Proceed, proceed.

ডি. এল। However Your Honour may kindly note the point raised by my learned friend: উনি কালীচরণ সাঁপুই ওরফে হেলার পুলিশের কাছে দেওয়া confession-এর কথা বলেছেন। উনি সম্ভবত ভুলে গেছেন যে এই মামলার শুরুতে জেরার জবাবে হেলা court-এর কাছে বলেছে সেই confession পুলিশ তার কাছ থেকে আদায় করেছে জবরদস্তি ক'রে third degree method apply ক'রে—অর্থাৎ মারপিট ক'রে torture ক'রে। সম্ভবত Learned Public Prosecutor একথাও ভুলে যাচ্ছেন যে court-এর কাছে admit না করলে out of court পুলিশের কাছে দেওয়া confession-কে admission of guilt ব'লে গণ্য করা যায় না।

পি. পি.। কিন্তু Your Honour—হেলার সাক্ষ্য ছাড়াও যে দুজন independent neutral সাক্ষী raid-এর সময় seize করা arms amunition ও contra-band article-এর seizure list-এ সই করেছেন এবং court-এর কাছে তাঁরা তা confirm করেছেন।

ডি. এল'। Your Honour, court-এর কাছে আমি প্রার্থনা করছি যে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের স্বার্থে এই সাক্ষী দুজনকে further examine করার অনুমতি দেওয়া হোক!

পি. পি.। Objection Your Honour! Evidence chapter is over, সাক্ষ্য-প্রমাণাদির পাট শেষ। এই সব সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে court নিশ্চয়ই অভিযুক্তদের অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছেন।

ডি. এল.। Your Honour—আমার learned friend নিশ্চই জানেন যে বিচার এখনও চলছে, রায় এখনও হয়নি। অতএব code of criminal procedure-এর section 311 অনুযায়ী প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের জন্যে এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে court যে-কোন সময় যে-কোন সাক্ষীকে ডাকতে পারে এবং সাক্ষ্য দিতে পারে।

জজ। Objection overruled। সাক্ষীদের re-examine করার অনুমতি দেওয়া হ'ল।

[প্রভাস প্রামাণিক নামে সাক্ষীকে ডাকা হ'ল এবং শপথ বাক্য পড়ানো হ'ল।]

ডি. এল.। প্রভাসবাবু, গগন মুহুরির বাসায় যখন পুলিশ raid করে তখন তো আপনি সেখানে ছিলেন না?

পি. পি.। Objection Your Honour। আমার learend friend witness-এর মুখে তাঁর সুবিধেমত কথা বসাতে চাইছেন।

জজ। Proceed, proceed.

ডি. এল.। বলুন, জজ সাহেবকে বলুন।

প্রভাস। ছিলাম।

ডি. এল.। ছিলেন?

প্রভাস। ছিলাম আবার ছিলাম নাও বলতে পারেন।

ডি. এল.। ছিলেন আবার ছিলেন নাও বলতে কি বোঝাতে চাইছেন?

প্রভাস। হুজুর, যখন পুলিশ ধরপাকড় করছিল তখন ছিলাম না, পরে ডেকে নিয়ে গেল যখন তখন ছিলাম।

ডি. এল.। কে ডেকে নিয়ে গেল?

প্রভাস। দুজন সেপাই এসে ডেকে নিয়ে গেল।

ডি. এল.। কি ব'লে ডেকে নিয়ে গেল?

প্রভাস। বলল ডাকাত ধরা পড়েছে, আমাকে যেতে হবে।

ডি. এল.। তাহলে স্বেচ্ছায় নয়, পুলিশের কথায় আপনি সেখানে গিয়েছিলেন। আপনি গিয়ে কি দেখলেন?

প্রভাস। দেখলাম গগনবাবুরা হাতকড়ি পরে বসে আছেন, আর ডি. এস. পি সাহেব তাঁর লোকজন নিয়ে পাহারা দিচ্ছেন।

ডি. এল.। গগনবাবুর হাতে হাতকড়ি ছিল?

প্রভাস। হ্যাঁ হুজুর।

ডি. এল.। ভালো ক'রে মনে ক'রে বলুন—ওঁর হাতে বন্দুক পিস্তল কিছু ছিল না?

প্রভাস। হাতকড়ি পরে লোকে বন্দুক পিস্তল নেবে কি ক'রে বলুন তো?

ডি. এল.। কিন্তু বন্দুক পিস্তল তো ওখানে ছিল?

প্রভাস। হ্যাঁ, পুলিশের হাতে বন্দুক ছিল।

ডি. এল.। পুলিশের হাতে নয়, পুলিশের হাতে নয়। অন্য কোন বন্দুক পিস্তল ওখানে রাখা ছিল কি ?

প্রভাস। হ্যাঁ।

ডি. এল.। সেগুলো কার।

প্রভাস। তাতো বলতে পারি না। [দর্শকরা হেসে ওঠে]

ডি. এল.। ওখানকার ওই সব অস্ত্রশস্ত্রের একটা তালিকা তৈরী হয়েছিল,—সে তালিকায় আপনার সই আছে ?

প্রভাস। হ্যাঁ।

ডি. এল.। ওই তালিকায় কি কি ছিল বলুন তো প্রভাসবাবু ?

প্রভাস। ওই···কি কি সব ছিল কয়েকটা···

ডি. এল.। কি কি সব ছিল কয়েকটা মানে ? আপনি জানেন না কি কি ছিল ? অথচ সেই তালিকায় আপনি সই ক'রেছিলেন ?···বলুন ওই তালিকায় কি কি ছিল ?

পি. পি.। Objection Your Honour। সাধারণ মানুষ যাঁদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এসবের কোন সম্পর্কই নেই তাঁদের পক্ষে detail-এ seizure list অনুযায়ী নাম বলা সম্ভব নয়।

জজ। Proceed.

ডি. এল.। আপনি ওই তালিকায় কেন সই ক'রেছিলেন প্রভাসবাবু ? [প্রভাস নীরব] ওই list-এ কি কি ছিল আপনি না জানতে পারেন। কিন্তু ওতে কেন সই ক'রেছিলেন তাতো আপনি জানেন। নাকি বলবেন তাও জানেন না ?

প্রভাস। পুলিশ সাহেব অত জোরাজুরি করতে লাগলেন, সই না করে কি পার পাওয়া যেত ?

[আদালতে গুঞ্জন]

ডি. এল.। No more questions. [পি. পি.-কে] Your witness—

পি. পি.। No question.

[প্রভাস প্রামাণিক কাঠগড়া থেকে নেমে যায়]

ডি. এল.। আমি এবার seizure list-এ সই ক'রেছেন যে দ্বিতীয় সাক্ষী, সেই অখিল বিশ্বাসকে ডাকছি [অখিল বিশ্বাসের কাঠগড়ায় আগমন ও শপথ গ্রহণের পর]

ডি. এল.। অখিলবাবু, গগন মুহুরিকে গ্রেফতার করার সময় আপনি ছিলেন ?

অখিল। হ্যাঁ, খুব ভীড় জমেছিল আমিও দেখতে গিয়েছিলাম।

ডি. এল.। সে সময় পুলিশ আপনাকে এই কাগজে সই করতে বলেছিল কি ?

অখিল। না—ওই কাগজে তো নয় !

ডি. এল.। ভালো ক'রে দেখে বলুন—এই list-এ আপনি সই করেন নি ?

অখিল। না, আমাকে বলল সাক্ষী হিসেবে সই করতে হবে—একটা সাদা কাগজে সই করিয়ে নিল।

[আদালতে গুঞ্জন]

ডি. এল.। Thats all Your Honour.

জজ। Prosecution may cross-examine the witness.

পি. পি.। No questions.

ডি. এল.। Your Honour এই মামলার সব থেকে vital document হ'ল এই seizure list। কিন্তু এই seizur list যে নিছকই একটা মামলা সাজানোর জন্যে তৈরী করা হয়েছে তা এতে সাক্ষরকারীদের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। দুজন সাক্ষীর কথা থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে actual raid-এর সময় তাঁরা উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং এই seizure list-এ তালিকাভুক্ত জিনিশগুলি সত্যিসত্যিই raid-এর সময় আমার মক্কেলের possession-এ পাওয়া গেছে কি না সে বিষয়ে সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে সন্দেহাতীতভাবে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না। প্রভাস প্রামাণিক মহামান্য আদালতের সামনে ওই seizure list-এ কি কি ছিল তা তো বলতে পারেনই নি, উপরন্তু পুলিশ যে raid-এর পরে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওই seizure list-এ সই করিয়েছে এবং D. S. P. সাহেবের চাপে পড়েই তিনি যে সই করতে বাধ্য হয়েছেন একথাও সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন। দ্বিতীয় সাক্ষী অখিল বিশ্বাস তো তাঁর সাক্ষ্যে ওই list-এ সই করার কথা অস্বীকার ক'রে আদালতের সামনে পরিষ্কার ব'লে দিয়েছেন যে পুলিশ তাঁকে একটা সাদা কাগজে সই করিয়ে নিয়েছিল।

অতএব Your Honour—বোঝাই যাচ্ছে যে এই list সাক্ষীদের সই করিয়ে নেবার পরে সুপরিকল্পিত ভাবে তৈরী করা হয়েছে। Your Honour সমস্ত evidence থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে পুরো মামলাটাই সাজানো। আমার মক্কেলদের হেনস্থা করা ও তাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই পুলিশ এই ধরনের জঘন্য চক্রান্ত ক'রেছে ব'লে আমার বিশ্বাস।

Your Honour—আশা করি আমি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করতে পেরেছি যে আমার মক্কেলরা নির্দোষ।

[ডিফেন্স লইয়ার মাথা নুইয়ে বাউ করে বসে পড়েন—আদালতে কথাবার্তা চলতে থাকে। তারপরে—]

জজ। এই মামলার সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি পরীক্ষা ক'রে দেখা যায় prosecution-এর case যে সাক্ষীদের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই সাক্ষীদের সাক্ষ্য আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করার

পক্ষে যথেষ্ট নয়। এমনকি তাদের সাক্ষ্য থেকে এমন ধারণাই তৈরী হয় যে পুলিশের চাপে পড়েই সাক্ষীরা এই মামলার গুরুত্বপূর্ণ নথীপত্রে তাঁদের সাক্ষর দিয়েছেন। তাঁদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা ক'রে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির সত্যতা সম্বন্ধে আদালত আদৌ নিঃসন্দেহ হ'তে পারছে না। আদালত তাই উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে prosecution-এর আনা সব অভিযোগ থেকেই আসামীদের মুক্তি দিচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে Court এই মামলার Investigating officer ও মামলায় বর্ণিত Police raid-এর নেতা Deputy Superintendant of Police এর সমালোচনা করতে বাধ্য হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই পদাধিকারী যেন তাঁর পদ-পর্যাদার উপযুক্ত দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দেন।

এই রায়ের copy court District Magistrate-কে পাঠাচ্ছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে।

আদালতের কাজ শেষ হ'ল।

[জজ আদালত কক্ষ ত্যাগ করেন। সকলেই আস্তে আস্তে বেরিয়ে যেতে থাকে। S.P. নীতিশের কছে এসে বলে]

এস. পি.। আপনাকে কত করে বলেছিলাম case-টা ভালো ক'রে সাজান, নিজেদের reliable সাক্ষী দিন। আপনি আমার কথা শুনলেন না। local লোকগুলোকে সাক্ষী করলেন।

নীতিশ। কিন্তু স্যার—ওরাই তো সত্যি সত্যি raid-এর সময় ছিল। Raid-এর সময় ছিল না এমন লোককে শিখিয়ে পড়িয়ে সাক্ষী করাটা কি আইনের দিক থেকে ঠিক হত?

এস.পি.। আইনসম্মত রাস্তায় চলতে গিয়ে কি হ'ল তা দেখলেন তো! Criminal-টার coviction করাতে পারলেন? আমাদের লোককে সাক্ষী করলে তারা উকিলের জেরাতে ঘাবড়েও যেত না, তারা home work ক'রে যেত, seizure list-এ কি কি ছিল ঠিক ঠিক বলে আসত। এদেশে আইন মোতাবেক সব কিছু করতে গেলে কাজই করা যাবে না। এমন কি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজও করা যাবে না। আমার কথামত সাক্ষী দিলে একটা notorious criminal-কে আপনি জেলে পুরতে পারতেন, এবং সে ক্ষেত্রে The end would have justified the means.

নীতিশ। কিন্তু indipendent neutral সাক্ষীরা যে এভাবে পাল্টি খাবে এতো ভাবতে পারি নি।

এস.পি.। ওরা neutral থাকবে এটা আশা ক'রেছিলেন কি ক'রে? ওদের প্রাণে ভয় নেই? গগন মুহুরিরা বহু interior rural area-তে প্রায় একটা parralled administration চালায়। তার হুমকিতে তার ভয়ে ওরা

পাল্টি খাবে না?

[এস.পি. চলে যায়। ততক্ষণে খাঁচা থেকে বেরিয়ে গগন মুহুরি নীতিশের কাছে এগিয়ে আসে]

গগন। হেলাটাকে ঝাড়ফোঁক ক'রে ঠেকটা চিনেছিলেন বটে, কিন্তু আমাকে কি কুপিতে ভরতে পারলেন ডি. এস. পি সায়েব? পারবেন না। আপনি তো অনেকদিন ধরেই আমার তালাশ করছেন, এবারে ছেড়ে দিন। বরং একটা সমঝোতায় আসুন। তাতে দুজনেরই নাফা।

নীতিশ। এবারের মত সাজা এড়িয়ে গেলে গগন। তাই বলে ভেবোনা চির-কালই পারবে। শাস্তি তোমার হবেই।

গগন। আমার মেয়াদ করাতে আপনি পারবেন না রায় সাহেব। চেষ্টা করে দেখুন।

[গগনকে নিয়ে পুলিশরা চলে যায়। Court room এখন প্রায় খালি। বেলা দরজার কাছে উঁকি মারে। নীতিশ তাকে দেখতে পেয়ে ডাকে]

নীতিশ। বেলা না? [বেলা নীতিশকে দেখে তার কাছে এগিয়ে আসে] এখানে কি করছ? তোমার চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে কেন?

বেলা। বড্ড ভুগছি কাকু। ডাক্তার বলেছে আমার গ্যাসটিক আলসার আছে।

নীতিশ। সে কি? চিকিৎসা করছ তো?

বেলা। কোত্থেকে করব কাকু? আপনারা যত টাকা দিয়েছেন তার সবটাই তো প্রায় রথীনবাবু উকিলের খাঁই মেটাতে চলে গেছে। লোকটা বলেছিল ওকে খালাশ ক'রে আনবেই। খেপে খেপে টাকা দিয়ে গেছি। ওঁকেই তো খুঁজতে রোজ কোর্টে আসি।

নীতিশ। নিজের চিকিৎসাটা পর্যন্ত করোনি বেলা? আমাকে একবার জিজ্ঞেস করলে না কেন? মেয়াদ শেষ হবার আগে তিলুকে কোন উকিল ছাড়াতে পারবে না। লোকটা তো তোমায় ধাপ্পা দিয়েছে।

বেলা। সে আর কি ক'রে বুঝব কাকু? একা একা যে থাকতে পারছি না আর।

[একটু চুপ করে থেকে চলে যেতে যায়, তারপর থামে]

কাকু—একটা কথা বলব কিছু মনে করবেন না তো? থানার লোকদের আর আমার খোঁজ খবর করতে পাঠাবেন না। তারা রাতবিরেতে গিয়ে বড্ড বিরক্ত করে। জরজারি মানতে চায় না, গ্যাসটিকের ব্যথা পর্যন্ত মানতে চায় না। কিছুই তো নেই—ইজ্জৎটুকু থাক!

দৃশ্য শেষ হয়]

দশম দৃশ্য

[সিংহরায় বাড়ির নাটমন্দিরের উঠান। সানাই বাজছে, উলুধ্বনি শোনা যাচ্ছে। রমাপদ কন্যা সম্প্রদান করছে। পুরোহিত মন্ত্র পড়াচ্ছেন। বিয়ে বাড়ি অতিথি অভ্যাগততে ভরে আছে। পুরোহিত গোরোচনা কুঙ্কুমাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য লিপ্ত বরের ডান হাতটির ওপর মাঙ্গলিক দ্রব্যলিপ্ত উষার ডান হাতটি রেখে তার ওপর গাঁটছড়া ঢেকে বললেন]

পুরোহিত। ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রার্কাবশ্বিনাবুভৌ।
তে ভবা গ্রহনিলয়ং দধতাং শাশ্বতী সমাঃ।

[কুশ ও মালা দিয়ে উভয়ের হাত একযোগে বেঁধে ঘটের ওপর রাখে। তার ওপর কন্যাচ্ছাদনের গামছা ঢাকা দেন। রমাপদকে কুশী ক'রে কুশ, তিল তুলসী হরতুকি -ও ফুল সমেত জল ডান হাতে ধরিয়ে দিয়ে মন্ত্র বলাতে থাকেন। রমাপদও তা পুনরাবৃত্তি করতে থাকে]

বলুন, ওঁ এতসৈ সবস্ত্রাচ্ছাদনালঙ্কারায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ। তিনবার জলের ছিটে দিন কন্যার গায়ে। ফুলটা নিন, বলুন, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতসৈ সবস্ত্রাচ্ছাদনালঙ্কারায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ। ফুলটা মাথায় ঠেকিয়ে নামিয়ে রাখুন। বলুন, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধতিপতয়ে প্রজাপতয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৎসম্প্রদানায় বরায় নমঃ। কুশী করে জল নিয়ে আচমন করুন। ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেয়েকে একবার ছোঁন। তারপর বাঁ হাতে মেয়েকে ধরে ডান হাতটা কোশার মধ্যে রেখে বলুন, বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য ফাল্গুন মাসি কর্কট রাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চমী তিথৌ কাশ্যপ গোত্রঃ শ্রীরমাপদ সিংহ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি কামঃ—

[বাইরে একটা গাড়ি এসে থামার আওয়াজ হয়—এবং কয়েকটি বোমা ফাটার আওয়াজ হয়। হৈচৈ ও গোলমাল শোনা যায়]

পুরোহিত। ও কিসের শব্দ ?

[রমাপদর যারা প্রহরী তাদের সঙ্গে মারপিট করতে করতে গগন মুহুরী ও তার দল ঢুকে আসে। বিশৃঙ্খলায় বিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। গনার লোকজন যখন রমাপদর লোকেদের কবজা ক'রে ফেলেছে সেই সময় বাড়ির ভেতর থেকে একটা বন্দুক নিয়ে একজন ছুটে আসতেই গনা তার হাতে গুলি করে, লোকটার হাত থেকে বন্দুক পড়ে যায়। একজন ডাকাত সেটা কুড়িয়ে নেয়। লোকটি কাতরাতে কাতরাতে বসে পড়ে]

একজন ডাকাত। কেউ এক পা হিলবে না। কান খুলে শুনে নাও—বাইরে যাবার চেষ্টা করলে, কি সালি করলে একেবারে জানে খতরা হয়ে যাবে।

[গগন রমাপদর কাছে এগিয়ে যায়]

গগন। কি রাজাবাবু, খুব তো রমরমায় মেয়ের বিয়ে দিচ্চ। আমি যে খবর পাঠিয়েছিলাম তুমি পাওনি ? কি ভেবেছিলে, গনা ওস্তাদ ব্যানডেল্ দিচ্ছে বাতেলা করছে ? ভাবলে তোমার এতগুলো পাগড়ি আছে, লস্কর আছে, গনা এলে মহড়া নেবে ?

পুরোহিত। শুভন কন্যাসম্প্রদান হয়ে গেছে। লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেলে ঘোর অমঙ্গল হবে—

গনা। চুপ বে। তোকে এর মধ্যে কে কথা বলতে ডেকেছে ? যা সিধে নিয়ে ফেরার হয়ে যা, নইলে এই ধোঁয়া দেখছিস—বেহ্মতালু দিয়ে বের করে দেব ?

রমাপদ। গগন, তুমি কাজটা হয়ে যেতে দাও পরে আমি তোমার সঙ্গে বসে কথা বলব।

গনা। সালা তিকরমবাজি করার জায়গা পাওনি ? তুমি সালা পরে কথা বলবে বলে ঢপ দেবে আর আমি তাই স্থনে ভেড়ুয়া বনে যাব, আমি ও পাঠশালায় পড়িনি। ছ্যাগো সিংহবাবু, সোনামুখ ক'রে এখনও টাকা দিয়ে দাও, আমি কোন ভেজাল না ক'রে চলে যাব। নইলে এই বিয়ে বাড়ি আমি জাহান্নম বানিয়ে দেবো।

রমাপদ। টাকা এখুনি কোত্থেকে দেব গগন ? এত বড় কাজ করতে হচ্ছে, এত টাকা বরপণ দিতে হ'ল, এত তৈজসপত্তর গয়নাগাঁটি তৈরী করতে হ'ল—

গনা। কত টাকার গয়না দিয়েচ মেয়েকে ?

রমাপদ। অ্যাঁ ?

গনা। বলচি কতটাকার গয়না আচে মেয়ের গায়ে ? ওগুলো আগে খুলে দাও।

পুরোহিত। সালঙ্কারা কন্যা তো সম্প্রদান হয়ে গেছে বাবা।

গনা। এই স্থড্ডাটা তখন থেকে খালি কানের কাছে চরকি বাজাচ্ছে। একে একটু ঘুরিয়ে আনত। [আদেশ শুনে একজন দুর্বৃত্ত পুরোহিতকে ঘাড়ে রদ্দা মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। গগন রমাপদকে বলে] কি গো, মেয়েকে কাছে আসতে বলো। কতটা পাক্‌কি দিয়েচ একবার দেখি।

রমাপদ। এত বড় অধর্ম কোরোনা গগন, ফল ভালো হবে না···

গনা। [দলের লোকদের] বাড়ির ভেতরে যার যা গয়না আচে—যা খুলে নিয়ে আয়। এ বেহুলার ব্যবস্থা আমি করচি।

[দলের লোকেরা হৈ হৈ করতে করতে ভেতরে চলে যায় ; একটি লোক খালি প্রবেশ পথ আগলে থাকে—সে এজামুদ্দিন]

রমাপদ। গগন, গগন, আমি জোড়হাত করছি, অতিথি অভ্যাগত রয়েছেন, তাঁদের জিনিস লুটপাট কোরোনা—আমার পাপ হবে।

[গনা এইবার উষার কাছে এগিয়ে আসে]

গনা। ওয়া! এতো একদম তানুক চিজ দেখছি।

[বর দ্রুত উঠে এসে বাধা দিতে যায়]

বর। খবরদার ওর গায়ে হাত দেবেন না—

[দুটো ডাকাত ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাথি ঘুষি মেরে ওকে ধরাশায়ী করে ফেলে]

গনা। এমন একটা জুঁই এখানে ফুটে আচে একথা আগে জানলে তো আমিই মালাজোড়া করতাম।

উষা। [গায়ের গয়নাগুলো খুলে ফেলে গগনকে দিতে থাকে] আপনার পায়ে পড়ছি, আপনি সব গয়না নিয়ে যান, আমায় ছেড়ে দিন, আমার সর্বনাশ করবেন না—

গনা। সব্বোনাশের কথা উঠছে কেন জান? তোমার ওভিসার আয়না যে আমাকে মাতাল ক'রে দিয়েচে। এস, পয়লা তোমার পাপড়িতে একটা ছক্কা দোব।

[উষার হাত ধরে ফেলে]

উষা। না—দোহাই আপনার—আমি আপনার মেয়ের মত—দয়া করুন—এত লোকের সামনে আমার বেইজ্জত করবেন না—আপনার পায়ে ধরছি—

[গগন উষার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। উষা চিৎকার ক'রে ওঠে। একটা সমবেত হাহাকার শোনা যায়। আলো নিভে যায়]

দৃশ্য শেষ হয়]

একাদশ দৃশ্য

[নদীর ধার। মাছধরার জাল শুকোচ্ছে। নিথর রাত। মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে আসে কুকুরের ডাক। বাদুড়ের পাখার শব্দ শোনা যায়।

নীতিশ তার ফোর্স নিয়ে প্রবেশ করে—তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে এজামুদ্দিন। এজামুদ্দিন আঙুল দিয়ে দেখায় একদিকে]

নীতিশ। ওই বাড়ি?

এজামুদ্দিন। হ্যাঁ হুজুর। রাতেই ওপার থেকে নৌকো আসবে। এখন কিছুদিনের জন্যে গা ঢাকা দেবে। যতক্ষণ না ভটভটির আওয়াজ পাওয়া যায় ততক্ষণ ওইখানেই থাকবে।

নীতিশ। এখন আছে তাহলে?

এজামুদ্দিন। আলবত আছে। তবে এখুনি ঢুকবেন না হুজুর, ঝারি কষছে হয়ত।

একটু অপেক্ষা করুন। এই পথ ছাড়া বেরুবার পথ নেই।

[নীতিশ তার সঙ্গের প্রায় দশজনের মত সশস্ত্র পুলিশকে নীচু গলায় নির্দেশ দেয়। তারা আড়ালে সরে যায়]

নীতিশ। এজামুদ্দিন, তোমায় বিশ্বাস করতে পারি তো?

এজামুদ্দিন। আল্লার কসম, একটাও মিচে কথা বলিনি। বরং ভাবচি এই যে উলটিবাজি করলাম এর জন্যে খারটা কি করে সামলাব।

নীতিশ। সে জন্যে ভেবোনা, আমরা তো আছি। তবে তোমার কথামত তোমার ওস্তাদকে যদি আজ এখানে পাই, তাহলে তার খেলা আজই আমি জন্মের মত শেষ ক'রে দেব।

এজামুদ্দিন। আমায় দেখবেন হুজুর···

নীতিশ। বলছি তো, তোমার ভাবনা নেই। তুমি যখন আমাদের কাছে এসেছ—

এজামুদ্দিন। আগেই আসতাম। ডাক্তার সাহেবের বাড়িতে যেদিন কাজ হবার কথা ছিল প্রথমটায় ভাবলাম থানায় যাই। পরে ভয় হল। ডাক্তারবাবুকেই খবরটা দিলাম। সেদিন এস্তক বসেই ছিলাম। এবারে প্রায় বাড়ির থেকে জোর করে তুলে নিয়ে না গেলে যেতাম না। কিন্তু বিশ্বেস করুন—ও যে এত বড় হারমাতি করতে পারে, বিয়ের কনেকে একবাড়ি লোকের সামনে—এইরকম অত্যেচার করবে···এইরকম বিলা কাজ দেখে আর ঠিক থাকতে পারলাম না হুজুর! আমার ঘরেও দু' দুটো মেয়ে আচে। তার একটার বয়েস ওই রকম সিংহরায় বাবুর মেয়ের মতই হবে···এ চোখে দ্যাকা যায় না।

[এই সময় নদীর দিক থেকে আস্তে আস্তে একটা পাওয়ার বোটের ইন্‌জিনের শব্দ শোনা যেতে আরম্ভ করে। নীতিশ ও এজামুদ্দিন সচকিত হয়ে ওঠে। পুলিশরা মঞ্চে আসে। নীতিশ তাদের আবার নির্দেশ দিলে তারা সরে যায়। নীতিশ এজামুদ্দিনকেও বলে চলে যেতে এবং নিজেও আত্মগোপন করে।

পাওয়ার বোটের শব্দ বাড়ে। তারপর একসময় ইন্‌জিন বন্ধ হয়ে সব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। একটা রাতপাখির ডাক শোনা যায়। তারপর গগন ও তার এক সাগরেদ খুব সন্তর্পণে মঞ্চে ঢুকে আসে। চারিদিক ভালো করে দেখে নিয়ে নদীর দিকে এগোতে যাবে চারদিক থেকে পুলিশ রাইফেল উঁচিয়ে ছুটে এসে ওদের ঘিরে ফেলে]

নীতিশ। কি গগন মুহুরি, বাংলাদেশে গা ঢাকা দেবে তাই না? তোমার শয়তানি এবার শেষ। বলেছিলে না তোমাকে মেয়াদ করাতে আমি পারবো না?

গগন। এখনও বলছি স্যার, বেরিয়ে আমি আসবই।

নীতিশ। এবার আর smuggling-এর case নয় গগন যে সাক্ষীকে ভয় দেখিয়ে উকিলের বাহাদুরিতে তুমি বেরিয়ে যাবে। বিয়ে বাড়ি চড়াও হয়ে তুমি ডাকাতি করেছ, মানুষ খুন করতে তুমি গুলি চালিয়েছ ; ফৌজদারি আইনের ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯ ধারা, ৪০২ ধারা। সবার ওপরে ৩৭৫ ধারা। একটা বাচ্চা মেয়েকে বিয়ের পিঁড়ি থেকে তুলে তুমি তাকে rape করেছ। Rape করেছ আত্মীয়স্বজন বরযাত্রী অতিথি অভ্যাগতের সামনে। তুমি মানুষ নও—পিশাচ। তোমাকে আমি ছাড়ছি না।

গগন। ডি. এস. পি. সাহেব—আইন আপনার একার জন্যে নেই, আইন আমার জন্যেও আছে। ক্ষমতাও আপনার একার নেই, জানবেন ক্ষমতা আমারও আছে। আপনাকে কেস্ প্রমাণ করতে হবে। আর ভুলে যাবেন না আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে একটি লোকও আসবে না।

[নীতিশ গগনকে সজোরে একটা ঘুষি মারে]

নীতিশ। জানোয়ার কাঁহাকা। তুমি এখনও বড় গলায় কথা বলে যাচ্ছ? এত বড় অপরাধ করার পরেও এতখানি স্পর্দ্ধা তোমার, [একজন কন্‌স্টেবল্‌কে] এ্যাসিডের বোতলটা নিয়ে এস। [কন্‌স্টেবল্ বেরিয়ে যায়] শোন গগন, আইনের হাত এড়িয়ে তুমি বেরতে পারবে কিনা সেটা পরে দেখা যাবে। কোথায় কোথায় তোমার বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁরা তোমার জন্য কি কি ব্যবস্থা করেন সেটাও পরে দেখা যাবে। তবে তোমাকে তাদের হাতে ছেড়ে দেবার আগে আপাতত এমন একটা শাস্তির ব্যবস্থা আমি করব যাতে বাকি জীবনটা জেলের বাইরে থাকলেও জেলের থেকে বেশি অন্ধকারে তুমি আটকানো থাকবে। এমন একটা শাস্তি তোমাকে দেব যাতে সারা জীবন তোমার মনে হবে এই বিরাট অন্ধকার পৃথিবীর থেকে জেলের সলিটারি সেল্‌ও অনেক ভালো।

[কন্‌স্টেবলটি এ্যাসিডের বোতল নিয়ে ফিরে এসেছে]

দাও—দুটো চোখেই এ্যাসিড ঢেলে দাও।

[গগন চকিতে রিভলবার বের করে, কিন্তু নীতিশের দিকে তোলার আগেই নীতিশের রিভলবার থেকে গুলি ছোটে—গগনের লক্ষ্যভ্রষ্ট রিভলবার থেকে গুলি ছুটে যায়—হাত থেকে ছিটকে পড়ে যায় রিভলবার। গগন কাতর আর্তনাদ করে বসে পড়ে। পুলিশরা গগন ও সঙ্গীকে মাটিতে ফেলে দেয়।]

যাক গুলি চালিয়ে তুমি আমাকে encounter-এর সুযোগটাও ক'রে দিলে। [কন্‌স্টেবলদের] ঢালো, ভালো ক'রে এ্যাসিড ঢালো চোখে যাতে ওই পাপদৃষ্টি আর কোন দিন কোন নিষ্পাপ মেয়ের দিকে না পড়ে।

[পুলিশরা ওদের চোখে এ্যাসিড ঢালতে আরম্ভ করতেই ওরা তীব্র যন্ত্রণায় চীৎকার করতে থাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চের আলো ক্রমে কমে যেতে থাকে। পাওয়ার বোটের ইন্‌জিন স্টার্ট দেবার আওয়াজ আসে এবং শব্দটা ক্রমশ দূরে চলে যেতে থাকে। অন্ধকারের মধ্যে বেশ খানিকক্ষণ গগনদের কাতরানি ও পাওয়ার বোটের ভুটভুটভুটভুট আওয়াজ শোনা যায়।

দৃশ্য শেষ হয়]

দ্বাদশ দৃশ্য [ক]

[একটা club ধরনের জায়গা। কিছু উচ্চবিত্ত ভদ্রলোক card table-এ তাস খেলছে। দু' একজন মদ্যপান করছে সভ্যরীতিতে। একজন একটা ইংরাজী খবরের কাগজ পড়ছিল।]

প্রথম ব্যক্তি। Shocking ! Abominable ! Inhuman ! আরে ! Criminal-কে ধরে তার চোখ গেলে দিবি? এও তো in itself একটা crime। কোন দেশে বাস করছি আমরা?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। পুলিশ তো চিরকালই এইসব করে আসছে। Amnesty International-এর report-এ দেখোনি গত দু' বছরে কতগুলো lock up-এ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে?

তৃতীয় ব্যক্তি। না না, এ কিন্তু আরও সাংঘাতিক। Law enforcing authority-ই যদি unlawful কাজ করে তাহলে তো দেশে আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকলই না। সমাজের ভিতগুলোই তো ভেঙে পড়ছে।

চতুর্থ ব্যক্তি। Law আর এদেশে কোথায় enforced হচ্ছে?

তৃতীয় ব্যক্তি। হচ্ছে না?

চতুর্থ ব্যক্তি। দেখুন, একজন পুলিশ অফিসার দুটো ডাকাতের চোখ অন্ধ ক'রে দিয়েছে বলে আপনাদের মনে হচ্ছে সমাজের ভিতগুলো ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু share scandal, হাওলা scandal, বাবরি মসজিদ ধ্বংস—ভোটের সময় খুনোখুনি—মুক্ত বাজারে MLA-MP কেনা—এসবের সময় আপনাদের মনে হয়না সমাজের ভিত অনেকদিন আগেই আলগা হয়ে গেছে? [বেয়ারাকে] এই—আমাকে আর একটা whisky দাও।

তৃতীয় ব্যক্তি। একটা জিনিশ তুমি বুঝছনা সত্যেশ, এই reporter কিন্তু ঠিকই লিখেছে! পুলিশের মত একটা institutionalised force-কে কিছুতেই illegal method use করতে দেওয়া যায় না। যে plea-তেই তা করুক।

crime বন্ধ করার নাম করে তাহলে তো ব্যক্তিগত আক্রোশও চরিতার্থ করতে পারে পুলিশ। এটা কোন দেশে চলে না।

চতুর্থ ব্যক্তি। ভবেশদা – মনে করবেন না আমি এই ধরনের brutal ব্যাপার সমর্থন করছি। কিন্তু পুলিশের কাজ তো বাবা-বাছা করে হয় না। এরকম hardened criminal-দের deal করার সময় পুলিশকে extra legal method use করতেই হয়।

প্রথম ব্যক্তি। কিন্তু সেটা confession আদায়-টাদায়ের সময় চলতে পারে, তাই বলে ধরা পড়ার পর পুলিশ স্বরচিত বিচার করবে সাজা দেবে – এ চলতে পারে না। কোন দেশে এটা হয়না।

চতুর্থ ব্যক্তি। কিন্তু কোন দেশে কি এত বিপুল সংখ্যক criminal court-কে কলা দেখিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। সেটা পারে তো police-criminal link up-এরই জন্যে।

চতুর্থ ব্যক্তি। Mr Mitra, আপনি কিন্তু এই link up-এর king-pin-টার কথা বললেন না, politician – তারাই তো পুলিশ এবং গুণ্ডার caretaker। বহু ক্ষেত্রে তো গুণ্ডারাই political নেতা।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আপনি যা বলছেন তা বিহার-ইউ পি সম্বন্ধে হয়ত খাটে—পশ্চিম বঙ্গের reality-টা কিন্তু অন্যরকম।

চতুর্থ ব্যক্তি। Sorry Mr Mitra, পশ্চিমবঙ্গের politics এ criminal-দের আধিপত্যটা নিশ্চয়ই ব্যাপক নয়, কিন্তু political গুণ্ডামি, কিম্বা গুণ্ডা পলিটিশিয়ান এখানে একেবারে নেই এটা কি আপনি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন? বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন এখানে কোথাও politician-পুলিশ-গুণ্ডা nexus নেই – antisocial-রা এখানে কখনই political protection পায় না। [স্তব্ধতা] বলুন?

[আলো নিভে যায় – দৃশ্য শেষ হয়]

দ্বাদশ দৃশ্য [খ]

[S. P.-র Office]

S. P.। যা বলার DIG বলবেন। এ ব্যাপারে Press-এর কাছে statement দেওয়ায় আমার অসুবিধে আছে।

সাংবাদিক। কিন্তু Press-এর যে সংবাদ সংগ্রহের অধিকার আছে এটা তো আপনি জানেন।

রাজনৈতিক নেতা। শুধু Press বলছেন কেন? সাধারণ মানুষের সমস্ত কিছু

জানার অধিকার আছে। এইরকম একটা নৃশংস অত্যাচার করল একটি Police Officer। তার সম্বন্ধে Department থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হল তা জানার অধিকার জনসাধারণের নিশ্চয়ই আছে, এবং জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমি সেইটেই জানতে চাইছি।

সাংবাদিক। আমাদের কাছে খবর আছে যে অপরাধ দমনে ব্যর্থতা ঢাকতেই পুলিশ সুপরিকল্পিতভাবে এই সব প্রতিশোধমূলক action নিচ্ছে। এ বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন?

S. P.। পুলিশ আইনের বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারে না।

সাংবাদিক। কিন্তু এক্ষেত্রে তো গিয়েছে। এটাকে কি ব্যক্তিগত আক্রোশ বলা যায় না?

S. P.। No comments.

রাজনৈতিক নেতা। আমাদের গভর্নমেণ্ট পুলিশকে জনসেবার হাতিয়ার হিসেবে দেখতে চায়। এইরকম দু'চারজন অত্যাচারী officer-এর জন্যে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। এই ধরনের অত্যাচারের অবিলম্বে বিচার ও শাস্তি হওয়া দরকার। লোকটিকে এখ্খুনি arrest করা হোক।

S. P.। এই officer-এর suspension order হয়েছে।

আলো নিভে যায় – দৃশ্য শেষ হয়]

দ্বাদশ দৃশ্য [গ]

[আলো জ্বলে উঠলে দেখা যায় সুমন্ত্র একদল লোকের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছে]

সুমন্ত্র। এই officer-এর suspensions order তুলে নিতেই হবে। আমরা জানি নীতিশ রায় DSP হয়ে এখানে আসার পর থেকে বহু স্মাগলার ধরা পড়েছে, স্মাগলিং ডাকাতি রাহাজানি অনেক কমে গিয়েছে। তবু গগন মুহুরির gang কিছু দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ, আমলা ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার মদতে আইনের হাত এড়িয়ে বুক ফুলিয়ে তাদের অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল। এদের অত্যাচারে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ সর্বদা আতঙ্কের মধ্যে বাস করেছে – সন্ধ্যের পর তাদের গ্রামের বাইরে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে। গগনের অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে বাড়তে – তার দুঃসাহস বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে একটি বিয়ের কনেকে অতিথি অভ্যাগতদের সামনে ধর্ষণ করতেও এই শয়তানের বিবেকে বাধেনি। এই ঘটনার পরে নীতিশ

রায় একে গ্রেফতার করেও যদি ভয় পেয়ে থাকেন যে এই শয়তান তার প্রভাব খাটিয়ে আবার খালাশ পেয়ে যেতে পারে, শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারে – তাই আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে যদি এই শয়তানের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে থাকেন, তাহলে বলব তিনি তা সাধারণ মানুষের স্বার্থেই করেছেন। সাধারণ মানুষকে তিনি এই মানুষরূপী পিশাচের ভয় থেকে মুক্তি দিয়েছেন যা প্রশাসন পুলিশ নেতারা দিতে পারেনি।

কাল তাই দলমত নির্বিশেষে আমরা DM-এর কাছে যাবো—গিয়ে বলব এই রকম officer-কে suspend করা চলবে না। suspend করুন সেই সব ঘুষখোর পুলিশকে যারা গগনের মত শয়তানের কাছে টাকা খেয়ে তাকে ছেড়ে রেখেছিল—গ্রেফতার করুন সেই সব আমলাকে যারা গগন মুহুরির টাকায় বাড়ি বানাচ্ছে—গ্রেফতার করুন সেইসব রাজনৈতিক নেতাকে যারা গগন মুহুরির টাকায় তাদের ইলেকশন ক্যাম্পেন চালাতে লজ্জা পায়না।

এই কথা বলবার জন্যে বন্ধুগণ, কাল সকাল দশটায় ডি এমের বাংলোর সামনে দলে দলে জমায়েত হোন।

আলো নিভে যায়—দৃশ্য শেষ হয়]

ত্রয়োদশ দৃশ্য

[নদীর ধার। একটা Jeep এসে থামার আওয়াজ হয়। নীতিশ প্রবেশ করে। এখন তার উর্দি নেই। তার পিছনে পিছনে অর্চ্চনাও এসে দাঁড়ায়। এখন সে খুবই গম্ভীর]

অর্চ্চনা। এখানে নামলে কেন ?

নীতিশ। অ্যাঁ ? এমনিই। চলে যাচ্ছি তো, হয়ত আর কোনদিন এদিকে আসাই হবেনা। নদীটা ভারী সুন্দর এখানে, দেখে যেতে ইচ্ছে হ'ল একবার।··· এইখানটাতেই সেদিনের ঘটনাটা ঘটেছিল।

অর্চ্চনা। তুমি বলতে অপরাধী নাকি তার অপরাধের জায়গাটাতে ফিরে আসে। The criminal revisits the scene of crime.

নীতিশ। [স্তব্ধ থাকার পর] আমিও সেই অপরাধী মনস্তত্ত্বে ভুগছি বলছ ? [অর্চ্চনা উত্তর দেয় না] সেদিনের পর থেকেই তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে অদ্ভুত ব্যবহার করছ অর্চ্চনা।...কেন ?

অর্চ্চনা। তুমি বলেছিলে কোনদিন অন্যায় করবে না।

নীতিশ। Criminal-কে শাস্তি দেওয়া কি অন্যায় ?

অর্চ্চনা। সে তো তোমার কাজ নয়। তোমার কাজ তাকে বিচারের সামনে দাঁড় করানো।

নীতিশ। কিন্তু বিচারে যেখানে অপরাধীর সাজা হয় না, সেখানে Justice—ন্যায়—কিভাবে রক্ষা পাবে বলতে পারো ? সেখানে policeman হিসেবে আমার ভূমিকাটাই বা কি হবে ? একটা জঘন্য অপরাধী যাতে কোনভাবেই না পার পেয়ে যায়, তাই তাকে শাস্তি দিয়েছি। এটা অন্যায় ?

অর্চ্চনা। সেটা কি আইনসম্মত ভাবে দিয়েছ ?

নীতিশ। আচ্ছা বলো তো, শেষ পর্যন্ত আমার দায়টা কার কাছে ? commitmentটা কার কাছে ? আইনের বইয়ের শুকনো কতকগুলো ছাপার হরফের কাছে, নাকি সেই আইন যাদের জন্যে তৈরী সেই মানুষের কাছে ? মানুষকে আমি এই পিশাচটার অত্যাচার থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছি ; আর সেই কাজটা ঠিক করেছি বলেই না সাধারণ মানুষ আমার suspension order-এর বিরুদ্ধে ওইভাবে demonstrate করল। এটাকে তুমি কি বলবে ?

অর্চ্চনা। এতদিন ধরে ভয়ের রাজত্বে বাস করতে করতে লোকে হয়ত immediate relief-এর কথা ভেবে তোমায় support করেছে, কিন্তু কাজটা যে শেষপর্যন্ত অমানবিক সেটা আর ভেবে দেখেনি।

নীতিশ। যে লোকটা ফাঁসীর আসামীর গলায় ফাঁসটা পরায়, কি যে-বিচারক তাকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেয়, তারাও কি তাহলে একটা ভয়ঙ্কর অমানবিক কাজ করছে ? তারা সে কাজ না করলে সমাজ এইসব অপরাধীর হাত থেকে মুক্ত হবে কি ভাবে ?

অর্চ্চনা। তাদের ওপর সমাজ সেই দায়িত্বটা দিয়েছে, তোমার ওপর তো সে দায়িত্ব দেয়নি। তুমি বিচারক নও, জল্লাদও নও। তুমি কেন মানুষকে অন্ধ করবে ? [খানিকটা স্তব্ধতা। এইখানে ভিখারি কিশোরের গান শোনা যায়]

কিশোর। [গান] রাধিকার কি হয়্যাছে মনে
যায় না গো রাই কদমতলায় কৃষ্ণ অন্বেষণে।
যায় না গো রাই যমুনাতে জল আনিতে কে জানে
রাধিকার কি হয়্যাছে মনে
যায় না গো রাই কদমতলায় কৃষ্ণ অন্বেষণে।
শুনিয়া শ্যামের বাঁশরি
ঘরেতে আছে গো রাই হৃদিপাশরি
কয়না কথা মনের ব্যথা কি হয়্যাছে তার মনে ॥

[গানের কয়েক লাইন পরে অর্চ্চনা বলে]

অর্চ্চনা। ওপারে তো বাংলাদেশ, তাই না ?

নীতিশ। হ্যাঁ।

অর্চ্চনা। বাড়িঘর তো কিছুই ছাথা যাচ্ছে না।

নীতিশ। এদিকটা বড্ড জঙ্গুলে মতন। একটু ওধারে গেলেই গ্রাম ছাথা যায়।

অর্চ্চনা। চলো দেখে আসি।

[অর্চ্চনা বেরিয়ে যায়। নীতিশ তার অনুসরণ করে। গান চলতে থাকে। ক্ষণপরে উষা ও চন্দন প্রবেশ করে]

উষা। ছাথা করতে বলেছিলে কেন?

চন্দন। খুব জরুরী কথা আছে।

উষা। আর কি কথা থাকতে পারে? যা হবার তো হয়ে গেছে।

চন্দন। হ্যাঁ—দুর্ঘটনা যা ঘটার তা ঘটে গেছে ঠিকই, কিন্তু সেই জন্যেই তো কথা বলাটা আরও জরুরী হয়ে পড়েছে।

[বলতে বলতে চন্দন এসে উষার কাঁধে হাত রাখে। উষা সরে যায়]

উষা। ছুঁয়োনা। কি বলার আছে বলো।

চন্দন। উষা, চলো আমরা কোলকাতায় চলে যাই। আমরা বিয়ে করব।

[অনেকটা স্তব্ধতার পরে]

উষা। এখন আর তা হয় না।

চন্দন। কেন হয় না?

উষা। আমার মন এর জন্যে প্রস্তুত নয়—আমার শরীরও না।

চন্দন। তুমি কি নিজেকে অশুচি ভাবছ? ওটা তো দুর্ঘটনা। তুমি তার জন্যে দায়ী নও।

উষা। আমি আজকের মেয়ে চন্দনদা, ওসব শুচিবাই আমার নেই। কিন্তু এরকম কোন ঘটনা ঘটলে দেহ মন একেবারে থেঁতলে যায়। তুমি মেয়ে হলে বুঝতে। এ অবস্থায় নিজেকে সামলে আবার বিয়ের কথা চিন্তা করতে পারা যায় না। অন্তত আমি এখনি পারছি না।

চন্দন। নতুন করে জীবনটা গড়বার দরকার তো আমার মনে হয় এখনই সব থেকে বেশি উষা। এতেই তো তোমার মন সুস্থ হয়ে উঠবে। [একটু স্তব্ধতা] উষা, দ্বিধা কোরোনা। চলো আমরা কোলকাতায় চলে যাই। সেখানে এই চেনা-জানার ছোট্ট গণ্ডীটা থাকবে না। আমি এক বন্ধুকে যোগাযোগ ক'রেছিলাম, বহরমপুর কলেজে আমার সঙ্গে পড়ত—তাদের কাচের ব্যবসা—আপাতত সেখানে একটা কাজ পাওয়া যাবে। [স্তব্ধতা] উষা?

উষা। সেদিন যখন আমি তোমাকে আমায় নিয়ে চ'লে যেতে বলেছিলাম তখন যদি তুমি আমার কথা শুনতে—তাহলে এই ভয়ঙ্কর অত্যাচারটা আমাকে সহ্য করতে হ'ত না।

চন্দন। ঠিক। স্বীকার করছি সেদিন সত্যিই আমার সাহসে কুলোয়নি। আমায়

তার জন্যে ক্ষমা করো উষা। আমায় আর একবার সুযোগ দাও। সেদিন পারিনি ঠিকই, কিন্তু আজকের এই কষ্টের সময় তোমার পাশে দাঁড়িয়ে সেই দোষ স্খালন করার সুযোগ আমাকে দাও। না বোলো না। উষা, আমার সাহসের অভাব ছিল ঠিকই, কিন্তু ভালোবাসার অভাব ছিল না।

[উষা অশ্রুসজল চোখে চন্দনের কাছে এগিয়ে আসে। তার হাতটা ধরে বলে]

উষা। যাব।

[এই সময় নীতিশ ও অর্চ্চনা ফিরে আসে]

নীতিশ। উষা! কেমন আছ? [উষা নিরুত্তরই থাকে] অর্চ্চনা, এ হচ্ছে উষা সিংহরায়। আর ইনি এখানকার শিক্ষক…

চন্দন। আমার নাম চন্দন মিত্র।

নীতিশ। তোমাদের সঙ্গে এরকম যে ছাথা হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি।

চন্দন। এখন আর এখানে বেড়াতে আসায় কোন ভয় নেই স্যার।—আপনি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন?

নীতিশ। হ্যাঁ, আমাদের তো বদলির চাকরি।

উষা। আমরাও এখান থেকে চলে যাচ্ছি। কোলকাতায় ও একটা কাজ পেয়েছে। আমরা ওখানে গিয়ে বিয়ে করব।

নীতিশ। [চন্দনকে] সত্যি?

চন্দন। হ্যাঁ।

নীতিশ। বাঃ।

উষা। আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন।

[উষা ও চন্দন নীতিশকে প্রণাম করে, তারপর দুজনে চলে যায়]

অর্চ্চনা। এই সেই উষা সিংহরায়?

নীতিশ। হ্যাঁ। মনে হচ্ছে মেয়েটা ওর দুঃখের থেকে বেরনোর পথটা পেয়ে গেল।

অর্চ্চনা। ওকে সামনাসামনি দেখে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। কি ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই না ওকে যেতে হয়েছে।

নীতিশ। ওর কথা ভাবলেও কি মনে হচ্ছে না আমি ঠিকই করেছি? আমার কাজটা একজন স্বাভাবিক মানুষের মতই কাজ?

অর্চ্চনা। সেটা এখনও বুঝতে পারছি না।

নীতিশ। কেন বুঝতে পারছো না অর্চ্চনা আমাদের দেশটাই একটা ভয়ঙ্কর সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। মানুষ কতভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে, কিন্তু সে অত্যাচারের কোন প্রতিকার হচ্ছে না। যাদের ওপর প্রতিকার করার ভার, তারা অক্ষম, তারা corrupt। এইরকম একটা সময়ে কাউকে না কাউকে তো এগিয়ে এসে দায়িত্বটা নিতেই হবে। আমিও তাই করেছি। অত্যাচারীকে শাস্তি দিয়েছি।

অর্চ্চনা। কিন্তু এ কি ধরনের শাস্তি? খুনী হোক ডাকাত হোক, আমার স্বামী আর একজন মানুষের চোখ অন্ধ করে দিচ্ছে এটা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারা যায় না। আমি অন্তত পারছি না। [যেতে গিয়ে থামে] জানিনা, সময়ে তো সবই সয়ে যায়। হয়ত পরে পারব। চলো।

[ধীর পায়ে বেরিয়ে যায়। ভিখারি কিশোরটির গান ভেসে আসতে থাকে আবার—

দূরে যাবোনা বন্ধু গো রইব সন্নিকট
দূরে গেলে খুলবে কি আর কাছে থাকার জট।
তুমি হবে দূর গো বন্ধু তুমি সন্নিকট
যেমন তুমি কোঠা বাড়ি তেমনি বনবাসের মঠ ॥

[নীতিশ একটুক্ষণ চেয়ে থেকে অর্চ্চনার অনুসরণ করে]

[যবনিকা নেমে আসে]

একই অঙ্গে এত রূপ

পরিচালনা : হরিসাধন দাশগুপ্ত

একই অঙ্গে এত রূপ

যুগ্ম প্রযোজক : বিজয় চট্টোপাধ্যায় ও হরিসাধন দাশগুপ্ত

প্রোডাকশন ম্যানেজার : সুখময় সেন

গল্প : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

চিত্রনাট্য : হরিসাধন দাশগুপ্ত

পরিচালনা : হরিসাধন দাশগুপ্ত

চিত্রগ্রহণ : দীনেন গুপ্ত

শিল্প নির্দেশক : প্রীতিময় সেন (উপদেষ্টা) ও বিজয় বসু

সম্পাদনা : তরুণ দত্ত

শব্দগ্রহণ : বাণী দত্ত

পুনঃশব্দযোজন : শ্যামসুন্দর ঘোষ

সঙ্গীত : আলী আকবর খান

কণ্ঠশিল্পী : প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন

অঙ্গসজ্জা : অনন্ত দাশ

প্রচার : ফণীন্দ্র পাল

পরিবেশনা : চণ্ডীমাতা ফিল্মস

ভূমিকায় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, ছায়া দেবী, হারীণ চট্টোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল, দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত ছন্দা চট্টোপাধ্যায়, সুবল দত্ত, নিবারণ সেন।

১

[রাত্রি।

চলন্ত ট্রেনের কামরা। রেডিওয় রবীন্দ্রসংগীত বাজে।

"আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে"

রমেন জানালার ধারে বসে আছে। রেডিও বন্ধ করে।]

হাসি (নেপথ্যে)। এই, গানটা বন্ধ কোরোনা প্লীজ। গানটা আমার ভীষণ ভাল লাগে।

রমেন। আর তোমার মুখটাও যে একজনের খুব ভাল লাগে, তা বুঝি আর দর্শন করা যাবে না।

[আয়নায় হাসির মুখ]

রমেন। দেখ আমি তোমাকে একটা warning দিচ্ছি। আমি এক থেকে দশ গুনব। তার মধ্যে যদি তুমি বের হলে তো ভাল—তা না হলে—

[হাসি বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে।]

হাসি। তুমি হাত মুখ ধোবে না? পরিষ্কার হবে না? সত্যি তোমাকে নিয়ে পারা গেল না।

[রমেন হাসির হাত ধরে পাশে বসায়।]

রমেন। না, তুমি কিচ্ছু করতে পারবে না। যতক্ষণ আমার পাশে থাকবে। সবসময় আমার সংগে প্রেম করবে।

হাসি। সব সময়!

[রমেন হাত দিয়ে হাসির মুখে আদর করে।]

রমেন। হ্যাঁ। সবসময়। আচ্ছা, একটা কথা বলতো। বিয়ের পর থেকে এই কটা দিন তুমি আমার কাছে কতটুকু সময় ছিলে? তুমি আমাকে ভীষণ neglect করছ। কেন, বলত?

হাসি। তুমি যে কি! সময় পেলাম কখন? বাড়ীতে এত লোকজন, সব গুরুজনেরা। ভারী লজ্জা করে।

[হাসি মুখ নীচু করে।]

রমেন। এটা একটা excuse। ইচ্ছে হলেই তুমি পারতে। আসলে আমাকে তোমার ঠিক মনে ধরেনি। তাই না?

হাসি (হেসে)। ও। বুঝতে পেরেছি। তুমি এমন শুনতে চাও এরকম পাত্র হয় না। বিলেত ফেরত, ভাল চাকরি করে, হীরের টুকরো ছেলে।

রমেন। ঠিকই তো। অবশ্য পাত্রীটিও নেহাত মন্দ না। বড্ড গোঁ। তাছাড়া দয়ামায়াও একটুও নেই। তাই না?

[রমেন হাসিকে জড়িয়ে ধরতে যায়। হাসি ছাড়িয়ে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।]

রমেন। কি হল? হাসি, হাসি—তুমি কি সত্যি আমাকে বিয়ে করে disappointed হয়েছো?

[হাসির চোখে জল।]

রমেন। হাসি!

[রমেন চিবুক ধরে আস্তে হাসির মুখটা নিজের দিকে তুলে ধরে।]

রমেন। হাসি, তুমি কাঁদছ? তুমি একেবারে ছেলেমানুষ। তোমার সংগে ঠাট্টা করলাম বুঝতে পারলে না। জান, বিয়ের পর এই কদিন আমার সৌভাগ্য আর তোমার প্রশংসা শুনতে শুনতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। বাবা মায়ের কাণ্ড দেখে ভয় হয়, তোমাকে পেয়ে আমাকে ভুলে না যায়!

[হাসি হঠাৎ রমেনকে জড়িয়ে ধরে। রমেনও নিজেকে আস্তে করে ছাড়িয়ে নিয়ে চোখের জল মুছে দেয়। রমেন হাত দিয়ে হাসির গালে আদর করে।]

রমেন। ভয় করছে? কিসের ভয় তোমার?

হাসি। এই কদিন তোমাদের বাড়ীতে এসে যে স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি—জানিনা তা শোধ করতে পারব কিনা? এত সুখ, এত অফুরন্ত পাওয়া—একি আমার সইবে?

[মুখোমুখি বসে রমেন-হাসি।]

রমেন। হাসি! তুমি কি বোঝ না তোমাকে আমি কত ভালবাসি। তোমাকে পেয়ে আমি কত খুশি হয়েছি। কিসের দুঃখ তোমার! পুরনো -দিনগুলো ফেলে আসতে কষ্ট হচ্ছে?

হাসি। ফেলে আসার কি-ই বা ছিল? ছেলেবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছি। বড় একা ছিলাম। বড় নিঃসঙ্গ। তারপর—

রমেন। তারপর—

হাসি। তুমি কিন্তু আমাকে একা ফেলে যেও না। আমার ভীষণ ভয় করে।

রমেন। বোকা মেয়ে। তোমাকে আমি এমনি করে আঁকড়ে ধরব।

[রমেন হাসিকে বুকের মাঝে টেনে নেয়। বাইরে ট্রেন লাইনের দৃশ্য। ট্রেনের আলো। ভোর হয়ে এসেছে।

ছবির টাইটেল শুরু হয়। বাইরের মাঠ ঘাট, গাছগাছালির চলন্ত দৃশ্য। সূর্য ওঠে। টাইটেল পড়ে। মাঠের ভেতর দিয়ে ট্রেন যায়। টাইটেল শেষ হয়।]

২

[সকাল। পাখপাখালির ডাক! রমেন বিছানায় শুয়ে। খালি গা। চোখ মেলে তাকায়। কি যেন দেখে। আবার চোখ বন্ধ করে। হাসি মাথায় ঘোমটা দিয়ে দরজা দিয়ে বেরোতে যায়।]

রমেন। এই, কোথায় যাচ্ছ? শোনো।

[হাসি দাঁড়িয়ে যায়। এগিয়ে এসে বিছানার পাশে দাঁড়ালে রমেন তার হাত ধরে।]

হাসি। কি? ছাড়, ছাড়, মার পুজোর ফুলটা দিয়ে আসছি।

রমেন। তুমি জান না, আমি কাল কলকাতায় চলে যাব।

হাসি। জানি তো। সেই জন্যই তো তাড়াতাড়ি কাজ সেরে তোমার কাছে আসছিলাম।

[রমেন হাসির হাত ধরে আছে।]

রমেন। তুমি কেমন হয়ে গেছ।

হাসি। বোকার মত কথা বল না। মার পুজোর ফুল, বাবার চা-টা দিয়ে এক্ষুনি আসছি।

রমেন। না।

হাসি। ছাড়। আচ্ছা, দেখ পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি না আসি তাহলে যা খুশি তাই করবে।

[হাসি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। বারান্দা। ডানদিকে ঘুরে গিয়ে পাখির খাঁচার সামনে দাঁড়ায়। পাখিটা ডাকে।]

হাসি। কিগো! তোমারও রাগ হয়েছে। আচ্ছা বাবা আসছি।

[হাত দিয়ে খাঁচাটা দুলিয়ে দেয়। ঘুরে বারান্দা দিয়ে চলে যায়। রমেনের মা ঢোকে।]

মা। বৌমা। খোকা উঠেছে?

হাসি। হ্যাঁ।

মা। যাও, চা দিয়ে এসো।

[হাসি হেসে বেরিয়ে যায়, মা কুলুঙ্গিতে ঠাকুরের সামনে দাঁড়ায়। হাসি চা নিয়ে রমেনের বাবার ঘরে ঢোকে। বাবা কাগজ পড়ছেন।]

হাসি। বাবা।

বাবা। ও।

[বাবা কাগজটা হাসির দিকে বাড়িয়ে দেয়।]

হাসি। আপনি পড়ুন। ও এখনও ওঠেনি বাবা।

বাবা। তুমি পড়বে না?

হাসি। না না, আপনি আগে পড়ুন।

বাবা। আচ্ছা।

[বাবা চায়ের কাপটা নেয়। হাসি বেরিয়ে যায়। চা নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে। রমেন তখনও পাশ ফিরে শুয়ে। কাপটা টুলের উপর রেখে রমেনের পিঠে আঙুল দিয়ে লেখে "হাসি"। রমেন ঘুরে হাসির হাত ধরে।]

হাসি। ছাড়। ছাড়।

রমেন। আচ্ছা, তোমার একটুও মনখারাপ করছে না! কালকে আমি চলে যাচ্ছি। শোনো, তোমায় একটা কথা বলে রাখি—কলকাতায় গিয়ে আমি সাত দিনের মধ্যে একটা ফ্ল্যাট না পাই, তবে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আবার এখানে এসে গ্যাট হয়ে বসব।

[রমেন জামা পরে।]

হাসি। আগে চা-টা খেয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করে নাও।

[রমেন চা খায়। পাশে হাসি দাঁড়িয়ে থাকে।]

হাসি। তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমারও কি ভাল লাগে? তবে মা-বাবার জন্যে—

রমেন। মা-বাবা তো চিরকালই একা একা থাকে। তাছাড়া বাবাকে তো আমি বলেছি যে এখানকার পাট চুকিয়ে দিয়ে কলকাতায় এসে থাকতে। তো উনি হাজারিবাগ ছেড়ে কোথাও যাবেন না—কলকাতা তো নয়ই।

হাসি। আচ্ছা শোনো, তুমি কাল গিয়ে আবার কবে ফিরবে?

রমেন। কাল গিয়ে হয়ত কালই।

হাসি। মানে?

রমেন। মানে স্টেশন থেকে। আচ্ছা—সত্যি করে বলত, আমি চলে গেলে আমাকে খুব মিস্ করবে?

[হাসি রমেনের কাঁধে মাথা রাখে।]

হাসি। হুঁ। খুব মজা হবে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচবো। আর আমাকে জ্বালাতন করার কেউ থাকবে না। আবার আমি আগের মত একা হয়ে যাব। একেবারে একা। এতবড় একা কেউ থাকবে না। খুব ভাল লাগবে! যাই অনেক কাজ পড়ে আছে।

[হাসি উঠে কাপ-প্লেট নিয়ে বেরুতে যায়।]

রমেন। শোনো, সেখানে গিয়ে না আমি তোমাকে রোজ টেলিফোন করব।

[হাসি বেরিয়ে যায়। রমেন সিগারেট ধরায়।]

[ব্রেকফাস্টের টেবিল, বাবা, মা আর রমেন বসে। হাসি দাঁড়িয়ে থাকে। মা উল বোনেন। রমেন কাগজ পড়ে।]

মা। কাল তোর ট্রেন কটায়?

রমেন। সকাল ছটায়।

বাবা। কালই যেতে হবে?

রমেন। হুঁ।

বাবা। আর কয়েকদিনের বেশী ছুটি নিতে পারলে না।

রমেন। না।

বাবা। আমি যখন তোমার মাকে বিয়ে করেছিলাম—

মা। তখন তুমি বেকার ছিলে—ছুটি নেবার দরকার ছিল না।

বাবা। হ্যাঁ। তাতো বটেই। তা বটে—ঠিকই। আচ্ছা রমেন, তোমাদের কোম্পানী থেকে ফ্ল্যাট পেতে কত দেরী হবে?

[হাসি টি-পটে চা ঢেলে টেবিলে রাখে।]

রমেন। সে এখন অনেক দেরী। অনেকেই তো waiting list-এ আছে। দেখে-শুনে একটা ফ্ল্যাট যোগাড় করে নেব'খন। তাড়া কিসের?

বাবা। অবশ্য বৌমা যদি এখানে থাকে ভালই। তুমি আমার বইটা লেখার ব্যাপারে অনেক সাহায্য করতে পারবে। না কি, বৌমা?

[রমেন কাগজ রেখে উঠে যায়।]

মা। ও আবার কি কথা? ও ওখানে একা একা কষ্ট করে থাকবে কলকাতায়! না না, বৌমা তুমি বরং রমেনকে বলবে যত শীঘ্র হয় একটা ফ্ল্যাট দেখতে।

চাকর (নেপথ্যে)। বাবু—নিবারণ বাবু এসেছেন।

বাবা। ও। আচ্ছা—। অ্যাঁ। বৌমা দু কাপ চা বাইরের ঘরে পাঠিয়ে দিও।

[বাবা বেরিয়ে যান।]

মা। বৌমা, তুমি তাড়াতাড়ি চা দিয়ে বরং উপরে গিয়ে খোকার জিনিশপত্রগুলো গুছিয়ে দাও। ও যা খামখেয়ালি।

[মা বেরিয়ে যায়। হাসি চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে থাকে।]

[হাসি কিছু ইস্ত্রি-করা জামা প্যান্ট নিয়ে ঘরে ঢোকে। রমেন চেয়ারে বসে ক্যামেরায় কিছু দেখছে। জামা প্যান্ট বিছানায় রেখে হাসি টুলে উঠে আলমারির মাথা থেকে একটা বড় ব্যাগ নামায়।]

হাসি। এই শোনো—কাল যেওনা তুমি।

রমেন। হঠাৎ! আমি তো ভাবলাম তুমি বুঝি আমার যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছ।

[হাসি ব্যাগ গোছায়।]

হাসি। তোমার যদি এরকম মনে হয়, তবে তাই। কাল তো চলেই যাবে, তাহলে কেন আমাকে শুধু শুধু দুঃখ দিয়ে কথা বল বলত?

রমেন। সে তো তুমি, তুমিই আমার সঙ্গে পর পর ব্যবহার করছ। তোমাকে তো বললাম আমার সঙ্গে কলকাতা চল, যে-কদিন ভাল জায়গা না পাই, না হয় একটু কষ্ট করেই থাকবে।

হাসি। চল। তুমি যা বলবে তাই হবে।

রমেন। এ তোমার রাগের কথা, আমি জানি। তোমার এখন আমার চেয়ে বাবা-মার প্রতি টান বেশী। আমাকে ছেড়ে থাকতে তোমার একটুও কষ্ট হবে না।

হাসি। রমেন, লক্ষীটি, ও কথা বলে আমাকে খোঁচা দিও না। তুমি তো জান, আমার বাবা নেই, মা নেই। পৃথিবীতে কেউ নেই। কেউ আমাকে বুঝলে না। তুমিও না।

রমেন। শোনো, আমার ঐ গরম স্যুটটা এখন দিয়ো না। কলকাতায় এখন বড্ড গরম। আর দরকারী কাগজপত্র গুলো কিন্তু মনে করে দিও।

[রমেন উঠে গিয়ে জানালার ধারে চেয়ারে বসে, হাসি একটা ছবি তুলে নিয়ে দেখতে থাকে। রমেন সিগারেট ধরায়। হাসি রমেনের কাছে গিয়ে ছবিটা দেখায়।]

হাসি। ইস্। ছবিটা কি বোকা বোকা লাগছে। একটা ভাল ছবি নিতে পারলে না!

রমেন। আর মানুষটা বুঝি খুব চালাক চালাক।

হাসি। সত্যি, আমি ভীষণ বোকা। আর মানুষটাও মোটেই সুবিধের নয়। আমি জানি তুমি তাই ভাব।

রমেন। এইরে, আবার শুরু করেছে। লক্ষীটি, Please.

চাকর (নেপথ্যে)। দাদাবাবু। টেলিফোনকা আদমী আয়া।

রমেন। টেলিফোনকা আদমী উপরে কেন?

হাসি। শোনো, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। বাবা বলছিলেন টেলিফোনটা নাকি আজ থেকে আমাদের ঘরে থাকবে।

রমেন। আচ্ছা, বাবা যে এত রোমান্টিক হয়েছেন, জানতাম না তো।

[রাত্রিবেলা। রমেনের ঘর, ঘরে আলো জ্বলে। হাসি আয়নায় চুল আঁচড়ায়। গ্রামোফোনে একটা music বাজে।]

হাসি। এই শোনো—কি এত বই পড়ছ!

[রমেন হাতে বই নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হাসি এসে বইটা তুলে নেয়। বেড ল্যাম্প নেভায়, গ্রামোফোন বন্ধ করে। আলোর স্যুইচ অফ্ করে। সব অন্ধকার হয়ে যায়]

[সকাল। রমেন ঘুম ভেঙে উঠে বিছানায় বসে। উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ায়। সিগারেট ধরায়। হাসি ঘুম ভেঙে উঠে রমেনের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। পিঠে মাথা রাখে।]

রমেন। হাসি, আমি তোমার সংগে সারাদিন ঝগড়া করেছি। খোঁচা দিয়ে কথা বলে তোমায় খুব দুঃখ দিই, তাই না?

হাসি। দাও-ই তো।

রমেন। কেন বল তো?

হাসি। আমি জানি, আমাকে বিয়ে করে তুমি খুব নিরাশ হয়েছ। তোমাদের এত সুন্দর সংসারের আমি যোগ্য নই।

[রমেন ঘুরে হাসির দু'কাঁধে হাত রাখে।]

রমেন। তোমার বুঝি সেই ধারণা হল এতদিনে। বাবা, মা, আমি, আমরা বুঝি তোমার সংগে সেরকম ব্যবহার করি। হ্যাঁ, শোন—এবার মাথা থেকে ঐ ভূতটা নামাও তো। কেন তুমি নিজেকে এত একা মনে কর!

[হাসি রমেনের বুকে মাথা রাখে।]

রমেন। কি, আমার উপর ভরসা করতে পার না বুঝি?

হাসি। করিই তো।

রমেন। কর নাকি? দেখে তো মনে হয় না।

[দু'হাতে হাসির মুখ তুলে ধরে রমেন]

রমেন। দেখি, দেখি। কে যে তোমার নাম রেখেছিল হাসি! কখনও তো হাসতে দেখলাম না।

[হাসির মুখে হাসি ফুটে উঠে।]

হাসি। বিশ্বাস কর, আমি খুব সুখী। তোমাদের সংসারে এসে এ-কদিন যে ভালবাসা পেয়েছি তার কোনো তুলনা হয় না। তাই তো ভয় হয়। সইবে তো? ভাগ্য বিরূপ হবে না তো?

রমেন। না, হবে না।

৩

[দুপুর। কলকাতা শহর। বহুতল বাড়ি। গাড়ীর হর্ন কানে আসে। রমেন অফিসে রিভলভিং চেয়ারে বসে। মহিলা স্টেনোকে dictation দেয়।]

রমেন। '…to contact in Nuyork, we are getting in touch with them for details on cost. This of course invalvs foreign exchange and will have to be included in our application to

the Government'.

[রমেন ঘড়ি দেখে]

রমেন। It is post-lunch time.

[স্টেনো হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। রমেন ফোন তুলে বলে]

রমেন। Miss Brown, what has happened to my trunkcall ?

[দেওয়ালে রাধার ফ্রেমে বাধানো ছবি। টেবিলে রমেনের। গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজে। গান হয়। হাসি গান শোনে—

"কথা দিয়ে কেন বল শ্যাম
এল না ফিরে,
হৃদয় তীরে।
একা একা রাধা ভাসে
নয়ন নীরে।"

হাসি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়ায়। বাইরে গাছগাছালির, দূরের মাঠ। হাসি চুপ করে বেদনাভরা মুখে গান শোনে—

"আজও মায়া গোধূলি বেলায়
ফুল বনে রঙয়েরই মেলায়।
দখিনা সে উতরোল পরান ঘিরে
এল না ফিরে।
কথা দিয়ে কেন বল শ্যাম,
এল না ফিরে।"

[ঘরে ফোন বাজে। হাসি দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরে। রিসিভারটা গ্রামোফোনের উপর ধরে। গান হয়।]

রমেন। ফোন ধরে আছে।

[গান শোনে ফোনে—

"হৃদয় তীরে
একা একা রাধা ভাসে
নয়ন নীরে।
কথা দিয়ে কেন বল শ্যাম
এল না ফিরে।"]

রমেন। অ্যাই, হাসি—অ্যাই হাসি, কি হচ্ছে কি ? তুমি রেকর্ডটা পেয়ে গেছ ? জান, সবাই তোমার গানের খুব প্রশংসা করছিল।

হাসি। তুমি খুব jealous হয়েছো বুঝি ?

রমেন। Jealous !

হাসি। তুমি তো ওখানে খুব date করে বেড়াচ্ছ।

রমেন। তাই বুঝি !

হাসি। নিশ্চয়ই। আমি জানি গো, জানি।

রমেন। এই বল তুমি আমাকে খুব ভালবাস।

হাসি। উ-হু।

রমেন। না না, ও রকম করে নয়। বল, তুমি আমাকে ভীষণ ভালবাস !

হাসি। এই, তুমি কবে আসবে ? আমার আর একা একা ভাল লাগছে না। হ্যালো, হ্যালো !

[হাসির মুখ বেদনায় ভরে যায়। আস্তে রিসিভারটা নামিয়ে রাখে।]

[একটা হাত, শাঁখা পরা, চিঠি লেখে। হাসি চেয়ারে বসে চিঠি লেখা শেষ করে, কলম বন্ধ করে। চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পোরে। উঠে গিয়ে বারান্দায় থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। বিষন্নতার প্রতিমূর্তি যেন। কাঞ্চন পেছন থেকে ঢোকে।]

কাঞ্চন। বৌদি, বৌদি, তোমার বাপের বাড়ীর লোক এসেছে।

[হাসি কেমন অবাক চোখে তাকায়। ভেতরে যায়। চাকরকে চিঠিটা দেয়।]

হাসি। এটা Post করে দিও।

[ঘরের ভিতর মুখোমুখি বসে সৌমেন, মা]

মা। সারারাত ট্রেনে এসেছ। খুবই কষ্ট হয়েছে।

[পর্দা ঠেলে হাসি ঢোকে। সৌমেনকে দেখে ভূত দেখার মত ভয়ে-বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যায়। সৌমেন এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে হাসির দিকে। খুব কষ্টের এক সূক্ষ্ম ছায়া এক চিলতে হাসি ঠোঁটে খেলে যায়। হাসি চোখ নামিয়ে নেয়। সৌমেন জোর করে হাসে।]

সৌমেন। খুব অবাক হয়ে গেছ, তাই না। ভাবতেই পার নি আমি হঠাৎ এসে পড়ব। জানেন মাসীমা, হঠাৎ চলে এলাম। আমি আবার আর এক প্রান্তে থাকি তো। সেই নর্থ-ইষ্টার্ন ফ্রন্টিয়ারের ওদিকে ! হাসির বিয়ের খবরটা পর্যন্ত আমায় দেয়নি। কাল কলকাতায় ফিরে ন' মামার কাছে শুনলাম। সত্যি, হাসিকে কতদিন দেখি না। হাসি আবার আমার সবচেয়ে favourite cousin কি না।

মা। তুমি এসেছ খুব ভাল করেছ বাবা। বৌমার কাকা, কাকীদের কতবার সেধেছি। একবার বেড়িয়ে গেলে পারতেন। হাজারিবাগ তো কিছু খারাপ জায়গা নয়। আর বৌমার একা একা কি ভাল লাগে ? তবু তুমি এসেছ, খুব ভাল করেছ। আচ্ছা আমি একটু চায়ের ব্যবস্থা করে আসি।

[মা দরজা পর্যন্ত যায়।]

মা। কাঞ্চন, একটু চায়ের জল চড়িয়ে দে বাবা। বৌমা—তোমার দাদা হন তো,

ওকে—

[হাসি এগিয়ে এসে সৌমেনকে প্রণাম করে।]

সৌমেন। আরে, থাক্, থাক্। বিয়ের পর দেখছি হাসির ভক্তি খুব বেড়ে গিয়েছে। তা প্রণাম করলে তো আমারও আশীর্ব্বাদ করা উচিত। কি বলে আশীর্ব্বাদ করব। দীর্ঘায়ু হও, না পুণ্যবতী হও।

মা। দুই-ই হবে। বৌমার আমাদের তুলনা হয় না। খোকা আমাদের সত্যি ভাগ্যবান। আচ্ছা তোমরা কথা বল।

[মা-র বেরিয়ে যাওয়ার মুখে দোলন ঢোকে।]

মা। কে? দোলন, আরে এস এস। এই যে আমাদের দোলন। কি সুন্দর মুখ। তবে ভারী দুষ্টু। ভাবছি ওর একটা বিয়ে দেব। বস মা, বস। বৌমা—তোমার দাদার সঙ্গে একে পরিচয় করিয়ে দিলে না? আচ্ছা আমি চলি।

হাসি। আপনি বসুন মা, আমি চা করে নিয়ে আসছি।

মা। না, না। তোমরা বরঞ্চ কথা বল।

[মা বেরিয়ে যায়।]

সৌমেন। কেমন আছ?

হাসি। অনেকদিন পর—

[সৌমেন-হাসি পরস্পরের দিকে তাকায়]

দোলন। আচ্ছা, আমি চলি বৌদি।

সৌমেন। বেশ মেয়েটি তো। তোমার husband-এর বোন নাকি? যাক্‌গে—তারপর—বল—কি অ্যাদ্দিন পর আমায় দেখে খুশি হলে না। আমি তো তোমায় দেখে—

হাসি। আপনাকে এখানে কে আসতে বলেছে?

সৌমেন। আরে আমি যে এখানে একটা বিশেষ কাজে এসেছি।

হাসি। এখানে কি বিশেষ কাজ থাকতে পারে?

সৌমেন। একটা ইণ্টারভ্যু।

হাসি। ইণ্টারভ্যু? এখানে?

সৌমেন। সেই কথাই তো বলছি।

[দোলন ঘরে ঢোকে।]

দোলন। বৌদি—মাসীমা বললেন তোমার ঘরে নিয়ে যেতে। সেখানেই চা পাঠিয়ে দেবেন।

সৌমেন। এই খুকী শোন—বেশ নামটি তো তোমার। দোলন।

দোলন। দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত।

সৌমেন। কি পড়।

দোলন। P. U.

সৌমেন। আর্টস না সায়েন্স। কিসে ইনটারেস্ট তোমার?

দোলন। জানি না।

সৌমেন। সে কি?

দোলন। আমি যাই বৌদি।

হাসি। চলুন।

সৌমেন। চল।

[সৌমেন ব্যাগ নিয়ে ঘর থেকে বের হয়। পেছনে হাসি যায়। হাসির ঘরে ঢুকে সৌমেন ইজিচেয়ারে বসে হাই তোলে। হাসি ঢোকে। সৌমেন উঠে ঘরের জিনিশপত্র দেখে]

সৌমেন। পিকাসো!

[একটা Show case-এর সামনে এসে ঝুঁকে কিছু একটা দেখে।]

সৌমেন। রমেন চৌধুরী। মিষ্টার হাজারিবাগ—হাজারিবাগ ১৯৬৪। আচ্ছা—ইনিই রমেন চৌধুরী? বাঃ বেশ চেহারাটি তো! আমার থেকে অনেক সুন্দর। you are lucky. But what about—

[মাথায় টোকা মারে। হাসি কেমন অসহায় বোধ করে]

সৌমেন। তুমি দেখছি বিমলাকেও হার মানালে।

হাসি। কি চাই আপনার? কেন এসেছেন আমাকে জ্বালাতন করতে। একজন বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় আপনার জানা উচিত।

কাঞ্চন (নেপথ্যে)। বৌদি, চা এনেছি।

[হাসি বেরিয়ে গিয়ে চা-টা নেয়। চায়ের কাপটা একটা টুলের উপর রাখে।]

সৌমেন। তোমাকে আমি কোনদিনই বুঝতে পারলাম না হাসি।

[সৌমেন চা খায়।]

সৌমেন। কেন এসেছি জানতে চাও। ইণ্টারভ্যু দিতে। ভাবছ কিসের ইণ্টারভ্যু? মৃত্যুর সঙ্গে। মনে নেই আমাদের pledge.

হাসি। আপনি আমাকে blackmail করতে এসেছেন?

সৌমেন। তুমি কি ভীষণ বদলে গেছ! হাসি, আমি তো ভাবলাম…তোমার ভালোর জন্যই চলে এলাম। জান কতদূর থেকে? তিনদিন তিনরাত্রি তো ট্রেনেই কাটল। একটুও ঘুমাতে পারিনি।

[একটা তোয়ালে নিয়ে হাসি বাথরুমে ঢোকে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে বেসিনের সামনে। তারপর বেরিয়ে আসে।]

হাসি। আপনি বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিন।

[হাসি মাথায় ঘোমটা টেনে বেরিয়ে যায়।]

[বাবা খাটে বসে বই পড়ছেন। মা ঢোকে।]

মা। শুনছ, বৌমার দাদা এসেছেন।

বাবা। ও।

[সৌমেন ঢোকে। প্রণাম করে।]

বাবা। এই এস, এস, এস। আমি আর উপরে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না।

মা। হ্যাঁ, ওর ওপরে ওঠা বারণ কিনা।

[হাসি খাবারের প্লেট নিয়ে ঢোকে। সৌমেনের সামনে টেবিলের উপর রাখে।]

বাবা। বৌমা, তুমি তো আমাকে এ দাদার কথা বল নি।

সৌমেন। বলবে কি করে? আমার উপর ওর বেজায় অভিমান যে! আমি তো ওর বিয়ের সময় থাকতে পারি নি। একটা কাজে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। কবে যে ওর বিয়ে ঠিক হল, কবে যে হয়ে গেল আমি জানতেই পারিনি। আগে জানলে কি আর—

বাবা। এ তোমাদের বড় অন্যায় বৌমা। দাদাকে বাদ দিয়ে—

সৌমেন। না, না। হাসির কোন দোষ নেই। আসলে বিয়েটাই হয়ত খুব তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে গেল। আচ্ছা, হাসির বরকে তো কই দেখছি না। ওকি এখানে থাকে না?

বাবা। ও তো কলকাতায় থাকে। তুমি কোথায় থাক? আমি শুনলাম অনেক দূর থেকে আসছ। তো এখানে কি তোমার বোন দেখতে এসছ, না অন্য কোন কাজে?

সৌমেন। না। বিশেষ একটা কাজে। একটা ইণ্টারভ্যু।

মা। নাও, নাও। তুমি খেতে আরম্ভ কর।

[সৌমেন খেতে শুরু করে।]

বাবা। এখানে ইণ্টারভ্যু। আমাদের কলেজে? তুমিও কি আমার মত মাষ্টার নাকি?

[সৌমেন আমতা আমতা করে বলে।]

সৌমেন। না, মানে, সেরকম কিছু নয়। ওই একজনের কাছে—একটা Personal —ওই আর কি।

বাবা। আরে কি আশ্চর্য! এত লজ্জা পাচ্ছ কেন? তাহলে চাকরির ইণ্টারভ্যু নয়। কারো সঙ্গে দেখা করতে এসছ। বিশেষ কেউ?

সৌমেন। হ্যাঁ, বিশেষ একজন কেউ। না মানে, আসলে আমার কলকাতাতেই কাজ। হাতে একটু সময় ছিল, ভাবলাম হাসির সঙ্গে দেখাটা সেরে যাই। এখন মনে হচ্ছে আর দু-একদিন সময় বেশী নিয়ে এলে ভাল হত।

বাবা। সেকি! তুমি থাকবে না কয়েকদিন? বৌমা আছে একা একা। আর রমেনও তো এসে পড়ছে, তাই না বৌমা?

সৌমেন। না, মেসোমশাই। থাকার কোন উপায় নেই আমার। কাল কলকাতায় আমার বিশেষ জরুরী কাজ আছে।

[সৌমেন গ্লাসের জল দিয়ে হাত ধোয়। রুমাল বের করে হাত মোছে।]

মা। কিছুই খেতে পারলে না, বাবা। সবই পড়ে রইল। বুঝেছি, খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। আচ্ছা তুমি বিশ্রাম কর গিয়ে।

বাবা। By the way. অ্যা, তোমার জন্ম তারিখ আর সময়টা জানা আছে নাকি?

সৌমেন। না তো। কেন আপনি হাত দেখেন?

[সৌমেন উঠে গিয়ে খাটে বসে হাত মেলে ধরে।]

বাবা। তোমার বৃহস্পতি তো খুব স্ট্রং। স্টারও তো দেখছি একটা আছে। বাঃ, এ চমৎকার হাত। তুমি খুব বড় হবে।

[সৌমেন হাসির দিকে তাকায়।]

বাবা। Sun line চমৎকার। বাঃ। মান, সম্মান, অর্থ সব কিছু—। বৌমা, আমি predict করছি তোমার দাদা মস্ত বড়লোক হবে।

[হাসির মুখে হাসি ফুটে উঠে।]

বাবা। কিন্তু তোমার মংগলটা তো আমি ভাল দেখছি না। তুমি বড় সেণ্টিমেণ্টাল, একটুতেই দুঃখ পাও, আর দুঃখটাকে অত সিরিয়াসলি নাও কেন?

মা। না, না। তুমি ওসব কথায় কান দিও না। ওর মাথা খারাপ হয়েছে—কি সব ছাই ভস্ম বলে।

সৌমেন। না, না, মেসোমশাই। আপনি ভাল করে দেখুন, হাতে কোন ফাঁড়া-টাড়া নেই তো।

বাবা। আরে আমি ওসব কিছু বলতে পারি না। তবে কি জান বাবা, ভাগ্যই বল আর ভবিষ্যতই বল—সব তো তোমারই হাতে।

সৌমেন। জানেন মেসোমশাই, আমি নাস্তিক ছিলাম। আজ কিন্তু আপনার কথাগুলো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে। আর আমার ভবিষ্যৎ তো আমার নিজেরই হাতে। সে তো আমি জেনেই নিয়েছি।

[সৌমেন হাসির ঘরে সেতারের তারে হাত বোলায়। হাসি ঢোকে।]

সৌমেন। জান হাসি, আমি জানতাম এ দিনটার জন্য তুমি অপেক্ষা করে থাকবে। ভাগ্য আমাদের সহায় হল না। না হোক, আর আমরা মানব না। এবারে আমি যা plan করে এসেছি একেবারে full proof—কোনো ফাঁক নেই।

হাসি। কি বাজে বকছেন? আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! কিসের plan?

[হাসি ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করে।]

সৌমেন। সে কি হাসি? এরই মধ্যে ভুলে গেলে? এইতো কদিন আগেও লেখা তোমার চিঠি—

[সৌমেন পকেট থেকে চিঠি বের করে পড়তে থাকে।]

"যেদিন জানব আমার উপর তোমার সেই বিশ্বাসের এতটুকু ফাঁকা পড়েছে, আমার পক্ষে তখন আর বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না।.....। যদি এ জন্মে আমাদের মিলন না হয়, আসছে জন্মে নিশ্চয়ই হবে।"

সৌমেন। আমি কিন্তু পরজন্মে বিশ্বাস করি প্রিয়তমা। আর তার জন্যে দেরী আমার সইবে না। এস, এ জন্মের বিচ্ছেদটুকু শেষ করে দিয়ে, আসছে জন্মে সে মিলনটাকে ডেকে আনি। দেখ কি সুন্দর জিনিশ নিয়ে এসেছি। হাসি! হাসি!

[হাসি দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে চলে যায়। বাইরের দিকের বারান্দায় দরজা বন্ধ করে চুপ করে দাঁড়ায়। ক্লান্ত পাখির ডাক। হাসি রেলিং ধরে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়ায়। কেমন যেন বিধ্বস্ত লাগে।]

৪

[নেপথ্যে সৌমেনের গলায় আবৃত্তি শোনা যায়।

"মনে করাব না শপথ তোমার
আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দ্বার
আবার সময় হলে যেও সহজেই,
আবার আসিতে হয় এসো।
সংসার যদি রয়, তাহে ক্ষতি নাই।
ভালোবাসো যদি, বেসো।

গ্রীনরুমে হাসি আয়নায় বসে। হাসির বান্ধবী সুনি তাকে সাজিয়ে দিচ্ছে। স্টেজ থেকে সৌমেনের আবৃত্তি ভেসে আসে।

বন্ধু তোমা পথ সম্মুখে জানি।
পশ্চাতে আমি আছি বাধা।
অশ্রু নয়নে বৃথা শিরে কর হানি
যাত্রায় নাহি দিব বাধা।]

বান্ধবী। আমার cousin সৌমেন। ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে।

[সৌমেন স্টেজে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করে।—উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে শোনে হাসি আর তার বান্ধবী।

আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নহি
ভুলিতে ভুলিতে যাবে হে চির বিরহী।
তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন
আমার স্মৃতির আঁখি জলে।
আমার যা দান সেও যেন চিরদিন
রবে তব বিস্মৃতি তলে।
দূরে চলে যেতে যেতে দ্বিধা করি মনে
যদি কভু চেয়ে দেখ ফিরে,
হয়ত দেখিবে আমি শূন্য শয়নে
নয়ন সিক্ত আঁখি নীড়ে,
মার্জনা কর যদি পাবে তবে,
করুণা করিলে ঘোচে নাহি আঁখি জল।
সত্য যা দিয়েছিলে থাক মোর তাই
দিবে লাজ তার বেশী দিলে।
দুঃখ বাঁচাতে যদি কোন মতে চাই।
দুঃখের মূল্য না মিলে।
দুর্বল ম্লান করে নিজ অধিকার
বরমাল্যের অপমানে
যে পারে সহজে নিতে যোগ্য সে তার
চেয়ে নিতে সে কভু না জানে।
প্রেমের এ বাণী মিশাব না ফাঁকি,
সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি।
যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন
যা পায়নি বড় সেই নয়।]

[ছাদের কার্নিশ ধরে দাড়িয়ে হাসি বান্ধবীর সঙ্গে। নীচে রাস্তা দিয়ে বাস, ট্রাম, গাড়ি যায়।]

হাসি। তুই কি বলেছিস শুনি?

বান্ধবী। কি আবার বলব? যা সত্যি তাই। তুই তো ওর recitation শুনে পাগল। যেরকম হাঁ করে গিলছিলি?

হাসি। আমি তোকে বলেছি কিছু? তোর যত সব imagination.

বান্ধবী। আহা! ন্যাকামো করতে হবে না। আমি সব বুঝি। আর সৌমেনের অবস্থা তো—নাই বললাম। রোজ রোজ phone করে করে আমাকে

জালাচ্ছে।

হাসি। কি বলেরে ?

বান্ধবী। কি আবার ? Date.

[ঘরের ভেতর phone বেজে ওঠে—হাসির বান্ধবী গিয়ে ফোন ধরে]

—হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই হাসি।

সৌমেন। সুমি, আমার কথা ও কিছু বলে।

সুমি। উঁ-হুঁ। উঁ-হুঁ। একবারও না। এই—তুমি সেদিন coffe house-এ ওরকম ন্যাকামো করলে কেন ? ভাবটা যেন চেনই না।

সৌমেন। বাঃ। তাই বলে সকলের সামনে নিজেকে—

সুমি। ঠিক আছে। তবে আমার বন্ধুকে জালাচ্ছ কেন ?

সৌমেন। আমি কেন জালাব। ওইতো আমায় জালাচ্ছে। দেখা-সাক্ষাৎ করছে না।

সুমি। এক মিনিট ধর। (হাসিকে)এই—তোদের গানের স্কুলের ফাংশনটা কবে হচ্ছে রে। একজনকে নিয়ে যাবি। ও আবার classical music-এর খুব ভক্ত। আলি আকবরের মিউজিক শুনবে।

সৌমেন। I will love to.

সুমি। একটু ধর।

[সুমি ফোনটা হাসিকে দেয়। হাসি কথা বলে।]

হাসি। আসছে মঙ্গলবার আসুন না, আমাদের গানের স্কুলে। সুমিও আসবে।

সৌমেন। আ-আচ্ছা চেষ্টা করব। আমার আবার একটা tutorial আছে। হ্যাঁ চেষ্টা করব। সুমিকে একটু লাইনটা দিন না।

[হাসি ফোনটা সুমিকে দেয়।]

সৌমেন। এই—তোরা আমায় নিয়ে তো খুব মজা করছিস না। শোন—পাবলিক টেলিফোন থেকে কথা বলছি। অনেক লোক ঘিরে, তোকে পরে টেলিফোন করব।

সুমি। কি, ভয় পেলে নাকি ? ঠিক আছে, রাখছি।

৫

[আলি আকবর সরোদ বাজাচ্ছেন। হাসি শোনে, একবার হাতের ঘড়ি দেখে। সৌমেন ঢোকে। দরজার সামনে এদিক ওদিক হাসিকে দেখার চেষ্টা করে। হাসি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে উঠে যায়। দুজনে পাশাপাশি মেঝেতে

বসে। আলি আকবর সরোদ বাজান। সৌমেন হাসি তন্ময় হয়ে বাজনা শোনে। ময়দানের ভিতর দিয়ে হেঁটে আসে, তখনও বাজনা শোনা যায়। ওরা এসে একটা গাছের ছায়ায় বসে। হাওয়ায় সৌমেনের চুল এলোমেলো। চুলে হাত দিয়ে ঠিক করে, হাসির হাতে হাত রাখে। হাসি শিহরিত হয়। মুখে খুশির ভাব।

গঙ্গার তীর। দূরে জাহাজের ভোঁ শোনা যায়। একটা শেডের নিচে দুজনে এসে দাঁড়ায়। গঙ্গার ঢেউ। [নেপথ্যে রবীন্দ্রসংগীত শোনা যায়]

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার।
পরাণ সখা, বন্ধু হে আমার]

সৌমেন। একটা চাকরি না পেলেও তো নয় !

হাসি। বেশী দেরী কোর না, সৌমেন। ওরা যেভাবে আমার বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে—আমার বড় ভয় করে।

সৌমেন। কেন ? তোমার কাকারা কি জোর করে বিয়ে দেবেন নাকি ?

হাসি। না, না। ঠিক তা নয়, এমনিতে ওরা মানুষ বেশ ভাল। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে—।

সৌমেন। তাহলে ভয় কিসের ? কারও সাধ্য নেই।

৬

[হাজারিবাগের বাড়ি। হাসি বারান্দার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে]

সৌমেন (নেপথ্যে)। কারও সাধ্য নেই তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়।

[দরজা ঠেলে কাঞ্চন ঢোকে।]

কাঞ্চন। ওমা তুমি এখানে। তোমাকে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি। মা ডাকছেন বৌদি।

হাসি। তুমি যাও। আমি যাচ্ছি।

[সিঁড়ি দিয়ে নামে হাসি। ল্যাণ্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকায়। আঁচল দিয়ে চোখ মুখ মোছে। লম্বা টানা বারান্দা দিয়ে হেঁটে যায়। চুল ঠিক করে। মাথায় ঘোমটা দেয়। পর্দা ঠেলে মার ঘরে গিয়ে ঢোকে। মা বিছানায় বসে কাগজ পড়ছেন।]

[গঙ্গার জল, একটা জাহাজ নোঙর করা। নৌকায় সৌমেন শুয়ে, পাশে হাসি বসে। গান গায়—

"আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম।
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম,
চাই সে বারেবার।
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই,
সুদূর কোন নদীর পারে
গহন কোন বনের ধারে,
গভীর কোন অন্ধকারে
হতেছ তুমি পার।
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।
ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার।
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।"

দূরে জাহাজের ভোঁ শোনা যায়।]

সৌমেন। হাসি—

হাসি। উঁ।

[সৌমেন উঠে বসে। হাসির হাত ধরে।]

সৌমেন। তোমায় ছাড়া আমি বাঁচব না হাসি। বল, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

হাসি। করব।

সৌমেন। তুমি প্রতিজ্ঞা কর।

[হাসি সৌমেনের হাতে হাত রাখে]

হাসি। প্রতিজ্ঞা করছি।

সৌমেন। এই সময় তোমাকে ছেড়ে অতদূরে যেতে মন চাইছিল না। কিন্তু কি করব? বিয়ের আগে।

হাসি। মা।

মা। বৌমা—তোমার দাদা শুয়েছেন?

হাসি। হ্যাঁ।

মা। তাহলে এখন ডেকোনা। খাবারটা ঢাকা দেওয়া থাক। তোমার মুখটা শুকিয়ে গেছে কেন মা?

হাসি। কই না তো?

মা। কপালে সিঁদুর নেই! তুমি সিঁদুরের কৌটোটা নিয়ে এস।

[হাসি সিঁদুরের কৌটো নিয়ে আসে। মা সিঁথিতে আর কপালে সিঁদুর

পরিয়ে দেয়।

[ঘরে ঢুকতে গিয়েও হাসি থমকে দাঁড়ায়। এগিয়ে এসে বিছানা থেকে তানপুরা, বই সরিয়ে রাখে। সৌমেন চিৎ হয়ে ঘুমোয়। হাসি আস্তে মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সৌমেনের পকেট থেকে চিঠিটা নিতে যায়। সৌমেন মাথা নাড়ে। হাসি হাত সরিয়ে নেয়। যাতে আওয়াজ না হয়, সেজন্য শাঁখা চুড়িগুলো হাতের উপরের দিকে টেনে নেয়। বুক পকেট থেকে চিঠিটা বের করতে যায়। সৌমেন বাঁ হাত দিয়ে হাসির হাত ধরে ফেলে। হাসি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সৌমেনের কপালে বুলোয়।]

হাসি। মানে—দেখছিলাম তোমার জ্বর হয়েছে কিনা?

[সৌমেন পকেট থেকে চিঠিটা বের করে।]

সৌমেন। এটা চাই তোমার? এরকম চিঠিতো তুমি আমায় অনেক লিখেছো, মনে নেই?

[সৌমেন হাসির হাতে হাত রাখে]

হাসি। আঃ! ছাড়, কি হচ্ছে।

[হাসি হাত ছাড়িয়ে দ্রুত ঘরের অন্য প্রান্তে সরে যায়]

হাসি। একটা কথা বলব।

সৌমেন। একটা কেন? হাজার, লক্ষ, কোটি। তোমার একটা কথা শোনার জন্য আমি যুগ যুগ ধরে তপস্যা করতে পারি।

হাসি। তুমি আমাকে সত্যিই খুব ভালবাস, না? তাই যদি হয়, তবে আমার জন্য সব sacrifice করতে পার?

[সৌমেন খাট নেমে এসে হাসির মুখোমুখি দাঁড়ায়]

সৌমেন। জীবনের চেয়ে বড় sacrifice আর কি হতে পারে?

হাসি। তাই বলে এতগুলো মানুষের সর্বনাশ করে দিয়ে—আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু রমেন, ওর বাবা, ওর মা,—ফুলের মত সুন্দর সংসারটাকে ছারখার করে দিয়ে—না, না। না সৌমেন, আমি তা পারব না। আমার জন্য যদি তোমার এতটুকু মমতা থাকে, তবে তুমি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও। ওদের এই সুন্দর সংসারে কলঙ্ক—

সৌমেন। কি বাজে কথা বলছ? what do I care about these people? আমি শুধু তোমার সম্বন্ধে concern। যেদিন শুনেছি তোমার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে গিয়েছে, সেদিন থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি, স্বয়ং ভগবানও এসে তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। আর এতো সামান্য সমাজ। কি ভাবছ তুমি? কে কি ভাবল? কে কি বলল? বদনাম, scandal? হাসালে তুমি। তোমাদের ভালবাসার থেকে বড় হল কে কি

ভাবল, কে কি বলল ? আর তোমাদের সমাজের কতকগুলো কুসংস্কার। আর তার জন্য আমাকে ছেড়ে দিতে হবে আমার জীবনের একমাত্র সম্বল ! আমার সমস্ত কিছু। না, না, হাসি, এ নিশ্চয়ই তোমার মনের কথা নয়।

হাসি। কিন্তু সৌমেন, যা করেছি তার জন্য তো আমি দায়ী। শাস্তি যদি দিতে হয় তো আমাকে দাও। না, না, লক্ষ্মীটি। বোঝবার চেষ্টা কর। এদের সকলকে শেষ করে দিয়ে আমি মরেও শান্তি পাব না। আমি অভিশপ্ত হয়ে যাব। তুমি উদার, তুমি মহৎ, তুমি কত বড়। আমার মত একজন সামান্য মেয়ের জন্য কেন তুমি মরতে যাবে ? আজ তো আমি ধরা পড়ে গেছি। তুমি তো দেখলে—কত স্বার্থপর হতে পারি আমরা। আমি তো তোমাকে ভুলে গিয়ে সংসার পেতেছিলাম। তুমি আমার জীবন থেকে একেবারে মুছে গিয়েছিলে। আমরা সব পারি। বড় দুর্বল। বড় ভীরু। তোমার পায়ে পড়ি সৌমেন, একেবারে ভুলে যাও, আমায়। শুধু ভুলে কেন ? ঘৃণা কর। মন-প্রাণ দিয়ে ঘৃণা কর। মনে কর তোমার জীবন থেকে এক ঘোর শনিগ্রহ কেটে গেল।

সৌমেন। আচ্ছা হাসি, সেই কবিতাটা মনে পড়ে, তোমার জন্মদিনে সেটা dedicate করেছিলাম ?

[সৌমেন ঘুরে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করে।]

"চাই, চাই। আজও চাই তোমারেই কেবলই।
আজও বলি জনশূন্যতার কানে,
রুদ্ধকণ্ঠে বলি, অভাবে তোমার
অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ
বন্ধ অন্ধকার। কাম্য শুধু স্থবির মর্ম।
আমার জাগর স্বপ্নলোকে একমাত্র
সত্তা তুমি।"

হাসি ! সৌমেন ! আমি আর পারছি না, পারছি না। বড় কঠিন তুমি, বড় নিষ্ঠুর। একটা কথা তুমি কেন বুঝতে পারছ না, আমার পাপের জন্য এতগুলো নিষ্পাপ লোকের জীবন নষ্ট হতে দিতে পারি না।

বলছিই তো আমাকে তুমি যে শাস্তি দিতে ইচ্ছে হয় দাও, যা করতে ইচ্ছে হয় কর, ওদের তুমি কিছু কর না। ওদের তুমি রেহাই দাও।

[হাসি কাঁদে। সৌমেন দরজার কাছে। সৌমেন দরজা বন্ধ করে। হাসি সৌমেনের মুখোমুখি দাঁড়ায়।]

হাসি। কি চাও ? আমাকে চাও। সারাজীবন আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব। কিন্তু আমার স্বামী সে ত কিছু করে নি। আমার শ্বশুর শাশুড়ি। ওদের সংসারের এই সর্বনাশ কোরো না। না, না, সৌমেন। দয়া

করো। দয়া করো। সৌমেন !

[হাসি সৌমেনের হাতে মুখ ঘসতে থাকে। তারপর পায়ে পড়ে যায়। সৌমেন ছিটকে সরে আসে।]

সৌমেন। আর আমি তোমাকে ভালবাসি নি ? আমার দেহ, মন, প্রাণ, জীবনের সমস্ত কিছু দিয়ে তোমাকে ভালবাসিনি ?

[সৌমেন এগিয়ে এসে আলমারি খুলে দুটো কাচের পানপাত্র বের করে। হাসি দূরে মেঝেয় বসে থেকে দেখে, সৌমেন পকেট থেকে বিষের পুরিয়া বের করে দুটো পাত্রে ঢালে, জল ঢালে। হাসি নির্বাক দৃষ্টিতে দেখে। সৌমেন পাত্র দুটো দুহাতে তুলে ধরে।]

সৌমেন। মনে পড়ে হাসি—গঙ্গার ধারে আমাদের শেষ দেখা হয় ? আর আমাদের প্রতিজ্ঞা ? ভেবেছিলাম সাতদিনের মধ্যে চাকরি নিয়ে ফিরে আসব। সাতদিনের জায়গায় সাতমাস হয়ে গেল। কোথায় চাকরি ? চাকরি অবশেষে একটা হয়। ভাল চাকরি। মনে হল ভাগ্য এতদিনে প্রসন্ন হল। তোমায় খবর দেবার জন্য তাড়াতাড়ি কলকাতায় ছুটে এলাম। কিন্তু এসেই জানতে পারলাম—

৭

[সুমিদের বাড়ী। সুমি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। সৌমেন চেয়ারে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছে।]

সুমি। সৌমেন, তুমি হাসিকে ভুলে যাও।

সৌমেন। কি হল কি ? কি ব্যাপার বলত ? কি হয়েছে কি ?

সুমি। মাস ছয়েক হল হাসির বিয়ে হয়ে গেছে হাজারিবাগে।

সৌমেন। বিয়ে ? ঠাট্টা করছিস্।

সুমি। না, না, ঠাট্টা নয়। সেই কদিনের জন্য যাচ্ছি বলে, গেলে। আর কোন খবরই নেই।

সৌমেন। খবর নেই বলে—

সুমি। হাসির কোন উপায় ছিল না। আমি তো জানি। মামা মামীর কাছে কতখানি কৃতজ্ঞ। ওরা যখন জোর করলেন—এদিকে তোমারও কোন খবর নেই। আমি তো ভাল করে জানি। ও কিরকম চাপা, কিরকম অভিমানী।

সৌমেন। কি বলছিস তুই ! আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। অসম্ভব।

[সৌমেন উঠে গিয়ে ছাদের কার্নিশ ধরে দাঁড়ায়।]

তুমি। সৌমেন, হাসিকে ভুল বুঝো না। বিয়ের আগে কটা দিন কিভাবে কেটেছে, আমার থেকে তো কেউ বেশী জানে না। ওর সেই পাথরের মত মূর্তি আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। সৌমেন তুমি ওকে একেবারে ভুলে যাও। ও এখন পরস্ত্রী।

সৌমেন। পরস্ত্রী! না আমি মানি না। আমি মানব না। আমি কিছুতেই মানতে পারব না। হাসি আমার, ইহকাল, পরকাল—চিরকাল—হাসি আমার।

৮

[হাসির ঘর। হাসি মেঝেতে বসে আছে।]

সৌমেন। এ জীবনে যদি তোমাকে নাই পেলাম—তাহলে এ জীবনে প্রয়োজন কি? এস হাসি, আর দেরী নয়।

[সৌমেন হাসিকে মেঝে থেকে আস্তে তুলে এনে খাটে বসায়। সৌমেন বিষের পাত্র হাসির মুখে তুলে ধরে—আবৃত্তি করে।]

"বেলা কত যে আছে আর।
এতকাল ভুলে ছিনু তাই।
হঠাৎ তোমার চোখে দেখিয়াছি সন্ধ্যালোক।
আমার সময় আর নাই।

[সৌমেন বিষপাত্র হাসির মুখের কাছে ধরে, ফোন বেজে উঠে। সৌমেন ফোনটা ধরে।]

সৌমেন। আর সময় নেই।

[রিসিভারটা এগিয়ে দেয় হাসিকে, হাসি ফোনটা ধরে, ফোনে রমেনের গলা শোনা যায়।]

রমেন। হ্যালো, হাসি। একি কথা বলছ না যে, হাসি! কি হয়েছে কি? চুপ করে থেকো না। বল কি হয়েছে?

হাসি। কিছু হয় নি। একটু মাথা ধরেছে।

রমেন। ও, তাই বল। আশ্চর্য, আজ সকাল থেকে না—একটা অমঙ্গল, একটা ভীষণ ভয়ের আশংকা করছিলাম। যাক্, শোনো, কাল বোধহয় আমার যাওয়া হবে না। এখানে বড্ড কাজের চাপ পড়েছে।

হাসি। ঠিক আছে। তোমার যখন খুশি এসো, আর না এলেই বা ক্ষতি কি?

রমেন। এ তোমার রাগের কথা হল। আচ্ছা, তুমি কি মনে কর আমি ইচ্ছে করে এখানে পড়ে রয়েছি।

হাসি। না, না। বিশ্বাস কর, আমি একটুও রাগ করিনি।

রমেন। হ্যালো, বল তুমি আমাকে ভালবাস। হাসি, বল তুমি আমাকে ভালবাস। হাসি?

হাসি। বলতে পারব না। কেমন করে বলব? আমি আর পারব না।

রমেন। হাসি? হাসি! কি হল কি? কাঁদছ কেন? হাসি?

[রমেনের চোখেমুখে উদ্বেগের ছায়া, রিসিভারটা সামনে তুলে ধরে দেখে]

[হাসি খাটে বসে। সৌমেন পায়চারি করে।]

সৌমেন। ভাগ্যের উপর আমাদের হাত নেই হাসি।

[সৌমেন রিসিভারটা তুলে ঠিক করে রাখে। খাটে হাসির পাশে বসে।]

সৌমেন। Destiny আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

[সৌমেন হাসির মুখটা তুলে ধরে।]

সৌমেন। হাসি—তোমাকে আজ অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে। তোমার কপালে সিঁদুর জলজল করছে। কিন্তু এত উদাস, এত করুণ কেন? তুমি তো immortal হতে যাচ্ছ। আমরা তো অমর হয়ে যাব, হাসি। এস না, মুহূর্তের সমস্ত দুঃখ, সমস্ত যন্ত্রণা চোখের জলে শেষ করে দিই।

[সৌমেন বিষের পাত্র হাসির মুখের কাছে তুলে ধরে।]

সৌমেন। ধর হাসি। ধর।

[হাসি আস্তে করে নেয়। দুহাতে ধরে। কাঁপতে থাকে]

হাসি। না, না। আমি পারব না। পারব না। আমার ভয় করছে। এই ঘর, বাড়ী, মা, বাবা, সবাইকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।

সৌমেন। হাসি!

হাসি। না, না, না। আমার ভয় করছে। আমাকে তুমি ক্ষমা কর। আমি পারব না।

[হাসি হঠাৎ পাত্রটা মেঝেতে ছুঁড়ে ভেঙে ফেলে, কান্নায় ভেঙে পড়ে। সৌমেন ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। হাসি উঠে দাঁড়ায়।]

হাসি। তোমার মনে দয়া নেই, মায়া নেই, কিচ্ছু নেই—তুমি আমাকে কোনদিন ভালবাস নি। কোনদিন না।

[হাসি ছিটকে বেরিয়ে যায়, সৌমেন বিষের পাত্র হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। হাসি ঘরের বাইরে আসে, রেলিংয়ে মাথা রেখে আঝোরে কাঁদে।]

[ঘরের মধ্যে সৌমেন একাকী—গভীর বেদনাহত মুখ। কেমন আনমনা। উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। হাসি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামে, বারান্দায় নিশ্চুপ দাঁড়ায়। ভরা মুখ। ভুরু কুঁচকে আছে। আচ্ছন্নের মত খুব আস্তে পা ফেলে। আনমনা, হঠাৎ দ্রুত একটা বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে থমকে

দাঁড়ায়। ঘাড় নাড়ে। মুখে ভীতির ছাপ, দুহাতে গলা চেপে ধরে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। এগিয়ে এসে একটা জানালা খুলে দেয়। আকাশে ঘন কালো মেঘ, ঝড়ের আওয়াজ। হাসি চুপচাপ দেখে, একটা ঘরে ঢোকে, টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসে। একটা কাগজে রমেনকে কিছু লেখে।]

[রমেনের অফিস। রমেন পরপর সিগারেট টানে। দ্রুত রিসিভারটা তুলে –]

রমেন। Miss Brown, please book a call to Hazaribagh – urgent, urgent. I am little worried.

[হাসি চিঠি লিখে। বাইরে ঝড়ের আওয়াজ। পর্দাটা ঝড়ে উড়ছে। হাসি লেখা শেষ করে কলম বন্ধ করে। উঠে চোখের জল মোছে। দরজার দিকে এগিয়ে যায়। কাঞ্চন দোতলার সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে আসে। খুব উদ্বিগ্ন দেখায় তাকে।]

কাঞ্চন। বৌদি! বৌদি! বৌদি, শিগগির একবার উপরে আসুন।

[হাসি ঘাড় ফেরায়।]

হাসি। কেন? কি হয়েছে?

কাঞ্চন। আপনার দাদা। টেলিফোন বাজছে শুনে উপরে গিয়ে দেখি আপনার ঘরের দরজা বন্ধ। কত ডাকছি। কিন্তু আপনার দাদার সাড়া পাচ্ছি না।

[হাসি ঘুরে দাঁড়ায়। আশংকার ছাপ সারা মুখে। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে উপরের দিকে তাকায়। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে ওঠে। বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। দরজা বন্ধ। পর্দা উড়ছে, ঝড়ের একটানা শোঁ শোঁ আওয়াজ। হাসি এগিয়ে যায়। দরজার ওপাশ থেকে ফোনের আওয়াজ। হাসি বন্ধ দরজায় হাত দিয়ে জোরে মারতে থাকে।]

হাসি। দরজা খোল, দরজা খোল। সৌমেন! সৌমেন।

[টেলিফোন, বিষের পাত্র, হাসি দরজায় ক্রমাগত ধাক্কা মারে। সৌমেন চুপচাপ বসে।]

হাসি। দরজা খোল, দরজা খোল।

[সৌমেন চুপচাপ বসে, চোখে সচকিত ভাব। ফোন বাজে, বাইরে দরজায় ধাক্কার আওয়াজ, আর হাসির গলা।]

হাসি। দরজা খোল।

[সৌমেন চেয়ারে হেলান দুপাশে হাত ছড়িয়ে বসে। একনাগাড়ে ফোন বাজে। বাইরে হাসির করুণ আকুতি]

হাসি। সৌমেন, দরজা খোল, দরজা খোল।

[ঝড়ের আওয়াজ। হাসির চোখে মুখে এক ভয়ের ছাপ, গাঢ় আংশকায় ভেঙে পড়ে হাসি।]

হাসি। না, না, না – না।

[হাসি গভীর কান্নায় ভেঙে দরজার কাছে বসে পড়ে। কাঞ্চন দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, ছুটে যায়।]

কাঞ্চন। বৌদি, বৌদি।

[কাঞ্চন সাড়া না পেয়ে দৌড়ে মাকে ডাকে, মা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, আলুলায়িত অবস্থা, শাড়ী ঠিক করতে করতে তিনি ছুটে যান। সৌমেন বসে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসেন মা]

কাঞ্চন। কোন সাড়া দিচ্ছেন না, টেলিফোন বেজে যাচ্ছে, আমরা কত ডাকছি কিন্তু কোন সাড়া নেই।

মা। সে কি?

[মা দৌড়ে হাসির কাছে যান। টেলিফোন বাজে।]

মা। বৌমা! ও, বৌমা! কি হয়েছে? কি হয়েছে, মা? কথা বলছ না কেন?

[হাসি আচ্ছন্নের মত তাকায়। চোখ নামিয়ে নেয়, উঠে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। মা দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকে। ফোন বাজে। ঝড়ের আওয়াজ।]

মা। সৌমেন। দরজা খোল। সৌমেন! দরজা খোল সৌমেন।

[সৌমেন একই রকম বসে, ফোনের আওয়াজ, ঝড়ের শব্দ। হঠাৎ পাত্র হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সৌমেন।

বাইরে হাসি রেলিং ধরে পাথরের মত দাঁড়িয়ে। মাথার উপর পাখির খাঁচাটা ঝড়ে দোলে।

মা দরজায় ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছেন, আর ডাকছেন। কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল-ফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকান। তারপর দৌড়ে যান]

মা। ওগো শুনছ! বৌমার দাদার কি হয়েছে। তুমি শিগগির যাও, ডাক্তার ডাকো।

বাবা। যাচ্ছি। যাচ্ছি।

[রমেনের অফিস। রমেন ফোনে কথা বলে]

রমেন। No reply! No! No, there must be some mistake, Miss Brown. please try again.

[রিসিভারটা ধরে রমেন কি যেন ভাবে, বিড়বিড় করে।]

[সৌমেন বিষের পাত্র হাতে বেসিনের কাছে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। বিদ্যুৎ চমকায়। পাত্রটা তুলে ধরে। আয়নায় দেখে নিজেকে। বিষটা ঢেলে দেয় বেসিনে। কলটা খুলে দেয়। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

হাসি একইরকম পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে। খাঁচাটা দুলছে, ঝড়ের আওয়াজ।

দরজা খুলে বেরিয়ে আসে সৌমেন। কাঞ্চন দেখে।]

কাঞ্চন। মা!

মা। কি হয়েছিল বাবা? তোমার কি হয়েছিল?

সৌমেন। বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মা। বাবা! কি সব্বোনেশে ঘুম—আমরা ভেবে মরি।

[নেপথ্যে]—আসুন, আসুন, এইদিকে আসুন।

মা। ওঃ। না, না। কিছু হয়নি, ওই তিনদিন তিনরাত্রি ঘুমোয়নি তো ট্রেনে—সেইজন্যে—

[সৌমেন আস্তে দু-এক পা বারান্দা দিয়ে এগোয়। হাসি পাশ দিয়ে দৌড়ে ঘরে ঢোকে। বিছানায় আছড়ে পড়ে। ফুঁপিয়ে কাঁদে। সৌমেন ঘরে ঢোকে। দাঁড়ায়। এগিয়ে এসে হাসির পাশে বসে।]

সৌমেন। হাসি!

[হাসি, চোখে জল, মুখ তুলে চায়।]

সৌমেন। হাসি। তোমার বিয়েতে কিছু দিতে পারিনি।

[পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে। হাসিকে দেয়।]

সৌমেন। আমার wedding gift.

[হাসি সৌমেনকে দেখে। সৌমেন তাকায়। পরক্ষণেই ঘাড় ঘুরিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ব্যাগটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে সোজা বারান্দা দিয়ে হেঁটে যায়। পাতলা সাদা পর্দাটা উড়ছে। ঝড়ের আওয়াজ। বিদ্যুৎ চমকায়। হাসি বিছানায় শুয়ে কাঁদতে থাকে।]

৯

[সন্ধ্যা। ঘর অন্ধকার। ঝড় বইছে। হাসি চুপচাপ বিছানায় বসে। ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ। হাসি খাট থেকে নামে। আলো জ্বালাতে যায়। ভাঙা গ্লাসের টুকরো পায়ে লেগে আওয়াজ হয়। আলো জ্বালে। আলোর সামনে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে।

বারান্দা দিয়ে রমেন, হাতে পোর্টফোলিও, আসে। সিঁড়ির মুখে দাঁড়ায়। উপরের দিকে তাকায়। মুখে হাসির ছোঁয়া। সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠে। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ায়। এদিক ওদিক তাকায়। মেঝেতে ভাঙা কাচের টুকরো। ঘাড় তুলে তাকায়। টেবিলে ফোনের পাশে একটা চিঠি কলম দিয়ে চাপা। বিছানায় এলোমেলো শুয়ে রয়েছে হাসি। এগিয়ে এসে চিঠিটা তুলে নিয়ে দেখে। চিঠিটা পড়ে রমেন।]

হাসি। "বিয়ের পর থেকে যে কথা তোমাকে বহুবার বলতে গিয়েও বলতে

পারিনি। আজ সেই কথা জানাচ্ছি। কারণ আর এক মুহূর্ত দেরী হয়ে গেলে, হয়ত সে কথা কোনদিন বলা হবে না।"

[চিঠি পড়া থামিয়ে রমেন বিমূঢ়ের মত হাসির দিকে তাকায়। তারপর আস্তে, আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে ঘরের বাইরে যায়। বিছানায় পড়ে থাকে হাসি, হতাশার প্রতিচ্ছবি যেন। শুয়ে থেকে, শোনে ক্রমঅপসৃয়মান জুতোর আওয়াজ।

রমেন চিঠি পড়ে—]

"একদিন সৌমেন আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে। বলে, আমাকে না পেলে সে বাঁচবে না। ওকে আমি না বলতে পারি না। আমি রাজী হই। কথা দিই, সৌমেনের জন্য আমি প্রতীক্ষা করব।"

[রমেন চিঠি পড়া শেষ করে কেমন স্থবির হয়ে যায়। দূরে পেছনে দরজা দিয়ে হাসি দেখে। রমেন বেরিয়ে যায়। অন্ধকার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। আলো জ্বালে। চিঠি পড়ে। এখন ঝড় থেমে গেছে। ঝিঁঝির আওয়াজ।]

—"জানি না, আমার ভাগ্যে কি আছে। জানি না, নিষ্ঠুর নিয়তি আজ আমায় কোথায় নিয়ে চলেছে। কিন্তু যাই ঘটুক না কেন, একটা কথা তোমাকে জানিয়ে যাই—আমি তোমাকে কোনদিন ঠকাইনি। বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে সত্যিই ভালবেসেছি। সেখানে কোন ফাঁকি নেই, কোন মিথ্যে নেই। আজ আমার সারা মন জুড়ে, আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে যে রয়েছে, সে তুমি। সেখানে আর কেউ নেই। কিচ্ছু নেই।

হাসি।"

[রমেন বারান্দায় এসে বন্ধ দরজার দিকে তাকায়। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছাদে যায়, অন্ধকার ছাদ। রমেন পায়চারী করে। হাসি নীচে দাঁড়িয়ে শোনে তার জুতোর শব্দ। ঠক ঠক-ঠক। হাসি খাটে বসে।

রমেন ছাদের কার্নিশের ধারে। একটানা ঝিঁঝির ডাক। সীমাহীন অন্ধকার। হাসি ছাদে উঠে অন্যদিকে হেঁটে যায়। দুজনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। রাতের গাঢ় অন্ধকার তাদের মধ্যে এক অসীমের বেড়াজাল সৃষ্টি করে। রাত ফিকে হয়ে আসে। কোকিলের ডাক শোনা যায়। দূরে কোথাও চার্চে ঘণ্টা বাজে। ভোর। হাসি তাকায় রমেনের দিকে। রমেন চোখ ফিরিয়ে নেয়। হাসি তাকিয়ে থাকে।]

হাসি। এখন তুমি কি করবে?

[রমেন এসে হাসির মুখোমুখি দাঁড়ায়।]

রমেন। এখন? সারারাত ট্রেনে জেগে এসেছি। ভীষণ টায়ার্ড। চল, ঘরে চল।

[হাসি মুখ তুলে বলে।]

হাসি। তুমি আমাকে কিছু বলবে না ?

[হাসি রমেনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফোঁপাতে থাকে।]

হাসি। তুমি আমায় ভুল বোঝ না লক্ষ্মীটি।

[রমেন জোর করে জড়িয়ে ধরে।]

রমেন। আমি তোমাকে ভালবাসি।

হাসি। তুমি আমাকে ফেলে যেওনা।

রমেন। চল।

[দুজনে পাশাপাশি হেঁটে ছাদ থেকে দরজা দিয়ে নীচে নামে।]

—

হরিসাধন দাশগুপ্ত

হরিদা

হরিদাকে, মানে হরিসাধন দাশগুপ্তকে চিনতাম সেই ইউনিভার্সিটিতে পড়ার দিনগুলো থেকে। সেটা ১৯৬৮/৬৯ সাল। শেষ কথা বলেছিলাম এ বছরের মে মাসে। মাঝখানের সময়ের প্রথম দিক জুড়ে আছে অসাধারণ সব স্মৃতি, শেষের দিকের কয়েক বছর প্রায় সব কিছু থেকে ডুব মারার জন্য আমাদের দেখাই হতো না মাসের পর মাস। আমার বাবা হরিদার বাবার ছাত্র ছিলেন ডাক্তারীতে। তাই হরিদার কাছে আমার ছিল বিশেষ খাতির।

অবশ্যই খুব বড় মাপের তথ্যচিত্র পরিচালক ছিলেন এদেশের। বড় ছবি 'একই অঙ্গে এত রূপ' দেখলে আজো বোঝা যাবে তাঁর দক্ষতা কিছু কম ছিল না কাহিনী চিত্রের ক্ষেত্রে। বরং তাঁর সময়ের অনেকের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। কিন্তু তখন সময় ছিল অন্য। পুরস্কারকে কি ভাবে ভালবাসতে হয় না বা নিজেকে বড় করে অন্যদের নস্যাৎ করতে হয় না বা সিনেমা ছাড়া অন্য কিছুর জন্য যে চিন্তা করতে হয় না সত্যিকারের সিনেমা-পাগল মানুষদের—এসব হরিদার জানা ছিল। লাজুক ছিলেন, আড্ডাবাজ ছিলেন, হিংসা বা পরশ্রীকাতর ছিলেন না আর জিনের সরবত তৈরী করে খাওয়াতে ও খেতে খেতে হো হো করে হাসতে পারতেন।

হরিদার দাদা কালীদা। কালীদার সঙ্গেও বহুকাল দেখা হয় না। দেখা হয় না সে সব দিনগুলোর সঙ্গেও। স্ক্রিপট লিখে পড়াতেন হরিদা। কালীদা ইংরেজি প্রেমের ছড়া অনুবাদ করে। আকাশে মেঘ জমতো, নানান মুখের অবয়বের রূপ নিতো। হরিদা বলতেন 'মেয়েরা মেঘের মতো বদলায়'! বদলাতে হয়। না হলে মানুষ বড় একঘেয়ে। হরিদা সেটা জানতেন, তাই আশ্চর্য হতে পারতেন তাড়াতাড়ি।

কয়েক বছর আগে পি. জি. হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে বলছিলেন, 'রেডি থেকো, বেরিয়েই ছবি করছি।' শেষ টেলিফোনে বলছিলেন, 'রেডি থেকো। শান্তিনিকেতন থেকে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটে যাচ্ছি। ফিল্ম নিয়ে কথা বলবো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। তারপর ছবি করবো।'

ছবি হচ্ছে। পুরস্কার হচ্ছে। ছুরি শানানোর আওয়াজ হচ্ছে। ইঁদুরদের দৌড়ে যাবার হরার শব্দ হচ্ছে। কত কি হচ্ছে। হরিদা কিন্তু আর হচ্ছে না। সময় বদলাচ্ছে। হরিদার মত গোটা একটা মানুষ আর হচ্ছে না। সিনেমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসার মত সিনেমা করিয়ে সামনের সময়গুলোতে আর বোধ হয় হচ্ছে না।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

ইতিহাস আমাকে উপেক্ষা করেছে

"ইতিহাস আমাকে উপেক্ষা করেছে। না না আমি তথ্যচিত্রের কোন পথিকৃৎ জনক-টনক নই—এসব বললে আমার সম্পর্কে বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আমি যা আমি তাই, তাই ভাবো এর বেশী কিছু নয়। হ্যাঁ, ইতিহাস আমাকে কোন মূল্যায়ন করেনি, হয়তো করার মতো মনেও করেনি। কারোর বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগও নেই। আমি ছবি করতে এসেছি একেবারে আচমকা। আসলে আমি তো ছবি করিয়ে হবো বলে ভাবিও নি। আমার প্রপিতামহ থেকে কেউই ছবির সঙ্গে যুক্তও ছিল না। আমারও হবার কথা নয়। আমি বিদেশে গিয়েছিলাম চাটার্ড একাউন্টেন্সি পড়তে। হিসাব কষা—ওঃ আমার সত্যি ঘেন্না লাগে—আমি, হ্যাঁ সত্যি বলছি, একাউন্টেন্সি আমি ঘৃণা করি।"

এটা ঠিক হরিসাধন দাশগুপ্ত জীবনে কখনও হিসেবী পা ফেলেন নি। ছবি করার আগে পরে বা ঐ সময়ে। জীবনকে গোছানোর ক্ষেত্রেও ছিল না কোন হিসাব। বলা যায়—একান্তই বেহিসেবী ছিলেন। তবে ছবি তৈরি করার সময়? ছবির কি কতটা লাগবে—হিসেব একদম নিখুঁত। ক্যামেরায় এ্যাঙ্গেল, মুভমেণ্ট, দৃশ্যভাগ, ছবির বিষয়বস্তুগত আঙ্গিক ভাবনায় শৈলী বিশ্লেষণেও প্রয়োজনীয় ব্যাঞ্জনাকে তুলে ধরার সময়, শট বিভক্তিতে, ঘাত-প্রতিঘাত রচনা সে ক্যামেরাই হোক বা সাঙ্গীতিক মূর্ছনাই হোক—হিসেব মাপা। সামগ্রিক ভাবে ছবিটি যেন কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুচ্যুত না হয় সে ব্যাপারে তাঁর প্রখর দৃষ্টি।

"আমি ছবি করার জন্য স্বপ্ন দেখতেই ভালবাসতাম। ছবির স্বপ্ন বা স্বপ্নের ছবি। স্বপ্ন দেখাটা আমার গোড়া থেকেই ছিল। অবশ্য সেটা শুরু হয়েছিল, আমি যখন বিলেতে এক হাসপাতালে প্রায় ছয় মাস শয্যাশায়ী ছিলাম। সেখানে হাসপাতালের বেডে শুয়ে শুয়ে ফিল্ম সোসাইটিজ মুভমেণ্ট নিয়ে বিস্তর পত্রপত্রিকা পড়তে পড়তে চলচ্চিত্র আন্দোলন বিষয়ে হঠাৎই একটা উৎসাহ আমার মনে গড়ে ওঠে। চলচ্চিত্র একটা শিল্প ওখান থেকে আমার বোধের মধ্যে আসতে থাকে। আমিও আগে বলেছিনা—স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি, সেইরকম কিছু একটা সেখান থেকেই মাথায় ঘুরপাক খেতে শুরু করে। ছবি করতে গেলে তো একটা প্রাথমিক শিক্ষাও লাগে—আর সেটা হলিউড ছাড়া সেই আমলে কে দেবে। চললুম হলিউড। জয়েন করলাম ইউনিভার্সিটি অফ সার্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়ায়। ওখানে কাজ করা শিখলাম আরভিং পিচেলের সঙ্গে—যিনি পরে আমাকে রেঁনোয়ার সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। রেনোয়াঁর রিভার ছবিতে এ্যাসিসটেন্ট-এর কাজ করলাম। রাইজ না ফল্ বুঝতে চেষ্টাও করিনি—কোন এ্যাসেসমেণ্ট করার কথাও না। আরভিং পিচেলের

সুপারিশে রেনোয়াঁর সঙ্গে কাজ করছি—এটাই একটা সাংঘাতিক কিছু—এটাই ছিল তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। বড় মানুষদের কাছাকাছি থাকলে বেশ কিছু শেখা যায় তবে সেটা অবশ্যই কৌতূহল নির্ভর একটা ব্যাপার।"

"বাংলা ছবি সম্পর্কে ইমপ্রেশন? মজার ব্যাপার কি জানো আমাদের বাংলা ফিল্মে দেখবে একজন বিলেত ফেরৎ বাবা কিংবা ঠাকুরদা—পরনে ড্রেসিং গাউন, মুখে পাইপ, কণ্ঠস্বর জলদ গম্ভীর, নামছেন সিঁড়ি দিয়ে—ব্যক্তিত্ব একদম শরীরে সর্বত্র ফুটে ফুটে বেরুচ্ছে। আমি তো বিদেশে গিয়েছিলাম আমার দাদাও বিদেশে ছিলেন। আমার বাবা, তিনিও বিলেত ফেরৎ। কিন্তু আমার কথা ছেড়েই দাও—আমার বাবাকে কখনও দেখিনি ঐ সব জমকালো মিনিংফুল পোশাকে—আর মুখে পাইপ? নাঃ নাঃ কক্ষণও দেখিনি। বিলেত সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা বাংলা ছবি একদম সাংঘাতিক করে দেয়—আমি তো সাহেবদের ওখানে সাহেবদেরও এসব করতে কখনও দেখিনি—আর ওকি চলাফেরা! কথা বলা—একেবারে যাচ্ছেতাই।" থামলেন হরিদা। আমাদের অনেকেরই হরিদা—বা হরিসাধন দাশগুপ্ত ওরফে হ্যারি এস্ দাশগুপ্ত—কেমনতর সাহেব ছিলেন? উনি—রাজপুর থেকে যোধপুর পার্ক সাইকেল রিক্সায় চড়ে আসতেন প্রতিদিন। রিক্সার গায়ে লেখা থাকতো হ্যারি এস দাশগুপ্ত—আভিজাত্য? তবে মানুষটা ব্যতিক্রমী ছিলেন সন্দেহ নেই। জন্ম-ধনী। শেষ দেখা শান্তিনিকেতনের প্রত্যন্ত গ্রামে। যতীন দাস রোডে যাঁর কৈশোর যৌবন কেটেছে, গ্রাম্য পর্ণকুটিরে তার পরনে লুঙ্গি, গা-খালি, হাতে নির্ভরতার সঙ্গী কি লাঠি। এই যে সহনশীলতা কখন কোথা থেকে এলো? কেমন করে? এ শিক্ষা কেমন করে নিলেন? হয়তো বাঁচতে ভালবাসতেন তাই? হয়তোও বা নাগরিক তীক্ষ্ণ কোলাহলমুক্ত জীবন থেকে নির্বাসনে চরাচরে নির্জনতার সঙ্গী হোতে ভালবাসতেন তাই। ওঁর বোধ? প্রবল আত্মাভিমান ছিল—কিন্তু প্রকাশ ভঙ্গীতে ছিল সহজাত শৃংখলা। জীবন থেকেই শিক্ষা নিয়েছিলেন—আস্থা স্থাপনের জন্য বিশ্বাস চাই—আর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আত্মবিশ্বাস ও ঔদার্য! ওঁর যৌবনকালে কারা কারা সব ছিলেন ওঁর বন্ধু হিসেবে—

"সত্যজিৎ রায়, কমলদা (কমলকুমার মজুমদার), রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, বংশী চন্দ্রগুপ্ত—ওঁদের সঙ্গে ইণ্ডিয়া কফি হাউসের আড্ডায় বসতাম। সত্যজিৎ বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ প্রথম হয় ওঁর বালীগঞ্জ গার্ডেনস্-এর বাড়ীতে। অসিত সেন আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। সত্যজিৎ বাবুর ব্যক্তিত্ব, চেহারার ডিগনিটি, গলার আওয়াজ—সবেতেই আমি একেবারে ইমপ্রেসড্ হয়ে গিয়েছিলাম। উনি ডি. জে. কীমারে ছিলেন। ওঁর অফিসে আমি অনেক যেতাম। সেখান থেকে হেঁটে ইণ্ডিয়া কফি হাউজ। ওঁর সঙ্গে ঘরে বাইরে ছবি করবো বলে ঠিক করেছিলাম—কথা ছিল দুজনে ছবিটা করবো। সত্যজিৎ

রায় চিত্রনাট্য লিখবেন, অজয় কর ক্যামেরা—তা ছবি তো করবো—ঘরে বাইরে, চিত্রস্বত্ব কী করে পাওয়া যাবে—শুনলাম নীতিন বসু ঘরে বাইরে ছবি করবেন বলে ঠিক করেছেন। এদিকে সত্যজিৎ বাবু চিত্রনাট্য রচনা করে ফেলেছেন। আমাদের কিন্তু চিত্রস্বত্ব নেই। কিনতে গেলে টাকা লাগবে—তা—কি হোল—সত্যজিৎ বাবু বলছিলেন—আরে মশাই এতো খেটে চিত্রনাট্য করলাম সে কি মাঠে মারা যাবে? যতীন দাস রোডের বাড়ী বিক্রী থেকে ২০,০০০ টাকা যোগাড় করে—বিশ্বভারতী থেকে চিত্রস্বত্ব কিনে ফেললাম—তবে—হ্যাঁ ঐ অবধি—ছবিটা আর করা হোল না। কারণ সবাই যে যার ভিন্ন ভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়লাম—এটাই বিশেষ কারণ বলতে পারো।"

এখনও সাক্ষাৎকার নিতে গেলে গলগল করে স্মৃতিনির্ভর ঘটনাসমূহ পর পর আসতে থাকে। হাসপাতালে শুয়েও পরপর বলতে পারেন। বলে থাকতেন। অনেক ছোট্ট ছোট্ট টুকরো টাকরা ঘটনা, একটা জীবন কত বৈচিত্র্যময়! বেকার। শেভ্রলে গাড়ী। কফি হাউজ। কাপের পর কাপ কফি উড়ে যাচ্ছে। পরিকল্পনা, স্বপ্ন আবারও কল্পনা—হরিদা। এ বড় রোমান্টিক সময়। "আত্মজীবনী লিখবো বলে ঠিক করেছি। না না মদ, সেক্স, নারী বিবর্জিত নয়, সব সব থাকবে—স্মরণে আসে তবে লিখতে পারিনা আজ কাল তেমন দ্রুত-সংবদ্ধ" চোখে ঝিকি ঝিকি অভিজ্ঞতা, ইতিহাস স্মৃতির আলোড়ন-আন্দোলন। না—কোন ক্ষোভ আক্ষেপ নেই। কেন মহৎ হতে পারলাম না—তার কোন বিশ্লেষণের ইঙ্গিতও নেই। "যে বড় হবার হয়েছে—যাঁর হবার কথা তিনি হয়েছেন—আমি? জানি না ইতিহাস কি বলবে কে জানে।"

"হ্যাঁ অতীত, অতীত সততই বর্তমান আমার কাছে—সব বারেবারে ফিরে ফিরে আসে। আমার সময়টা কেমন যেন ওখানেই থেমে গেছে—কি বলো—স্টপ ওয়াচ।"

"জীবন আর জীবনের মর্ম মুখোমুখি দাঁড়ালে / আমরা বুঝতে পারি / আমাদের ক্ষমা চাইতে হয়।" জীবনটাকে হরিদা বুঝতে চাইতেন—তবে জীবনের মর্ম সিদ্ধি, উপলব্ধি, কখনই তাঁকে স্পর্শ করেছে কি? আমি তো বুঝিনি। বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎ করেও না। আমি বুঝিনি—আ পারফেক্ট ডে, পাঁচথুপি, কোনারক, টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল, কোয়েস্ট অফ হেল, আওয়ার চিলড্রেন উইল নো ইচ আদার বেটার, ব্লেড নেভার ডাইজ্-এর পরিচালক, ভারতের স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্রের ইতিহাস বিশ্লেষিত নন। এক ছত্র লেখা আছে জগ মোহনের বইতে। Hari S. Dasgupta is another documentary producer of quality some of whose films have given some of finest moments of the cinema on the screen. (producer ?)

যুদ্ধ, মন্বন্তর, রাজনীতি, দেশভাগ, স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু, অর্থ নৈতিক অবিন্যস্ততা

ও তার মেরুকরণ, ধর্মের নামে মানুষের সংখ্যা ভাগাভাগি—এ অস্থির সময় হরিসাধনের যৌবন কেটেছে। স্বচ্ছলতা, সম্পদ ও যৌবন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কি? তাঁর অনুভবে প্রবেশ করেনি কি এইসব মর্মান্তিক দৃশ্যগুলি, তাঁকে করেনি বিমুক্ত ও আলস্যপীড়িত? "কিন্তু বেঁচে থাকার মধ্যে একটা অহংকার আছে। কারা কারা সব আমার বন্ধু ছিলেন—বলেছিতো—যাঁদের ইতিহাস উপেক্ষা করতে সাহস করবে না। ইতিহাস আমাকে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু সত্যজিৎ রায় ইতিহাস—আর তার এসোসিয়েট—গর্ব হবে না বলো? তবে উনি যে পরবর্তী জীবনে এত বড় এবং এত উঁচুতে উঠে যাবেন সেটা না বুঝতে পারলেও যেসব গুণ থাকলে অতবড় হওয়া যায় তার সব কটি গুণই তার মধ্যে ছিল।"

"আমি কত রকম মানুষ দেখেছি, কত বড়, কত কত মানুষ। আর মানুষ দেখার যে অহংকার সেটাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে—তখনও এখনও আজও—"

মানুষ দেখার কৌতূহল। জীবনের বিচিত্র দিকসমূহ দেখার জন্যই হয়তো বার বার বদলেছেন ঘর বাড়ি গৃহস্থালি। এক অট্টালিকা থেকে অন্য অট্টালিকা। এক পর্ণকুটির থেকে অন্য পর্ণকুটির। হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া, ফিরে আসা। শহুরে হরিদা গ্রামে থিতু হয়ে বসলেন—কোন অসন্তোষ গ্রাস করে নি। এক বোহেমিয়ান চরিত্র। এই মানুষ চরাচরে তীব্র নির্জনতার পাশাপাশি তীক্ষ্ণ নাগরিক কোলাহল। যাতায়াত তরল পদক্ষেপ, মনে মনে হয় তো বলতেন কবির মতো "আমি জয়ী নই, আমি পরাজিত নই, আমি এমনই একজন মানুষ"।

ভালবাসাতে বিশ্বাস করতেন। অনেকটা ছেলেমানুষ। কথা বলতে বলতে স্মৃতির অলিগলিতে ঘুরে বেড়ানো। বলতেন আমার কোন বন্দীত্বই ভালো লাগেনা। "আমি চাই মানুষের সঙ্গে থাকতে, ওদের সঙ্গেই থেকে যেতে—তাই তো ভালো—"

তাই হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের মউলি গ্রামে ১৯ অগাস্ট ১৯৯৬। মানুষের সঙ্গে থাকতে থাকতে চলে গেছেন। শেষ শয্যায় শরীর। শরীরে ছড়ানো ছেটানো লাল সাদা বুনো ফুল। তাঁর প্রতিবেশী পরম আত্মীয়রা জানতেন একজন বড় মানুষ চলে গেলেন। ওঁদের কাছ থেকে খাবার নিতেন—কুণ্ঠা ছিল না। ওঁদের কাছে থাকতেন—কোন কামনা ছিল না। হাসপাতালে শুয়ে শুয়েও স্মিত মুখে বলতেন—"তুমি আর আমার জন্য আপেল এনো না বরং—"

হরিদা আপনাকে নিয়ে আমার এমন ভাবতে ভালো লাগে—

"এই ভোরে
এত সুন্দরের কেন্দ্র চিরে
গল্পের বর্ণনা হয়ে হেঁটে যায় যে মানুষ
সে কি আমি?
ক্ষ্যাপাটের মত আমি মুখ মচকে হাসি।"

পুনশ্চ

হরিদা,

আপনার পাঁচথুপি প্রশংসিত কিন্তু আলোচিত নয়। আপনার কোনারক উড়িষ্যার মোহময় ভাস্কর্যের নিপুণ চিত্রকরণই মাত্র। টাটা স্টীলের তথ্যচিত্রটি বহু বড় মানুষকে জড়ো করারই কৃতিত্ব। আপনার দুটি কাহিনীচিত্রই কৃৎকৌশল অনালোচিত। ইতিহাস আলোচনা করে না। আলোচনাই ইতিহাসে বর্ণিত থাকে। বৃহৎ সমালোচকেরা 'বাঃ বেশ' অবধি বলেছেন—কিন্তু আপনিও জানেন পুংখানুপুংখ আলোচনা হলে হয়তো আপনার কীর্তিসমূহের মর্যাদা বাড়তো, নতুন প্রজন্মও শিক্ষিত হতে পারতো বেশী।

ইতিহাস আপনার প্রতি একটু বেশী রকম নির্মম। জেনে তো গেছেন।

অংশু শূর

পরাণ সখা বন্ধু হে আমার

'একই অঙ্গে এত রূপ' আর 'কমললতা' এই দুই ফিচার ফিল্ম করা সত্ত্বেও হরিসাধন দাশগুপ্ত ছোট ছবির জগতে ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকা একটা নাম। অথচ এমনও কেউ কেউ আছেন, ধরা যাক বারীন সাহার কথাই, 'তেরো নদীর পারে', এই একটি মাত্র ছবি করতেই যাঁকে আমরা পূর্ণ দৈর্ঘের ছবি করিয়ের দলে টেনে নিতে পেরেছি। অথচ হরিদা 'জলপথে' যাওয়ার আগে 'আমাকে লোকে ভারতে ছোট ছবির জনক বলে', ব'লে একটু লাজুক হাসি হাসলেও, যথেষ্ট 'সজল' হয়ে ওঠার পরেই বলতেন 'ধুত্তোর, কে চায় তোমাদের ঐ জনকত্ব! বড় ছবি করতে পারলেও সব আমি কেয়ার করতাম ভেবেছ।'

পারেননি কেন হরিদা! শাদা-কালো ফটোগ্রাফি এবং ফিল্ম মিউজিকের অমন চমৎকার ব্যবহার সত্ত্বেও ছবি দুটো যে তেমন জনপ্রিয় হয়নি তার কারণ কী! ষাট-সত্তরে এই দুই ছবির জন্মকালে কি ঐরকম মানের ছবি হরবখতই হোত! তা ত' নয়! তাহ'লে কি ছবি দুটি সময়ের চাইতে এগিয়েছিল! Ahead of the time নামের অনির্দেশ্য এক অঞ্চলে তাদের ঠেলে দেওয়ার মধ্যেই কি আমাদের সব ভাবনা চিন্তার জলাঞ্জলি ঘটে যাবে তবে!

'একই অঙ্গে এত রূপ' আর 'কমললতা'-র গুণগত মানের তফাত থাকলেও বক্তব্যের দিক থেকে বা তার রোমান্টিক বক্তব্যের জায়গায় একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য

আছে। হয়তো সেই সাদৃশ্যই হরিদাকে ফিচার ফিল্ম করিয়ে হতে না নেবার পিছনে মদত জুগিয়েছে। আবার প্রবলভাবে তাঁর ছবির গল্পকে তাঁর জীবনের কাছাকাছিও করে রেখেছে।

এই দুই ছবিতেই নারী একজন, পুরুষ দুজন। দুই ছবিতেই তৃতীয় ব্যক্তি ('একই অঙ্গে এত রূপ' ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং 'কমললতা' ছবিতে নির্মলকুমার) 'আউটসাইডার' নয়। শুধু আক্ষরিক ভাবেই নয় তা নয়, ভাবগত-ভাবেও নয়। এঁদের দুজনের কেউই 'ভিলেন নয়', দুজনেই আপাদমস্তক প্রেমিক। ভালবাসার মানুষটি (মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং সুচিত্রা সেন) অন্য মানুষকে ভালবাসছে জেনেও তারা তাদের নিজেদের কাছ থেকে মুহূর্তের জন্যেও মুক্তি পাচ্ছে না। আর তাদের সেই প্রবল বন্ধন, যে নারী অন্য পুরুষকে ভালবাসছে সেও অস্বীকার করতে পারছে না। 'একই অঙ্গে এত রূপ'-এর 'পরাণসখা' 'কমললতা'-র 'সে বিনে আর জানেনা'-র 'সে'-র মধ্যে লুকিয়ে রাখছে দুটি পুরুষের অস্তিত্বকে, কোন ব্যাকরণ না মেনেই।

এই তৃতীয় ব্যক্তিটিকে কেন জানিনা শনাক্ত করা গিয়েছিল হরিদার নিজের মধ্যেও। হরিদা যেন নিজের জীবনেও গহর (নির্মলকুমার) কিংবা সৌমেন (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়)-এর মতই তাঁর জীবন মরণ জুড়ে ভালবেসেছিলেন সেই নারীকেই যে তাঁকে আঘাত করেছিল, অপমানও কি করেনি! শেষ পর্যন্তও যে একটু খোলামেলা বাতাস দিলেই হরিসাধন দাশগুপ্ত বলতেন, সোনালী ত' একটু 'বেশী'ই ছিল আমার মত মানুষের পক্ষে। আর তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর ওর জীবনের কোথাও এ মানুষটা নেই! এ ত' হয়না। হতেই পারে না'। হরিসাধন দাশগুপ্ত ভালবাসতে পারতেন। ভালবাসায় বিশ্বাসও রাখতেন!

সেই ভালবাসার চরিত্র সব সময় মিলত না বটে অনেকের সঙ্গে। তাই তাঁর ছবিকেও 'ততটা জনপ্রিয় নয়'-এর তালিকায় থাকতেই হয়। মিল ছিলনা যে অনেক কিছুর সঙ্গে।

সুনেত্রা ঘটক

হরিদা

পরিণত বয়সে হলেও হরিসাধন দাশগুপ্তের আকস্মিক প্রয়াণ তাঁর অনুরাগীদের কাছে গভীর বেদনাদায়ক। প্রায় অর্ধ শতক পূর্বে নবীন ভাবধারার বাহক হয়ে তিনি দেশে ফিরেছিলেন চলচ্চিত্রে তাঁর স্বাক্ষর রাখবার বিপুল আগ্রহ নিয়ে। আমেরিকায় শিক্ষানবীশী চলচ্চিত্র শাস্ত্রে কিছু করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে গেঁথে দিয়েছিল। কেতাদুরস্ত হলিউডী কায়দা তাঁর বাইরের খোলস মাত্র। এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি মোটামুটি ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং তাই তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা হল ওদেশের প্রযোজকের মতো এখানে তাঁর প্রথম সোপান থেকেই চলচ্চিত্র নির্মাণে ওদেশের ধ্যানধারণা ও কর্মপ্রচেষ্টায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করবেন। ছবি প্রযোজনার সুরু থেকে অর্থসংগ্রহ, খুঁটিনাটি ব্যবস্থাপনা, উপযুক্ত ব্যক্তিদের সৃষ্টিমূলক কাজে নিয়োগ, এসবেই হরিদা তাঁর আরদ্ধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে ব্রতী হলেন। এদেশের পরিবেশে, বিশেষত চলচ্চিত্রের পঙ্কীল দুনিয়ায়, এই সদিচ্ছা অনেকের কাছে বেমানান বা উটুমার্গের চিন্তা বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু হরিদা ছিলেন তাঁর বিবেকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। স্বাধীনতার ঠিক পরমুহূর্তে অনেক আশা নিয়ে বিদেশ প্রত্যাগত এক নবীন যুবার কাছে এই মনোভঙ্গী স্বাভাবিক মনে হয়েছিল এবং এক স্বপ্নের হাতছানি তাঁকে দিকনির্দেশে সহায়তা করল।

তাঁর আশংকা ছিল কলকাতায় এক দমবন্ধ করা আবহাওয়ায় তাঁকে পড়তে হতে পারে। তাই প্রথমেই তার অনুরূপ মানসিকতার অন্যান্য ব্যক্তিত্বের সন্ধানে সচেষ্ট হলেন। সত্যজিৎ রায়, কমলকুমার মজুমদারের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ে তাঁর প্রাত্যহিক একাকীত্বের সমস্যার সুরাহা হল। কয়েক মাস আগেই ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির পত্তন হয়েছে। সাগ্রহে যোগ দিয়ে বিলেত ও আমেরিকায় যে পরিবেশে কয়েক বছর সিনেমায় নিবিষ্ট হতে পেরেছিলেন সেই মানসিক পুষ্টির জন্য আরো অনেকের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুললেন। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, অসিত সেন, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, বংশীচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে শরিক হলেন। সেই সময়ের সেনট্রাল এভিনিউ কফি হাউস, ফিল্ম সোসাইটিতে সহকর্মীরা এক নতুন আশার সৃষ্টি করে তুললেন। কলকাতায় সাহিত্য, সংগীতের বিশিষ্ট জগতের পাশাপাশি ছায়াছবির প্রতি উৎসর্গীকৃত এই গোষ্ঠির উন্মাদনা সেই থেকে কলকাতার সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার অংশ হয়ে আছে।

চল্লিশ দশকের শেষ পর্যায় শুধু হরিদার ব্যক্তিগত জীবনেই নয় কলকাতার সাংস্কৃতিক মানচিত্রেও বিশেষ জায়গা নিয়ে আছে। এসময়ে রেনোয়া কলকাতায় এলেন তাঁর দি রিভার ছবি নির্মাণের উদ্দেশ্য নিয়ে। হরিদা সম্পর্কে শুনেছিলেন,

এখানে যোগাযোগ হল। রেনোয়ার কলকাতা বৃত্তান্ত অবশ্যই সত্যজিৎ রায়ের লেখায় অনেকে জেনেছেন। হরিদা ছবির জন্য আরো অনেককে সোৎসাহে একত্র করলেন। একদিকে বংশীচন্দ্র গুপ্ত, রামানন্দ সেনগুপ্ত, অভিনয়ের জন্য সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়—এছাড়া ফরাসী ভাষা-সংস্কৃতি বিশারদ কমলকুমার মজুমদার। রেনোয়ার কলকাতা বাসের প্রভাব শুধু তাঁর ছবিতেই নিবদ্ধ ছিল না। বেশ কয়েকজন বাঙালী আত্মানুসন্ধানীর উৎসাহ, উদ্দীপনায় অভূতপূর্ব এক জোয়ার এলো। নতুন এই চিন্তা উন্মোচনে তাঁর বিশেষ ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে।

নতুন কিছু করার তাগিদে হরিদা 'ঘরে বাইরে'র স্বত্ব কিনলেন। সত্যজিৎ চিত্রনাট্য লিখবেন, তিনি পরিচালনা করবেন, হলিউড ও রেনোয়া যেন হরিদার ভাবনায় এক হয়ে উঠল। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও তিনি বাধা অতিক্রম করতে পারলেন না। এখানে বস্তাপচা ধারণা, গ্রাম্যতা, স্থূল বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে বিচলিত করল। কিন্তু নৈরাশ্য তাঁকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারেনি। যাত্রারম্ভে আশাভঙ্গেও তিনি হাল ছাড়েননি।

হরিদা ভাবনা চিন্তায়, কাজেকর্মে পারফেক্সনিস্ট হতে চেয়েছেন। তাই বোধহয় প্রথম ছবির নাম 'এ পারফেক্ট ডে'—বিজ্ঞাপন বিষয়ক হলেও আকাঙ্ক্ষায় অনুভবে, কাহিনীচিত্রণে পারফেকসনের চূড়ান্ত। সযত্নে অংকুরিত বন্ধুগোষ্ঠি হাত মিলিয়েছেন এই ছবিতে—সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্যে, চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রযোজনায়। অজয় কর ক্যামেরার নিপুণতায়, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত ও রণেন রায় চরিত্রচিত্রণে। ছবি ভালই উতরেছিল।

তৎকালীন অনেক বিদেশী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতার ঠিক পরের সময়ে তাদের ইমেজ মজবুত করার জন্য বেশ কয়েকটি ডকুমেনটারী প্রযোজনা করেছিল। হরিদা যে এদেশে এধরনের ছবির ক্ষেত্রে প্রধান পুরুষ হতে পেরেছিলেন তার পেছনে এদের উদ্যোগ অনেকাংশে সহায়ক হয়েছিল। 'কোনারক' চিত্রনির্মাণে হরিদা তাঁর চিন্তাভাবনার পরিণতির স্বাক্ষর রেখেছেন। পৃথ্বীশ নিয়োগীর সন্দর্ভ ভিত্তিক জটিল এই বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা পরিচালকের পরিমিতিবোধের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ক্লদ রেনোয়ার ক্যামেরার ভাষা, রমেশ থাপারের ভাষ্যপাঠ, মন্দিরের কারুকার্য, ওড়িশার পরিবেশ, ভক্তদের আকুলতা—সব মিলিয়ে দর্শককে এক অনাবিল স্বচ্ছতা ও শিল্পসৌষ্ঠবে আবিষ্ট করে। এই সাফল্যের পর হরিদাকে আর অনেকদিন ফিরে তাকাতে হয়নি। শৈল্পিক ও বৈষয়িক সাফল্য এখন তাঁর অনায়াস আয়ত্ত।

গোটা পঞ্চাশ দশক ধরে হরিদা তাঁর think big act big ধারায় বেশ কয়েকটি ছবি উপহার দিয়েছিলেন। 'উইভারস অফ মাইনডারগি' 'পাঁচথুপি' তাঁকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। 'মালাবার স্টোরি'তে তাঁর পরিচিতি

বিদেশও ছড়িয়ে যায়। 'স্টোরি অফ ষ্টিল'এ তিনি সত্যজিৎ রায়, রবিশঙ্কর ও রুদ রেনোয়া এই শ্রেষ্ঠ কুশলী ত্রয়ীকে একত্র করে অনুপম গুণসম্পন্ন ছবি তৈরী করলেন। হরিদার ছবিতে মনন ও কল্পনার মেলবন্ধন এদেশের ডকুমেনটারীর ক্ষেত্রে অভাবনীয়। এর সংগে কারিগরী কুশলতা পারফেকশনের নিরিখে যে উচ্চপর্যায়ে পৌঁছেছিল একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। 'পাঁচথুপি' ছবির প্রযোজক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের হস্তশিল্পের সৌষ্ঠব ও বিকাশের এক অনন্য চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। হরিদা বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান উপস্থাপিত করে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করলেন। সমসাময়িক উত্তরসূরীদের কাছে ছবি তৈরীর অনেক শিক্ষণীয় বিষয় এই ছবিগুলির উপকরণে পাওয়া যায়।

ষাটের দশকে হরিদা কাহিনীচিত্র পরিচালনায় এগিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে তাঁকে ব্যক্তিগত জীবনে অনেক ঝড় সামলাতে হয়েছে। স্ত্রীর সংগে ছাড়াছাড়ি, প্রতিভাবান অনুজ বুলু দাশগুপ্তর মর্মান্তিক মৃত্যু তাঁকে অবিচলিত থাকতে দেয়নি। 'একই অঙ্গে এত রূপ' কাহিনীচিত্র তিনি অনেক আশা নিয়ে করেছিলেন। আলী আকবর খানের সংগীতে, মাধবী ও সৌমিত্রর অভিনয়ে উজ্জ্বল এই ছবি এডিনবরা উৎসবে সমাদৃত হয়েছিল। 'টাইমস' পত্রিকায় সত্যজিৎ রায়ের পরে ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেনের পাশাপাশি হরিসাধন দাশগুপ্তর উপস্থিতি এদেশের ছবির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বলা হয়েছিল। এরপর 'কমললতা' ছবিতে অবশ্য বিশেষ স্বীকৃতি মেলেনি। এ দুটির পর হরিদার কাহিনীচিত্রের ক্ষেত্রে অভিযানের সমাপ্তি ঘটল।

সত্তরের দশকে কলকাতা বন্দর নিয়ে ছবির সময় থেকেই অগ্রজতুল্য হরিদার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌঁছয়। বন্দরের তদানীন্তন জনসংযোগের ভারপ্রাপ্ত স্নেহাংশু ভট্টাচার্য একজন কবি এবং আমরা বেশ কিছুদিন একঘরে কাটিয়েছি। অনেক স্যুটিং-এ এবং অবসরে হরিদার সঙ্গ আমাদের বিশেষ ভাবে উজ্জীবিত করেছিল। ১৯৭৮-এর বিধ্বংসী বন্যার পরে রাজ্য সরকার একটি ছবির প্রস্তাব হরিদাকে দেন সেখানে বন্যার চেহারা, মানুষের সংকট, খয়রাতি ইত্যাদি এবং পুনর্গঠনে গুরুত্ব দেওয়া হবে। চলচ্চিত্র বিজ্ঞানে যুক্ত থাকায় আমি হরিদার সাথে দক্ষিণবঙ্গের অনেক জায়গায় নৌকো, গাড়ি এমনকি হেলিকোপ্টারেও যাতায়াত করে স্যুটিং করেছিলাম। তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুরা হরিদার দুর্ভাগ্য নিয়ে অনেক সময় খেদ প্রকাশ করতেন—আমি এই ছবির সময় সেটা যেন প্রত্যক্ষ করলাম। পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত বিমল রায়ের বর্ধমানে স্যুটিং-এ এসে হঠাৎ মৃত্যু হল। মৃতদেহ নিয়ে আমরা কলকাতায় ফিরলাম। ছবি শেষ করতে দেরী হল। মনে হল বিচলিত হলেও হরিদা ভেঙ্গে পড়েন নি। এরকম বিপত্তি হরিদা জীবনের স্বাভাবিক স্রোতের অংশ হিসাবে মেনে নিয়েছেন।

১৯৮০ নাগাদ হরিদা একদিন বাড়ি এসে বললেন তাঁর মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। সে সময় রাজ্যসরকার বেশ কয়েকটি ডকুমেনটারীও কাহিনী চিত্র প্রযোজনা করছেন। হরিদা বললেন তাঁর পুরানো বন্ধু রবিশংকর কলকাতায় আসছেন এবং কিছুদিন থাকবেন। কাজেই এই সুযোগে রবিশংকর অনায়াসেই একটি ছবির বিষয় হতে পারেন। তাকে যোগাযোগ, রাজী করানো হরিদার দায়িত্ব। মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এসব বিষয়ে গভীর আগ্রহী। তাঁকে বিষয়টি জানাতে তিনি বললেন ব্যাপারটা কিভাবে সম্পন্ন হলে একটি উন্নতমানের তথ্যচিত্র হতে পারে সেটা দেখতে। আমি জানালাম যদি রবিশংকর ও সত্যজিৎ রায়কে একত্র করা যায় এবং টিভি ছবির ধাঁচে In conversation ছবির অনেকটা অংশে রাখা যায় তাহলে হয়ত ছবিটি একটি বিশেষ চেহারা পাবে। সত্যজিতের সঙ্গে হরিদা ও আমি দীর্ঘ আলোচনা করি। দুর্ভাগ্য, শেষে জানা গেল রবিশংকর সেবারে কয়েকদিনের বেশী থাকতে পারবেন না।

আরো বেশ কিছু ভাবনা হরিদার ছিল। গত দশ বছরে টিভিতে ছবির কথাও ভেবেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নৃত্যনাটকের দশটি এপিসোডের একটি কনসেপ্ট নোট তৈরী করেছিলেন—সেটা আমি দেখেছি। সূচনার পর ডাকঘর, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, শেষরক্ষা, নটির পূজা, তপতী, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ইত্যাদি এতে ছিল। কিন্তু বেশীদূর আর এগুতে পারেননি। আমি পুরোপুরি জানি না কেন এটা করা যায়নি।

গত বছর শান্তিনিকেতনে এক কুটিরে যেখানে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন যেখানে oral history প্রোগ্রামে সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা টেপে লিপিবদ্ধ করি। গৌতম ঘোষও সঙ্গে ছিলেন। ব্যক্তিগতও পেশাগত অনেক অভিমান, মনোবেদনা, পারিবারিক শোকের হাহাকার তাঁকে বিচলিত, বিপর্যস্ত করলেও তাঁকে প্রতিহত করতে পারে নি। তাঁর স্বাভাবিক মাধুর্যে দুঃখ-শোকে অন্তর্হিত হতে দেখেছি। অনুরাগীদের সঙ্গ ও সাহচর্য তাঁর একান্ত কাম্য ছিল। আড্ডা, আমোদ-প্রমোদ ছাড়া হরিদার অস্তিত্ব অকল্পনীয় ছিল। বয়সের ব্যবধান কোন বাধা হয়ে ওঠেনি।

শান্তি চৌধুরী, প্রমোদ লাহিড়ি, মৃগাংক রায় ও আমি বহুদিন ধরে তাঁর সঙ্গ উপভোগ করেছি নানা জায়গায়। দেখতাম তিনি যতটা প্রমোদপ্রিয় ততটা হয়ত শান্তিপ্রিয় ছিলেন না। মধ্য কলকাতার এক আস্তানায় নাচগানের এক আসরে একটি মেয়ে গাইত 'মেরা নাম হ্যায় চামেলী'—হরিদা বললেন আমাদের অ্যানথেম এটাই। পরে একবার পার্ক হোটেলের অভিজাত কক্ষে মেয়েটিকে দেখলাম হোটেলের নৃত্যপটিয়সী রূপে, অন্য নামে অবশ্যই। পার্কষ্ট্রীটের পানশালার সান্ধ্য আড্ডায় (কখনো বিখ্যাত অভিনেত্রী সঙ্গে নিয়ে হরিদা আসর জমাতেন) বলতেন, One must do things in style. উপভোগ্য কাহিনী সব বলতেন—

ক্যালিফোর্নিয়ায় উনি যখন ছিলেন তখন জুলফিকার আলী ভুট্টোও ছাত্র। রাধকৃষ্ণণ নাকি একবার এসে নাইট ক্লাবে যাবার বায়না ধরেছিলেন, তার ব্যবস্থা হরিদাকে করতে হল। রামকিংকর নিয়ে ছবি যা সমাপ্ত হয়নি—এবং এ নিয়ে গল্প শেষ হতো না। শিল্পী শান্তিনিকেতনে সন্ধেবেলায় হরিদা এলে বলতেন আপনারা খান মুড়িমুড়কী আর আমি সন্ধে হলে পানীয়ের সঙ্গে গলাঃধকরণ করি—মুড়ি-মুরগী! মুরগীর টুকরো দিয়ে মুড়ি খাওয়া। আস্তানা পালটাতে হরিদার জুড়ি ছিল না। সাদার্ণ এভিনিউ-এর পৈতৃক প্রাসাদ থেকে প্রত্যাপাদিত্য রোড। যেখান থেকে টালিগঞ্জের কবরখানার পেছনে এক বন্ধুর বাড়ি। হঠাৎ চলে গেলেন সোনারপুর, সেখানে দেখাশোনা করার কেউ ছিল। তারপর শান্তিনিকেতনে—অবশেষে চিরশান্তি।

একবার কয়েকবছর আগে কলকাতায় এলেন অসুস্থ হয়ে। গৌতম ঘোষ জানালো কিছু করতে হবে। মৃণালবাবু (সেন) স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ফোন করলেন। গৌতম পি. জি. হাসপাতালে নিয়ে গেল। সরকারী ব্যবস্থায় কার্পণ্য ছিল না। ডাক্তার, নার্স, কর্মী হরিদার স্বভাবে, ব্যবহারে অভিভূত। সুস্থ না অসুস্থ পুরোপুরি বোঝা যাচ্ছে না—হরিদার কাছে সেটা তো একটা state of herd. বেশ কিছুদিন খেল। ভক্ত, অনুরাগীদের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে লাগল হাসপাতালে। সময় অসময় যেখানে বেমানান। সৌভ্রাত্রে বাঁধা পড়লেন অন্যান্য রোগীরাও। বিকেলে দক্ষিণের বারান্দায় নির্ভেজাল আড্ডা। হাসপাতালে থাকবার সময়সীমা অনেকদিন পেরিয়েছে। অবশেষে অনেক বুঝিয়ে, প্রয়োজনে আবার ওখানে আনবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হরিদাকে হাসপাতাল থেকে শান্তিনিকেতনে পাঠানো হল। মানুষ হিসেবে, বন্ধু হিসেবে, শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে, তাঁর তুল্য চরিত্র আমার অভিজ্ঞতায় বেশী দেখিনি। তাঁর গুণপনা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হলেও অনেকে তাঁকে ভাগ্যহত মনে করতেন। অনেক সুযোগ সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। হয়ত তাঁর ঢিলেঢালা স্বভাব, সঙ্গসুখের অভিলাস অনেক সময়েই তাঁকে প্রয়োজনীয়কৃত্য থেকে সরিয়ে রেখেছিল। শেষ জীবনে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পরবাসে কাটালেন। কিন্তু দূরকে নিকট ও পরকে ভাই করার মানসিক রসায়ন তাঁকে সম্ভাব্য নির্বাসন থেকে মুক্ত রেখেছিল।

তাঁর শারীরিক অনুপস্থিতি কয়েক দশক পরিব্যাপ্ত একযুগের অবসান হলেও আমাদের স্মৃতিতে তিনি ভাস্বর হয়ে থাকবেন।

প্রবোধকুমার মৈত্র

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ের বই

বিলুপ্ত জনপদ প্রচলিত কাহিনী (দীপংকর লাহিড়ী)	৭৫.০০
স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা সাধক (গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত)	৫০.০০
রাজনীতি (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ)	১৫.০০
রক্তের অক্ষরে (কমলা দাশগুপ্ত)	৪০.০০
অগ্নিযুগ ও বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত (সংযুক্তা মিত্র)	৪০.০০
রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)	৫০.০০
কাশীদাসী মহাভারত (দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) ১ম, ২য় (প্রতি খণ্ড)	৬০.০০
লোরচন্দ্রাণী ও সতী ময়না (দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত)	৬৫.০০
ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য (শশিভূষণ দাশগুপ্ত)	৬০.০০
উপনিষদের কথা (সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়)	১০.০০
উপনিষদের দর্শন (হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়)	২০.০০
ঠাকুরবাড়ির কথা (হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়)	৬০.০০
যথা নিযুক্তোঽস্মি (মহেন্দ্রনাথ দত্ত)	২০.০০
বাংলা ভাষাচর্চা (সুভাষ ভট্টাচার্য)	২৫.০০
রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি (সুধাংশুবিমল বড়ুয়া)	২৫.০০
গীতার কথা ও সাধনা (মহেন্দ্রনাথ দে)	১৫.০০
স্বামী প্রেমানন্দ তীর্থ (বিশ্বতোষ চট্টোপাধ্যায়)	১২.০০
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী (মহেন্দ্রনাথ দত্ত)	১২.০০

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ● কলকাতা ৭০০ ০০৯

Bivav **Reg No. 30017/76**

Price : Rs 40.00
Vol. 18 No 3

Special Autumn Issue 96
April–June 96
July–Sept 96

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NO ISSN 0970-1885

Enjoy
Coca-Cola
Coke
TRADEMARKS REGD.

CALCUTTA SOFT DRINKS PVT. LTD.

P-41 TARATALLA ROAD
CALCUTTA - 700 088
CABLE : CALBISLERI

Phone : 478-4013/4014
478-4994/4442
468-4838
468-4839

Fax : (033) 478-4142